ভেঙ্গে গেল তলোয়ার

নসীম হিজাযী



ভেঙ্গে গেলো তলোয়ার

নসীম হিজাযী

অনুবাদ ঃ
সৈয়দ আবদুল মান্নান



Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

ভেঙ্গে গেলো তলোয়ার

নসীম হিজাযী

প্রকাশক
এস এম রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশ কাল
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৪
৮ম সংস্করণ ঃ মে - ২০১০

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ ২৩০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫১-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।

Bhenge Gelo Taloar Written by NaseeOm Hiszajee. Translated in to Bengali by Syeed Abdul Mannan. Published by: S.M. Raisuddin, Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.
Price: Tk. 230.00 US$: 11.00 **ISBN.984-493-002-2**

প্রকাশকের কথা

'ভেঙে গেলো তলোয়ার' মহীশুরের জননন্দিত শাসক টিপু সুলতানের বীরত্বপূর্ণজীবনকাহিনী অবলম্বনে নসীম হিজাযী রচিত একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। নসীম হিজাযী এদেশের পাঠক সমাজে বহুল পরিচিত একটি নাম। ইতিহাসকে উপজীব্য করে তাঁর রচিত সকল উপন্যাস পাঠক সমাজে দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছে।

মহীশূরের বীর শাসক টিপু সুলতানের যে তলোয়ার বৃটিশদের বুকে ত্রাসের সঞ্চার করতো, হায়দারাবাদের নিজাম ও দুর্দান্ত মারাঠা জাতির মিলিত শক্তি যে তলোয়ারে আঁচড় লাগাতে পারে নি; সেই তলোয়ার ভেঙে গেলো মহীশূরের দেওয়ান ও টিপু সুলতানের কুটুম্ব মীর সাদিকের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার কাছে। গাদ্দার মীর সাদিক মহীশূরের পতনের আগেই কতল হলো। মৃত্যু দিয়ে বুঝতে পারলো সে বেঈমানী করে শুধু স্বদেশের ও স্বজাতির স্বাধীনতা নিয়ে সওদা করে নি, নিজ স্ত্রী-কন্যাদের ইযযতেরও সওদা করেছে। মহীশূরের পতনের পর হয়ত বা তার বিদেহী আত্মা দেখতে পেয়েছিল ইংরেজ কর্তৃক তার স্ত্রী-কন্যার লেবাস ছিনিয়ে নেয়ার এক পাশবিক দৃশ্য। মহীশূরের সিংহ-শার্দুল পরাজিত হলো এবং এর সাথে পতন ঘটলো ভারতের স্বাধীনতার শেষ শক্তিশালী দুর্গটির।

একথা সত্যি, বিনোদন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। বঙ্কিম চন্দ্র ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু হিন্দু জাত্যাভিমানের কাছে তিনি ইতিহাসের সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। মীর মোশারফ হোসেন ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনিও বিনোদন এবং ভাবোচ্ছ্বাসের কাছে ইতিহাসের সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। কিন্তু ঔপন্যাসিক নসীম হিজাযী এর ব্যতিক্রম। তিনি ইতিহাসের নির্জলা সত্যকে তুলে ধরতে গিয়ে বিনোদনকে ক্ষুণ্ন করতে দ্বিধা করেন নি। নিঃসন্দেহে, এই সততার জন্যে নসীম হিজাযীর রচিত উপন্যাস সর্বকালের পাঠক মনকে আকৃষ্ট করার জন্যে এক চিরায়ত ভিত পেয়েছে।

বস্তুতঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান অনূদিত "ভেঙ্গে গেলো তলোয়ার" পুস্তকখানা নসীম হিজাযী রচিত "আউর তলওয়ার টুট গেয়ী" পুস্তকের বাংলা অনুবাদ। এই পুস্তকটি বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ কর্তৃক সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। এর দ্বিতীয় "সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। অতঃপর ছয় বছর পর ২০০২ সালে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পঞ্চম সংস্করণ হয় ২০০৫ সালে ৬ষ্ঠ সংস্করণ হয় ২০০৬ সালে, ৭ম সংস্করণ ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে উপন্যাসটির ৮ম সংস্করণ প্রকাশিত হলো।

পরিশেষে, কিছুকাল আগে বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক প্রচারিত টি ভি সিরিয়েল "দি সোর্ড অফ টিপু সুলতান" যেভাবে দর্শক হৃদয়ে আলোড়ন তুলেছিল, একই কাহিনী অবলম্বনে 'ভেঙে গেলো তলোয়ার' পুস্তকখানাও পাঠক সমাজে সমাদৃত বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

(এস এম রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রসংগ কথা

পাঠক মহলে ঔপন্যাসিক নসীম হিজাযীকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি উপমহাদেশের সার্থক ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের অন্যতম। জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় রচিত তাঁর উপন্যাসগুলো নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধ, মূল্যবোধ জাগরণ এবং জাতিসত্তার স্বকীয় অনুভূতির উজ্জীবন ফলপ্রসু ও সুদূর প্রসারী অবদান রেখেছে।

নসীম হিজাযীর উপন্যাসের ভিন্নরূপ স্বাদ, বৈশিষ্ট্য এবং স্বতন্ত্র সাহিত্য মূল্যের কথা বিবেচনা করে কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি তাঁর সবগুলো উপন্যাস বাংলায় অনুবাদের গ্রন্থস্বত্ব গ্রহণ করে অতীতে অনেকগুলোই প্রকাশ করেছিল। স্বাধীনতার পর "ভেঙ্গে গেলো তলোয়ার" বাংলাদেশ কো-অপরেভি বুক সোসাইটি লিঃ প্রকাশিত নসীম হিজাযী রচিত তৃতীয় উপন্যাস।-যা "আউর তলওয়ার টুট গেয়ী"-এর বাংলা তরজমা। ১৯৬৩ সনে বাংলাদেশ কো-অপরেটিভ বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রথম প্রকাশের সুদীর্ঘ দুইযুগ পর ১৯৮৩ এর দ্বিতীয় এবং ১৯৯৬ সালে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমানে বইটি বাজারে না থাকায় চতুর্থ সংস্করণ হিসেবে এ উপন্যাসটি আবার পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বাংলায় অনূদিত নসীম হিজাযীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে "শেষ প্রান্তর," "মরণ জয়," "খুন রাঙা পথ" "মুহাম্মদ বিন কাসিম", কাইসার ও কিসরা", মাটি ও রক্ত", "সোহাগ", "শেষ সময়", "কাফেলায়ে হিজায" ইত্যাদি। এক সময় এ অনুবাদ গ্রন্থগুলো পাঠকদের মধ্যে নসীম হিজাযী ও তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে প্রভূত কৌতুহল ও আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। "ভেঙ্গে গেলো তলোয়ার"- এর এবারের প্রকাশনাও পাঠক মহলে সমভাবে সমাদৃত হবে আশা করি।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম চন্দ্র, শরৎচন্দ্র এক সময় উপন্যাসকে হাতিয়ার করে হিন্দু সমাজের সংস্কার এবং উন্নয়নের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এক সময় একই উদ্দেশ্যে ইমদাদুল হক লিখেছিলেন "আবদুল্লাহ", নজিবর রহমান খান লিখেছিলেন "প্রেমের সমাধি", "আনোয়ারা", "মনোয়ারা" ইত্যাদি। এ সমস্ত উপন্যাস শরৎ সাহিত্যের ন্যায় রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। তবে মীর মোশারফ হোসেন বিষাদ সিন্ধুর মাধ্যমে মুসলিম বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছেছিলেন। নসীম হিজাযী ঔপন্যাসিক। তার উপর তিনি একজন দরদী সমাজ সংস্কারক। উপন্যাস তার হাতে সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার।

এদেশে কালল মাক্স এর ডাস ক্যাপিটাল যত জনপ্রিয়, তারচেয়ে অনেক বেশী

জনপ্রিয় ম্যাক্সিম গোর্কির মাদার এবং অন্যান্য উপন্যাস। উপন্যাস যে কেবল বিনোদন ছাড়াও আরও মহত্তর কিছু হতে পারে, তার প্রমাণ শরৎচন্দ্র, ম্যাক্সিম গোর্কি এবং নসীম হিজাযী প্রমুখ। ম্যাক্সিম গোর্কির সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্য কম্যুনিজম প্রচার। বঙ্কিম চন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্য হিন্দু সমাজের সংস্কার; নসীম হিজাযীর পরিমন্ডল আরও বিস্তৃত। তাঁর উপন্যাস মুসলিম সভ্যতার পতনের যুগ-দর্শন। কিভাবে সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বোত্তম শিখরের অবস্থান থেকে একটি জাতি ক্রমশঃ অধঃপতিত হতে থাকে তারই রেখচিত্র এঁকেছেন নসীম হিজাযী। তাঁর উপন্যাস পড়তে পড়তে চোখে পানি চলে আসে, যেমন বড়বোনের কাছে মায়ের মৃত্যু কাহিনী শোনার সময় নিজের অলক্ষ্যে কেবল নয়ন অনশ্রুভারাক্রান্ত হয়।

সমাজের অধঃপতন অবশ্য কেবল একজন থেকে হয় না। সমগ্র জাতির বৃহত্তম অংশের মনমানসিকতা এবং চারিত্রিক মানের উপর নির্ভর করে প্রশাসকের আচরণ। "খুন রাঙা পথ", মুহাম্মদ বিন কাসিম", মরণ জয়ী", "শেষ প্রান্তর", "ভেঙ্গে গেলো তলোয়ার" প্রভৃতি উপন্যাসের মাধ্যমে নসীম হিজযী মুসলিম বিশ্বের উত্থান ও পতনে রাষ্ট্রীয় শাসকবর্গ, অমাত্য-বর্গ, সমাজ নেতৃবৃন্দের ভূমিকা, পতনের যুগেও দেশপ্রেমিক যুবকদের মহা-আত্মোৎসর্গ সাধারণ মানুষের নিস্পৃহতা ও হতাশার করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন।

উপমহাদেশীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের সিংহ-পুরুষ মহিশূর-শার্দুল টিপু সুলতানের উত্থান ও বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত ও পল্লবিত হয়েছে "ভেঙে গেলো তলোয়ার"-(মূল উর্দু-আউর তলওয়ার টুট গেয়ী)-এর কাহিনী। উর্দু সাহিত্যের এই যশস্বী ঐতিহাসিক উপন্যাসকার নসীম হিজাযী তাঁর উপন্যাস 'খুন রাঙা পথ' (মূল উর্দু-'ময়াযযাম আলী', অনুবাদ-সৈয়দ আব্দুল মান্নান)-এর পরবর্তী পর্যায়ের ঘটনাস্রোতে ও সংগ্রামের মধ্য থেকে এর কাহিনী ও চরনও আহরণ করেছেন। পলাশীর বিপর্যয় পরবর্তী হায়দার আলী-টিপু সুলতানের উত্থান ও টিপু সুলতানের পতনকাল এর সময় সরহদ্দরূপে পরিচিন্তিত।

নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার বিপর্যয়ের পর তাঁর বিশিষ্ট সেনানী মুয়াযযাম আলীর পরিবার-পরিজন সুবে বাংলা থেকে হিজরত করে রওনা দেন পশ্চিমের দিকে, ভবিষ্যতের নতুন স্বপ্নে। এ সময় মহিশূরে উত্থান হচ্ছিলো হায়দার আলীর। তাঁরা স্বপ্ন দেখলেন, ভারতের স্বাধীনতার যে সাধনা বাংলায় ব্যর্থ হয়েছে, এবার তা মহিশুরে গিয়ে সফল করবেন।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে হায়দার আলীর মহিশূর একটি শক্তিশালী ঘাটিতে পরিণত হচ্ছে। মুয়াযযাম আলীর সন্তানেরা যোগ দিলেন হায়দার আলীর সেনাবাহিনীতে, স্বাধীনতা-স্বকীয়তা রক্ষার উত্তাল আবেগে সংকল্পে উদ্দীপ্ত হয়ে তাঁরা আত্মনিয়োগ করলেন এ সংগ্রামে।

পরবর্তী সময়ে হায়দার আলীর সত্য ঘলা। বিদেশী ইংরেজ ও স্বাধীনতা

বিরোধী শক্তির হিংস্র থাবা থেকে স্বাধীনতা রক্ষার প্রত্যয়ে উত্থান হলো অমিতপুরুষ হায়দার-তনয় টিপু সুলতানের। ইংরেজ ও জাতীয় দুশমনদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে ভারতের অন্যান্য শক্তিগুলোর সমন্বয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিমিত লড়াইয়ে তিনি ভারতের বুকে ইসলামের সাম্য শান্তি স্বাধীনতার পতকা উর্ধে তুলে ধরে রাখার জন্যে; একটি মানবতাবাদী প্রাগ্রসর ও শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে। কিন্তু তাও এক সময় ব্যর্থ হলো। ভারতের স্বাধীনতার শেষ শক্তিশালী দুর্গ টিপু সুলতানের পতন ঘটলো।

মীর সাদিকের বিশ্বাসঘাতকতায় মহিশূরের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হলো। শেষ কয়েকজন জাঁনেসার সৈনিক নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার শেষ তলোয়ারটিও ভেঙে গেলো এবারে।

মুযায্‌যাম আলীর পরিবারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে, এগিয়ে গেছে ভেঙে গেলো তলোয়ারের কাহিনী। বিবৃত হয়েছে ইতিহাস। স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস। মুয়াযয্‌াম আলীর পরিজনেরা আবার নুতন স্বপ্ন চোখে নিয়ে রওনা দিলেন আফগানিস্তানের পথে।

উপন্যাসের একটি উদ্দেশ্য চিত্ত বিনোদন। প্রবন্ধ অপেক্ষা উপন্যাস অধিকতর জনপ্রিয়। কারণ উপন্যাস পড়তে ভাল লাগে। দর্শনের আবেদন মেধা ও মস্তিকে। উপন্যাস হৃদয়-মনকে আলোড়িত করে। তবে মস্তিস্ক দ্বারা পরিচালিত মানুষ অপেক্ষা হৃদয় দ্বারা তাড়িত মানুষের সংখ্যা অনেক বেশী। বিধাতা মানব অবয়ব সৃষ্টির সময় মস্তিষ্ককে শারিরীকভাবে হৃদয়ের উপরে স্থাপন করেছেন কিন্তু হৃদয়ের জয়জয়কার সর্বত্র।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিকালে প্রকাশিত জনপ্রিয় উপন্যাসগুলো পড়লে মনে হয় মানুষ যেন বিবেকবান প্রাণী নয়, মানুষ হলো একটি কাম তাড়িত জীব। মানুষের জীবনে কামই যেন প্রধান পরিচালিকাশক্তি। মনে হয় যেন যে উপন্যাস কামোদ্দীপনা জাগ্রত করতে পারে না, এদেশের পাঠকেরা সে উপন্যাস পড়ে না। কিন্তু নসীম হিজাযীর মতে উপন্যাসের উপজীব্য কাম নয়। ঘটনার ধারাবাহিকতায় কামোদ্দীপনা জাগ্রত করে আকর্ষণ সৃষ্টি করাও তাঁর উপন্যাসের টেকনিক নয়। আবিলতা ও অশ্লীতামুক্ত উপন্যাসও যে জনপ্রিয় হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নসীম হিজাযীর উপন্যাস।

কাম ও যৌন ক্ষুধা মানব জীবনের নিতান্ত স্বাভাবিক অনুভূতি। কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ব্যক্তি জীবন এবং সমাজ জীবনে নিয়ে আসে বিড়ম্বনা এবং ধ্বংস। বাস্তবতার নামে কিছু কিছু বিকৃত রুচি সাহিত্যিক, যৌন-প্রদর্শনী এর কামাচারকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে মনুষ্যত্বের বদলে পশুত্বের অনুশীলনে মগ্ন আছেন। এই সব কাম-শিল্পীদের যৌন-উপন্যাস পড়ে রুচিবিকৃত হয়ে গেলে সুরুচি

সম্পন্ন আবিলাতামুক্ত সব উপন্যাস পড়তে তরুণদের আর ভালো লাগার কথা নয়। রুচি উন্নয়নের প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করবে না।

যারা চান তাদের সন্তান-সন্ততি আবিলতামুক্ত রুচিবান মহত মানুষ হোক, পশুদের উর্ধ্বে সুন্দর সমাজের আদর্শ নাগরিক হয়ে গড়ে উঠুক, সমাজ সভ্যতার ক্রমাগত অধঃপতন এবং অবক্ষয়ে নয়, বরং উন্নতি ও অগ্রগতিতে কিছুটা অবদান রাখুক, তাদের প্রতি আমাদের আবেদনঃ-নসীম হিজাযীর উপন্যাস কিনে আপনজনকে উপহার দিন। এর চেয়ে সুন্দর উপহার বোধ হয় আর কিছু হয় না।

ঈদের দিনে আপনজনের দেহ সজ্জিত করার জন্যে আমরা দামী জামাকাপড় অলংকার দিয়ে থাকি। তাদের রুচি ও মনকে সুন্দর সুসজ্জিত করার জন্যে কি আমাদের কিছু করা উচিত নয়? চরিত্র গঠনমূলক গল্প, উপন্যাসসহ মহৎ মানুষের জীবনী উপহার দিয়ে আমরা তাদের চারিত্রিক মান উন্নয়নে সাহায্য করতে পারি। পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে আমরা বাজার থেকে মাছ, গোস্ত, দুধ এবং মিষ্টি কিনে থাকি। আত্মার ক্ষুধা নিবারনের জন্যও সুরুচিশীল সাহিত্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

আমরা পচনশীল দেহের খোরাক সরবরাহ করতে রাতদিন ছোটাছুটি করি অথচ আত্মার অবক্ষয় ও দুর্গতি রোধ করার জন্য সচেতন প্রয়াস আমাদের মধ্যে নাই। এ প্রয়োজনের তাগিদেই বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি নসীম হিজাযী রচিত সুরুচিশীল উপন্যাস' ভেঙ্গে গেলো তলোয়ার' এর অনুরূপ সাহিত্য প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। সকল পাঠক মহলের সামান্য সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আমাদের এ সাহিত্য প্রকাশনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর হবে।

কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ সুদীর্ঘকাল প্রকাশনার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং এ কারণে পাঠক সমাজে এটি একটি পরিচিত নাম। বর্তমানে এই সংস্থা মনোপোযোগী বিভিন্ন স্বাদের পুস্তক প্রকাশনার এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য পাঠক-শ্রেণীকে মান ও রুচিসম্মত সব ধরনের সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী করা এবং লেখক ও পাঠকের মাঝে একটি সূদৃঢ় সেতুবন্ধন করা। প্রতিষ্ঠিত নারী দামী লেখকদের পাশাপাশি নতুন লেখকদেরও স্থান করে দেওয়ার উদার নীতি নিয়েই সংস্থার পথযাত্রা।

আ.জ.ম. শামসুল আলম
সাবেক সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

এক

মাংগালোরের সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী মহীশূর ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে দ্বিতীয় যুদ্ধের অবসান ছিলো সুলতান টিপুর এক অতি বড়ো বিজয়। ইংরেজরা মীর নিযাম আলী ও মারাঠা শক্তির সাহায্যের ভরসা করে যুদ্ধ শুরু করেছিলো এবং গোড়ার দিকে তাদের সাফল্য ছিলো খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। তথাপি নিযাম ও মারাঠা শক্তি যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে পূর্ণ আশ্বাস ব্যতীত ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে রাযী ছিলো না । বিজনোর বিজয়ের পর ইংরেজের মনে আশা ছিলো যে, এবার তাদের দ্বিধাগ্রস্ত মিত্রেরা গণিমতের মালের অংশীদার হবার লোভে মহীশূরের উপর আচানক হামলা করতে এগিয়ে আসবে, কিন্তু যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে মহীশূরের আহত সিংহের ইস্পাতকঠিন পাঞ্জা ইংরেজের সিনা পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলো এবং যেসব শকুনকে তারা ঘিরে রাখা শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো, তারা তখন নিজ নিজ নীড়ে বসে এক পরিবর্তিত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলো।

মাংগালোরে ইংরেজের অবরুদ্ধ লশকরের কোনো দিক থেকে দ্রুত সাহায্য লাভের প্রত্যাশা থাকলো না, এহেন পরিস্থিতিতে তারা শান্তির ঝান্ডা উঁচু করে ধরলো। সুলতানের তোপখানার গোলাবর্ষণের দরুন কেল্লার পাঁচিল এক-একটি করে ভেঙে পড়তে লাগলো। রসদ ও বারুদের ভান্ডার তখন শেষ হয়ে এসেছে। বাইরে দৃষ্টিক্ষেপ করলে ইংরেজের নযরে পড়ে শুধু আগুনের শিখা আর ধোঁয়ার মেঘ। কেল্লার ভিতরে দেখা যায় আহত, সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত ও ক্ষুধিত সাথীদের মৃত্যুর মর্মন্তুদ দৃশ্য। মাংগালোর ছাড়া অন্যান্য ময়দানেও তারা ক্রমাগত ভয়ংকর মার খেয়ে যাচ্ছে। কাড্‌লোরে তাদের শ্রেষ্ঠ ফউজ ফরাসী বাহিনীর হাতে নিশ্চিত ধ্বংসের মোকাবিলা করছে।

দক্ষিণ ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দৌরাত্ম্যের সংকল্প চিরদিনের জন্য মাটিতে মিশিয়ে দেবার তখনই ছিলো সব চাইতে বড়ো সুযোগ, কিন্তু আচানক ইউরোপ থেকে খবর পৌছলো যে, বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে এবং হিন্দুস্থানেও তারা যুদ্ধ বন্ধ করার ফয়সালা করেছে। ফরাসী সিপাহসালার এ খবর শুনেই ইংরেজের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন।

ফ্রান্সের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানবার ক্ষমতা সুলতান টিপুর ছিলো, কিন্তু যুদ্ধ চলতে থাকার অবস্থায় সুলতানের একদিকে ছিলো নিযাম ও মারাঠাদের হামলার আশংকা, অপরদিকে ইংরেজ, মারাঠা ও মীর নিযাম আলীর প্ররোচনায় করদ ও সামন্ত রাজাদের বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন তাঁর জন্য এক ভয়াবহ বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছিলো।

তা'ছাড়া সুলতান টিপু কেবল এক দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী সিপাহীই ছিলে না, বরং তিনি এক অক্লান্ত সংগঠন কর্তাও ছিলেন। প্রজাদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি উদ্দীপনা তাঁর মনে এমন প্রবল ছিলো যে, তিনি যুদ্ধের ময়দানেও দরিয়ার উপ বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন, অনাবাদী যমিন আবাদ,সড়ক নির্মাণ এবং কৃষি ও শিল্পে উন্নতিবিধান ব্যতীত জনশিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের বড় বড় পরিকল্পনা প্রণয় করতেন। মহীশূরের জনগণের উন্নতি বিধান ও সুখ-সমৃদ্ধি বর্ধনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন ছিলো শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির, কিন্তু তাঁর দুশমনরা বুঝে নিয়েছিলো যে, সুলতান টিপু তাদের পথে শেষ বাধার প্রাচীর এবং শান্তিপূর্ণভাবে কয়েকটি বছর অতিবাহিত করার সুযোগ লাভ করলে তাঁর খোদাদাদ সালতানাত হিন্দুস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হবে। সুতরাং মাংগালোরের শান্তিচুক্তির পর ইংরেজ, মারাঠা ও নিযামের চেষ্টা হোল কোনো না কোনো ময়দানে সুলতানকে বিব্রত করে রাখা।



যুদ্ধের অবসান ঘটার সাথে সাথেই সুলতানকে সবার আগে মনোযোগ দিতে হোল নারগন্ড ও কুর্গের দিকে। এসব রাজ্য ছিলো মহীশূরের করদ রাজ্য এবং বিগত যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে তথাকার রাজারা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সুলতান সন্ধির জন্য নারগন্ডের ব্রাহ্মণ রাজা বেংকট রাওয়ের কাছে দূত পাঠালেন, কিন্তু মারাঠার প্ররোচনায় তিনি সন্ধি করতে রাযী হলেন না। সুলতান মারাঠাদের মহীশূরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে দূরে রাখার জন্য এক প্রতিনিধিদল পাঠালেন পুণায়; কিন্তু নানা ফার্ণাবিস দীর্ঘকাল ধরে মহীশূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন এবং পেশোয়া ব্যতীত প্রায় সকল মারাঠা রাজাই তাঁর হাতে এসে গিয়েছিলেন। তাই সুলতানের শান্তি প্রচেষ্টা সফল হোল না।

সুলতান বাধ্য হয়ে বুরহানুদ্দীনের নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন নারগন্ডের দিকে। বুরহানুদ্দীন নারগন্ড থেকে কয়েক মাইল দূরে বেংকট রাওকে পরাজিত করে তাঁকে নারগন্ডের কেল্লায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করলেন। নানা ফার্ণাবিস তিন হাজার সিপাহী বেংকট রাওয়ের সাহায্যের জন্য পাঠালেন এবং বুরহানুদ্দীন মারাঠাদের অগ্রগতি রোধ করার জন্য নারগন্ডের কেল্লার অবরোধ তুলে নিলেন।

বর্ষার মওসুম শুরু হয়ে গেছে। পথের নালা ও দরিয়ায় প্লাবন। তাই মারাঠাদের ভারী সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এগিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য। মারাঠা ফউজের সিপাহ্সালার পরশুরাম ভাও রামদুর্গে তাঁবু ফেলে বর্ষার সমাপ্তি ও অধিকতর সেনা সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাকলেন। বুরহানুদ্দীন মারাঠাদের হামলার প্রতীক্ষা না করে আচানক মিনুলীর দিকে অগ্রসর হলেন। মারাঠারা নিরুপায় হয়ে তাঁর পথরোধ করবার চেষ্টা করলো, কিন্তু মহীশূরের ফউজ তাদেরকে উপর্যুপরি পরাজিত করে মিনুলী ও রামদুর্গ দখল করে নিলো। কিছুদিনের মধ্যে মারাঠা লশকর ক্রমাগত পরাজয় বরণের পর

কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত তামাম এলাকা খালি করে চলে গেলো এবং নারগন্ডের দিকে তাদের সকল পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

এই গৌরবময় বিজয়ের পর বুরহানুদ্দীন পুনরায় নারগন্ডের কেল্লার দিকে মনোযোগ দিলেন। বেংকট রাও কয়েকদিন মোকাবিলা করলেন, কিন্তু মারাঠাদের পিছু হটে যাওয়ার দরুন তিনি ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়লেন। অবশেষে তিনি হাতিয়ার সমর্পণ করলেন। নারগন্ডের কেল্লা জয়ের পর বুরহানুদ্দীন বেংকট রাওয়ের সহযোগী ও সামন্ত রাজাদের উপর আক্রমণ চালালেন এবং কাঠোর, দুদওয়াদ, খানাপুর, হাওসকোট, পাদশাহপুর ও জাম্বটি কেল্লা জয় করলেন।

প্রায় এই সময়ে সুলতানের ফউজের হায়দর আলী বেগ নামে অপর একজন সালার কুর্গের নায়ারদের বিদ্রোহ দমন করতে ব্যস্ত ছিলেন। কুর্গের অভিযান ছিলো যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি দুঃসাধ্য। এলাকাটি পশ্চিমঘাট পাহাড়শ্রেণীর ভিতরে এমন এক স্থানে অবস্থিত, যেখানে বছরে ছয়মাস ক্রমাগত বৃষ্টিপাত হয়। পাহাড়ের পাদদেশে ঝরণা ও সুদৃশ্য ঝিল ব্যতীত বাঁশ, সেগুন, চন্দন ও অন্যান্য গাছপালা সন্নিবিষ্ট ঘন জংগল। তার কোথাও কোথাও সিংহ, বাঘ ও চিতা ব্যতীত হাতীর পালও দেখা যায়। কোথাও কোথাও উপত্যকার নীচু দিকে নযরে পড়ে ধানের ক্ষেত এবং ফল ও গাছপালা ভরা বাগান।

কুর্গের নায়ার কওমের বিশালকায়, সুডৌল ও স্বাস্থ্যবান বাসিন্দারা ছিলো তাহ্‌যীব তমদ্দুনের সাথে অপরিচিত। পুরুষের মতো নারীও আধা উলংগ পোশাক পরিধান করতো। আশপাশের জেলাসমূহের খুব কম লোকই কুর্গের দুর্গম পাহাড় ও জংগলের দিকে পদক্ষেপ করবার সাহস করতো। সভ্য হিন্দুস্তানের কাছে এই এলাকার বাসিন্দাদের সৌন্দর্য, উলংগ অবস্থা, চরিত্রহীনতা, বন্য স্বভাব ও বর্বরতার কাহিনী কোহ্‌কাফের জিন-পরীদের কাহিনী থেকে ভিন্ন ছিলো না।

মহীশূরের ফউজ গোড়ার দিকে কুর্গের বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে কয়েকবার সাফল্য লাভ করেছিলো, কিন্তু দুর্গম অরণ্যপথ ও পাহাড়ে বিদ্রোহীদের পাল্লা ছিলো ভারী। নায়াররা তাদের গোপন আবাস থেকে বেরিয়ে এসে আচানক মহীশূরের লশকরের পশ্চাতে, ডানে অথবা বাঁয়ে হামলা করতো এবং দেখতে দেখতে পাহাড়ে জংগলে গায়েব হয়ে যেতো। হায়দর আলী বেগ এ সংকটময় অভিযানের অযোগ্য প্রমাণিত হলেন এবং তিনি ঘন বনের মধ্যে দুশমনের উপর্যুপরি হামলায় আতংকিত হয়ে পিছু হটে গেলেন।

এহেন অবস্থায় সুলতান টিপুকে নিরুপায় হয়ে ময়দানে অবতরণ করতে হোল। নায়াররা পায়ে পায়ে তীব্রভাবে মোকাবিলা করলো, কিন্তু সুলতানের সামনে দাঁড়াতে না পেরে তারা হাতিয়ার সমর্পণ করলো। সুলতান যয়নুল আবেদীন মাহ্‌দুবীকে কুর্গের সুবাদার নিযুক্ত করে সেরিংগাপটমে ফিরে এলেন। এই সময়ে নানা ফার্ণাবিস নারগন্ড ও কুর্গে সুলতানের বিজয় লাভের দরুন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি

সুলতানের বিরুদ্ধে মারাঠা, নিযাম ও ইংরেজের সম্মিলিত হামলার চেষ্টায় বিব্রত ছিলেন এবং তাদের সেনাবাহিনী কৃষ্ণা নদীর কিনারে জমা হচ্ছিলো।



একদিন ফরহাত বালাখানার এক কামরায় বসে তাঁর পরিচারিকার সাথে কথা বলছেন। আচানক সিঁড়ির উপর কার ছুটে আসার আওয়ায শোনা গেলো। দেখতে দেখতে বারো বছরের কাছাকাছি বয়সের একটি শ্যামবর্ণ বালক এসে কামরায় প্রবেশ করলো।

পরিচারিকা বললোঃ মুনাওয়ার, তুমি কি রকম নালায়েক হয়েছো। বিবিজী কতোবার তোমায় মানা করেছেন সিঁড়ির উপর ছুটোছুটি করতে।'

মুনাওয়ার পরিচারিকার কথার জওয়াব না দিয়ে ফরহাতকে লক্ষ্য করে বললোঃ 'বিবিজী, আজ এক মেহমান এসেছেন। খুব বড়ো লোক মনে হচ্ছে। করীম খান তাঁর ঘোড়া বেঁধে এসেছে আস্তাবলে, আর আমি তাঁকে বসিয়ে এসেছি দেওয়ানখানায়। এসেই তিনি ভাইজান আনওয়ার আলী ও ভাইজান মুরাদ আলীর কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি জওয়াব দিয়েছি যে, ভাইজান আনওয়ার আলী এখানে নেই আর মুরাদ আলী সাহেব এখন মাদ্রাসায়। তারপর তিনি দীলাওয়ার খান ও সাবেবের কথা জানতে চাইলেন। জওয়াবে আমি বললাম, সাবের মরে গেছে আর দীলাওয়ার খান ভাইজান আনওয়ার আলীর সাথে চলে গেছে। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেনঃ তুমি কে? বললামঃ 'আমি বিবিজীর নওকর।'

ফরহাত বললেন ঃ 'তুমি তাঁর নাম জিজ্ঞেস করো নি?'

ঃ 'জি, তিনি নিজেই বললেনঃ 'বিবিজীকে আমার সালাম দিও আর বলো, আমার নাম আকবর খান।'

ফরহাতের কাছে এ খবর অসাধারণ। কয়েক মূহূর্ত তিনি নির্বাক নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। তারপর উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন ঃ 'মুনাওয়ার, যাও, ওঁকে ভিতরে এনে নীচের বড়ো কামরায় বসিয়ে দাও।

মুনাওয়ার ছুটে কামরার বাইরে চলে গেলো, কিন্তু অর্ধেকটা সিঁড়ি পার হয়ে হঠাৎ থেমে গেলো এবং নিঃশব্দ পদক্ষেপে নীচে নামতে লাগলো।

বসতবাড়ির চার দেওয়ালের বাইরে গিয়ে সে দেওয়ানখানার এক কামরায় প্রবেশ করলো। আকবর খান গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে অবনত মস্তকে বসে রয়েছেন। তাঁর চিবুক ও কর্ণমূলের কাছে কিছুটা দাড়ি সাদা হয়ে এসেছে, কিন্তু মুখে যৌবনের আভাস এখনো অবশিষ্ট রয়েছে।

মুনাওয়ার বললো ঃ 'জনাব, বিবিজী আপনাকে ভিতরে যেতে বলেছেন।'

আকবর খান নিঃশব্দে উঠে মুনাওয়ারের সাথে চললেন। কিছুক্ষণ পর তিনি

বসতবাড়ির এক প্রশস্ত কামরায় প্রবেশ করলে মুনাওয়ার বললোঃ 'জনাব, আপনি তশ্‌রীফ রাখুন। আমি বিবিজীকে খবর দিচ্ছি।'

মুনাওয়ার বেরিয়ে গেলো, আর আকবর খান বসে পড়লেন একটি কুরসীর উপর। কামরায় গালিচার উপর বিছানো কয়েকটি বাঘ ও চিতার চামড়া। এক দেওয়ালের সাথে কয়েকটি তলোয়ার ও বন্দুক টাঙানো। আর এক দেওয়ালের সাথে লাগানো আবুলস কাঠের একটি সুন্দর তখ্‌তীর উপর রাখা হয়েছে একটি খঞ্জর ও দু'টি পিস্তল। বাকী দু'টি দেওয়ালের পাশে সাজানো কিতাবের আলমারী-দুনিয়ায় আকবর খানের সব চাইতে প্রিয়জনের স্মরণচিহ্ন। মোয়ায্‌যম আলীর সাহচর্যের দিনের অগুনতি ঘটনা একে একে ভেসে আসতে থাকে তাঁর চোখের সামনে । তিনি সেরিংগাপটমে আসবেন আর সেখানে মোয়ায্‌যম আলী থাকবেন না, তাঁর শাহাদতের খবর পাওয়ার আগে তা' মনে আসেনি কোনো দিন। নিঃসংগতা ও অসহায়তার এক পীড়াদায়ক অনুভূতিতে তাঁর চোখ দু'টি বন্ধ হয়ে এলো।

কামরার মধ্যে কার যেনো পায়ের আওয়ায শোনা গেলো। তিনি চোখ খুললেন। ফরহাত একটি সাদা চাদরে দেহ আবৃত করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঃ 'ভাই আকবর, আস্‌সালামু আলাইকুম।' কম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন।

আকবর জলদী উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সালামের জওয়াব দেবার চেষ্টার করলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেলো। তাঁর দু'চোখে নেমে এসেছে অশ্রু প্লাবন।

ফরহাত দরযার কাছে এক কুরসীতে বসতে বসতে বললেন ঃ 'আকবর, বসে পড়ো, ভাই! তিনি বসে পড়লেন। কয়েক মুহূর্ত দু'জনই নির্বাক। অবশেষে আকবর খান গর্দান তুললেন এবং ধরা গলায় বললেন ঃ 'ভাবীজান, কুদরতের এর চাইতে বড়ো শাস্তি আর কি হোতে পারে যে, আমার প্রিয়তম ভাই ও তাঁর জোয়ান বেটা শহীদ হয়ে গেছেন, অথচ দু'বছরে আমি তা' জানতে পারিনি। ঘটনাক্রমে গত কয়েক দিনের মধ্যে সেরিংগাপটমের এক ব্যবসায়ী হায়দরাবাদে গেলে বিলকিসের মামুজানের সাথে তাঁর দেখা হয় এবং তিনি খবর শুনেই আমায় চিঠি লিখে জানান।'

ফরহাত অশ্রুসজল চোখে বললেনঃ 'আমার আফসোস, আমি তোমায় খবর দিতে পারিনি। ওঁর শাহাদতের পর, কয়েক মাসের মধ্যে আমার নিজেরই কোনো হুঁশ ছিলো না।'

আকবর বললেনঃ 'ভাবীজান, আমি আপনার কাছে অভিযোগ করছি না। আপনাদের অবস্থা সম্পর্কে আমি এতটা বেখবর ছিলাম, তার জন্য আমি লজ্জিত। ভাইজানের সাথে আমার সম্পর্ক ছিলো এমন যে, তাঁর পায়ে কাঁটাটি ফুটলে বহু ক্রোশ দূরে থেকেও আমি তার বেদনা অনুভব করতাম। আপনার নওকরের কাছে শুনলাম, আনওয়ার আলী মিঞা এখানে নেই। সে কোথায় ?

ঃ ' আনওয়ার আলী এক অভিযানে পন্ডিচেরী চলে গেছে।'

ঃ 'কি ধরনের অভিযান?'

ঃ 'তা আমার ঠিক জানা নেই। আমি শুধু এতটা জানি, যে কাজ তাকে দেওয়া হয়েছে, তার জন্য ফরাসী ভাষা জানা লোকের প্রয়োজন ছিলো এবং আনওয়ার আলী ফউজী মকতবের এক ফরাসী ওস্তাদের কাছে ভাষাটি শিখেছিলো। তোমার ছোট ভাতিজাও ফরাসী যবান জানে।'

ঃ 'মুরাদ আলী কখন ফিরে আসবে?'

ঃ 'ও হয়তো এক্ষুণি আসছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আকবর খান বললেন ঃ 'ভাবীজান, সাবের কবে মারা গেলো?'

ফরহাত জওয়াব দিলেন ঃ 'আনওয়ার আলীর আব্বাজানের শাহাদতের প্রায় পাঁচ মাস পরে সে মারা গেছে। বুড়ো বয়সে এ শোক ছিলো তার কাছে অসহনীয়। সে বিশ্বাস করতে পারলো না যে, তিনি শহীদ হয়েছেন। তাঁর কবর দেখবার জন্য সে বিজনোর যাবার এজাযত চাইলো। বেশ কিছুদিন একথা সেকথা বলে রাখার পর তাকে সেখানে যাবার এজাযত দিলাম। ফিরে এসে তার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেলো। পনেরো দিন পর এক রাত্রে নওকর এসে আমায় খবর দিলো যে, তার অবস্থা নাযুক হয়ে পড়েছে। গিয়ে দেখলাম, সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে বিছানার উপর। আমি নওকরকে পাঠিয়ে দিলাম চিকিৎসক ডাকতে, কিন্তু তিনি আসার আগেই সে মারা গেলো। তোমার কথা তো আমায় কিছু বললে না! বিলকিস,শাহ্বায ও তানবীর কেমন আছে?'

ঃ 'তারা সব ভালোই। বিলকিস আপনার কথা খুবই মনে করে। শাহ্বায এখন জোয়ান হয়ে গেছে, আমার কিছু কাজ আমি ওর উপর ছেড়ে দিয়েছি। তানবীরের বয়সও এখন চৌদ্দ বছর হয়ে গেছে। তার খালুর ছেলে হাশিম বেগের সাথে আমি তার শাদী স্থির করেছি। ওর ছোট বোন সামিনার বয়স ন' বছর। আমি তাকে বলতামঃ 'শাহ্বায ছাড়া তোমার আরো চার ভাই রয়েছে সেরিংগাপটমে। কখনো শাহ্বায অথবা তান্বীরের সাথে ঝগড়া হোলে সে ধমক দেয় ঃ আমি সেরিংগাপটমের ভাইয়ের কাছে চলে যাবো। নামাযের পর সে হামেশা সিদ্দীক, মাসউদ, আনওয়ার ও মুরাদের জন্য দোআ করতো আর বার বার আমার কাছে নালিশ করতো, কেন আমি তাদেরকে নিজের ঘরে নিয়ে যাই না। আমি তার কাছে ওয়াদা করেছিলাম, শাহ্বায অথবা তানবীরের শাদীর সময়ে তাদেরকে নিয়ে আসবো আর সাথে তার চাচা ও চাচীজানও থাকবেন। ভাইজানের শাহাদৎ সম্পর্কে শেখ ফখরুদ্দীনের চিঠি পাওয়ার আগে সে বড়োই অস্থির হয়ে ভাইবোনের শাদীর দিনের ইন্তেযার করছিলো। এবার আমি যখন এদিকে আসি, সেও আসার জন্য যিদ ধরেছিলো এবং আমি তাকে ওয়াদা দিয়ে এসেছিঃ তোমার চাচীজান ও ভাইদের সাথে নিয়ে আসবো।'

ফরহাত বললেন ঃ 'আহা! আমি যদি যেতে পারতাম ওখানে।'

আকবর খান বললেন ঃ 'পথে একদিন আতিয়ার ওখানে থেকে এসেছি। তিনিও আপনাকে খুব মনে করেন।'

ফরহাত প্রশ্ন করলেনঃ 'আতিয়ার বাচ্চাদের অবস্থা কি ?'

আকবর খান জওয়াব দিলেন ঃ'হাশিম বেগ ছাড়া তাঁর আর কোন সন্তান নেই। সে খুবই প্রতিভাশালী ও সুদর্শন জোয়ান। আমার ধারণা ছিলো, সে দুনিয়ায় কোন ভালো কাজে লাগবে, কিন্তু তাহির বেগ তাকে আধুনিক ফউজে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

কামরার বাইরে কারুর পায়ের আওয়ায শোনা গেলো। ফরহাত বললেনঃ মুরাদ এসে গেছে।'

পনেরো বছর বয়সেই মুরাদ আলীকে বেশ জোয়ান মনে হচ্ছিলো। মুরাদ কামরায় প্রবেশ করে হয়রান হয়ে আকবর খানের দিকে তাকাতে লাগলো।

ফরহাত বললেন ঃ 'বেটা, তুমি ওঁকে সালাম করোনি। উনি তোমার চাচা আকবর খান।'

ঃ 'চাচাজান, আসালামু আলাইকুম।' বলে মুরাদ আলী এগিয়ে গেলো। আকবর খান উঠে তার সাথে মোসাফেহা করলেন। তারপর দু'জন পাশাপাশি বসে গেলেন।

ঃ ফরহাত বললেনঃ 'আজ তুমি খুব দেরী করেছো, বেটা ?'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলো ঃ 'আম্মাজান, আজ যখন ছুটি হবার কথা, তখনই বুরহানুদ্দীন এলেন মকতব দেখতে। তাই আমাদেরকে কিছু সময় দেরী করতে হয়েছে।'

আকবর খান প্রশ্ন করলেনঃ 'মুরাদ, তোমার শিক্ষা কবে শেষ হবে?'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলো ঃ 'চাচাজান, প্রায় তিন মাস পর আমি মকতব থেকে ছাড়া পাবো।'

ঃ তারপর তুমি কি করবে?

ঃ 'তারপর ফউজে শামিল হওয়া ছাড়া আর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না আমার জন্য।'

ঃ 'তা 'হলে এর অর্থ, তোমার মকতবে শিক্ষাপ্রাপ্ত নওজোয়ানদের জন্য ফউজে শামিল হওয়াই জরুরী।'

ঃ 'হ্যাঁ চাচাজান, ফউজী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কায়েম করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিক্ষিত অফিসার তৈরী করে তোলা, কিন্তু ফউজে শামিল হওয়ার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিক্ষা শেষ করা জরুরী নয়। কঠিন প্রয়োজনের সময়ে আমাদেরকে শিক্ষা সমাপ্তির আগেই ফউজী খেদমতের জন্য ডেকে নেওয়া যেতে পারে। অনেক ছেলে শিক্ষায়

আমার পিছনে ছিলো, কিন্তু বয়সে আমার চাইতে বড়ো ছিলো বলে তাদেরকে ফউজে শামিল করে নেওয়া হয়েছে। গত কয়েক দিনে আমাদের মকতবের কয়েকটি শিক্ষার্থী শেষ পরীক্ষার আগেই কুর্গের ময়দানে চলে গেছে। আমি তাদের সাথে যাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমি বয়সে ছোট, কেবল এই কারণেই আমার দরখাস্ত না-মনযুর হয়েছে।'

আকবর খান বললেন ঃ 'মুরাদ, ধরো আমি যদি তোমায় পরামর্শ দেই যে, সিপাহী না হয়ে তোমার অপর কোনো পেশা এখ্‌তিয়ার করলে ভালো হবে, তা'হলে তুমি কি জওয়াব দেবে?'

মুরাদ আলী বললো ঃ 'আমার বিবেচনায় সিপাহী হওয়া পেশা নয়; বরং তা হচ্ছে কওমের খেদমত। চাচাজান, আব্বাজান বলতেন, আপনি পানিপথের ময়দানে তাঁর সাথে ছিলেন। আমি অনেক কিছু জানতে চাই আপনার কাছে। কিন্তু এখন কিছুক্ষণের জন্য আমায় বাইরে যেতে হবে। আমি এক্ষুণি এসে যাবো।'

ঃ 'কোথায় যাচ্ছো বেটা?' ফরহাত প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'আম্মাজান, আমি নেযাহ্‌বাযির জন্য যাচ্ছি।'

মুনাওয়ার কামরায় প্রবেশ করে তাকে বললো, ঃ 'জনাব , করীম খান আপনার ঘোড়ায় যিন লাগিয়েছে, বললো।'

মুরাদ আলী উঠে কামরার বাইরে চলে গেলো।

আকবর খান বললেনঃ 'ভাবীজান, আমি আপনার কাছে এক দরখাস্ত করবো- কিছু মনে করবেন না। আপনার খান্দান কওমের জন্য অতি বড়ো কোরবানী দিয়েছে। কওমের আরো কোরবানী দাবি করার হক নেই আপনাদের থেকে। আমার মনে হয়, সেরিংগাপটম আপনার পুত্রদের জন্য নিরাপদ নয়। আপনারা আমার কাছে চলুন। আমার বিশ্বাস, আনওয়ার ও মুরাদের জন্য আমি কোনো কর্মের সংস্থান করে দিতে পারবো। সেখানে ওদের জন্য ভালো যমিনও পাওয়া যাবে।'

ফরহাত বললেনঃ 'আকবর! তুমি কি বলছো? আমি সেই বাসভূমি ছেড়ে যাবো, যার হেফাযতের জন্য রক্ত দিয়েছেন আমার স্বামী, আমার দুই পুত্র ?'

ঃ 'কিন্তু ভাবীজান, এর ফল কি? কবে এ যুদ্ধের শেষ? কাল পর্যন্ত সুলতান টিপু ছিলেন ইংরেজের সাথে যুদ্ধরত, আজ তিনি আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের মোকাবিলা করছেন। এরপর হয়তো নিযাম ও মারাঠা ময়দানে নেমে আসবে।

ফরহাত বললেন ঃ 'আমি শুধু এইটুকু জানি যে, আমাদের যুদ্ধের একটি মাত্র লক্ষ্য। যে মক্‌সাদ ছিলো তোমার ভাই ও তাঁর পুত্রদের কাছে জানের চাইতেও প্রিয়তর, সেই মক্‌সাদের জন্য আমার বাকী দুই পুত্রও কোরবান হয়ে যাক, এ কামনা আমি করতে পারি, কিন্তু তারা যিন্দাহ্‌ থাকার জন্য সে মকসাদ থেকে

ফিরিয়ে নিক, এ কামনা আমি কখনো করতে পারি না।'

আকবর খান লা-জওয়াবের মতো হয়ে বললেনঃ 'এক সময়ে আমিও যিন্দেগীর অত্যুচ্চ লক্ষ্যসমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করেছি, কিন্তু দীর্ঘকাল আমি সে নিয়ামতে বঞ্চিত। আপনার সামনে এ আলোচনার অবতারণা করা আমার উচিত হয়নি। অন্ধ অপরকে পথ দেখাতে পারে না। আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

ফরহাত বললেন ঃ 'ভাই, তোমার কোনো কথা আমায় দুঃখ দিতে পারে না। যে মর্মান্তিক ঘটনাবলী তোমার যিন্দেগীতে এনে দিয়েছে এ ইন্‌কেলাব, তা'আমার জানা আছে। তোমার পথ তাঁর পথ থেকে আলাদা হয়ে গেছে বলে তোমার ভাইয়ের মনে আফসোস ছিলো, কিন্তু দোআ করতে গিয়ে তিনি হামেশা তোমায় স্মরণ করেছেন। তিনি বলতেনঃ আকবর খান যামানার যে ইন্‌কেলাব দেখেছেন, তা'তে যিন্দেগীর হাংগামা থেকে তাঁর সরে দাঁড়ানো আমার কাছে মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিলো না।'

আকবর খান বললেন ঃ 'ভাবীজান, রোহিলাখন্ড ছেড়ে যাবার পর কখনও আমার মনে এ অনুভূতি জাগেনি যে, আমি যিন্দাহ্ রয়েছি। জংগল কেটে আমি সবুজ শস্য-শ্যামল বাগিচায় ও ফসল-ভরা ক্ষেতে রূপান্তরিত করেছি। খুব ভোরে ঘোড়ায় চড়ে আমি চলে যাই এবং সারাদিন যমিনের দেখাশুনা করে ঘরে ফিরে আসি। আমি বছরের পর বছর মেহ্‌নত করে নিজ গাঁয়ে এক আলীশান গৃহ নির্মাণ করেছি। আমার সাথী শরণার্থীদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য অনেক কিছু আমি করেছি। এবং এ যাবত তাদের পাঁচটি বস্তি আবাদ হয়েছে। তারা এমন প্রাচুর্যের মধ্যে রয়েছে যে, রোহিলাখন্ডের স্মৃতি তাদেরকে আর পীড়ন করে না। এই মক্‌সাদ সামনে রেখেই আমি ভাইজান থেকে আলাদা পথ এখ্‌তিয়ার করেছিলাম। আমার কর্মব্যস্ততা নিয়েই আশ্বস্ত থাকা আমার উচিত ছিলো। কিন্তু এমন অধীর হয়ে উঠেছি আমি যে, আমার মনে হচ্ছে, আমার অংশের সকল হাসি-আনন্দই রোহিলাখন্ডের মাটিতে সমাহিত হয়ে রয়েছে। ছোট ছোট কথায় আমি রেগে যাই। যারা আমায় মুহাব্বত করতো, তারা আমায় ভয় করে। কখনো কখনো আমি নিজেই হিসাব নিকাশ করে দেখেছি। শপথ করেছি যে, নওকর ও গোষ্ঠীর লোকদের সাথে আর কঠোর হবো না। খুব রেগে গেলেও, আমি হাসবার চেষ্টা করি। কিন্তু কয়েকদিন পরেই পরেই আমি তা' ভুলে যাই। কখনো কখনো আমার দীলের মধ্যে এখানে আসার আকাংখা জেগেছে এবং আমি কল্পনা করেছি যে, ভাইজান আমার আগমন সংবাদ পেয়ে হাসিমুখে বাড়ির কোনো কামরা থেকে বেরিয়ে এসে আমায় বুকে চেপে ধরবেন। আমার দুনিয়ার নির্বাক পরিবেশ হয়ে উঠবে হাস্যমুখর। কিন্তু বাস্তব দুনিয়ায় আমার এ সুখস্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ হয়নি। আহা! ওফাতের আগে আমি যদি একবার তাঁকে দেখতে পেতাম! একদিন তিনি যে বালককে কয়েদখানার কুঠরীর অন্ধকার পরিবেশে যিন্দেগীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পরিচিত করেছিলেন, আজ আমি তার চাইতেও অক্ষম ও অসহায়। যে চেরাগ ভয়াবহ অন্ধকারের সাথে

লড়বার সাহস সঞ্চার করেছিলো আমার দীলে, তা' নিভে গেছে আর আমি হোঁচট খাচ্ছি। আমি ভাবছিলাম, চিরদিনের জন্য আমার তলোয়ার কোষবদ্ধ করে এ দেশের অযোগ্য যালিম শাসকদের বিরুদ্ধে শেষ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার বিদ্রোহ সেই শাসকদের চাইতেও বেশী করে সেই আকবর খানের বিরুদ্ধে, একদিন যার দীল ছিলা কওমের খেদমতের উদ্যম-উৎসাহে ভরপুর এবং যে একদিন পানিপথের ময়দানে মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে হাসতে পেরেছিলো। যার শিরায় রক্তের বদলে বয়ে যেতো বিদ্যুৎ প্রবাহ, আমি সেই মানুষটির আশা-আকাঙ্খার লাশ। বোন, আজ আমার প্রয়োজন আপনার দোআ।'

আকবর খানের চোখে আর একবার অশ্রু জমা হচ্ছিলো।

ফরহাত বললেন, ঃ 'আকবর, তোমার সে কথা বলবার প্রয়োজন নেই। আমার দোআ সব সময়েই তোমার সাথে রয়েছে।'

মুনাওয়ার কামরায় ঢুকে বললোঃ 'বিবিজী মেহমানের জন্য খানা তৈরী। নিয়ে আসবো ?'

ঃ 'হ্যাঁ, জলদী করো।'

ঃ আকবর খান বললেনঃ 'না, আমি পথেই খানা খেয়ে এসেছি। আপনি অনর্থক তকলীফ করেছেন।

ফরহাত বললেনঃ 'কিছু খেয়ে নাও।'

ঃ 'না ভাবীজান, আমি সত্যি খেয়ে এসেছি। আসরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে এলো। আমি মসজিদ থেকে আসছি।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা। মুনাওয়ার, তুমি ওঁর সাথে যাও।'

আকবর খান কুরসী থেকে উঠে দরযার দিকে এগিয়ে গেলেন। ফরহাত তাঁর চলায় কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলেন। চলার সময়ে তিনি এক পায়ে কিছুটা বেশি ভর করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি প্রশ্ন করবার আগেই আকবর খান কামরার বাইরে চলে গেলেন।



কিছুক্ষণ পর যখন আকবর খান নামায পড়ে ফিরে এলেন, তখন ফরহাত বারান্দায় একটি মোড়ার উপর বসেছিলেন। আঙিনা পার হতে গিয়ে আকবর তেমনি খুঁড়িয়ে চলছিলেন। ফরহাত বললেন ঃ 'আকবর, কি ব্যাপার, তোমার পায়ে কোনো তকলীফ আছে কি?

আকবর খান সতর্ক পদক্ষেপে বারান্দায় ঢুকে একটি মোড়ায় বসে বললেনঃ 'জি, এমন কিছু নয়। গত বছর এক লড়াইয়ে আমার পায়ে গুলী লেগেছিলো। এখন একটু বেশী সওয়ারী করলে অথবা পায়দল চললে পায়ে ব্যথা হয়।'

ঃ 'তোমার লড়াই হোল কার সাথে ?'

ঃ 'মারাঠা বর্গীদের একটি দল আমার উপর হামলা করেছিলো। হামলা ছিলো এমন আকস্মিক যে, আমার বাঁচবার কোনো আশা ছিলো না। সেদিন আমার ছোট মেয়ে সামিনা না হলে আপনি আজ আমায় এখানে পেতেন না। রোহিলাখন্ড থেকে হিজরত করার পর আমি আমার গোষ্ঠীর লোকদের আবাদ করার জন্য আধুনীর সীমান্তে এক অনাবাদী এলাকা হাসিল করেছিলাম। এই এলাকার কয়েক মাইল দূরে এক ঘন বন এবং এই বনের আগে একটি ছোট নদী। আধুনী ও মারাঠার মধ্যকার সীমানা এই নদীটি। আধুনীর হুকুমাতের তরফ থেকে আমাদের এজাযত ছিলো যে, যতো খুশী বন আমরা আবাদ করতে পারবো। বনের কোথাও ভীলদের আবাদী ছিলো। তারা শিকার করেই সাধারণভাবে জীবিকার সংস্থান করতো। আমি তাদেরকে চাষবাসের উৎসাহ দিয়ে কাজে লাগিয়ে দিলাম এবং কয়েক বছরে অনেকখানি বন কেটে আবাদ পত্তন হোল এবং তারা সমৃদ্ধ মানুষের যিন্দেগী যাপন করতে লাগলো। একদিন সীমান্ত পার থেকে মারাঠা সরদারের দূত এসে আমায় জানালো যে যদি আমরা সেখানে শান্তিপূর্ণ যিন্দেগী যাপন করতে চাই, তা'হলে প্রতিবছর তাদেরকে আমাদের আমদানীর চতুর্থাংশ দিতে হবে। এ দাবি ছিলো আমার কাছে গালির শামিল এবং আমি সরদারের দূতকে রাগদাপট দেখিয়ে ফেরত দিলাম।

কয়েক মাস পর জানতে পারলাম যে, মারাঠা সরদারের ধমকে ভীত হয়ে কতক কিষাণ তাদেরকে আমার অজ্ঞাতে চৌথ দিতে রাযী হয়ে গেছে। আমি একদিন এলাকার সকল ভীলকে জমা করে তাদের কাছ থেকে শপথ নিলাম যে, মারাঠাদের তারা এক কানাকড়িও দেবে না। এর ফল হোল, মারাঠারা এক রাত্রে দরিয়া পার হয়ে, তাদের কয়েকটি বস্তি লুট করলো এবং কিছুসংখ্যক পুরুষ ও নারীকে তারা ধরে নিয়ে গেলো। আমি লোকগুলোকে ছাড়িয়ে আনার জন্য আলোচনা শুরু করলে মারাঠা সরদার মোটা অর্থের দাবি জানালো। ভীলরা তাদের মালপত্র, গরু-মহিষ বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করবার জন্য তৈরী হোল। কিন্তু আমি এক রাত্রে তিনশ' লোক সাথে নিয়ে দরিয়া পার হয়ে মারাঠা সরদারের গাঁয়ের উপর হামলা করলাম। সরদার আমাদের হাত থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলো। তার এক ভাই লড়াইয়ে মারা গেলো এবং বাকী দু'ভাই, এক বেটা এবং আরো কিছু আত্মীয় ও নওকরকে আমরা যিন্দাহ্ গেরেফতার করে নিলাম। এরপর চললো সন্ধি-আলোচনা এবং সরদার তার লোকদের বিনিময়ে আমাদের লোকদের ছেড়ে দিলো। তারপর দীর্ঘদিন শান্তিপূর্ণ অবস্থা চললো। তথাপি অপ্রত্যাশিত হামলার সম্ভাবনা বিবেচনায় আমি নিজস্ব চাষীদের অস্ত্রসজ্জিত করতে শুরু করলাম এবং যে ভীলদের সাধারণভাবে আমরা বুযদীল মনে করতাম, তারা বেশ ভালো সিপাহী হয়ে উঠলো। কয়েকবার মারাঠা সরদার দূত পাঠিয়ে আমার কাছে আপত্তি জানালো যে, এই লোকগুলোকে সশস্ত্র করে আমি এই এলাকার জন্য বিপদ সৃষ্টি করছি, কিন্তু আমি তাকে হামেশা জওয়াব দিয়েছিঃ "যতোক্ষণ তোমাদের দিক থেকে দুষ্কৃতি না হবে, ততোক্ষণ এরা তোমাদেরকে পেরেশান করবে না।"

গত বছর আমি আমার পল্লী থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা নতুন যমিন আবাদ করার জন্য জংগল কাটাতে শুরু করলাম। একদিন ভোরে আমিও শাহ্‌বায মযদুরদের কাজ দেখাশুনার জন্য ঘোড়ায় চড়ে ঘরে থেকে বেরিয়েছি। গাঁয়ের বাইরে সামিনা ছোট ছেলেমেয়ের সাথে খেলা করছিলো। সে আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে সাথে যাবার জন্য যিদ ধরলো। সামিনার সওয়ারীর খুব শখ এবং কাছে কোথাও যাবার সময়ে মাঝে মাঝে তাকে আমি সাথে বসিয়ে নিয়ে যাই। কিন্তু সেদিন দূরে যাচ্ছি বলে তাকে অনেক করে বুঝিয়ে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলাম। এরূপ অবস্থায় চোখের পানিই হয়ে থাকে তার মারাত্মক অস্ত্র। তা-ই সে প্রয়োগ করলো। সুতরাং শাহবায তাকে নিজের ঘোড়ার উপর বসিয়ে নিলো। সন্ধ্যার কিছুটা আগে আমরা কাজ শেষ করে ফিরে আসছি, আচানক খানিকটা দূরে ঘন গাছের আড়াল থেকে পর পর আমাদের দিকে গুলী আসতে লাগলো। আমার ঘোড়া যখমী হয়ে পড়ে গেলো। সাথে সাথেই এক গুলী এসে লাগলো আমার পায়ে।

আমি বন্দুক সামলে নিয়ে একটা পড়ে থাকা গাছের আড়ালে শুয়ে পড়লাম। শাহ্‌বায আমার কাছে থেকে কয়েক কদম দূরে ছিলো। সে অবিলম্বে ঘোড়া থামিয়ে সামিনাকে নিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়লো। সামিনা তার ইশারা পেয়ে এক ঝোঁপের আড়ালে শুয়ে পড়লে শাহ্‌বায ছুটে এলো আমার কাছে। হামলাদাররা সামনে গাছপালার মাঝে লুকিয়েছিলো। আমার বিশ্বাস ছিলো যে, তারা বাইরে এসে হামলা করে বসবে আমাদের উপর। হঠাৎ পিছন থেকে ঘোড়ার পায়ের আওয়ায শোনা গেলো। ফিরে দেখলাম, সামিনা ঘোড়ার যিন আঁকড়ে রয়েছে আর ঘোড়া ছুটে চলেছে পূর্ণ গতিতে। আমার পায়ের তলার মাটি সরে গেলো। বাড়িতে সামিনা একটি টাট্টুতে সওয়ারী করতো, কিন্তু তার ঘোড়ায় চড়ে এমনি করে দ্রুত হাঁকিয়ে চলা ছিলো আমার দৃষ্টিতে একটা অসম্ভব ব্যাপার। সামিনার কথা ভাববার বেশী সময় পাওয়া গেলো না। গাছের ঝাড় থেকে আচানক গুলি বৃষ্টি হতে লাগলো। আমরাও জওয়াবী হামলা করলাম। কিছুক্ষণ পর আবার দুশমনের বন্দুক চুপ হয়ে গেলো এবং একজন বুলন্দ আওয়াযে বললোঃ "আকবর খান, এখন লড়াই নিস্ফল। এবার তুমি বেঁচে যেতে পারবে না। তবে যদি তুমি হাতিয়ার নিক্ষেপ করো, তা'হলে তোমার জান আমরা বাঁচাতে পারি।" আমি কোনো জওয়াব দিলাম না এবং দুশমন পুনরায় গুলীবর্ষণ শুরু করলো। আমার মনে বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, দিনের আলোয় দুশমন গাছের বাইরে এসে আমাদের উপর হামলা করবে না, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারের পুরো সুযোগটাই তারা নেবে।'

'সামিনার সম্পর্কে আমার ধারণা ছিলো, হয়তো ভয় পেয়ে সে পালিয়ে গেছে, কিন্তু আমার ধারণা ভূল প্রমাণিত হোল। সূর্যাস্তের সময়ে আমি শাহ্‌বাযকে বললাম, খানিকক্ষণ পরে অন্ধকার ছেয়ে যাবে এবং অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তাকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। আমি দুশমনকে আমার দিকে আকৃষ্ট করে রাখবো। কিন্তু সে আমার পরামর্শ শুনতে রাযী হোল না। তারপর যখন অন্ধকার ছেয়ে আসতে লাগলো এবং আমরা অনুভব করলাম যে, দুশমন এবার আচানক আড়াল থেকে বেরিয়ে

আমাদের উপর হামলা করবে, ইতিমধ্যে দূর থেকে ঘোড়ার পদধ্বনি আমাদের কানে এলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বস্তির আঠারোজন জোয়ান আমাদের সাহায্যের জন্য এসে পৌছলো। এ ছিলো সামিনারই কৃতিত্ব। সে ভয়ে পালিয়ে যায়নি। খোদা মালুম, কি করে তার মাথায় চিন্তা এসেছিলো যে, বেশী সময় আমরা দুশমনের মোকাবিলা করতে পারবো না। সে সব চাইতে কাছের পল্লীর লোকদের খবরদার করতে চেয়েছিলো, কিন্তু পথের প্রথম বস্তিতে সে ঘোড়া থামাতে পারেনি এবং দ্বিতীয় বস্তিতে এসে উদ্ধত ঘোড়াকে না থামিয়ে এক ধানের ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন চীৎকার জুড়লো যে, দেখতে দেখতে সারা গাঁয়ে লোক এসে সেখানে জমা হোল। ভাবীজান, সে এক অদ্ভূত মেয়ে। তানবীরের অবস্থা হচ্ছে, সে টিকটিকি দেখে ভয় পায়, আর সামিনা সাত বছর বয়সে প্রায় দু'গজ লম্বা এক সাপ মেরে ফেলেছিলো।'

ফরহাত বললেন ঃ 'আচ্ছা, যারা হামলা করেছিলো, তাদের কি হোল?'

ঃ 'সওয়ারদের দেখেই তারা পালিয়ে গেলো। আমরা তাদের পিছু ধাওয়া করে দু'জনকে মেরে ফেললাম এবং একজনকে যিন্দাহ গেরেফতার করে নিলাম। তার যবানী আমরা জানলাম যে, তারা সংখ্যায় ছিলো আটজন। সীমান্তপার থেকে মারাঠা সরদার আমায় কতল করার জন্য তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন।'

ফরহাত প্রশ্ন করলেনঃ 'এখন তাদের সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন ?'

ঃ 'তারপরে আর কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেনি এবং তার কারণ সম্ভবত এই যে, আধুনীর হুকুমাতের দাবি অনুযায়ী পুণার হুকুমত মারাঠা সরদারকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন।'



তৃতীয় দিন ভোরে নামাযের পর ফরহাত হাত তুলে দোআ করছেন। মুরাদ আলী কামরায় প্রবেশ করে কিছুক্ষণ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। ফরহাত দোআ শেষ করে তার দিকে মনোযোগ দিলেন। মুরাদ আলী বললোঃ 'আম্মাজান! চাচা আকবর খান সফরের জন্য তৈরী হয়েছেন, আপনার কাছ থেকে বিদায়ের এজাযত চাচ্ছেন।'

ঃ 'আচ্ছ, ওঁকে ভিতরে নিয়ে এসো।'

মুরাদ আলী ফিরে চলে গেলো। ফরহাত কামরা থেকে বেরিয়ে আঙিনায় এলেন। খানিকক্ষণ পরেই আকবর খান ও মুরাদ আলী আঙিনায় প্রবেশ করলেন।

আকবর খান বললেনঃ 'এবার আমায় এজাযত দিন। আমার আফসোস, আনওয়ার আলীর সাথে দেখা হোল না। আপনি এক সময়ে মুরাদ ও আনওয়ারকে আমার ওখানে পাঠাবার ওয়াদা ভুলবেন না।'

ফরহাত বললেনঃ 'পরিস্থিতি অনুকূল হলে ওদেরকে অবশ্যি পাঠাবো।'

আকবর খান ধরা গলায় 'খোদা হাফিয' বললেন এবং মুরাদ আলীর সাথে বেরিয়ে গেলেন। ফরহাত নির্বাক নিশ্চল হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন অতীতের

অন্ধকারে হারিয়ে ফেলা রঙিন দিনগুলোর কথা। তাঁর স্বামীর সাথে আকবরের সাহচর্যের যামানা এক স্বপ্নের মতো ভেসে উঠলো তাঁর মনে।

বাইরে দেওয়ানখানার সামনে করীম খান আকবর খানের ঘোড়ার বাগ ধরে দাঁড়িয়েছিলো। মুরাদের ইশারায় সে তাঁদের পিছু পিছু চললো। দেউড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর পথ চলার পর আকবর খান থেমে গেলেন এবং মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন ঃ 'মুরাদ, এখন আর তোমার আগে যাবার প্রয়োজন নেই। খোদা হাফিয!'

মুরাদ আলী দু'হাতে মোসাফেহা করে বললোঃ 'চাচাজান, শাহবায ও চাচীজানকে আমার সালাম বলবেন।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা।' বলে আকবর খান নওকরের হাত থেকে ঘোড়ার বাগ নিয়ে সওয়ার হলেন।

ঃ 'চাচাজান, বোন তানবীর ও সামিনাকেও আমার সালাম জানাবেন।' কম্পিত কণ্ঠে বললো মুরাদ আলী।

আকবর খান ঘোড়া হাঁকিয়ে বললেনঃ 'বহুত আচ্ছা, খোদা হাফিয।'

ঃ 'খোদা হাফিয, চাচাজান।'

ঘোড়া কয়েকটি লাফ মেরে কাছের রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং মুরাদ আলী করীম খানের সাথে ফিরে চললো। দেউড়ির কাছে পৌছলে মুনাওয়ার পূর্ণগতিতে ছুটে বেরিয়ে এলো এবং হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করলো ঃ 'ভাইজান, মেহমান চলে গেলেন?'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলো ঃ 'হাঁ, কিন্তু তুমি এতটা ঘাবড়ে গেলে কেন?'

মুনাওয়ার অভিযোগের স্বরে বললোঃ 'ভাইজান, করীম বখশ হামেশা আমার সাথে দুশমনি করে থাকে। সে আমায় জাগিয়ে দেবার ওয়াদা করেছিলো।'

করীম খান বললোঃ 'আমি তোমায় আওয়ায দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি গাধার মতো নাক ডাকাচ্ছিলে।'

মুনাওয়ার ফরিয়াদ করে বললোঃ 'দেখুন, ও মিথ্যা বলছে। আমি কখ্নো নাক ডাকাই না।'

মুরাদ আলী বললোঃ 'আচ্ছা, এবার বলো, মেহ্মানের কাছে তোমার কি কাজ ছিলো ?'

ঃ জি, আমি তাঁকে সালাম করতাম। দেখুন? তিনি আমায় কাল একটা মোহর দিয়েছেন। খালেস সোনার তৈরী মোহর। বিবিজীকেও আমি দেখিয়েছি। করীম বখশ ঈর্যায় জ্বলছে। তাই সে আমার জাগায়নি।'

মুনাওয়ার যেব থেকে আশরফী বের করে মুরাদ আলীকে দেখালো। করীম খান

তার যেব থেকে দু'টি আশরফী বের করে মুনাওয়ারের সামনে ধরে বললোঃ 'আমার জ্বলবার দরকারটা কি? খান সাহেব তোমায় দেবার আগে আমায় দু'টি মোহর দিয়েছেন এবং চৌকিদারকেও এক মোহর দিয়ে গেছেন।'

মুনাওয়ার মুখ ভার করে আশরফীটি যেবের মধ্যে ফেলে দিলো এবং মুরাদ আলী হাসতে হাসতে দেউড়িতে ঢুকে গেলো।

দুই

একদিন দুপুর বেলা পন্ডিচেরীর বন্দরগাহে বহু লোক মিলিত হয়ে এক ফরাসী জাহাজে আগত যাত্রীদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছিলো। জাহাজের মাল্লা ও বন্দরের মযদুররা মালপত্র নামাতে ব্যস্ত এবং কয়েকজন সিপাহী দর্শকদের বন্দরগাহের আবেষ্টনী থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করছিলো। জাহাজের কাপ্তান একদিকে দাঁড়িয়ে কয়েকজন ফরাসী কর্মচারী ও ফউজী অফিসারের সাথে কথা বলছিলেন। তাঁর কাছে এক সায়বানের তলায় এক মোহাররার মেষ পেতে বসেছে। তার সামনে কয়েকজন হাবসী ও ইউরোপীয় এবং তাদের অনেকের লেবাসে নিঃসম্বল ও দুস্থ অবস্থার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। তারা অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মোহররারের কুরসীর দু'ধারে ডানে বাঁয়ে দু'জন নওজোয়ান। পোশাক-পরিচ্ছদে তাদেরকে মহীশূর ফউজের সিপাহী বলে মনে হয়। এক দীর্ঘকায় সুদর্শন নওজোয়ান দর্শকদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে এগিয়ে গেলেন। মোহ্‌ররার তাঁকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো।

নওজোয়ান এক মূহূর্তের জন্য সায়বানের তলায় সমবেত লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখে মোহরারকে প্রশ্ন করলেনঃ ' এ জাহাজে কেবল এক'জন লোকই এসেছে?'

ঃ 'জি হ্যাঁ, জাহাজের কাপ্তান আমায় বলেছেন যে, আগামী মাসে মরিশাস থেকে আর একটি জাহাজ আসবে। এই এগারোজনের মধ্যে পাঁচজন ইউরোপীয় আর অবশিষ্ট আফ্রিকাবাসী। খোদা মালুম, জাহাজের কাপ্তান এদেরকে কোত্থেকে ধরে এনেছেন। এদের কারুরই ফউজী অভিজ্ঞতা নেই।'

নওজোয়ান লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ফরাসী ভাষায় বললেনঃ 'মহীশূরের ফউজের জন্য আমাদের শ্রেষ্ঠ সিপাহীর প্রয়োজন। আমি তোমাদেরকে ভগ্নোদ্যম করতে চাই না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কারুর ভুল ধারণা থাকে যে, মহীশূরের ফউজ বেকার লোকদের আশ্রয়স্থল, তা'হলে সে ভুল ধারণা এখন থেকেই কেটে যাওয়া দরকার। মহীশুরের ফউজে শামিল হবার আগে তোমাদেরকে প্রারম্ভিক শিক্ষার দুঃসাধ্য পর্যায় অতিক্রম করতে হবে। তোমাদের মধো যারা আমাদের মান অনুযায়ী পুরোপুরি উতরে যাবে, তাদের জন্য তরক্কী ও ইয্‌যতের পথ উম্মুক্ত থাকবে। মহীশূরের শাসককে তোমরা পাবে শ্রেষ্ঠ গুণগ্রাহী হিসাবে। প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য কয়েক হফতা তোমাদেরকে থাকতে হবে এখানে। তারপর যাদেরকে ফউজী খেদমতের যোগ্য মনে করা হবে, তাদেরকে পাঠানো হবে এবং বাকী লোকদের এক মাসের বেশী বেতন

দিয়ে ফেরত পাঠানো হবে।'

পিছন দিকে থেকে আওয়ায শোনা গেলোঃ 'আমার বিশ্বাস, এরা আপনার প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারবে। এরা বিলাস ভ্রমণের জন্য এখানে আসেনি, এসেছে নিজেদের জন্য নতুন যিন্দেগীর সন্ধানে।'

নওজোয়ান ফিরে দেখলেন, তাঁর পিছনে জাহাজের বয়োবৃদ্ধ কাপ্তান ও কয়েকজন ফরাসী অফিসার দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

'মসিয়ে' ফ্রাঁসক! ': নওজোয়ান মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন।

কাপ্তান ফ্রাঁসক পরম উৎসাহে মোসাফেহা করে বললেনঃ 'আনওয়াঁর আলী, আপনাকে তো আমি আশা করিনি। আপনি কবে এলেন এখানে?'

এক ফরাসী অফিসার বললেনঃ 'আপনাদের পরিচয় কবে থেকে?'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'কাপ্তান ফ্রাঁসক সেরিংগাপটমের ফউজী শিক্ষায়তনে আমার ওস্তাদ ছিলেন। এঁর কাছে থেকে আমি ফরাসী যবান শিখেছি।'

কাপ্তান ফ্রাঁসক প্রশ্ন করলেনঃ 'আপনার বাপ ও ভাইদের খবর কি?'

আনওয়ার আলী বিষণ্ন কণ্ঠে জওয়াব দিলেনঃ 'ভাই সিদ্দীক, মাসউদ ও আব্বাজান বিজনোরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। মুরাদ আলী সেরিংগাপটমে শিক্ষা গ্রহণ করছে।'

ঃ 'আমার বড়োই আফসোস হচ্ছে।' কাপ্তান ফ্র'াসক বিষণ্ন কণ্ঠে বললেনঃ 'মোয়ায্যম আলী ছিলেন আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু।'

আনওয়ার আলী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেনঃ 'আপনি কতোদিন পণ্ডিচেরীতে থাকবেন?'

ঃ 'তিনদিনের বেশী এখানে থাকবো না। আপনার সাথে অনেক কথা আছে। আপনি থাকেন কোথায়?'

আনওয়ার আলী বন্দরগাহ্ থেকে প্রায় দেড়শ' কদম দূরে কয়েকটি খিমার দিকে ইশারা করে বললেনঃ 'ওই আমার তাঁবু। আপনি রাতের খানা আমার সাথে খেলে খুব খুশী হবো।'

এক ফউজী অফিসার বললেন ঃ 'খানা খেতে আসতে পারবেন না। আজ রাত্রে গভর্ণরের বাড়িতে দাওয়াত রয়েছে।'

ফ্রাঁসক বললেনঃ 'আপনি ঘুমিয়ে না পড়লে গভর্ণরের দাওয়াত শেষে আমি দেখা করবার চেষ্টা করবো।'

আনওয়ার আলী হেসে বললেনঃ 'আমি ঘুমিয়ে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি অবশ্যি তশরীফ আনবেন।'

ঃ 'আমি অবশ্যি আসবো। আপনার সাথে একটা জরুরী কাজ আছে আমার।'

●

রাত এগারোটায় আনওয়ার আলী কাপ্তান ফ্রাঁসকের আগমন সম্পর্কে হতাশ হয়ে শুয়ে পড়বার ইরাদা করছিলেন, ইতিমধ্যে দীলাওয়ার খান খিমায় প্রবেশ করে বললোঃ 'জনাব, কাপ্তান সাহেব এসে গেছেন।

আনওয়ার আলী কুরসী ছেড়ে উঠলেন এবং খিমার বাইরে বেরিয়ে গেলেন। কাপ্তান ফ্রাঁসক আর একটি লোক সাথে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে।

তিনি এগিয়ে এসে আনওয়ার আলীর সাথে মোসাফেহা করে বললেন ঃ 'আমার মনে হয়েছিলো, আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। গভর্নরের দাওয়াতে গিয়ে কয়েকজন পুরানো দোস্তের সাথে দেখা। তাঁদের সাথে কথা বলতে অনেকখানি দেরী হয়ে গেলো। তারপর আপনার এখানে আসার আগে আমার জাহাজে যাওয়া ছিলো জরুরী।

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'আমি ভাবছিলাম, হয়তো আপনি এ সময়ে আসবেন না। চলুন, ভিতরে এসে বসুন।'

কাপ্তান ফ্রাঁসক আনওয়ার আলীর সাথে খিমায় প্রবেশ করলেন, কিন্তু তাঁর সাথী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফ্রাঁসক ফিরে বাইরে তাকিয়ে বললেনঃ 'লা গ্রাঁদ! এসো, বাইরে রইলে কেন?'

কাপ্তানের সাথী ভিতরে ঢুকলেন। প্রায় বিশ বছরের দুবলা পাতলা নওজোয়ান। তাঁর চেহারা-রূপে একটা অসাধারণ ভাবের অভিব্যক্তি। তথাপি তাঁর আনত মস্তক, বিষণ্ন উদাস দৃষ্টি দৈহিক ও মানসিক বেদনার সন্ধান দিচ্ছিলো।

ফ্রাঁসক আনওয়ার আলীর কাছে এক কুরসীতে বসে নওজোয়ানকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'বসো বেটা, তোমার জন্য এ খিমা আমার জাহাজের চাইতেও বেশী নিরাপদ।'

তারপর আনওয়ার আলীকে বললেনঃ পন্ডিচেরী পৌছে আমার সব চাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে এই নওজোয়ানের জন্য আশ্রয় স্থানের সন্ধান করা।

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'কোনো বিপদাশংকা থাকলে এক্ষুণি আমি ওঁকে সেরিংগাপটমে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি।'

ফ্রাঁসক বললেনঃ 'কেবল সেরিংগাপটমে পাঠানোর প্রশ্ন হলে আমার এতটা পেরেশানীর কারণ হোত না, কিন্তু অন্য কারণে ওঁকে কিছুদিন এখানে থাকতে হবে। আগে ভেবেছিলাম, ওঁকে কোনো ফরাসী বন্ধুর কাছে ছেড়ে যাবো। পন্ডিচেরীর ফউজের কতক অফিসারের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু প্যারীর পুলিশ ওঁকে সন্ধান করছে এবং কোনো ফরাসীই নিজের উপর বিপদ টেনে এনে ওঁর হেফাযতের যিম্মা নিতে পারে না। এক যুবতীর অপেক্ষায় ওঁকে এখানে থাকতে হবে এবং সে এসে গেলে তাঁকে নিয়ে উনি মহীশূরে চলে যাবেন। কিছুকাল প্যারীর ফউজী শিক্ষায়তনে ওঁর শিক্ষা হয়েছিলো এবং আমার বিশ্বাস, সুলতান টিপুর ফউজের ইউরোপীয় সেনাদলে

ওঁর কোনো উপযুক্ত কর্মের সংস্থান করা কঠিন হবে না। ততোদিন আপনি ওঁকে কোনো কাজে লাগিয়ে এখানে রাখুন। এ এক ভালো খান্দানের ছেলে এবং ওঁর বাপ ছিলেন আমার দোস্ত। আপনি যেনো মনে না করেন যে, এক স্বভাব-অপরাধীকে আপনার আশ্রয়ে রাখতে চাচ্ছি। আমার দৃষ্টিতে লোকটি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ এবং যে ঘটনায় উনি জড়িয়ে পড়েছেন, যে কোন শরীফ লোকই তাতে জড়াতে পারেন।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'আপনি ওঁকে আমার সাহায্য লাভের যোগ্য মনে করেছেন, তা-ই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি ওয়াদা করছি, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি ওঁর হেফাযত করবো এবং কর্মচারী হিসাবে নয়; বরং আমার দোস্ত হিসাবে উনি আমার কাছে থাকবেন।'

ফ্রাঁসক নওজোয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'প্যারীর পুলিশ এখান পর্যন্ত তোমার সন্ধান করবে, আপাতদৃষ্টিতে তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। তা 'হলেও তোমার সতর্ক থাকতে হবে। এখানে নিজের দেশের কোনো লোকের সাথে মেলামেশা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে না। তোমার সব সময়েই মনে রাখতে হবে, এই খিমার বাইরে যে কোনো জায়গা তোমার জন্য অরক্ষিত এবং এরপর মহীশূরে পৌঁছেও তোমার আসল নাম কারুর কাছে প্রকাশ না করাই হবে ভালো।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'এখানকার কোনো লোক ওঁকে আপনার সাথে এখানে আসতে দেখে নি তো?'

ঃ 'না, এখানে আসার পর ওঁকে আমি জাহাজের বাইরে উঁকি মারার এজাযতও দিইনি। এখন বন্দরগাহ্‌র যে সব পাহারাদার ওঁকে আমার সাথে আসতে দেখেছে, তারাও হয়তো ওঁকে আমার মাল্লাদেরই একজন মনে করেছে। পথে যাত্রীরাও মনে করেছে, উনি জাহাজের আমলাদের স্বজন। খোদার শোকর, বন্দরগাহে আপনার সাথে মোলাকাত হোল, নইলে ওঁকে নিয়ে আমি খুবই পেরেশান ছিলাম।'

আনওয়ার আলী নওজোয়ানের উদ্দেশ্যে বললেনঃ 'দেখুন, পেরেশানীর কোনো কারণ নেই। আমি আপনার হেফাযতের যিম্মা নিচ্ছি?'

নওজোয়ান বিষণ্ন হাসি হেসে আনওয়ার আলীর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আমার জন্য আপনার তকলীফ হবে, এই শুধু আমার আফসোস।'

কাপ্তান ফ্রাঁসক বললেনঃ 'এখন আমি মহীশূর সম্পর্কে আপনার সাথে কয়েকটি কথা বলবো। আজ গভর্নরের দাওয়াতে প্রায় সবটা সময়ই কুর্গ ও নারগন্ডে সুলতান টিপুর বিজয়কে বিষয়বস্তু করে আমাদের আলোচনা চলেছে এবং আমি ভালো করে উপলব্ধি করছি যে, কোনো কিছুর বিনিময়ে মহীশূরের চাকুরী ত্যাগ করা আমার উচিত হয়নি। মরিশাস পৌঁছে আমি হায়দর আলীর মৃত্যুর খবর পেলাম এবং আমি ফ্রান্সে না গিয়ে ফিরে আসার ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু মরিশাসে দীর্ঘদিন পীড়িত থাকার ফলে সে আশা পূর্ণ হোল না। রোগশয্যায় আমার সবটুকু আকর্ষণ সীমাবদ্ধ হোল মহীশূরের নয়া পরিস্থিতি অবগত হওয়ার ভিতরে এবং আমি অনুভব করছিলাম

যেনো মহীশূরই আমার আবাসভূমি। মহীশূরের ইযযত ও আযাদীই আমার ইয্যত ও আযাদী। মহীশূরের ফউজের প্রত্যেক পরাজয়কে আমার নিজস্ব পরাজয় ও প্রত্যেক বিজয়কে নিজস্ব বিজয় মনে করেছি। তারপর যখন মারসেলয্ পৌঁছলাম, তখন প্রত্যেক মজলিসে টিপুর বিজয় নিয়ে আলোচনা হোত। যাঁরা জানতেন যে, আমি মহীশূর সরকারের কর্মচারী ছিলাম, তাঁরা আমার কাছে বহু বিচিত্র প্রশ্ন করতেনঃ "টিপু কেমন লোক ? তাঁর বয়স কতো? তাঁর চেহারা আকৃতি কেমন? আপনি কখনো কাছে থেকে তাঁকে দেখেছেন। কখনো তাঁর সাথে কথা বলেছেন ?" তারপর আমি যখন বলতাম যে, টিপুকে আমি মহীশূর ফউজে প্রথম কর্মচারী হিসাবে দেখেছি এবং যাঁরা তাঁর সাথে প্রতি মাসে দু'চার বার মোসাফেহা ও আলাপ করার মওকা পেতেন, আমি তাঁদেরই একজন এবং তিনি আমার কাছে ফ্রান্সের ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে বেশুমার প্রশ্ন করতেন, তখন আমার কথায় শ্রোতাদের বিশ্বাস হোত না। আমায় খুব শীগগিরই ফিরে যেতে হচ্ছে। নইলে আমি সুলতানের খেদমতে অবশ্যি হাযির হতাম। আজ গভর্নরের সাথে আলোচনায় আমি জানলাম যে, মারাঠা ও নিযাম মহীশূরের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এবং সুলতান তাদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ইংরেজও ময়দানে নেমে আসবে। এরূপ পরিস্থিতিতে সুলতানকে একাধিক ময়দানে লড়তে হবে। আমার বিশ্বাস, মাংগালোরের সন্ধিচুক্তির পর মহীশূরের বিরুদ্ধে ইংরেজের যুদ্ধ সংকল্পের ব্যতিক্রম ঘটেনি। তারা অতীত পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কেবল উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করছে।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'ইংরেজদের সম্পর্কে কোনো মিথ্যা আশা আমরা পোষণ করি না। আমরা জানি, তারা নিযাম ও মারাঠার সাহায্যের আশা করে যুদ্ধ শুরু করেছিলো এবং এ-ও জানি যে, মাংগালোরের সন্ধিচুক্তির পর মহীশূরের বিরুদ্ধে যতো ষড়যন্ত্র হয়েছে, তার সবটাতেই ইংরেজ, নিযাম ও মারাঠার অংশ ছিলো। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের প্রত্যয় রয়েছে যে, যদি ইংরেজের প্ররোচনায় নিযাম ও মারাঠা যুদ্ধ শুরু করে দেয়, তা'হলে ইংরেজদের ময়দানে নামবার আগেই আমরা তাদেরকে দূরে তাড়িয়ে দেবো। মাংগালোর ও বিজনোরের যুদ্ধে ইংরেজ এতটা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে যে, পুনরায় ময়দানে অবতরণ করতে তাদের যথেষ্ট সময় লাগবে এবং যুদ্ধ বিলম্বিত করে তাদের প্রস্তুতির সুযোগ দেবার মতো ভুল আমরা করবো না। আপাততঃ মহিমান্বিত সুলতান নিযাম ও মারাঠাদের যুদ্ধ থেকে বিরত রাখবার সর্ববিধ চেষ্টা করছেন, কিন্তু যদি তাঁরা আমাদের জন্য যুদ্ধ ব্যতীত আর কোনো পথ না রাখেন, তা'হলে আপনি দেখতে পাবেন, নিযাম ও নানা ফার্ণাবিসের জন্য সেদিনটি হবে চরম দুর্ভাগ্যের দিন। ইংরেজের সাহায্যের আশায় যখন তারা মহীশূরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ফয়সালা করেছিলো, আমাদের আফসোস, তখন আমাদের ফরাসী মিত্র আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেননি। মাংগালোরের যুদ্ধের সময়ে ফরাসী ফউজ আমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে না গেলে আজ আমাদের এহেন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হোত না।'

কাপ্তান ফ্রাঁসক বললেনঃ 'এ ব্যাপারে আমি ফ্রান্সের পক্ষে ওকালতি করবো না। এ এমন এক ভুল, যার জন্য ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক হামেশা নিন্দা করতে থাকবেন

ফরাসীদের।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'কিন্তু ফ্রান্স এখনো বাস্তব নিষ্ঠার পরিচয় দিলে অতীত ত্রুটির প্রতিকার হোতে পারতো।'

ফ্রাঁসক জওয়াব দিলেনঃ 'হায় ! ফ্রান্সের পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান যদি আপনার থাকতো। ইংরেজের সাথে আমাদের সন্ধির কারণ এ নয় যে, আমরা তাদের শান্তিপ্রিয় মনোভাব স্বীকার করি। বরং তার কারণ, আমরা আমাদের দুর্বলতা পর্দার অন্তরালে ঢাকা দিতে চাই। আজকের ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা নিজস্ব বৈদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বাস্তববাদী পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুকূল নয়। সুলতান টিপুর খেদমতে হাযির হোতে পারলে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্তমান সরকারের দুর্বলতা স্বীকার করবো, যার দরুন আমরা আমাদের মিত্রদের সাহায্য করতে পারছি না। ফ্রান্সের প্রত্যেকটি সচেতন মানুষ উপলব্ধি করেন যে, প্রাচ্যে ইংরেজদের যুদ্ধ প্রবণতার মোকাবিলা করার মতো শক্তি একমাত্র মহীশূর, কিন্তু হায়! তাঁদের আওয়াজ যদি আমাদের শাসকদের প্রভাবিত করতে পারতো ! বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি ফ্রান্সের ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেছি, কিন্তু মহীশূরের ভবিষ্যত সম্পর্কে আমি হতাশা পোষণ করি না। আমার সমধারণাসম্পন্ন লোকেরা যথাসাধ্য ফ্রান্সকে হিন্দুস্তানে সুলতান টিপুর পক্ষ সমর্থনে প্ররোচিত করবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু হায় ! সেখানেও যদি হায়দর আলী বা টিপুর মতো শাসক থাকতেন!'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'আপনার হতাশ হওয়া উচিত হবে না। মহৎ লোক মহৎ প্রয়োজনের তাগিদেই জন্মে থাকেন।'

কাপ্তান ফ্রাঁসক কিছুক্ষণ মাথা নত করে চিন্তা করলেন। অবশেষে বললেনঃ 'খোদা করুন, যেনো ফ্রান্সেও সুলতান টিপুর মতো পথপ্রদর্শক জন্মান এবং আবার এসে আমি যেনো আপনাদেরকে খোশখবর দিতে পারি যে, আমার পিছনে এক বিশাল সামরিক বাহিনী এগিয়ে আসছে। আমার আফসোস, কতকগুলো বেকার লোককে আমি এখানে নিয়ে এসেছি। আপনি অবশ্যি হতাশ হবেন।'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'সুলতান টিপুর সিপাহী আমি এবং হতাশা আমার কাছে গুনাহ্। আমি ওদের সবাইকে কাজের লোক বানাতে পারবো, এ বিশ্বাস আমার আছে।'

ঃ 'কিন্তু এ কাজের জন্য কেন আপনাকে নির্বাচন করা হোল, ভেবে আমি হয়রান হচ্ছি। আপনাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত ছিলো। পন্ডিচেরীর পরিবর্তে পশ্চিম উপকূলের কোনো বন্দরগাহে আপনার অস্ত্রশস্ত্র ও সিপাহী সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হোত।'

ঃ 'আমরা বাইরে থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করি, তা' সাধারণত মাংগালোরেই এসে নামে। প্রকৃতপক্ষে, পন্ডিচেরীতে আমি আমাদের হুকুমতের প্রতিনিধিত্ব করছি। এখানে পৌছে আমি এমন কতক ইউরোপীয়কে পেয়েছি, যার রোযগারের সন্ধানে

ুরে বেড়াচ্ছিলো এবং আমি তাদেরকে কয়েকদিন ফউজী শিক্ষা দিয়ে মহীশূরে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারপর হুকুম এসেছে, যেনো আমি এখানে লোক ভর্তির জন্য এক নিয়মিত দফতর খুলে দেই। আমার বেকারীর দিন কাটিয়ে দেবার মতো কাজ জুটে গেছে বলে আমি খুশী হয়েছি। কুর্গের ময়দান থেকে আমায় এখানে পাঠানো হোল এবং ব্যক্তিগত ভাবে, আমি তাতে খুশী হইনি। কিন্তু আমায় এখানে পাঠানোর অন্যতম কারণ, আমি ফরাসী ভাষা জানি। দ্বিতীয় কারণ, কুর্গের কয়েকটি যুদ্ধে আমি অসতর্কতা অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত সাহস প্রদর্শন করেছিলাম। অন্যতম সিপাহসালার বুরহানুদ্দীন আমায় ডেকে বললেনঃ "কুর্গের যুদ্ধ এখন প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে এবং আমার আকাংখা, তুমি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামে অংশ নেবার জন্য বেঁচে থাকবে। সুলতান কোনো বুদ্ধিদীপ্তিসম্পন্ন লোককে পন্ডিচেরী পাঠাতে চান এবং আমি তোমারই নাম পেশ করে দিয়েছি।" এখানে এসে আমি খুবই হতাশ হয়ে গেলাম। পন্ডিচেরীর গভর্নর থেকে শুরু করে মামুলী অফিসার পর্যন্ত প্রত্যেকেই স্বীকার করে যে, ইংরেজের সংকল্প সম্পর্কে আমাদের আশংকা নির্ভুল এবং তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি শেষ হয়ে গেলে ভার্সাই সন্ধিপত্রের মূল্য এক টুকরা ছেঁড়া কাগজের বেশী থাকবে না। কিন্তু যখন ফ্রান্স ও মহীশুরের মধ্যে সক্রিয় সাহায্যের প্রশ্ন ওঠে, তখন সবাই জওয়াব দেন যে, এ ব্যাপারে তাঁরা অসহায়। ইংরেজের তরফ থেকে চুক্তিভংগ না হোলে ফরাসী সরকার ভার্সাই চুক্তির খেলাফ কোনো পদক্ষেপ করতে পারেন না।'

ফ্রাঁসক বললেনঃ 'আমার ভয় হয়, ইংরেজের দিক থেকে চুক্তি ভংগের সূচনা হোলেও ফরাসী সরকার প্রতীক্ষা করে অবস্থা দেখবার নীতি অনুসরণ করতে পারেন। আজ আমি গভর্নরের সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারলাম যে, তিনি সুলতান টিপুকে সাহায্য করার পূর্ণ সমর্থক, কিন্তু ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এতটা বিগড়ে গেছে যে, ওখান থেকে কোনো কার্যকরী সাহায্য লাভের আশা আপনারা করতে পারেন না।'

আনওয়ার আলী ও কাপ্তান ফ্রাঁসক প্রায় দু'ঘন্টা নানা প্রসংগ আলোচনা করলেন। অবশেষে ফ্রাঁসক উঠতে গিয়ে বললেনঃ 'অনেক দেরী হয়ে গেলো। এবার আমায় এজাযত দিন। অবসর পেলে কাল আবার দেখা করবার চেষ্টা করবো।'

আনওয়ার আলী উঠে কাপ্তান ফ্রাঁসকের সাথে খিমার বাইরে গেলেন এবং লা গ্রাঁদ এক মূহূর্তে দ্বিধা করে তাঁদের অনুসরণ করলেন। খিমার বাইরে গিয়ে কাপ্তান ফ্রাঁসক বললেনঃ 'এখন আপনারা গিয়ে আরাম করুন।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'আমি বন্দরগাহ্ পর্যন্ত আপনার সাথে যাবো।'

ঃ 'না, এতটা তকলীফের প্রয়োজন নেই। আরাম করুনগে।'

দু'জন পাহারাদার কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়েছিলো। আনওয়ার আলী একজনকে বন্দরগাহ্ পর্যন্ত কাপ্তান ফ্রাঁসকের সাথে যাবার হুকুম দিলেন।

ফ্রাঁসক একে একে আনওয়ার আলী ও লা·গ্রাঁদের সাথে মোসাফেহা করে পাহারাদারের সাথে চললেন।

ঃ 'আসুন। আনওয়ার আলী লা গ্রাঁদের বাহু আকর্ষণ করে বললেন।

তাঁরা ফিরে এসে খিমায় প্রবেশ করলে আনওয়ার আলী বললেনঃ 'দেখুন, এখন আপনার জন্য আলাদা খিমা পাততে দেরী হবে। তাই আজকের রাত আপনাকে আমার সাথে একই খিমায় কাটাতে হবে।'

লা গ্রাঁদ জওয়াব দিলেনঃ 'আমার আলাদা খিমার প্রয়োজন নেই আর আপনাকেও তক্‌লীফ দিতে চাই না। আপনার কোনো নওকরের সাথেই আমি থাকতে পারবো।'

ঃ 'না, আমার কোনো তক্‌লীফ হবে না।'

আনওয়ার আলী দীলাওয়ার খানকে আর একটা বিছানা আনতে বললেন এবং কিছুক্ষণ পর উভয়ে কাছাকাছি শুয়ে পড়লেন। লা গ্রাঁদের সাথে প্রথম সাক্ষাতে তাঁর পীড়াদায়ক নীরবতাই আনওয়ার আলীর মনে সব চাইতে বেশী দাগ কেটেছিলো। তিনি বললেনঃ 'মসিয়েঁ! প্যারীতে আপনার উপর কি ঘটেছে, আমি জানি না, কিন্তু আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে, এখানে আপনার কোনো বিপদ নেই। এখন আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকুন। আমার বিশ্বাস, পন্ডিচেরীর হুকুমত আপনার দিকে সাধারণ অবস্থায় নযরই দেবে না। তবে যদি কোনো দ্রুত বিপদ সম্ভাবনা আসে, তা'হলে আমি আপনাকে এখান থেকে কোনো নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবো।'

'লা গ্রাঁদের অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। তিনি শুধু বললেনঃ 'মসিয়েঁ আপনি বড়োই রহমদীল।'



তৃতীয় দিন কাপ্তান ফ্রাঁসকের জাহাজ রওয়ানা হয়ে গেলো। লা গ্রাঁদের ব্যক্তিত্ব আনওয়ার আলীর কাছে একটা দুর্জেয় রহস্য হয়ে থাকলো। তিনি জীবনে কখনো এমন স্বল্পভাষী নওজোয়ান দেখেন নি। তিনি তাঁর সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন কিন্তু লা গ্রাঁদ তাঁর প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জওয়াব দিয়ে চুপ করে যান। তাঁর বিষণ্ন রূপ দেখে আনওয়ার আলীর অন্তরে জাগে কতো রকম প্রশ্ন, কিন্তু তাঁকে বেশী কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহস হয় না।

একদিন মধ্যরাত্রের কাছাকাছি সময়ে খিমার মধ্যে শোরগোল শুনে আনওয়ার আলী গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। লা গ্রাঁদ স্বপ্নের মধ্যে বিড় বিড় করে বলছেনঃ 'এ মরে গেছে- আমি নির্দোষ- আমি কোনো অপরাধ করিনি- তুমি জালেম- খোদার দিকে চেয়ে আমায় আমার ইস্কুলে নিয়ে চলো- জিন, জলদী করো- এখান থেকে আমরা বেরিয়ে চলে যাবো- ওরা আসছে, এখানে আমাদের থাকা চলবে না- জলদী করো, ছুটে চলো, ছুটে চলো!'

দীলাওয়ার খান মশাল হাতে খিমায় প্রবেশ করলো। আনওয়ার আলী লা গ্রাঁদের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখ ঘামে ভিজে গেছে। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হয়

যেনো তিনি এক ভয়াবহ দৈত্যের হাত থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করছেন। জলদী উঠে আনওয়ার আলী এগিয়ে গিয়ে লা গ্রাঁদের দু'বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন। লা গ্রাঁদ চোখ খুলে একদৃষ্টে আনওয়ার আলীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। খুব জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে তাঁর।

ঃ 'কি হোল?' আনওয়ার আলী বললেনঃ 'আপনি ভালো আছেন তো ?' তারপর দীলাওয়ার খানকে বললেনঃ 'দীলাওয়ার খান, তুমি ফরাসী ফউজের কমান্ডারের কাছে ছুটে গিয়ে বলো, আমার একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের প্রয়োজন।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'না, না মসিয়েঁ, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। ডাক্তারের প্রয়োজন নেই আমার। আমি একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি। আমায় শুধু পানি আনিয়ে দিন।' আনওয়ার আলী দীলাওয়ার খানকে পানি আনতে বললেন। সে খিমার ভিতরে একটি সোরাহী থেকে পাত্র ভরে পানি এনে লা গ্রাঁদের হাতে দিলো। লা গ্রাঁদ হাঁপাতে হাঁপাতে কম্পিত হস্তে পানি গিলতে লাগলেন। তারপর আনওয়ার আলীকে বললেনঃ 'মসিয়েঁ, আমি বড়োই লজ্জিত। আমি আপনাকে বহুত তকলীফ দিয়েছি।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'আপনার তক্‌লীফের অংশ আমি নিতে পারিনি, এই আমার কষ্ট। আমি গায়ে পড়ে আপনার গোপন তথ্য জানবার চেষ্টা করিনি, কিন্তু এখন আমি অনুভব করছি যে, আপনার এমন একজন বন্ধুর প্রয়োজন, যিনি আপনার দীলের বোঝা হালকা করে দিতে পারবেন। আমি জানতে পারি, জিন কে?'

লা গ্রাঁদ জওয়াব দিলেনঃ 'মসিয়েঁ ! যদি আমি আপনার কাছে কিছু গোপন করে রাখার চেষ্টা করে থাকি, তার কারণ এ নয় যে, আপনার উপর আমার বিশ্বাস নেই। বরং তার কারণ, আমি আপনাকে পেরেশান করতে চাইনি। এবার আপনি ঠান্ডা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ুন। আপনার যে কোনো প্রশ্নের জওয়াব আমি দেবো।

আনওয়ার আলী দীলাওয়ার খানকে বললেনঃ 'দীলাওয়ার খান, তুমি গিয়ে এখন আরাম করো।'

দীলাওয়ার খান চলে গেলে আনওয়ার আলী শুয়ে পড়লেন। খানিকক্ষণ খিমার মধ্যে স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। তারপর লা গ্রাঁদ তাঁর কাহিনী শুনাতে লাগলেনঃ 'মসিয়েঁ আনওয়ার আলী ! কুদরত আমার সাথে বিদ্রুপ করছে। আমি আপনাকে আমার অতীত কাহিনী শোনাচ্ছি। আমার আসল নাম লেম্বার্ট ! আমি মারসেলয্‌ ও প্যারীর মাঝখানে একটি ছোট শহরে জন্মেছিলাম। আমার বাপ ছিলেন ফরাসী নৌবহরের এক জাহাজের কাপ্তান। আমার দশ বছর বয়সে আমার বাপকে এক অভিযানের সাথে হিন্দুস্তানে আসতে হোল। তার আসার প্রায় এক বছর পর আমার মা মারা গেলেন। ঘরে তখন আমার চাইতে আট বছরের বড়ো এক বোন। আড়াই বছর পর বাপ ফিরে এলেন। হিন্দুস্তানে এক যুদ্ধে যখমী হয়ে তাঁর একখানা বাহু বেকার হয়ে গিয়েছিলো। ফিরে এসেই তিনি চাকুরী ছেড়ে দিলেন এবং চাকুরীর আমলের জমা টাকা দিয়ে এক সরাই খরিদ করলেন। মারসেলয্‌ ও প্যারীর মধ্যে ক্রমাগত যাত্রী চলাচল হোত এবং আমাদের সরাইর কারবার বেশ লাভজনক হোল।

কয়েক বছর পর আমার পিতা শহরের আমীর লোকদের মধ্যে গণ্য হলেন। সরাইয়ে যাত্রীদের জন্য কয়েকটি নতুন কামরা তৈরী হোল। ফউজের এক লেফটেন্যান্টের সাথে আমার বোনের শাদী হোল এবং স্বামীর সাথে তিনি মারসেলয় চলে গেলেন। আমি ভর্তি হোলাম প্যারীর কাছে ফউজী ইস্কুলে। আমি ফরাসী ফউজে একটা বড়ো পদ লাভ করবো, এই ছিলো আমার পিতার যিন্দেগীর আকাংখা এবং আমারও ভবিষ্যতের আশা কম ছিলো না, কিন্তু আজ আমি অনুভব করছি যে, মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারে, কিন্তু সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ তার এখতিয়ারে নয়।

'শীতের ছুটিতে আমি ঘরে ফিরে এলাম। অবসর সময়ে আমি সরাইয়ের কাজে আমার বাপকে সাহায্য করতাম। তখন আমার ছুটির দশ দিন মাত্র বাকী। একদিন ভোরে একখানা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামলো সরাইয়ের সামনে। আমার বাপ তখনো ঘর থেকে ফেরেননি। আমি তাঁর হ'য়ে যাত্রীদের অভ্যর্থনা করার জন্য বাইরে এলাম। এক বৃদ্ধ এক যুবতীর দেহে ভর করে গাড়ি থেকে নামলেন। আমি ছুটে গিয়ে বৃদ্ধের বাহু ধরলাম। যুবতী বললোঃ "পথে আব্বার বড়োই তক্লীফ হয়েছে। অবিলম্বে আপনি একজন ডাক্তার ডাকিয়ে দিন।"

'আমি এক নওকরকে শহরের শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের জন্য পাঠিয়ে দিলাম এবং যাত্রীকে সরাইয়ের এক কামরায় শুইয়ে দিলাম। যাত্রীটির নাম মসিয়ে আন্তন। তিনি প্যারীর একজন ধনী ব্যবসায়ী। যুবতীর নাম জিন। সে বারবার আমায় প্রশ্ন করছিলোঃ "ডাক্তারের বাড়ি কতো দূরে ? এত দেরী কেন করছেন ? তা'র বাড়ি বেশী দূরে হোলে আপনি কেন নওকরকে পায়দল পাঠালেন ? কেন আমাদের গাড়িটা পাঠালেন না?"

'আমি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে বললামঃ "ডাক্তারের বাড়ি খুবই কাছে। তিনি হয়তো এক্ষুণি আসছেন।"

'আচানক মসিয়েঁ আন্তন উঠে বসে বললেনঃ "বেটি, পেরেশানির কোনো কারণ নেই। এ রোগ নতুন কিছু নয়। দেখো আমি কেমন সুস্থ হয়ে উঠেছি।"

'যুবতী চীৎকার করে উঠলোঃ "না, না আব্বা, আপনি আরামে শুয়ে থাকুন।" মসিয়েঁ আন্তন হাসিমুখে আবার শুয়ে পড়লেন।

'কিছুক্ষণ পর ডাক্তারও এসে গেলেন। রোগীকে ভালো করে পরীক্ষা করে এবং কয়েকটি প্রশ্ন করে তিনি বললেনঃ 'ওঁর হৃদযন্ত্রের রোগ। আপাতদৃষ্টিতে ওঁর কোনো বিপদ নেই, কিন্তু এ অবস্থায় সফর করা ঠিক হবে না।" জিন ডাক্তারকে সমর্থন করলো এবং মসিয়েঁ আন্তনকে সফর মুলতবী রাখতে হোল।

'এটা কোনো অসাধারণ ঘটনা নয়, কিন্তু হায় ! সেদিন যদি আমি জানতাম যে, প্যারীর এই ব্যবসায়ী ও তাঁর শুভ্রকেশা নীলনয়না কন্যার সাথে এই মোলাকাতই আমার যিন্দেগীর গতি পরিবর্তন করে দেবে!

'মসিয়েঁ ও তাঁর কন্যা মারসেলযে কোনো আত্মীয়ের বিয়েতে শরীক হওয়ার

পর ফিরে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন জানলেন যে, আমি প্যারীতে শিক্ষালাভ করছি এবং আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে, তিনি আমায় তাঁদের গাড়িতেই সফরের দাওয়াত দিলেন এবং আমার খাতিরে একদিন দেরী করে গেলেন। তাই তৃতীয় দিন আমি তাঁদের সাথে চললাম।

'প্যারী থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে মসিয়েঁ আন্তনের পুনরায় হৃদযন্ত্রের কষ্ট দেখা দিলো এবং আমাদেরকে আরো দু'দিন পথে এক সরাইয়ে থাকতে হোল। সাধারণ অবস্থায় প্যারীর এক উঁচু তবকার যুবতী হয়তো আমায় মনোযোগ দেওয়ার যোগ্য মনে করতো না, কিন্তু মসিয়েঁ আন্তনের অসুস্থতার দরুন আমি জিনের কাছে একটা বড়ো অবলম্বন হয়ে উঠলাম।

'সরাইয়ে দ্বিতীয় রাত্রে মসিয়েঁ আন্তনের অবস্থা বেশ কিছুটা খারাপ হয়ে পড়লে দীর্ঘ সময় আমায় তাঁর পাশে বসে রাত জাগতে হোল। শেষ রাত্রে ঘুম এসে গেলো এবং জিনও তার কুরসীতে বসে ঘুমোতে লাগলো। ভোরে মসিয়েঁ আন্তন চোখ খুলে আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেনঃ "আফসোস, আজ আপনাকে সারাটা রাত জেগে থাকতে হোল।"

'আমি প্রশ্ন করলামঃ "এখন আপনার কি রকম অবস্থা?"

'মসিয়েঁ আন্তন জওয়াব দিলেন ঃ "আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। অবিলম্বে প্যারী পৌঁছে কোনো যোগ্য ডাক্তারকে ডাকবো, এই আমার ইরাদা।"

'আমি বললামঃ "এখন আপনার সফর করা ঠিক হবে না। আপনার এজাযত হোলে আমি প্যারী থেকে ভালো ডাক্তার এখানে নিয়ে আসি।"

'মসিয়েঁ আন্তন জওয়াব দিলেন ঃ "এই ভাঙা সরাইয়ে দুনিয়ার সব বড়ো বড়ো ডাক্তার জমা হোলেও আমার আরাম হবে না। আমি অবিলম্বে প্যারীতে পৌঁছতে চাই।"

'আমাদের কথাবার্তার মধ্যে জিনও জেগে উঠলো এবং সেও তার পিতাকে সফরের সংকল্প ত্যাগ করতে অনুরোধ করলো, কিন্তু তাঁর ফয়সালা অটল। তাই কিছুক্ষণ পরেই আমরা আবার গাড়িতে সওয়ার হলাম। বাকী সফর সম্পর্কে আমার শুধু মনে পড়ে, আমি ঘুমের নেশায় কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে ঢুলে পড়ছিলাম। তারপর আমি যখন গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, তখন গাড়ি এক প্রশস্ত বাড়ির প্রাংগণে প্রবেশ করেছে। আমি তখন জিনের গায়ে ঠেস দিয়ে রয়েছি আর মসিয়েঁ আন্তন হাসছেন।

ঃ "মাফ করুন।" আমি একদিকে সরে গিয়ে বললাম।

'গাড়ি থামলে এক নওজোয়ান এগিয়ে এসে দরযা খুললেন। মসিয়েঁ আন্তন বললেন ঃ 'আমার পুত্র ডেন্‌স্‌।'

'মসিয়েঁ আন্তনের গৃহে প্রবেশ করতে গিয়ে আমি তাঁর ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য আন্দায

করতে পারলাম। আহারের পর তাঁর কাছ থেকে বিদায়ের এজাযত নেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার ইস্কুল খোলা পর্যন্ত তাঁরা সবাই আমায় সেখানে রাখবার জন্য যিদ ধরলেন। তাই আমায় ইরাদা বদল করতে হোল।

'জিনের ভাই ডেন্‌স্ বেশ বুদ্ধিমান ও স্বল্পভাষী নওজোয়ান। প্যারীতে তিনি আইন পড়তেন। আমি তাঁর সাথে অবাধে মিশবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু অচেনা লোকের সাথে মেলামেশা করার মতো লোক তিনি ছিলেন না। চারদিন পর আমি গৃহস্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম এবং মসিয়েঁ আন্তনের কাছে ওয়াদা করলাম যে, ছুটির দিনে আমি তাঁদের বাড়িতে আসবো। এর পরে ইস্কুলের বাইরে আমার সব চাইতে বড়ো আকর্ষণ হোল মসিয়েঁ আন্তনের বাড়ি। আমার ইস্কুল ছিলো প্যারী থেকে কয়েক মাইল দূরে। আমি প্রতি মাসে দু'একবার সপ্তাহ শেষে তাঁদের বাড়িতে যাই আর রবিবার ফিরে আসি। সপ্তাহ শেষে প্যারী যাবার সুযোগ না পেলে রবিবার ভোরে সেখানে যাই এবং সারাদিন সেখানে কাটিয়ে ফিরে আসি। ডেন্‌স্ সাধারণত বাড়িতে থাকেন না এবং কলেজের পর তিনি কি কাজে কোথায় ব্যস্ত থাকেন, বাড়ির কেউ সে খবর রাখে না। এ কথা আমি অস্বীকার করবো না যে, সেই খান্দানের সাথে মেলামেশা করার আমার প্রধান আকর্ষণ ছিলো জিন, কিন্তু আমি ভালো করে জানতাম যে, জীবনে আমাদের পথ কখনো এক হবে না। যেসব মেয়েকে একবার দেখলে বারবার দেখতে মন চায়, সে ছিলো নিঃসন্দেহে তাদেরই একজন, কিন্তু আমি যদি তাকে জীবনের লক্ষ্য বলে ধরে নিতাম, তা'হোলে তা' হোত চরম আত্মপ্রতারণা। আমায় দেখলে তার মুখের উপর একটা হালকা হাসির ঝিলিক খেলে যেতো, এই ছিলো আমার জন্য যথেষ্ট এবং এই হাসিটুকু দেখবার জন্যই আমি অধীর হয়ে ছুটির দিনের ইন্তেযার করতাম।

'একদিন আমি মসিয়েঁ আন্তনের বাড়িতে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে বিদায়ের এজাযত চাইলাম, কিন্তু তিনি আমায় রাতের খানা খেয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। নওকর সাথে দিয়ে তিনি তাঁর গাড়িতে আমায় পাঠাবার ওয়াদা করলেন। সন্ধ্যার খানিকক্ষণ আগে ডেন্‌স্ কোনো এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করার বাহানা করে বেরিয়ে গেলেন। রাতের বেলায় খাবার জন্য আমরা তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে বসে গেলাম খানার টেবিলে। মসিয়েঁ আন্তন খুব রেগে গিয়েছিলেন, কিন্তু জিন তার ভাইয়ের পক্ষে ওকালতি করছিলো। কিছুক্ষণ পর মসিয়েঁ আন্তনের রাগ দূর হয়ে গেলো এবং কথায় কথায় তার স্বভাবসিদ্ধ অট্টহাসি শোনা যেতে লাগলো। খানা শেষ করার পর আমি তাঁর এজাযত চাইলে তিনি বললেনঃ "একটুখানি দেরী করো। তোমার সাথে একটা যরুরী কথা আছে। আগামী মাসের দশই তারিখে জিনের বিয়ে উপলক্ষে আমার এখানে দাওয়াত। তা'তে তুমি অবশ্যি হাযির থাকবে।"

'আমি জিনের দিকে তাকালাম, কিন্তু তার মুখ দেখে সঠিক মনোভাব কল্পনা করা আমার পক্ষে কঠিন ছিলো। আমি কিছু বলতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার কণ্ঠে স্বর জুটছিলো না। হঠাৎ বাইরে কারুর পদশব্দ শোনা গেলো। ডেন্‌স্ দু'হাতে পেট চেপে ধরে কাঁপতে কাঁপতে কাপতে কামরায় প্রবেশ করে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। আমি

জলদী করে উঠে ডেন্‌স্‌কে ধরে তুলবার চেষ্টা করলাম। তাঁর পোশাক রক্তে ভিজে গেছে। জিন আচ্ছন্নের মতো তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মসিয়েঁ আন্তন কুরসী ছেড়ে উঠলেন। তিনি দু'হাতে নিজের বুক চেপে ধরে দাঁড়ালেন এবং পরক্ষণেই হঠাৎ উপুড় হয়ে মেঝের উপর পড়ে গেলেন। আমি ডেন্‌স্‌কে ছেড়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে ধরে তুলবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ততোক্ষণে তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে। পুনরায় আমি ডেন্‌সের দিকে মনোযোগ দিলাম এবং তাঁকে ধরে উঠাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি বললেনঃ "মসিয়েঁ তুমি পালাও এখানে থেকে। পুলিশ আমার পিছু ধাওয়া করছে। এখানে থাকা তোমার ঠিক হবে না।" দু'জন নওকর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দেখছিলো এ মর্মান্তিক দৃশ্য। আমি তাদেরকে ডাক্তার ডাকতে বললাম। জিন প্রথমে তার পিতার মৃতদেহের উপর পড়ে চীৎকার করতে লাগলো, তারপর ভাইয়ের মাথা কোলে তুলে নিলো। এ আমার কাছে এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন। কতোবার আমি এ দুঃস্বপ্ন দেখেছি। নিদ্রায় জাগরণে এ মর্মান্তিক দৃশ্য আমার চোখে ভেসে উঠেছে।

'ডেন্‌স্‌ বারবার আমায় বলতে লাগলেন ঃ "তুমি পালিয়ে যাও। এখানে থাকা তোমার ঠিক নয়। তুমি বিনাদোষে ধরা পড়বে।" সহসা পুলিশের এক ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন সিপাহী কামরায় এসে ঢুকলো। ইন্সপেক্টর ডেন্‌সের মাথার চুল ধরে নির্মমভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে বলতে লাগলোঃ "বলো, তোমার সাথী কে কে ছিলো?"

'জিন ইন্সপেক্টরের হাত চেপে ধরলো, কিন্তু এক সিপাহী তাকে ধাক্কা দিয়ে এক দিকে ফেলে দিলো। আমি সিপাহীর মুখের উপর এক ঘুসি বসিয়ে দিলাম এবং তারপর ইন্সপেক্টরের গলা চেপে ধরলাম। বাকী সিপাহীরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং আমি তাদের হাতে অসহায় হয়ে পড়লাম। ইন্সপেক্টর আবার ডেন্‌স্‌কে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে প্রশ্ন করলোঃ "বলো, তোমার সাথী কারা?" কিন্তু এক বিদ্রূপাত্মক হাসি ছাড়া ডেন্‌সের কাছে থেকে কোনো জওয়াব মিললো না। যিন্দেগীর সফর শেষ হওয়া পর্যন্ত এই হাসিই লেগেছিলো তাঁর মুখে।

'ইন্সপেক্টর আমার দিকে তাকিয়ে বললোঃ "এতো মরে গেছে আর তুমি যিন্দা, আমার বিশ্বাস, তুমি আমাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জওয়াব দেবে।"

'আমি বললামঃ 'উনি কি অপরাধ করেছেন, আমি জানি না। একটি যখমী লোকের সাথে এমনি বর্বর ব্যবহার তুমি করতে পারো না।'

'জিনের চীৎকার বন্ধ হয়ে গেছে। সে সিপাহীদের আমার দিকে ভিড় করতে দেখে ছুটে চলে গেলো পিছনের কামরায়।

'ইন্সপেক্টরের হুকুমে আমার কোট খুলে ফেলে দরযার সামনে বারান্দায় এক স্তম্ভের সাথে বেঁধে দেওয়া হোল। তারপর এক সিপাহী আমায় চাবুক মারতে লাগলো আর ইন্সপেক্টর বার বার আমায় প্রশ্ন করতে লাগলো ডেন্‌সের সাথীদের সম্পর্কে। ডেন্‌সের কোনো সাথীকে আমি জানি না, আমি ফউজী ইস্কুলের শিক্ষার্থী এবং এই সময়ে এ বাড়িতে থাকা একটা আকস্মিক ব্যাপার মাত্র, এ কথা ইন্সপেক্টরকে বুঝাবার

সব রকম চেষ্টাই আমি করলাম, কিন্তু সে কোনো কথাই মানতে রাযী নয়। আচানক জিন পিস্তল হাতে বেরিয়ে এসে অবিলম্বে ইন্সপেক্টরের উপর গুলী চালিয়ে দিলো। গুলী ইন্সপেক্টরের বাহুতে লাগ্‌লো এবং সিপাহীরা জিনকে গেরেফতার করলো। সিপাহীরা আমায় ছেড়ে ইন্সপেক্টরের দিকে মনোযোগী হলো। তখন তার বাহু থেকে রক্ত পড়ছে। সে জলদী করে কোট খুলে ফেললো এবং এক সিপাহীকে পট্টি বেঁধে দিতে বললো। সহসা দশ-বারোজন লোক বাড়ির পাইন বাগিচা থেকে বেরিয়ে এলো এবং পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দেখতে দেখতে তারা দু'জনকে মেরে ফেললো এবং বাকী চারজনকে নিরস্ত্র করে ফেললো। হামলাকারীদের মুখের উপর ছিলো নেকাব ঢাকা এবং তাদেরকে চিনতে পারা ছিলো দুঃসাধ্য। আমায় মুক্ত করে দিয়ে তারা ডেন্‌সের কথা জিজ্ঞেস করলো। আমি বললাম যে, ডেন্‌স ও তাঁর পিতার লাশ ভিতরে পড়ে রয়েছে। তারা ইন্সপেক্টর ও তার সাথীদের রশি দিয়ে বেঁধে এক কামরায় আটকে রাখলো। একজন জিনকে বললোঃ "ডেন্‌সের বোন আমাদের সবারই বোন। আজ এক গাদ্দার আমাদের গোপন বৈঠক সম্পর্কে পুলিশকে সতর্ক করে দিয়েছে। এখন আপনার এখানে থাকায় বিপদ রয়েছে। আপনি আমাদের সাথে চলুন।"

'জিন জওয়াব দিলোঃ "না, আমি আমার বাপ-ভাইয়ের লাশ ফেলে যেতে পারবো না। পুলিশ আমার সাথে কি ব্যবহার করবে, তার জন্য আমার পরোয়া নেই।"

'নেকাবপোষ বললোঃ "বোন ! ডেন্‌স্ এক উচ্চ আদর্শের জন্য জান দিয়েছে। যদি আপনি এখানে থাকবার জন্য যিদ ধরে থাকেন, তা' হোলে এক সাথীর বোনের ইয্‌যত রক্ষার জন্য পুলিশের কাছ আত্মসমর্পণ ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর থাকবে না। জানের ভয় আমাদের নেই, কিন্তু যে লক্ষ্য ডেন্‌সের কাছে জীবনের চাইতেও প্রিয়তর ছিলো, তার পুর্ণতা বিধানের জন্য আমরা যিন্দাহ থাকতে চাই। খোদার দিকে চেয়ে সময় নষ্ট করবেন না। এখন কথার সময় নেই। চলুন, হয়তো বেশ কিছুকাল আপনার এ বাড়িতে আসার সুযোগ হবে না। তাই ঘরে যে নগদ অর্থ ও গহনাপত্র রয়েছে, তা' বের করে নিন।"

'জিন উদ্বেগ ও দ্বিধায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো। নেকাবপোষ আমায় বললোঃ "মসিয়েঁ ! একটি আকস্মিক ভুল আপনাকে আমাদেরই কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। চলুন, আপনারও এরপর প্যারীতে স্থান হবে না।"

'আমি বললামঃ "ডেন্‌সের মৃত্যুর জন্য আমার আফসোস হচ্ছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আপনাদের লক্ষ্যের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ রয়েছে। যদি কোনো বিপজ্জনক জামা'য়াতের সাথে সংযোগ থাকে আপনাদের, তা'হোলে আমার পথ আলাদা। আমি যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, তা হচ্ছে আমি একটি যখমী মানুষের উপর পুলিশের বন্য আচরণের প্রতিবাদে ইন্সপেক্টরের গায়ে হাত তুলেছি এবং প্যারীর যে কোনো আদালতে আমি এ অপরাধ স্বীকার করতে তৈরী।"

'নেকাবপোষ বললোঃ "আমি আপনাকে আমাদের সাথে শরীক হওয়ার দাওয়াত

দিচ্ছি না। আমি শুধু জানি যে, আপনি ফ্রান্সের এক শান্তিপ্রিয় নাগরিক, এ বিশ্বাস প্যারীর পুলিশের মনে আপনি কখনো জন্মাতে পারবেন না। আমরা শুধু আপনার জান বাঁচাতে চাই। শুধু তাই নয়, আমরা আরো অনুভব করি যে, জিনকে কোনো নিরাপদ স্থানে পৌছানোর জন্য আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হবে আমাদের।"

'আমি আমার কোটটা গায়ে দিয়ে জিনকে বললামঃ "জিন ! আমি তোমার সাথে রয়েছি। পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই আমাদের। আর সময় নষ্ট করো না।"

'ফয়সালা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে জিন। তথাপি আমার ও তার ভাইয়ের বন্ধুদের কথায় সে ঘর ছেড়ে যেতে রাযী হোল। নগদ অর্থ ও গহনা ছাড়া জিনের কতকগুলো জরুরী পোশাক বের করে আমার বাক্সে রেখে দিলাম। ততোক্ষণে দু'জন লোক গাড়ি তৈরী করে রেখেছে। এক নওজোয়ান কোচোয়ানের আসনে বসলো এবং আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হোলাম। প্যারীর বাজার ও গলিতে তখনো রয়েছে বেশ রওনক, তাই আমাদের বাইরে বেরিয়ে যেতে কোনো অসুবিধা হোল না। এক জায়গায় আমাদেরকে পাহারাদারদের আড্ডায় বাধা দিলো, কিন্তু আমার উর্দি দেখে তারা কোনো প্রশ্ন করবার প্রয়োজন বোধ করলো না। ভোর পর্যন্ত আমরা প্যারী থেকে কয়েক মাইল দূরে চলে এলাম।

'এক শহরের কাছে এসে আমাদের কোচোয়ান গাড়ি থামালো এবং আমায় লক্ষ্য করে বললোঃ 'ঘোড়া বড়োই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আর এমনিতেও এ গাড়িতে চলা বিপজ্জনক হবে। আমার সাথীরা এতক্ষণে বাড়িটি ছেড়ে চলে গেছে হয়তো। এতক্ষণে পুলিশ হয়তো তাদের লোকজনের অবস্থা জেনে ফেলেছে। মসিয়েঁ ডেন্‌সের নওকরদের কাছ থেকে আপনাদের খবর জেনে নিতে তাদের দেরী হবে না। তারপর ফউজী ইস্কুল থেকে আপনার বাড়ির ঠিকানা তারা সহজেই জেনে নেবে এবং দুপুরের আগেই এ পথে আপনাদের সন্ধান শুরু হয়ে যাবে। আমি আপনাদেরকে এই শহরের সরাইয়ে পৌছে দিয়ে ফিরে আসবো এবং পুলিশকে ধোকা দেবার জন্য গাড়িটি আর কোনো রাস্তায় ফেলে রেখে যাবো।"

'যে নওজোয়ান কোচোয়ান হয়ে আমাদের সাথে এসেছে, সে এক বিপ্লবী জামা'আতের উৎসাহী কর্মী। কয়েকটি প্রশ্ন করে তার কাছ থেকে আমি জানতে পারলাম যে, ডেন্‌স ছিলেন সেই জীবনপণ কর্মীদলের নেতা। আগের রাতে যখন এক বাড়িতে তাদের বৈঠক হচ্ছিলো, তখন এক গাদ্দার পুলিশকে খবরদার করে দিয়েছে। বেশীর ভাগ বিপ্লবী অস্ত্রসজ্জিত হয়ে এসেছিলো। পুলিশ আশপাশের গলি ঘিরে ফেলবার জন্য জমা হচ্ছিলো। বিপ্লবীরা খবর পেয়ে পালিয়ে গেলো। এক গলিতে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হোল তাদের এবং দু'জন নওজোয়ান নিহত হোল। ডেন্‌স্ এই সংঘর্ষে যখমী হয়ে পলালেন, কিন্তু কিছু দূরে গিয়ে পড়ে গেলেন। তার দুই সাথী তাঁকে বাড়ির দরযা পর্যন্ত পৌছে দিলো। তারা ফিরে যাবার সময়ে দেখতে পেলো পুলিশের একটি দল। তারা এক সংকীর্ণ গলির ভিতরে আর এক বিপ্লবীর গৃহে লুকোলো এবং পুলিশ আগে বেরিয়ে গেলে তাদের মধ্যে এক নওজোয়ান

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য বেরিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর সে এসে জানালো যে, পুলিশের সিপাহী ডেন্‌সের গৃহে প্রবেশ করেছে। তখন তারা কয়েক মিনিটের মধ্যে অন্যান্য সাথীদের জমা করে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলো।

'জিন নির্বাক ও নিশ্চল হয়ে বসে আমাদের কথা শুনছিলো। গাড়ি পুনরায় রওয়ানা হোল এবং কিছুক্ষণ পর শহরের সরাইয়ে পৌঁছে গেলো। সেখান থেকে আমরা আর এক গাড়ি ভাড়া করে নিলাম এবং সাথীকে বিদায় দিলাম। বাকী পথ আমরা খুব কমই আরাম করেছি। জিন তার সাথে প্রচুর অর্থ এনেছিলো এবং প্রত্যেক মনযিলে তাযাদম ঘোড়া পেতে আমাদের কোনো অসুবিধা হোল না। তৃতীয় রাত্রে প্রায় দু'টোর সময়ে আমরা নিজের গৃহে পৌঁছে গেলাম। সতর্কতার খাতিরে বাড়ি থেকে দূরে রাস্তায় গাড়িটা ছেড়ে দিতে হোল। আমাদের নওকর ঘুমিয়েছিলো এবং তাকে জাগানোও আমি ঠিক মনে করলাম না। আমার বাপ অন্তহীন দুঃখ ও উদ্বেগ নিয়ে আমার কাহিনী শুনলেন। তাঁর ফয়সালা করতে দেরী হল না যে, আমাদের অবিলম্বে ফ্রান্সের সীমানা ছেড়ে চলে যেতে হবে। তিনি জলদী করে জরুরী মালপত্র বেঁধে দিয়ে বললেনঃ "আমরা মারসেলয্‌ যাচ্ছি। আমি সরাই থেকে গাড়ি নিয়ে আসছি। তুমি ইস্কুলের উর্দি ছেড়ে অন্য পোশাক পরে নাও। তারপর রাস্তায় এসে আমার প্রতীক্ষা করো।"

'কিছুক্ষণ পর আমরা মারসেলযের দিকে রওয়ানা হচ্ছিলাম। মারসেলয্‌ পৌঁছে আমরা আমেরিকা যাবো, এই ছিলো উদ্দেশ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমেরিকাগামী এক জাহাজ আমাদের পৌঁছবার দু'দিন আগে রওয়ানা হয়ে গেছে এবং আর একখানা জাহাজ ছাড়বে দু'হফ্‌তা পরে। আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে তখন উদ্বেগে কাটছে। ঘটনাক্রমে কাপ্তান ফ্রাঁসকের সাথে আমার বাপের সাক্ষাত হোল। এক সময়ে তিনি আমার পিতার অধীনে কাজ করতেন। তাঁর জাহাজ পরদিন ভোরে কিছুসংখ্যক সিপাহী ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মরিশাস যাবে। কাপ্তান ফ্রাঁসক রাতের বেলায় আমাদেরকে নিজের কাছে রাখলেন। শেষ রাত্রে বাকী যাত্রীদের কিছুক্ষণ আগে আমাদেরকে তাঁর জাহাজে পৌঁছে দিলেন। বন্দরগাহ্‌র মুহাফিয অফিসারও ছিলেন আমার পিতার পুরানো বন্ধু এবং তাঁর সাহায্যে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বেঁচে গেলাম। মারসেলয্‌ পৌঁছবার আগে আমার পিতার ধারণা ছিলো, আমেরিকাগামী কোনো জাহাজে আমায় তুলে দিয়ে ফিরে চলে যাবেন, কিন্তু কাপ্তান ফ্রাঁসক তাঁকে বুঝালেন যে, তাঁর পক্ষেও ফ্রান্সে বাস করা বিপদমুক্ত নয়। তাই তিনি আমাদের সাথে যাবার সংকল্প করলেন। তাঁর সংকল্পের বড়ো কারণ ছিলো এই যে, জাহাজটি মরিশাস যাচ্ছিলো এবং সেখানে আমার বোন থাকতেন। কাপ্তান ফ্রাঁসক আমাদের জন্য জাহাজের মাল্লার উর্দি যোগাড় করে দিলেন। জিনের সম্পর্কে তিনি রটিয়ে দিলেন যে, তার স্বামী মরিশাস ফউজের কর্মচারী এবং সে তাঁরই কাছে যাচ্ছে।

'সমুদ্র সফরে আমার পেরেশানি ছিলো জিন ও আমার পিতার সম্পর্কে। জিন সব সময়ই দুঃখ বিষাদের প্রতিমূর্তি হয়ে থাকতো। কালের নির্মম হস্ত তার মুখের

চিত্তমুগ্ধকর হাসি কেড়ে নিয়ে গেছে। আমি যখন কোনো কথা বলতাম, সে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো আমার দিকে এবং সংক্ষিপ্ত জওয়াব দিয়ে আবার নির্বাক হয়ে যেতো। আমার পিতার সম্পর্কে আমি ভাবতাম যে, বৃদ্ধ বয়সে তাঁর প্রয়োজন ছিলো বিশ্রাম, আর তিনি আমারই জন্য এখন মুসীবতে পড়েছেন, কিন্তু আমার পিতার কোনো অভিযোগ ছিলো না অদৃষ্টের বিরুদ্ধে। তিনি ছিলেন সকল অবস্থায়ই হাসতে অভ্যস্ত। জাহাজে তিনি কাপ্তানের ভাগের অনেক কাজ নিজে করতেন।

'তারপর শুরু হোল আমাদের বদনসীবীর নতুন ধারা। মরিশাস থেকে কয়েকদিনের পথ দূরে থাকতে আমাদের জাহাজে সংক্রামক পৈত্তিক জ্বর দেখা দিলো এবং তিন দিনের মধ্যে আট ব্যক্তি মারা গেলো। পঞ্চম দিনে আমার পিতাও মারা গেলেন। আমরা যিন্দেগীর আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু জিনের উপর তার যে প্রভাব দেখা গেলো, তা' আমাদের সবারই কাছে ছিলো অপ্রত্যাশিত। সে দিনরাত রোগীদের শুশ্রুষা করে বেড়ায়। অন্যান্য লোক, এমন কি, জাহাজের ডাক্তার পর্যন্ত রোগীদের কাছে বসতে ভয় পান, কিন্তু জিন প্রত্যেকটি রোগীর শুশ্রুষা তার কর্তব্যের শামিল করে নিয়েছে। তার যেনো ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও ক্লান্তির অনুভূতিটুকুও নেই।

'রোগ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কাপ্তান বুরবুন দ্বীপের উপকূলে থামবার ফয়সালা করলেন, কিন্তু সেখান থেকে আমরা দু'দিনের পথে থাকতেই আমাদেরকে ভীষণ তুফানের মোকাবিলা করতে হোল। রাতভর আমরা যিন্দেগী ও মউতের মাঝখানে দোল খেতে লাগলাম। পরদিন ঝড় থামলে বুরবুন উপকূল নযরে পড়লো। পৈত্তিক জ্বরে ত্রিশজন লোক মারা গিয়েছিলো। বুরবুনের বন্দরগাহে নামবার পর জাহাজের কোনো লোকের শহরে ঢুকবার এজাযত ছিলো না। তাই আমাদের জন্য সমুদ্রের কিনারে তাঁবু খাটানো হলো। কাপ্তান ফ্রাঁসক এখানেও আমাদের সাহায্য করলেন এবং রাতের বেলায় আমাদেরকে তাঁবুর বাইরে এনে মরিশাসগামী এক আরব ব্যবসায়ীর জাহাজে তুলে দিলেন। বিদায় বেলায় তিনি আমাদেরকে বললেনঃ "আমায় জাহাজ মেরামত করে নেবার জন্য কিছুকাল এখানে থাকতে হবে। তোমাদের কোনো বন্দরগাহে নামা ঠিক হবে না। তাই আরব ব্যবসায়ী তোমাদেরকে নামিয়ে দেবেন বন্দরগাহ্ থেকে কিছু দূরের উপকূলে। জাহাজ মেরামতের পর যথাসম্ভব শীঘ্র আমি মরিশাস পৌছাবার চেষ্টা করবো। তারপর আমি তোমাদেরকে হিন্দুস্তানে পৌঁছাবার বন্দোবস্ত করবো। মরিশাসে কারুর কাছে তোমাদের আসল নাম বলো না। আমার বিশ্বাস, প্যারীর পুলিশ তোমাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেই মরিশাসে তোমাদের সন্ধান করবার চেষ্টা করবে।"

'তারপর কাপ্তান ফ্রাঁসক আমার হাতে একটা চিঠি দিয়ে বললেনঃ "মরিশাসের এক পুলিশ অফিসার আমার বন্ধু এবং এ চিঠিটা আমি তাঁর নামেই লিখছি। কখনো প্রয়োজন হলে চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে যেয়ো। তিনি তোমায় সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্য করবেন।

'বিপন্ন মানবতার সাহায্য করাকে যাঁরা ফরয মনে করেন, আরব ব্যবসায়ী ছিলেন তাঁদেরই একজন। তিনি আমাদের যবান বুঝতেন না, কিন্তু আমাদের মুখের

দিকে তাকিয়ে বুঝতে অসুবিধা হোত না যে, আমরা বিপন্ন। এক সন্ধ্যায় তিনি আমাদেরকে মরিশাস বন্দরগাহ্ থেকে কয়েক মাইল দূরে নামিয়ে জাহাজের এক মাল্লাকে আমাদের সাথে দিলেন। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আমরা এক ভয়ংকর জংগলের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলাম। অবশেষে মাল্লা এক ছোট নদীর কিনারে থেমে বললোঃ "শহর এখানে থেকে খুব কাছে, কিন্তু এ সময়ে আপনাদের শহরে ঢোকা ঠিক হবে না। পাহারাদার অবশ্যি কোনো প্রশ্ন করবে আপনাদেরকে।"

'জিন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছিলো। নদীর কিনারে শুয়েই সে ঘুমিয়ে পড়লো। বাকী রাত মাল্লাকে নিয়ে আমি তার কাছে বসে রইলাম। ভোরে আমি জিনকে জাগালাম এবং আমরা শহরের দিকে রওয়ানা হোলাম। প্রায় ঘন্টাখানেক পর আমার ভগ্নিপতির বাড়িতে গিয়ে আওয়ায দিলাম। মাল্লা বিদায় নিয়ে বন্দরগাহ্র দিকে চলে গেলো। আমার ভগ্নিপতি এতদিনে মেজর হয়ে গেছেন এবং মরিশাস সরকারের বড়ো বড়ো ফউজী অফিসার তাঁর দোস্ত। তবু আমার কাহিনী শুনে তিনি বললেনঃ 'প্যারী পুলিশের কোনো আদনা অফিসারও এখানে এলে মরিশাসের গভর্নর পর্যন্ত তোমায় সাহায্য করতে পারবেন না। তুমি ঘরের বাইরে পা না রাখলেই ভালো। প্যারী পুলিশের কোনো লোক এখানে এলে আমি তোমায় কোনো বন্ধুর বাড়িতে পৌছে দেবো। স্থানীয় পুলিশের তামাম অফিসার আমার দোস্ত, সময় এলে তারা আমায় খবরদার করে দেবে।"

'বিশদিন আমরা আমার ভগ্নিপতির গৃহে লুকিয়ে কাটালাম। তারপর এক সন্ধ্যায় জানা গেলো যে, মারসেলয্ থেকে এক জাহাজ এসেছে এবং ফরাসী পুলিশের এক ইন্সপেক্টর জাহাজ থেকে নেমে সোজা স্থানীয় পুলিশ হেড কোয়ার্টারে চলে গেছে। খবর শুনেই আমার ভগ্নিপতি আমাদেরকে পাঠালেন তাঁর রেজিমেন্টের এক কাপ্তানের গৃহে। পরদিন কাপ্তানের বিবি আমার বোনের কাছে গিয়ে খবর পেলেন যে, ওখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসার খানিকক্ষণ পরেই এক পুলিশ ইন্সপেক্টর তাঁদের গৃহে এসেছিলো। আমার ভগ্নিপতিকে কয়েকটি প্রশ্ন করে গৃহে তালাশী না নিয়েই সে চলে গেছে। তারপর রাত্রে আমার ভগ্নিপতি আমাদের সাথে দেখা করে বললেনঃ 'এ সেই ইন্সপেক্টর, যাকে জিন গুলী করেছিলো। তার নাম বার্ণার্ড এবং তার হু'শিয়ারী ও সন্দিগ্ধচিত্ততা সারা ফ্রান্সে মশহুর। প্রকাশ্যে আমি তাকে আশ্বস্ত করে দিয়েছি, কিন্তু যতোক্ষণ সে এখানে থাকবে, তোমাদের সম্পর্কে ততোক্ষণ আমি আশ্বস্ত হোতে পারবো না। ফরাসী পুলিশের কোনো অফিসারের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লোক এখানে নেই, কিন্তু যদি সে তোমাদের সন্ধান পায়, তা' হোলে দেখবে, কেউ খোলাখুলি তোমাদের সাহায্য করবে না। এখন কয়েকদিন আমাদের দূরে দূরে থাকা জরুরী। তাই আমি তোমাদের কাছে আসতে না পারলে পেরেশান হয়ো না।'

'পরদিন ভোরে জিন শয্যা ত্যাগ করে অভিযোগ করলো, তার দেহ যেনো ভেঙে পড়ছে। সন্ধ্যার মধ্যে তার কঠিন জ্বর দেখা দিলো। জাহাজে মারাত্মক পৈত্তিক জ্বরের কথা মনে করে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। কিন্তু রাত্রে কাপ্তান ফউজী

ডাক্তারকে নিয়ে এলে তিনি সান্ত্বনা দিলেন যে, এ শুধু মওসুমী জ্বর। জিন দশদিন শয্যাশায়ী থাকলো। একাদশ দিনে তাঁর হুঁশ হোল। ইতিমধ্যে কাপ্তানের বিবির মাধ্যমে জানা গেলো যে, বার্ণার্ড যথারীতি আমাদের সন্ধানে ব্যস্ত। দ্বাদশ দিনে জিনের জ্বর অনেকটা কমে গেলো, কিন্তু সে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভোর সাতটায় আমাদের মেযবানের দরযায় করাঘাত শোনা গেলো। আমরা অবিলম্বে একটা ছোট কুঠরীতে আত্মগোপন করলাম। আমার বুকের ভিতর হাতুড়ীর আঘাত পড়ছে যেনো। চাপা গলায় আমি বললামঃ "জিন, আমরা তক্‌দীরের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবো না। আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা আমি জানি না। কিন্তু আমি তোমায় মনে করি আমার যিন্দেগীর শেষ অবলম্বন। আমি যদি তোমায় সাথে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র অনাবাদী দ্বীপে যিন্দেগী গুজরান করতে পারি তা'হোলে ফ্রান্স ছেড়ে আসার দুঃখ আমায় অন্তর এক লহ্‌মার জন্যও স্পর্শ করবে না।"

'জিন বিষণ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো এবং তার কম্পিত হাতখানি রাখলো আমার হাতের উপর। আমার মনে হচ্ছিলো, এক্ষুনি পুলিশ ধাক্কা মেরে আমাদের কুঠরীর দরজা খুলে ফেলবে এবং আমাদের সামনে এসে দেখা দেবে ইন্সপেক্টর বার্ণার্ডের অবাঞ্ছিত রূপ। কিন্তু আচানক মোলাকাতের কামরা থেকে শোনা গেলো পরিচিত কণ্ঠস্বর ও অট্টহাস্যের আওয়ায। তারপর আমাদের মেযবান এসে কড়া নেড়ে বললেন ঃ "এসো বন্ধু, কোনো বিপদ নেই।"

'আমি জিনের হাত ধরে কুঠরীর বাইরে এলাম। মোলাকাতের কামরায় আমার বোন, ভগ্নিপতি ও কাপ্তান ফ্রাঁসক দাঁড়িয়ে। দুর্বলতার দরুন জিনের পা কাঁপছে। আমি তাকে এক কুরসীর উপর বসিয়ে দিলাম। আমার বোন এগিয়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। কাপ্তান ফ্রাঁসক কষ্টে হাসি সংযত করে বললেনঃ "ভাই, খোদার কসম, এর চাইতে বড়ো গাধা আমি যিন্দেগীতে কখনো দেখিনি। ওর বুদ্ধির খ্যাতি সারা ফ্রান্সে মশহুর, কিন্তু আজ ও একটা উল্লু বনে গেছে।"

'আমি পেরেশান হয়ে ফ্রাঁসকের দিকে তাকালাম। আমার বোন তাঁকে বললেনঃ "আমার ভাই এখনো পেরেশান হয়ে আছে। ওকে সান্ত্বনা দিন।" কাপ্তান ফ্রাঁসক আমার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ "বেটা, এখন আর কোনো বিপদ নেই তোমার। ইন্সপেক্টর বার্ণার্ডকে আমি একটা ভুল পথ দেখিয়ে দিয়েছি। আমার জাহাজ কাল সন্ধ্যায় এখানে পৌছলে সে বন্দরগাহে দাঁড়ানো ছিলো। নেমে আসা যাত্রীদের দেখে নিয়ে সে জাহাজের ভিতরটা খুঁজে দেখলো। আমি তাকে বললামঃ "কাকে তালাশ করছেন, আমায় বললে আমি হয়তো সাহায্য করতে পারবো।" তোমার কথা সে জানতে চাইলো, মারসেলয্ থেকে আমার জাহাজে এক বুড়ো, এক নওজোয়ান ও এক যুবতী সওয়ার হয়েছিলো কিনা।

'আমি ভীত হয়ে বললামঃ "আমাদের কথা ওকে বলে দিলেন?"

ঃ "হ্যাঁ আমি তোমার চেহারা পর্যন্ত ওকে বলে দিয়েছি, কারণ তাই ছিলো ওকে

বেঅকুফ বানাবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। আমি জানতাম যে, সে একদিন জানবে, আমার জাহাজে এক যুবতী সওয়ার হয়েছিলো এবং সত্যি কথা অনেক সময়ে কাজে লাগে। ব্যাধির জন্য সকল যাত্রীকে বুরবুনে নামিয়ে দিয়েছিলাম, বলে আমি ওকে আশ্বস্ত করে দিয়েছি। আরো বলেছি যে, কয়েকজনকে আমি সাথে এনেছি, আর সবাই সেখানে পড়ে রয়েছে। আমি তাকে তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদও জানিয়েছি এবং তোমার নামও আমি ঠিক বলে দিয়েছি। তার ফল হয়েছে এই যে, দেখতে দেখতে সে বুরবুন যাওয়ার জন্য জাহাজে চেপেছে। কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এখান থেকে পন্ডিচেরী রওয়ানা হবো এবং তুমি আমার সাথে যাবে।"

'আমি বুঝতে পারলাম, আমার পথ থেকে মুসীবতের পাহাড় সরে গেছে, কিন্তু জিনের অবস্থা সফর করার মতো নয়। রাত্রে ডাক্তারের পরামর্শ চাইলে তিনি তাকে সফর করতে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। আমার ভগ্নিপতি আমাদের একত্রে সফরের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বললেনঃ "তুমি গিয়ে হিন্দুস্তানে আশ্রয়স্থল খুঁজে নাও। পরে আমরা জিনকে পাঠাবার ব্যবস্থা করবো, জিনের কোনো বিপদ নেই এখানে। জিনের মতো মেয়েকে পুলিশী যুলুম থেকে বাঁচাবার জন্য আশ্রয় দিতে অস্বীকার করবে, এমন ফরাসী এখানে কেউ নেই।"

'পরদিন সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে কাপ্তান ফ্রাঁসকের জাহাজ ছাড়লো। আমি জাহাজে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো মরিশাসের দৃশ্যটি দেখছিলাম। পন্ডিচেরী পৌছার পর আমার কাহিনীর এক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটলো। এরপর আমার দৃষ্টির সামনে দেখতে পাচ্ছি এক বিরাট শূন্যতা।'

লা গ্রাঁদের কাহিনী শোনার পর আনওয়ার আলী শয্যার উপর নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকলেন। অবশেষে তিনি বললেনঃ ' দোস্ত, আমি তোমায় সর্বপ্রকারে সাহায্য করবো।'

তিন

আনওয়ার আলী সাহচর্যে লা গ্রাঁদের দেড় মাস কেটে গেলো। এর মধ্যে জিনের কোনো খবর আসেনি তাঁর কাছে। পন্ডিচেরীতে যখনই কোনো নতুন জাহাজ আসে, তখনই তাঁর বুকের মধ্যে জ্বলে উঠে আশা-আকাঙ্খার দীপ-শিখা। বন্দরগাহ্‌র দিকে যেতে যেতে জিনের কল্পনা তাঁর দুনিয়াকে মুখর করে তোলে হাসি-আনন্দ ও সংগীত-সুরে। জাহাজ থেকে নেমে-আসা যাত্রীদের মধ্যে যখন জিন তাঁর নযরে পড়ে না, তখন তিনি নিজের অন্তরকে মিথ্যা আশ্বাস দিতে চেষ্টা করেনঃ 'হয়তো জিন এখনো লুকিয়ে রয়েছে জাহাজের ভিতরে, হয়তো কাপ্তান বন্দরগাহে অন্য লোকদের সামনে তার নেমে আসা ভালো মনে করেন নি।' বন্দরগাহ খালি হয়ে গেলে খানিকটা সাহস করে তিনি যান কাপ্তানের কাছে এবং জাহাজে আর কোনো যাত্রী নেই, সে সম্পর্কে নিশ্চিত জেনে নিয়ে তাঁর কাছে প্রশ্ন করতে থাকেনঃ 'এমন কোনো যাত্রী তো আপনার জাহাজে আসেন নি, যাকে রোগের জন্য পথে ফেলে

এসেছেন?-আমি মহীশূর ফউজের কর্মচারী এবং আমি এক বন্ধুর ইনতেযার করছি। গত কয়েক হফতার মধ্যে মরিশাস থেকে আগত কোনো জাহাজের দুর্ঘটনা হয়নি তো?'

একদিন আসমানে মেঘ ছেয়ে এলো। গুমোট আবহাওয়া। আনওয়ার আলী খিমার বাইরে এক কুরসীর উপর বসে রয়েছেন। আচানক লা গ্রাঁদ ছুটে এসে তাঁর কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর পেরেশান অবস্থা দেখে আনওয়ার আলীর বুঝতে অসুবিধা হোল না যে, কোনো অপ্রত্যাশিত বিপদ আসন্ন।

ঃ 'খবর ভালো তো?' তিনি লা গ্রাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

লা গ্রাঁদ বিষন্ন কণ্ঠে জওয়াব দিলেনঃ 'মসিয়েঁ ! ইন্সপেক্টর বার্ণার্ড পণ্ডিচেরী পৌঁছে গেছে। আমি তাকে জাহাজ থেকে নামতে দেখেছি। জাহাজ কোত্থেকে এসেছে, আমি জানতে পারিনি, কিন্তু যদি মরিশাস হয়ে এসে থাকে, তা'হোলে হয়তো জিন এসেছে এ জাহাজে। ইন্সপেক্টরকে দেখার পর আমি বন্দরগাহে থাকা ভালো মনে করলাম না।'

আনওয়ার আলী প্রশ্ন করলেনঃ 'সে তো দেখে ফেলে নি আপনাকে?'

ঃ 'না, জাহাজ থেকে নামামাত্র পন্ডিচেরীর কয়েকজন অফিসার তার আশপাশে জমা হোল আর আমি এক ফাঁকে পালিয়ে এলাম।'

আনওয়ার আলী কুরসী থেকে উঠে তাঁর সিপাহীদের মধ্যে এক নওজোয়ানকে আওয়ায দিয়ে ডাকলেন এবং তাকে কতকগুলো নির্দেশ দিয়ে লা গ্রাঁদকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'আপনি অবিলম্বে এখান থেকে চলে যান। আমার লোককে আমি সবকিছু বুঝিয়ে বলে দিয়েছি। আপনার সাথে কয়েক মাইল গিয়ে সে এক জায়গায় আমার ইন্‌তেযার করবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি বন্দরগাহ্‌র অবস্থা জেনে নিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছাবো। জিন এ জাহাজে এসে থাকলে তাকে আমি সাথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবো। তা' না হোলে আপনি জরুরী নির্দেশ পেয়ে যাবেন। জিন এ জাহাজে না এলেও আপনি ইন্সপেক্টর বার্নার্ডের উপস্থিতিতে এখানে তার ইনতেযার করতে পারেন না। পন্ডিচেরীর সীমানা ছেড়ে যাওয়া আপনার পক্ষে ভালো হবে। তারপর জিন এখানে এলে তাকে আপনার কাছে পৌঁছে দেবার যিম্মা আমার উপর থাকলো।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'জিন হয়তো আপনাকে বিশ্বাস করতে চাইবে না, কিন্তু আপনি যখন তাকে জিন না বলে মাদাম লা গ্রাঁদ বলে সম্বোধন করবেন, তখন সে অনেক কিছুই বুঝতে পারবে। জাহাজে সে হয়তো এই নামেই সফর করবে।'

ঃ 'আপনি আশ্বস্ত থাকুন, জিন যে নামেই সফর করুক না কেন, তাকে খুঁজে নিতে আমার অসুবিধা হবে না।' বলে আনওয়ার আলী দীলাওয়ার খানকে দু'টি ঘোড়া তৈরী রাখার হুকুম দিয়ে বন্দরগাহ্‌র দিকে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে লা গ্রাঁদ ও আনওয়ার আলীর সাথী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পশ্চিমদিকে চললেন। পন্ডিচেরী থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরে একটি ছোট নদীর পুলের কাছে লা গ্রাঁদের পথ প্রদর্শক ঘোড়া থামিয়ে বললোঃ 'জনাব, উনি এখানেই আমাদেরকে থামবার হুকুম দিয়েছেন।

লা গ্রাঁদ ঘোড়া থামিয়ে বললেনঃ 'তুমি ঠিক জানো যে, এখানেই তিনি আমাদেরকে থামতে বলেছেন?'

ঃ 'জি হ্যাঁ। এই রাস্তাই চলে গেছে কৃষ্ণগরীর দিকে এবং আমি কম-সে কম আটবার এ পথে চলেছি।' বলে নওজোয়ান ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো এবং লা গ্রাঁদও তার অনুকরণ করলেন। তাঁরা ঘোড়া দু'টো এক গাছের সাথে বেঁধে রেখে নদীর কিনারে বসে গেলেন। প্রতীক্ষার এই সময়টা ছিলো লা গ্রাঁদের কাছে দুঃসহ। তিনি কখনো এদিক ওদিকে টহল দেন, কখনো ছুরি বের করে গাছের ডাল কাটেন, আবার কখনো নদীর কিনারে বসে নুড়ি তুলে তুলে মারতে থাকেন পানির মধ্যে। আশপাশে পদশব্দ বা আর কোনো আওয়ায শুনতে পেলে তিনি ছুটে যান পুলের কাছে। সওয়ার অথবা পথচারী চলে গেলে তিনি বসে থাকেন দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে।

সন্ধ্যায় চারটার কাছাকাছি সময়ে বৃষ্টিপাত শুরু হলো এবং লা গ্রাঁদ একটা মোটা গাছের নীচে সংকুচিত হয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পর ঘোড়ার পদশব্দ শোনা গেলো এবং লা গ্রাঁদের সাথী বললোঃ 'ওই যে উনি এসে গেলেন।'

লা গ্রাঁদ ছুটে পায়ে চলা পথের দিকে এগিয়ে গেলেন। বুকের ভিতরে তাঁর তীব্র বেগে ধক্ ধক্ করছে। কিন্তু আনওয়ার আলীকে একা দেখে তাঁর পা যেনো যমিনে বসে গেলো। তাঁর কাছে এসে আনওয়ার আলী ঘোড়া থেকে নামলেন। তারপর বললেনঃ 'আমি আপনার জন্য কোনো ভালো খবর আনতে পারিনি বলে দুঃখিত। জিন এ জাহাজে আসেনি। আমি কাপ্তানের সাথে দেখা করে এসেছি। এ জাহাজ বুরবুন থেকে এসেছে। ইন্সপেক্টর বার্ণার্ড সম্পর্কে মাত্র এতটুকু জানা গেছে যে, তার এক ভাতিজা পণ্ডিচেরী ফউজের কর্মচারী এবং সে তারই কাছে রয়েছে। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, ভাতিজার সাথে মিলিত হবার জন্যই সে এখানে আসেনি। এখন আমাদের দোআ করা উচিত, যেনো তার উপস্থিতির মধ্যে জিন এখানে না পৌঁছে। মরিশাসে ভগ্নিপতিকে আমি পরিস্থিতি জানাবার চেষ্টা করবো, কিন্তু জিন যদি এরই মধ্যে ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে থাকে, তা'হোলে আপনি পন্ডিচেরীতে থেকেও তার কোনো সাহায্য করতে পারবেন না।'

আনওয়ার আলী ঘোড়ার জিন থেকে সফরের থলে খুলে লা গ্রাঁদের হাতে দিয়ে বললেনঃ 'এ থলের মধ্যে আপনার রাতের খাবার, কয়েকটি টাকা ও তিনখানা পরিচয়পত্র রয়েছে। একখানা চিঠি লিখেছি কৃষ্ণগরীর ফউজদারের কাছে। তিনি আপনাকে সেরিংগাপটমে পৌঁছাবার বন্দোবস্ত করবেন। দ্বিতীয় পত্রটি মসিয়েঁ লালীর কাছে লেখা এবং আমার বিশ্বাস তিনি আপনার যথাসম্ভব সাহায্য করবেন। তৃতীয়

পত্র আমি আমার ভাইয়ের কাছে লিখেছি। সেরিংগাপটমে সে হবে আপনার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। প্রয়োজন হোলে আমার ভাই আপনার জন্য সেরিংগাপটমের বড়ো বড়ো লোকের সাহায্য হাসিল করতে পারবে। আমার এ লোকটি আপনাকে কৃষ্ণগরী পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। ওখানে পৌঁছে আপনি আমার নামে এই মর্মে এক পত্র লিখে তার কাছে দেবেন যে, আপনি সুলতানের ফউজের এক কর্মচারী এবং আপনার বিবি পন্ডিচেরী এলে আমি যেনো তাঁকে আপনার কাছে পৌঁছাবার বন্দোবস্ত করি। জিন আপনার হাতের লেখা চিনতে পারলে আশ্বস্ত হবে। তা'ছাড়া ইন্সপেক্টর বার্ণার্ডের উপস্থিতিতে সে এখানে পৌঁছলে চিঠিটা আমার কাজে আসবে। এখন আমি অবিলম্বে ফিরে যেতে চাই। জিনের অপ্রত্যাশিত আগমনের সম্ভাবনা বিবেচনায় আমায় প্রতি মুহূর্তে ওখানে হাযির থাকতে হবে। সম্ভবত আজ রাত্রেই মরিশাসের জাহাজ ওখানে পৌঁছে যাবে। আমি বন্দরগাহে ব্যবস্থা করে এসেছি যেনো কোনো নতুন জাহাজ এলে আমায় খবরদার করে দেওয়া হয়।'

আনওয়ার আলী দেরী না করে মোসাফেহার জন্য হাত বাড়ালেন এবং মোসাফেহা করতে গিয়ে লাগ্রাঁদ বলেন। 'মসিয়েঁ, আপনি বড়োই রহমদীল।'



তিনমাস পর আনওয়ার আলী একদিন সূর্যোদয়ের ঘন্টাখানেক পর এক জাহাজের আগমন সংবাদ পেয়ে বন্দরগাহে গিয়ে দেখলেন, ইন্সপেক্টর বার্ণার্ড ও পন্ডিচেরী পুলিশের কয়েকজন অফিসার সেখানে হাযির। আনওয়ার আলীর কাছে এ সাক্ষাত অপ্রত্যাশিত ছিলো না। এর আগেও ইন্সপেক্টর বার্ণার্ড প্রত্যেকটি নতুন জাহাজের আগমনকালে বন্দরগাহে হাযির থেকেছেন। যে সব ফরাসী এর আগে মহীশূরের ফউজে ভর্তি হয়ে গেছে, পন্ডিচেরী পৌঁছাবার দু'দিন পরে বার্ণার্ড আনওয়ার আলীর তাঁবুতে তাদের খবর সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছে। যে সব কাগজে লা গ্রাঁদের কোনো উল্লেখ নেই, তা' দেখিয়েই আনওয়ার আলী তাকে আশ্বস্ত করে দিয়েছেন। বার্ণার্ড তাকে এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, সে এক বিপজ্জনক বিপ্লবীকে সন্ধান করে ফিরছে এবং লোকটি ফ্রান্স থেকে একটি খুবসুরত যুবতীকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

জাহাজ তখনো বন্দরগাহ থেকে কিছুটা দূরে। আনওয়ার আলী কিছুক্ষণ দ্বিধা ও পেরেশানীর মনোভাব নিয়ে ইন্সপেক্টর ও তাঁর সাথীদের থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে এক পুলিশ অফিসার তাঁর দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারা করলো। তিনি দ্রুতগতিতে এগিয়ে এলেন। ইন্সপেক্টর বার্ণার্ড তাকে লক্ষ্য করে বললোঃ 'মসিয়েঁ, আপনি আজ কেন এলেন না, তাই আমি ভাবছিলাম।

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'আপনার ধারণা, আমি সময় মতোই এসেছি।'

স্থানীয় পুলিশের এক অফিসার বললোঃ 'মসিয়েঁ আনওয়ার আলী নিয়মিত প্রত্যেকটি জাহাজই দেখে যান।'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'এখানে আপনাদের জাহাজ দেখা ছাড়া

আমার কাজই বা এমন কি আছে ? খোদার শোকর, আমার ডাক এসে গেছে, নইলে এখানে বেকার থেকে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।'

ঃ 'তা' হোলে আপনি চলে যাচ্ছেন?'

ঃ 'জি হ্যাঁ।'

ঃ 'কবে ?'

ঃ 'খুব শীগগিরই। আমার জায়গায় কোনো নতুন লোক আসার ইনতেযার করছি শুধু।' বলে আনওয়ার আলী ইন্সপেক্টর বার্ণার্ডকে লক্ষ্য করে বললেন।

ঃ 'বলুন, আপনার অভিযান সফল হোল?'

বার্ণার্ড জওয়াব দিলেন ঃ 'সাফল্য সম্পর্কে আমার কোন অধীরতার কারণ নেই। আমার বিশ্বাস, যদি সে যিন্দা থাকে, একদিন না একদিন সে গেরেফতার হবেই।

জাহাজ বন্দরগাহর খুব কাছে পৌঁছে গেলো এবং জাহাজের সামনের দিকে কতক মহিলাকেও দেখা গেলো। পণ্ডিচেরীর কতিপয় সামরিক ও বেসামরিক অফিসারও বন্দরগাহে হাযির ছিলেন এবং তাঁরা অন্তহীন আগ্রহ সহকারে দেখছিলেন জাহাজের দিকে।

কিছুক্ষণ পরে জাহাজ বন্দরগাহে এসে লাগলো এবং যাত্রীরা নেমে আসতে লাগলেন নীচে। ফরাসী অফিসাররা তাঁদের ছেলেমেয়ে ও ছুটি থেকে ফিরে আসা বন্ধুদের অভ্যর্থনা করছিলেন। ইন্সপেক্টর বার্ণার্ড জাহাজে আগত প্রত্যেকটি নওজোয়ান ও নারীকে ঘুরে ঘুরে ভালো করে দেখছে। একটি নীলনয়না স্বর্ণাভ কেশবিশিষ্টা জীর্ণাশীর্ণা যুবতী হাতে একটি ছোট বাক্স নিয়ে জাহাজ থেকে নামলেন এবং ভিড় ছাড়িয়ে একধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। আনওয়ার আলী চট করে তাঁর কাছে গিয়ে চাপা গলায় বললেনঃ 'আমি যদি ভুল না করে থাকি, তা'হোলে আপনি লা গ্রাঁদের সন্ধান করছেন। আমি এও জানি যে, তাঁর আসল নাম লেম্বার্ট। মাদাম লা গ্রাঁদ নামে আপনি সফর করছেন। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। যে ইন্সপেক্টর বার্ণার্ডের উপর আপনি গুলী চালিয়েছিলেন, সে এখানেই রয়েছে। এই দিকেই সে আসছে। আপনি তার দিকে তাকাবেন না। আমি লা গ্রাঁদের বন্ধু। তিনি আপনার ইনতেযার করছিলেন কিন্তু ইন্সপেক্টর বার্ণার্ডের আসার পর আমি তাঁকে সেরিংগাপটম পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনি ইন্সপেক্টরকে জানাবার চেষ্টা করবেন যে, আপনার স্বামী গত দু'বছর ধরে মহীশূর ফউজে কর্মচারী। ভয় সংযত করে কথা বলবেন। ইন্সপেক্টরের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হোলে আপনি মুসীবতে পড়ে যাবেন।'

ইতিমধ্যে বার্ণার্ড তাঁদের কাছে এসে গেছে। আনওয়ার আলী তার দিকে মনোযোগ না দিয়ে যুবতীর বাক্সটি হাতে নিয়ে কণ্ঠস্বর বদলে নিয়ে বেশ উঁচু গলায় বললেনঃ 'মাদাম, পেরেশান হবার কোনো কারণ নেই। এক সিপাহীর বিবিকে এ

ধরনের তিক্ততা বরদাশ্‌ত করতে হয়। আপনার স্বামী এক অভিযানে চলে গেছেন। তাই আপনাকে সেরিংগাপটমে পৌঁছে দেবার যিম্মাদারী তিনি আমার উপর সঁপে গেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের ফউজের কোনো সিপাহীকে ছুটি দেওয়া, সম্ভব হচ্ছে না। আমার নামে এই চিঠি পড়ে আপনি আশ্বস্ত হবেন।'

আনওয়ার আলী এ কথা বলে যেব থেকে একখানা চিঠি বের করে যুবতীর হাতে দিলেন। যুবতী কম্পিত হস্তে চিঠিখানা নিয়ে খুলে পড়তে লাগলেন।

'কি খবর, মসিয়েঁ? ঃ ইন্সপেক্টর বার্ণার্ড তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললো।

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ ইনি আমাদের ফউজের ইউরোপীয় ডিভিশনের এক অফিসারের বিবি। ওঁর স্বামী ওঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্য আসেন নি, তাই উনি রাগ করেছেন। ওঁকে সেরিংগাপটমে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পড়েছে আমার উপর।'

ইন্সপেক্টর বার্ণার্ড পুরো মনোযোগ দিয়ে যুবতীর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো আর যুবতী তার দৃষ্টির প্রখরতা থেকে বাঁচবার জন্য কাগজের দিকে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করলেন।

বার্ণার্ড বললো ঃ 'মাদাম, চিঠিটা আমি দেখতে পারি?

আনওয়ার আলী অবিলম্বে মাঝে পড়ে বললেনঃ 'মসিয়েঁ, আমি জানি, আপনি প্যারীর পুলিশের একজন অফিসার, কিন্তু আমার ধারণা, মহীশূর ফউজের এক অফিসারের বিবির কাছে লেখা চিঠি পড়ে দেখাটা আপনার কর্তব্যের শামিল নয়।'

বার্ণাড় জওয়াবে বললোঃ 'নিজ কর্তব্যের সীমারেখা আমার ভালো করে জানা আছে। আপনি যদি ওঁকে সেরিংগাপটম পৌঁছাবার যিম্মাদারী নিয়ে থাকেন, তা' হোলে ওঁর সম্পর্কে আমার উপরও কতকগুলো যিম্মাদারী ন্যস্ত রয়েছে। আমার বিশ্বাস, চিঠিটা দেখতে ওঁর কোন আপত্তি হবে না।'

যুবতী চিঠিটা ইন্সপেক্টরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেনঃ 'আপনি সানন্দে এ চিঠি পড়তে পারেন। আমার আর কি আপত্তি থাকবে?'

বার্ণার্ড চিঠি পড়তে লাগলো। আনওয়ার আলীর এক সিপাহী দ্রুতগতিতে তাঁদের কাছে এসে দাঁড়ালো এবং তাঁকে বললোঃ 'জনাব, এ জাহাজে মাত্র আটজন লোক এসেছে। তাদের মধ্যে মাত্র তিনজন ইউরোপীয় আর বাকী মরিশাসের বাসিন্দা।'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'ওঁদের তাঁবুতে নিয়ে যাও। আমি এক্ষুণি আসছি। বাক্সটি সাথে নিয়ে নাও আর মাদামের জন্য একটি খিমা খালি করিয়ে দাওগে।'

সিপাহী চামড়ার বাক্সটি তুলে নিলো। আনওয়ার আলী যুবতীর দিকে তাকিয়ে বললনঃ 'মাদাম, আপনার আর কিছু জিনিষ জাহাজে নেই তো ?'

ঃ 'জি না, আমার স্বামী আমায় লিখেছেন যে, আমায় স্থলপথে দীর্ঘ সফর করতে হবে, তাই কিছু জরুরী কাপড় ছাড়া আর কোনো জিনিস সাথে আনা ঠিক

হবে না।

বার্ণার্ড চিঠি পড়ে আনওয়ার আলীকে বললোঃ 'মাদামের স্বাস্থ্য খুব খারাপ মনে হচ্ছে। আমার ধারণা, সেরিংগাপটম সফরের আগে ওঁর কিছুদিন এখানে বিশ্রাম করা উচিত এবং ওঁর জন্য আপনাকে খিমা খালি করাতে হবে না। আমি গভর্ণরের মেহ্মানখানায় থাকি। ওঁর থাকার ব্যবস্থা আমি করতে পারবো।

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমার ধারণা, এ প্রশ্ন আপনি আমার পরিবর্তে মাদামের কাছে উত্থাপন করতে পারেন।'

বার্ণার্ড হেসে বললোঃ 'আমার ধারণা, গভর্নরের মেহ্মান হতে ওঁর আপত্তি হবে না।'

ইতিমধ্যে জিন তাঁর পেরেশানী সংযত করে নিয়েছেন এবং তাঁর ভিতরে আত্মরক্ষার শক্তি পুরোপুরি জেগে উঠেছে। তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আওয়াযে বললেনঃ 'আমার স্বাস্থ্য বিলকুল ভালো রয়েছে এবং আমি এক লম্হার জন্যও এখানে থাকতে চাই না। দিন আমার চিঠিটা।'

বার্ণার্ড বললো ঃ 'চিঠিটা আপনি কাল পর্যন্ত পাবেন না।'

'এ চিঠিতে কোনো বিশেষ কথা আছে কি, মসিয়েঁ!' ঃ আনওয়ার আলী তাঁর পেরেশানী চাপা দেবার চেষ্টা করে বললেন।

ঃ 'তেমন বিশেষ কিছু নেই। তথাপি পুলিশ অফিসারকে সব কিছুই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হয়।'

কয়েকজন ফরাসী তার পাশে জমা হয়েছিলো। এক ফউজী অফিসার তাকে সম্বোধন করে বললোঃ 'কি ব্যাপার, মসিয়েঁ?'

'কিছু নয়।'ঃ সে রুক্ষ ভাষায় জওয়াব দিলো।

আনওয়ার আলী জিনকে বললেনঃ 'মাদাম, আপনার আরামের প্রয়োজন। আপনি ঘোড়ায় সওয়ার হতে পারলে দু'দিনের মধ্যে আপনার সফরের বন্দোবস্ত করে দেবো, নহলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

যুবতী বললেনঃ 'আমি ঘোড়ায় চড়ে সফর করতে পারবো।'

বার্ণার্ড হাসবার চেষ্টা করে বললোঃ 'মাদাম! আমার কথায় আপনার মনোকষ্ট হয়ে থাকলে আমি তার জন্য মাফ চাচ্ছি। আপনার কোনো তক্লীফ না হয়, আমি সে সম্পর্কেই আশ্বস্ত হতে চেয়েছিলাম। অবসর পেলে কাল আপনার সাথে দেখা করবার চেষ্টা করবো।'

ঃ 'আসুন মাদামঃ আনওয়ার আলী বললেন এবং জন তাঁর সাথে চলতে শুরু

করলেনঃ

বন্দরগাহ্ থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ে আনওয়ার আলী ফিরে দেখলেন, ইন্সপেক্টর বার্ণার্ড স্থানীয় পুলিশের লোকদের সাথে কথা বলছে। তিনি জিনকে বললেনঃ 'আমার ধারণা, বার্ণার্ড আপনাকে চিনতে পারেনি, কিন্তু ওর সন্দেহ পুরোপুরি দূর হয়নি।'

জিন বললেনঃ 'আমারও বিশ্বাস, ও আমায় চিনতে পারেনি হয়তো। রোগে ভুগে আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমি আয়নায় আমার নিজেরই মুখ চিনতে পারি না। তা' ছাড়া ইন্সপেক্টর বার্ণার্ড বেশীদিন মনে রাখার মতো অবস্থায় আমায় দেখে নি।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'তারপরও আমার আশংকা হচ্ছে, আপনার সম্পর্কে ইন্সপেক্টর পুরো আশ্বস্ত হবার চেষ্টা করবে। হয়তো কিছুকাল পণ্ডিচেরী পুলিশের লোককে আমার তাঁবুর উপর নযর রাখার জন্য লাগিয়ে রাখবে। আমার আরো ভয় হয়, কাল সে আপনার সাথে দেখা করতে এলে পুরোপুরি তৈরী হয়ে আসবে। লা গ্রাঁদের চিঠিটা সে অকারণে হস্তগত করেনি। অবিলম্বে পন্ডিচেরীর সীমানা পার হয়ে যাওয়াই আপনার পক্ষে ভালো হবে। যদি আপনি ঘোড়ায় সফর করতে পারেন, তা'হলে আমাদেরকে এক্ষুণি রওয়ানা হতে হবে।'

জিন বললেনঃ 'আমি তৈরী, কিন্তু আপনি কি করে জানলেন যে, এই জাহাজে আমি এসেছি?'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'এতে হয়রান হওয়ার কিছু নেই। লা গ্রাঁদকে বিদায় করে দেবার পর আমি এখানে আগত প্রত্যেকটি জাহাজই পরীক্ষা করে দেখেছি।'

জিন কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে তাঁর সাথে সাথে চললেন। অবশেষে তিনি বললেনঃ 'মসিয়েঁ, আমি জানি না, আপনি কে, কিন্তু আপনার উপর নির্ভর করা ব্যতীত আমার চারা নেই।'

ঃ 'আমায় আপনি নির্ভরযোগ্যই পাবেন।' আনওয়ার আলী বললেন।

কিছুক্ষণ পর তাঁরা এসে তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। সিপাহীরা একটি খিমা পাতছিলো। আনওয়ার আলী অবিলম্বে তাদেরকে তিনটি ঘোড়া তৈরী করবার হুকুম দিলেন এবং দীলাওয়ার খানকে বললেনঃ 'দীলাওয়ার খান, তুমি আমাদের সাথে যাবে। বন্দরগাহ্ থেকে যে বাক্সটি আমি পাঠিয়েছি, সেটি জলদী করে আমার ঘোড়ার যিনের পিছে বেঁধে দাও।'

তারপর তাঁর নায়েবকে লক্ষ্য করে তিনি বললেনঃ 'সরদার খান! সন্ধ্যা পর্যন্ত যেনো কেউ জানতে না পারে যে, আমি এখানে নেই। সেদিন যে ইন্সপেক্টর আমার কাছে এসেছিলো, হয়তো সে অথবা পন্ডিচেরী পুলিশের কোনো লোক আমার সম্পর্কে জানতে আসবে। তুমি তাকে এই বলে আশ্বস্ত করে দেবে যে, আমি বিশ্রাম করছি। মাদাম লা গ্রাঁদের কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে তুমি বলে দেবে যে, তিনি তাঁর খিমায় ঘুমিয়ে আছেন। আজই যে তারা তোমায় পেরেশান করবে, এমন কোনো

সম্ভাবনা নেই। তবু ভোরে তারা অবশ্যি আসবে এবং তুমি তাদেরকে বলে দেবে যে, মাদাম অবিলম্বে সেরিংগাপটম যাবার জন্য যিদ করেছিলেন এবং এতক্ষণে হয়তো তাঁরা কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করে গেছেন। তাঁকে বলো যে, বিশেষ অসুবিধার দরুন আমি এখানে থেকে তাঁর ইন্তেযার করতে পারিনি।'



আনওয়ার আলী ও জিন তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাবার প্রায় আধঘন্টা পর বার্ণার্ড দুঃখ ও ক্রোধে অধীর হয়ে পণ্ডিচেরীর গভর্নরের সামনে দাঁড়িয়ে বললোঃ 'জনাব, ব্যাপারটি বড়োই সংগীন। আপনার পুলিশ যদি আমার সাথে সহযোগিতা করতো, তা'হলে আমি এ যুবতীকে পন্ডিচেরী থেকে বেরুতেই গ্রেফতার করতে পারতাম।'

ঃ 'কি করে আপনি জানলেন যে, আনওয়ার আলী সেই যুবতীকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেছেন?'

ঃ 'আমি বন্দরগাহ্ থেকে ফিরে আসার সময়েই দু'টি লোককে তাঁদের তাঁবুর উপর নযর রাখার জন্য পাঠিয়েছিলাম। তারা এসে জানালো যে, আনওয়ার আলী, একটি নওকর ও সেই যুবতী তাঁবুতে পৌঁছেই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলে গেছেন। আমি পুলিশকে বললাম অবিলম্বে তাঁদের পিছু ধাওয়া করতে, কিন্তু আপনার অফিসাররা জওয়াব দিলেন যে, গভর্নরের হুকুম ছাড়া তাঁরা তাদের পিছু ধাওয়া করতে পারবেন না।'

ঃ 'যদি যুবতীকে আপনি অপরাধী বলেই বিশ্বাস করে থাকেন, তা'হলে জাহাজ থেকে নামতেই কেন তাকে গ্রেফতার করলেন না ?'

ঃ 'জনাবে আলা ! তখন আমার হাতে কোনো প্রমাণ ছিলো না এবং আমি তার উপর হাত তোলার আগে নিজের মনের সন্দেহ দূর করতে চেয়েছিলাম। বন্দরগাহে যে চিঠিটা আনওয়ার আলী যুবতীকে দিয়েছিলেন, তা' আমি হস্তগত করলাম। লেম্বার্টের কয়েকটা লিপি প্যারীর ফউজী ইস্কুল থেকে আমার হাতে এসেছিলো। তা' আমার বাক্সে ছিলো। চিঠিটা তার সাথে মিলিয়ে দেখার জন্য আমি অবিলম্বে আমার অবস্থানস্থলে ফিরে এলাম। আমি ভালো করে দেখে নিয়েছি যে, লেম্বার্টের লিপির সাথে চিঠির লেখা মিলে যায় এবং লেম্বার্টে ও লা গ্রাঁদ একই ব্যক্তির দু'টি ভিন্ন ভিন্ন নাম। তাদের এখান থেকে দ্রুত পালিয়ে যাওয়ায়ও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, যুবতী আমায় দেখার পর নিজেকে এখানে নিরাপদ মনে করেনি। এখানো যদি তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করা না হয়, তা'হলে এর পুরো দায়িত্ব আপনার পুলিশের উপর পড়বে।'

গভর্নর বললেন ঃ 'আপনি জানেন, পন্ডিচেরী থেকে কয়েক মাইল দূরে ইংরেজের চৌকি এবং তারপরেই মহীশূরের সীমান্ত শুরু হয়ে গেছে। তাই বেশী দূর আমরা তাঁদের পিছু ধাওয়া করতে পারি না।'

ঃ জনাব, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারা বেশিদূর যেতে পারে নি। এখনো সময় রয়েছে।'

ঃ 'আমি দু'টি শর্তসাপেক্ষ আপনার সাথে কিছু সওয়ার পাঠাতে পারি। প্রথম শর্ত, আপনারা পন্ডিচেরীর সীমানা ছাড়িয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করবেন না। দ্বিতীয় শর্ত, যদি আপনি অকৃতকার্য হন, তা'হলে নিজস্ব গাফলতি ও ত্রুটির যিম্মাদারী আমার পুলিশের উপর চাপাবেন না।'

ঃ 'জনাব, আমার একমাত্র ত্রুটি হতে পারে আপনার পুলিশের সহযোগিতা লাভ করতে না পারে।'

গভর্নর বললেনঃ 'দেখুন, আনওয়ার আলী মহীশূর সরকারের একজন দায়িত্বশীল অফিসার। পণ্ডিচেরীর বড়ো বড়ো অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা মহীশূরের প্রত্যেকটি লোককে সম্মান প্রদর্শন করবেন। আমরা এখানে থেকে সুলতান টিপুর অসন্তোষভাজন হতে পারি না। আমি আপনাকে বিশেষ করে বলে দিচ্ছি, যদি সে যুবতীকে গ্রেফতার করা যায়, তা'হলেও আনওয়ার আলীর প্রতি আপনার আচরণ বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া চাই। আমি আমার সেক্রেটারীকে পাঠাচ্ছি আপনার সাথে। তিনি পুলিশের কয়েকজন সওয়ার আপনার সাথে রওয়ানা করে দেবেন, কিন্তু আমার মনে হয়, আনওয়ার আলী সঠিক অবস্থা জেনেও যদি যুবতীকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন, তা'হলে পন্ডিচেরীর সকল ফউজ আর পুলিশ একত্র হয়েও তার খোঁজ করতে পারবে না।

ঃ 'অনুরূপ অবস্থায় আপনি অপরাধীকে আমাদের হাতে ছেড়ে দেবার জন্য মহীশূর সরকারের কাছে দাবি জানাতে পারবেন না?

ঃ 'না, মহীশূরে আশ্রয় নেবার পর তারা আমাদের আধিপত্যের বাইরে চলে যাবে।'



দুপুর বেলায় আনওয়ার আলী ঘন জংগলের মধ্যে এক টিলার কাছে এসে ঘোড়া থামালেন এবং সাথীদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। জিন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে ঘোড়ার পিঠের উপর ঝুঁকে রয়েছেন। তাঁর মুখ পান্ডুর হয়ে গেছে।

ঃ 'আমি বড়োই ক্লান্ত।' অনুনয়ের স্বরে তিনি বললেনঃ 'যদি কোনো বিপদ না থাকে, তা'হলে একটুখানি দেরী করা যাক।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'আমরা এখনো বিপদের সীমানার বাইরে আসিনি। তবু আপনার খাতিরে কিছুক্ষণ দেরী করবো। এই টিলা পার হয়ে একটি নালা। নালার কিনারে আপনি কিছুক্ষণ আরাম করতে পারবেন।'

খানিকক্ষণ পরে তারা টিলার মাথার উপর উঠে গেলেন এবং কাছেই দেখা গেলো ছোট একটি নালা।

আনওয়ার আলী বললেনঃ দীলাওয়ার খান, তুমি এখানে থাক, কোনো বিপদ দেখলে আমাদেরকে খবরদার করে দেবে।'

জিন ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বললেনঃ 'যিনের উপর বসা আমায় দিয়ে আর হচ্ছে না। আমি পায়দল চলবো।'

আনওয়ার আলী জলদী লাফিয়ে পড়ে দু'টি ঘোড়ার বাগ ধরলেন এবং জিন কম্পিত পদে তাঁর সাথে টিলা থেকে নামতে লাগলেন।

খানিকক্ষণ পরে তাঁরা পুল থেকে কয়েক কদম দূরে এক দিকে সরে নালার কিনারে বসলেন। জিন সবুজ ঘাসের উপর বসে পড়লেন এবং আনওয়ার আলী ঘোড়া দু'টোকে পানি পান করিয়ে একটা ঝোঁপের সাথে বেঁধে রাখলেন। তিনি থলে থেকে একটা পেয়ালা বের করে নালা থেকে পানি এনে জিনের সামনে ধরে বললেনঃ 'আপনার তেষ্টা পেয়েছে?'

তিনি হাসিমুখে মাথা নেড়ে আনওয়ার আলী হাত থেকে পানির পেয়ালাটি ধরলেন।

আনওয়ার আলী বললেন ঃ 'ভূখও লেগেছে?'

তিনি জওয়াব দিলেন ঃ 'হাঁ, আমি দীর্ঘকাল পরে ভুখ অনুভব করছি।'

আনওয়ার আলী একটা গাছ থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নালার পানিতে ধুয়ে এনে জিনের সামনে বিছিয়ে দিলেন।

জিন ঘাবড়ে গিয়ে বললেনঃ 'মসিয়েঁ, এই-এই খাবার জিনিস?'

ঃ 'না, না,' আনওয়ার আলী হাসি চাপতে চাপতে বললেনঃ 'এ আপনার খাবার বরতন।' তারপর ঘোড়ার কাছে গিয়ে থলে থেকে একটা রওগনী রুটি বের করে এনে পাতার উপর রেখে বললেনঃ 'নিন খানা এসে গেছে।'

ঃ 'আপনি খাবেন না?'

ঃ 'না, আমি খেয়ে নিয়েছি।'

জিন কয়েক লোকমা খেয়ে নিয়ে বললেনঃ 'এতো বড়ো সুস্বাদু খানা, কিন্তু তাঁবু থেকে আনার সময়ে আমি বুঝতে পারি নি যে, আপনি খানাও সাথে নিয়েছেন।'

ঃ 'জাহাজের খবর পেয়েই আমি কতকগুলো জরুরী ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম।'

ঃ 'আপনি কি করে জানলেন যে, আমি এই জাহাজে আসছি।'

ঃ 'প্রত্যেকটি নতুন জাহাজ আসার পর আমি আপনার আসার প্রত্যাশা নিয়ে বন্দরগাহে যেতাম। গোড়ার দিকে তো আমি ঘোড়ার উপর জিনও লাগিয়ে রাখতাম। শুধু এবারই কিছুটা আয়োজনের ঘাটতি ছিলো।'

আরো কয়েক লোকমা খাওয়ার পর জিন বললেনঃ 'এ দেশের রীতি তো আমার

জানা নেই। রুটি আমার প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশী। আমি সবটা না খেতে পারলে আপনি কিছু মনে করবেন না তো?'

আনওয়ার আলী হাসলেন- তাঁরা দু'জনই হেসে উঠলেন এবার। তারপর জিন আচানক গম্ভীর হয়ে বললেনঃ 'মসিয়েঁ, আমি দীর্ঘকাল পরে হাসছি। এখানে কোনো বিপদ তো নেই?'

ঃ 'এখানে কোনো বিপদ নেই। আপনি এবার প্রাণভরে হাসতে পারেন।'

জিন বললেনঃ 'ইন্সপেক্টর বার্ণার্ড জানতে পারলে অবশ্যি আমাদের পিছু ধাওয়া করবে।'

ঃ আপাতদৃষ্টিতে তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। আর যদি সে আমাদের পিছনে আসে, তাহলেও কোনো উদ্বেগের কারণ নেই আপনার। আপনি নিশ্চিন্ত মনে আরাম করুন। আমার নওকর টিলার উপর পাহারায় রয়েছে।

জিন কিছুটা পিছু হটে একটি গাছের সাথে ঠেস দিলেন। তাঁর চোখ ঘুমের নেশায় মুদে এলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শিশুর মতো অঘোরে ঘুমুতে লাগলেন।

আনওয়ার আলী নালার কিনারে গিয়ে ওযু করে নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষ করে গাছের সাথে বাঁধা ঘোড়া খুলে তার বাগ ধরে বসে পড়লেন এক পাথরের উপর।

কিছুক্ষণ পর তিনি জিনকে জাগাবার ইরাদা করলেন। অমনি টিলার দিক থেকে ঘোড়ার পদশব্দ শোনা গেলো। তিনি জলদী উঠে দাঁড়ালেন। দীলাওয়ার খান খুব দ্রুতগতিতে তাঁর দিকে আসছে।

ঃ 'কি খবর, দীলাওয়ার খান?' আনওয়ার আলী বুলন্দ আওয়াযে বললেন।

দীলাওয়ার খান কাছে এসে ঘোড়া থামালো এবং তাঁর প্রশ্নের জওয়াবে বললোঃ 'আট-দশজন দ্রুতগামী সওয়ার এদিকে আসছে। আমি তাদেরকে টিলা থেকে প্রায় এক মাইল দূরে দেখেছি।

জিন চমকে উঠে চোখ খুলে প্রশ্ন করলেনঃ 'কি ব্যাপার?'

ঃ 'কিছু নয়। আপনি আপনার ঘোড়া সামলে নিন।'

জিন ছুটে গিয়ে ঘোড়ার বাগ ধরলেন এবং আনওয়ার আলী দীলাওয়ার খানকে সম্বোধন করে বললেনঃ 'তুমি পুলের ওপারে গিয়ে ওদের ইন্তেযার করতে থাক। তারা তোমায় দেখে ফেললে একবার হাওয়াই গুলী চালিয়ে চলে যেয়ো। তাদের মধ্যে কারুর ঘোড়া তোমার ঘোড়ার কাছে পৌছতে পারে না। এ রাস্তা ইংরেজের চৌকির দিকে গেছে। এই পুল থেকে তিন মাইল দূরে তুমি তাদের সাথে চালাকি করে ডানে ঘুরে গিয়ে জংগলে গা ঢাকা দিও। তারা ইংরেজের চৌকির কাছে গেলে ইংরেজ তাদের উপর হামলা চালাবে। আমরা এই নালার কিনার ধরে জংগলের পথে এগিয়ে যাবো

এবং এখান থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে নালা পার হয়ে তোমার ইন্তেযার করবো।'

দীলাওয়ার খানকে নির্দেশ দিয়ে আনওয়ার আলী জিনকে বললেনঃ 'চলুন।' জিন কিছু না জেনেও অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, কোনো বিপদ আসন্ন। তিনি বললেনঃ 'মসিয়েঁ, আমার ভয় হচ্ছে, আমি হয়তো আপনার সাথে সমানে চলতে পারবো না।'

ঃ 'আপনাকে এখন ঘোড়ার সওয়ার হতে হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘোড়ার বাগ ধরে আমার পিছু পিছু চলুন।

জিন তাঁর পিছু চললেন এবং তাঁরা গিয়ে জংগলের ভিতরে অদৃশ্য হলেন। কয়েক কদম দূরে গিয়ে তাঁরা থেমে নির্বাক হয়ে টিলার দিকে ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে লাগলেন। তারপর তাঁদের কানে এলো বন্দুকের আওয়ায এবং ঘোড়ার পদশব্দ ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগলো।

আনওয়ার আলী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেনঃ 'এবার আপনার বিপদ কেটে গেলো। আমার বিশ্বাস, ওরা দিগ্বিদিক ঘুরে ইংরেজ চৌকির দিকে পৌছে যাবে এবং সেখান থেকে দ্রুততর গতিতে ফিরে আসবে।'

ঃ 'কিন্তু আপনার সাথী ?'

ঃ 'ওর কোনো বিপদ নেই। কিছু সময়ের মধ্যেই ও জংগলের মধ্যে তাদের চোখের আড়াল হয়ে যাবে। চলুন, এখন আমাদের কিছুদূর এই জংগলের ভিতর দিয়ে চলতে হবে। আপনার তক্লীফ তো হবেই, কিন্তু এখন আমাদের কিছু সময় কিনারা থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন। নালা পার হবার পর আমাদের সফর এর চাইতে সহজ হবে। আপনিও স্বাধীনভাবে ঘোড়ায় চড়ে সফর করতে পারবেন।'

জিন বললেনঃ 'সওয়ারী করার শখ নেই আমার মোটেই। আমি পায়দল চলায়ই অধিকতর আনন্দ অনুভব করবো।'

জংগল খুব ঘন। মোটা মোটা গাছের তলায় ছড়ানো কতো ঝোপঝাড় আর নানারকম লতা তাকে আরো দুর্গম করে তুলেছে। কোথাও কোথাও আনওয়ার আলীকে তলোয়ার দিয়ে পথ সাফ করে নিতে হচ্ছে। জিন বহু কষ্টে তাঁর সাথে সাথে চললেন।

প্রায় এক ঘন্টা চলার পর তাদের ঘোড়া আচানক কান খাড়া করলো এবং সামনে চলতে চাইলো না। আনওয়ার আলী অবিলম্বে তলোয়ার কোষবদ্ধ করে কাঁধ থেকে বন্দুক হাতে নিয়ে সামনে ঝোঁপের দিক তাকাতে লাগলেন।

ঃ 'ব্যাপার কি?' জিন ভীত কণ্ঠে বলে উঠলেন।

ঃ 'চুপ'! আনওয়ার ফিরে তাঁর দিকে না তাকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন।

এক মুহূর্ত পরে বাঘের গর্জন শোনা গেলো। জিন মোহাচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। আচানক সামনের ঝাড় নড়ে উঠলো এবং বাঘের গর্জন বন্ধ হল। আনওয়ার আলী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। জিনের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আপনি সিংহ দেখেছেন কখনো?'

জিনের বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে গেছে। আনওয়ার আলী হেসে বললেনঃ ভয়ের কারণ নেই। চলে গেছে।

জিন ধরাগলায় বললেনঃ 'আমি কিছুই দেখিনি, কিন্তু ওর আওয়ায অতি ভয়ংকর। ও যে আমাদের উপরে হামলা করেনি, তার জন্য আল্লাহর শোকর।'

ঃ 'ও ভুখা ছিলো না। মনে হয়, ঝাড়ের পিছে ওর শিকার পড়ে রয়েছে।

ঃ 'আপনি বন্দুক চালালেন না? '

ঃ 'তার প্রয়োজন ছিলো না।'

ঃ 'আপনি কখনো বাঘ মেরেছেন?'

ঃ 'বহুবার।'

ঃ 'এ ভয়ংকর জংগল কবে শেষ হবে?'

ঃ 'এ জংগল খুব বড়ো, কিন্তু এখন একটুখানি আগে গিয়ে নালা পার হবার পর আপনার বিপদ কেটে যাবে।'

কয়েক মিনিট পরে তাঁরা জংগল থেকে বেরিয়ে নালার কিনারে এসে পড়লেন। আনওয়ার আলী বললেনঃ 'এবার আপনি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যান। এবার আমাদেরকে নালা পার হতে হবে।'

ঃ 'পানি খুব বেশী গভীর নয় তো?'

ঃ 'না, আপনি আপনার ঘোড়া আমার পিছে রাখুন।' আনওয়ার আলী ঘোড়ার রেকাবে পা রেখে বললেন।

জিন বিনা বাক্যব্যয়ে হুকুম তামিল করলেন এবং তাঁরা কোমর বরাবর পানি পার হয়ে অপর কিনারে চলে গেলেন। তারপর প্রায় আধ মাইল অপর কিনার ধরে চলার পর আনওয়ার আলী ঘোড়া থামিয়ে নীচে নামলেন এবং জিনকে বললেনঃ 'এখন এখানে আমাদের সাথীর ইন্তেযার করতে হবে।'

জিন বললেনঃ 'আমরা যে এখানে আছি, তা সে কি করে জানবে?'

ঃ 'আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম যে, দু'মাইল চলার পর আমরা তার ইন্তেযার করবো।'

ঃ 'তা হলে আপনার মতলব, এতক্ষণে আমরা মাত্র দু'মাইল পথ অতিক্রম করেছি?' জিন হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন।

ঃ হাঁ, জংগলের মধ্যে আমাদের গতি ছিলো খুব ধীর, কিন্তু দীলাওয়ার খানের তো এতক্ষণে আসা উচিত ছিলো।

জিন ঘোড়া থেকে নেমে এক পাথরের উপর বসলেন। প্রায় পনেরো মিনিট পরে তাঁরা জংগলের ভিতরে ঘোড়ার পদধ্বনি শুনতে পেলেন। আনওয়ার আলী

বললেনঃ 'ওই যে এসে গেলো।' জিন উঠে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর দীলাওয়ার খান গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলে তাকে দেখে আনওয়ার আলী বললেনঃ' তুমি বড়ো দেরী করেছো।'

ঃ 'জনাব, খোদার শোকর যে, আপনাকে পেয়েছি। জংগলের মধ্যে আমি তো জানতেই পারিনি যে, কোথায় যাচ্ছি। এক্ষুণি আমি ভাবছিলাম, ফিরে গিয়ে আবার পুলের কাছে থেকে নালার কিনার বেয়ে এদিকে আসবো।'

ঃ 'আমাদের পিছু এসেছিলো যারা, তাদেরকে কোথায় ফেলে এলে?

ঃ ' জনাব, ওরা এতক্ষণে ফিরে পন্ডিচেরীর কাছাকাছি গিয়ে থাকবে। আমি তাদেরকে চালাকি করে ইংরেজ চৌকির খুব কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর পায়ে চলা পথের ধারে ঝাড়ের পিছে লুকিয়ে নিজের চোখে দেখেছি তাদের ঘাবড়ানোর তামাশা। তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে পালাচ্ছে। আর তাদের পিছনে রয়েছে ইংরেজ সওয়ারের একটি দল। ওরা চলে যাবার পর আমি চলে এসেছি। ফরাসী পুলিশের কোনো লোক যখমী হয়েছে কিনা, আমি দেখিনি। তবে ইংরেজরা ক্রমাগত গুলী চালিয়েছে তাদের উপর।

জিনের অনুরোধে আনওয়ার আলী তাঁর নওকরের কাহিনী ফরাসী ভাষায় তাঁকে শুনালেন। শুনে তাঁর চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেনঃ 'মসিয়েঁ, আমার আফসোস, আমি নিজের চোখে ইন্সপেক্টর বার্ণার্ডের পিছু হটে যাওয়ার দৃশ্যটি দেখতে পারলাম না।'

আনওয়ার আলী বললেঃ 'চলুন এবার, দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

তারা ঘোড়ায় সওয়ার হলে আনওয়ার আলী বললেনঃ 'দীলাওয়ার খান, সন্ধ্যার আগে আমাদেরকে কোনো নিরাপদ জায়গায় পৌঁছাতে হবে। এবার তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে চলো।'

দীলাওয়ার খান বললোঃ 'এই জংগলে কিছু দূর এগিয়ে গেলে একটা পায়ে চলা পথ। মনে হয়, সে পথটি কৃষ্ণগরীর রাস্তার সাথে মিলেছে।'

ঃ 'চলো।'

সূর্যাস্তের সময়ে আরো কয়েক মাইল অতিক্রম করার পর তারা এসে পৌঁছে গেলেন এক পাহাড়ের কোলে। আনওয়ার আলী জিনকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'এখন রাত আসন্ন। এরপর কয়েক মাইল জংগল আরো ঘন। তাই ভোর পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে আমাদের।

তাঁরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। জিন বসে পড়লেন একটা পাথরের উপর। আনওয়ার আলী ও দীলাওয়ার খান একটা ঝোপের সাথে ঘোড়া বেঁধে যিন খুলে রাখলেন। তারপর কাছেই একটা স্বচ্ছ পানির ঝর্ণায় ওযূ করে তাঁরা নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁদের নামায শেষ হলে দেখলেন, জিন পাথরের উপর বসে না থেকে

যমিনের উপর ক্লান্ত দেহ ঢেলে দিয়েছেন। আনওয়ার আলী ঘোড়ার যিনের দু'টো আবরণ বের করে তার কাছে বিছিয়ে দিলেন এবং আর একটাকে জড়িয়ে বালিশের মতো করে দিয়ে বললেনঃ 'আপনি হয়তো যমিনের উপর ঘুমোতে অভ্যস্ত নন। এ সময়ে আপনার জন্য এর চাইতে ভালো শয্যার ব্যবস্থা করতে পারছি না বলে দুঃখিত। আপনি কিছু খেয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ুন।'

জিন ঘাসের উপর বসে পড়লেন। আনওয়ার আলী তাঁর সামনে নিজের রুমাল বিছিয়ে দিয়ে থলে থেকে রওগনী রুটি বের করে দিয়ে বললেনঃ 'আপনি দুপুরে যে খানা খেয়েছিলেন, এও তাই। পথে আপনার জন্য কোনো শিকারের সন্ধানও করতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত।'

ঃ 'এ রুটি বড়োই মজাদার।' জিন অবাধে লোকমা নিতে গিয়ে বললেনঃ 'আপনি খাবেন না?'

ঃ 'আমিও খাবো। আমার থলের মধ্যে এখনো যথেষ্ট রয়েছে।'

জিন কয়েক লোকমা খাওয়ার পর বাকী রুটি রুমালে জড়িয়ে একদিকে রাখলেন। তারপর উঠে ঝর্ণা থেকে পানি পান করে ফিরে এসে শুয়ে পড়লেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পর ধড়মড় করে উঠে বসে আনওয়ার আলীর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'মসিয়েঁ, মৃত্যুকে আমি ভয় করি না, কিন্তু ঘুমের মধ্যে মৃত্যুর কল্পনাও আমার কাছে ভয়ানক। আপনি বিশ্বাস করেন যে, এখানে আমাদের কোনো বিপদ নেই? বেখবর অবস্থায় বাঘ, চিতা বা নেকড়ে তো আমাদের উপর হামলা করবে না?'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'না, আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ুন।' জিন এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেনঃ 'আপনার সাথী কোথায় গেছে?'

ঃ 'সে আগুন জ্বালাবার জন্য শুকনো কাঠ সংগ্রহ করছে।'

ঃ 'হাঁ, অবশ্যি আগুন জ্বালাতে হবে, 'মসিয়েঁ? অন্ধকারে আমার বড্ড ভয় লাগছে।'

জিন তক্ষুণি শুয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে দুনিয়ার সব কিছু সম্পর্কে বেখবর হয়ে ঘুমোতে লাগলেন।

কয়েক ঘন্টা পর চোখ খুলে কাছেই তাঁর নযরে পড়লো আগুনের শিখা। তিনি উঠে বসলেন। কয়েক কদম দূরে আনওয়ার আলী বন্দুক হাতে বসে আছেন এক পাথরের উপর। তাঁর মুখের উপর পড়ছে আগুনের দীপ্তি। জিন দীর্ঘ সময় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অতীতের ঘটনাবলী তাঁর কাছে এক স্বপ্ন। এই যে নওজোয়ান কয়েক ঘন্টা আগেও তাঁর কাছে ছিলেন অপরিচিত, এখন তাঁকে মনে হচ্ছে বহু বছরের সাথী। তাঁর মন চায় তাঁর সাথে কথা বলতে। তিনি বলতে চান অনেক কথা, কিন্তু অন্তহীন কৃতজ্ঞতার আবেশে তাঁর মনের কথা মুখে এসে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তাঁর মুখ থেকে 'মসিয়েঁ' ছাড়া আর কোনো কথাই বেরুলো না।

আনওয়ার আলী তাঁর দিকে তাকিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। জিন প্রশ্ন করলেনঃ 'মসিয়েঁ, এখন রাত কতো হয়েছে?'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'রাত দুপুর পার হয়ে গেছে।'

ঃ 'আপনার সাথী কোথায়?'

আনওয়ার আলী একদিকে ইশারা করে বললেনঃ 'সে ঘুমিয়ে আছে।'

জিন বললেনঃ 'দীর্ঘকাল পরে আমার এত গভীর ঘুম হল। সময়ের অনুভূতিও নেই আমার। আপনি হয়তো মোটেই ঘুমান নি।'

ঃ 'আমি পাহারা দিচ্ছিলাম। এবার দীলাওয়ার খানের পালা।'

ঃ 'মসিয়েঁ, আমার তেষ্টা পেয়েছে।'

ঃ 'আমি এক্ষুণি পানি নিয়ে আসি।' আনওয়ার আলী পেয়ালা নিয়ে ঝর্ণা থেকে পানি ভরে আনলেন।

পানি পান করে জিন বললেনঃ 'কবে এ জংগলের শেষ হবে?

আনওয়ার আলী হেসে বললেনঃ 'আপনার খুব ভয় জংগলের জন্য?'

ঃ 'না, 'মসিয়েঁ, এখন আপনার সাথে সফর করতে কোনো ভয় নেই আমার।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'নিরুপায় হয়ে আমাদের আসতে হয়েছে এ দুর্গম পথে। আর্কটের সীমান্তে কোথাও কোথাও ইংরেজ চৌকি রয়েছে। আমরা অন্য কোনো রাস্তা ধরে এলে হয়তো কোনো চৌকিতে আপনাকে বাধা দেওয়া হত। এটাও অসম্ভব ছিলো না যে, তারা হয়তো আপনার সম্পর্কে পন্ডিচেরী পুলিশের কাছে অনুসন্ধান করতো এবং আপনাকে তাদের হাতে ছেড়ে দিতো, কিন্তু আপনার পেরেশান হওয়া ঠিক নয়। কাল দুপুর অথবা সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা জংগল থেকে বেরিয়ে এক আবাদী এলাকায় চলে যাবো। আপনি ঘুমিয়ে থাকুন। ভোরে আমরা এখান থেকে যাচ্ছি।'

আনওয়ার আলী দীলাওয়ার খানের দিকে গিয়ে তাকে জাগালেন। তারপর জিনের কাছ থেকে কয়েক কদম দূরে ঘোড়ার যিনের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। জিন কিছুক্ষণ বসে বসে তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন থাকলেন। রাতের ঠান্ডা হাওয়ার হালকা প্রবাহ ছিলো বড়োই আনন্দদায়ক। আসমান স্বচ্ছ সিতারারাজিকে মনে হচ্ছিলো যেনো নিত্যকার চাইতে বড়ো ও দীপ্তিমান। খানিকক্ষণ পর তিনি আবার অচেতন হয়ে পড়লেন গভীর ঘুমে।

পরদিন তারা কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড় অতিক্রম করে এক উপত্যকার নিবিড় বনপথ পার হয়ে চলছিলেন। অকস্মাৎ আনওয়ার আলী ঘোড়ার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে সাথীদের থামতে ইশারা করলেন এবং নিঃশব্দ পদক্ষেপে একদিক

সরে গিয়ে এক ঘন ঝোঁপের মধ্যে গা ঢাকা দিলেন। জিন ভয়ার্ত হয়ে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিলেন, কিন্তু দীলাওয়ার খানের মুখে ফুটে উঠেছিলো পূর্ণ নির্লিপ্ততা। আচানক বনের মধ্যে বন্দুকের আওয়ায শোনা গেলো। জিন চিৎকার করে দীলাওয়ার খানকে কি যেনো প্রশ্ন করছিলেন। দীলাওয়ার খান ফরাসী ভাষা জানতো না। প্রথমটা সে 'শিকার' 'শিকার' বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো, পরে বন্দুক ও খঞ্জর বের করে নানারকম অংগভংগী করে ইশারায় তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করলো। জিনের কাছে তার কথা ও ইশারা দুই-ই সমভাবে দুর্ভোধ্য, তাই তিনি অন্তহীন উদ্বেগ ও অসহায়তার মনোভাব নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর আনওয়ার আলী এক হরিণ কাঁধে নিয়ে এসে হাযির। জিন তাঁকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

খানিকক্ষণ পরে তাঁরা এক নদীর কিনারে আগুন জ্বেলে হরিণের গোশ্‌ত ভুনছিলেন। কাছেই এক গাছের উপর কতকগুলো বানর লাফালাফি করছিলো। জিন নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে গাছের তলায় গিয়ে বানরের দল দেখতে লাগলেন। আচানক বনের মধ্যে ঝোঁপঝাড়ে কিছুর পদশব্দ শোনা গেলো। ফিরে তাকিয়ে তিনি এক মূহূর্ত হতভম্ব হয়ে থাকলেন। তারপর চীৎকার করে ছুটে পালালেন। আনওয়ার আলী ও দীলাওয়ার খান বন্দুক নিয়ে ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। জিন সন্ত্রস্ত হয়ে আনওয়ার আলীর বাহু জড়িয়ে ধরলেন। তিনি কিছু বলতে চান, কিন্তু ভয়ে তাঁর বাক রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাঁর সারা দেহ তখন কাঁপছে থর থর করে। আনওয়ার আলী কয়েক মুহুর্ত জংগলের দিকে তাকিয়ে দেখে মৃদু হেসে জিনকে বললেনঃ 'আরে, ওযে হাতী। আপনি এতটা ভয় পেয়ে গেলেন'!

আনওয়ার আলীর হাসি জিনের ভয় অকেনটা দূর করলো। তিনি বললেনঃ 'হাতীকে আপনারা বিপজ্জনক মনে করেন না?'

ঃ 'না।'

ঃ তা' হলে আপনারা কা'কে বিপজ্জনক মনে করেন ?'

আনওয়ার আলী হেসে বললেনঃ 'আমি আপনার চীৎকার করে পালানোটাই বিপজ্জনক মনে করেছিলাম। এহেন অবস্থায় বুনো জানোয়ার ভয় পেয়ে হামলা করে বসে।'

পাঁচ ছয়টি হাতীর একটি দল ঝোঁপঝাড় ভেঙে একদিকে ছুটে যাচ্ছিলো। জিন বললেনঃ 'আমি আপনাকে অকারণে পেরেশান করেছি বলে দুঃখিত। কিন্তু যে হাতীটা আমি দেখেছিলাম, সেটা কতো বড়ো!'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'জংগলে প্রত্যেকটি হাতীই প্রথমবার খুব বড়ো দেখা যায়। চলুন, আপনার খানা তৈরী।'



মহীশূরের সীমানায় প্রবেশ করার পর জিনের মনে হচ্ছিলো যেনো অতীতের অন্ধকার ছায়া তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন তাঁদের সামনে দুর্গম অরণ্য পথের পরিবর্তে প্রশস্ত রাজপথ। মহীশূরের প্রথম চৌকি থেকে আনওয়ার আলী তার জন্য যোগাড় করে দিয়েছেন একটা বলদের গাড়ি এবং কৃষ্ণগরী ছেড়ে এসে তিনি সফর করতে লাগলেন একটি আরামদায়ক পালকিতে সওয়ার হয়ে। পন্ডিচেরী থেকে একটি অচেনা লোকের সাথে সফর শুরু করার সময়ে যে ভীতি ও পেরশোনী তাঁর মনে জাগছিলো, তা' দূর হয়ে গেছে এবং আনওয়ার আলীকে এখন তার মনে হচ্ছে কতো কালের চেনা। গোড়ার দিকে কয়েক মনযিল তিনি বারবার তাঁর কাছে প্রশ্ন করেছেনঃ সেরিংগাপটম আর কতো দূর-আমরা কতো মাইল এসেছি আর কতো মাইল বাকী -আরো আমাদের কতো পাহাড়, দরিয়া ও জংগল পাড়ি দিতে হবে-এখন পথে কোনো হিংস্র জানোয়ারের হামলার ভয় তো নেই? কিন্তু এখন তাঁর জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, তিনি সফর করছেন এবং আনওয়ারী আলী তাঁর সাথী।

তারপর একদিন দুপুর বেলায় তাঁরা এক উঁচু টিলার চূড়ার কয়েক কদম দূরে থামলেন। ক্লান্ত কাহাররা আনওয়ার আলীর ইশারায় জিনের পালকি যমিনের উপর রাখলো এবং পায়েচলা পথের কাছে গাছের তলায় বসে গেলো।

আনওয়ার আলী ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং লাগাম দীলাওয়ার খানের হাতে দিয়ে জিনকে বললেনঃ 'আমাদের সফর শেষ হয়ে এলো। আপনি এই টিলার চূড়া থেকে সেরিংগাপটমের প্রথম আভাস দেখতে পাবেন।'

জিন পালকি থেকে নেমে অবিলম্বে চূড়ার দিকে এগিয়ে চললেন। কয়েক কদম দূরে গিয়ে আনওয়ার আলীর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আপনি আসবেন না?'

ঃ 'আচ্ছা, আসছি।' বলে আনওয়ার আলী এগিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললেনঃ 'সেরিংগাপটম দেখার জন্য আমার টিলার চূড়ায় আসার প্রয়োজন ছিলো না। এই শহরের দৃশ্য হামেশা ভেসে বেড়াচ্ছে আমার চোখের সামনে।'

কিছুক্ষণ পর গিয়ে তাঁরা দাঁড়ালেন টিলার চূড়ার উপর এবং জিন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেরিংগাপটমের চিত্তমুগ্ধকর দৃশ্যপটের দিকে। টিলা থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে বয়ে চলেছে কাবেরী নদী। তারপর দেখা যায় উঁচু পাঁচিলের বুরুজ, শাহী মহলের উপরিভাগ এবং মস্‌জিদের গম্বুজ ও মিনার।

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'সেরিংগাপটম একটি দ্বীপ এবং দরিয়ার একটি শাখা তার অপরদিকে চলে গেছে।'

জিনের ঠোঁটে লেগেছিলো মুগ্ধকর হাসি এবং চোখে জ্বলছিলো আশার দীপ শিখা। তিনি বললেনঃ 'এই আমার শেষ আশ্রয়স্থল। এই আমার স্বপ্নের জান্নাত।

আপনি আমার জন্য কতো কিছু করেছেন। তার শোক্‌রিয়া জানাবার ভাষা নেই আমার। একটি কারণে আমি বড়োই লজ্জিত। আমার কোনো রহস্য আপনার কাছ গোপন করা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু আমি আপনাকে বলিনি যে, লেম্বার্ট-মানে লা গ্রাঁদের সাথে আমার বিয়ে হয়নি।'

আনওয়ার আলী মৃদু হেসে বললেনঃ 'আপনি আমায় নতুন কিছু জানান নি। লা গ্রাঁদ আমার দোস্ত এবং তিনি আমায় সব কাহিনীই শুনিয়েছেন।'

জিন বললেনঃ 'মসিয়েঁ, কিছু মনে করবেন না। ছোটবেলায় আমি এই দেশের কতো বিচিত্র কথাই না শুনেছি।'

ঃ 'আপনি হয়তো শুনেছেন, আমরা বন্য বর্বর এবং আমরা মানবতার মর্যাদা দিতে জানি না।'

ঃ 'হ্যাঁ, আরো শুনেছি যে, এ দেশের লোকদের আকৃতি অতি ভয়ংকর। পন্ডিচেরীর বন্দরগাহে আপনাকে দেখে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে, আপনি এ দেশেরই বাসিন্দা। তবু আপনার সাথে আসতে আমার ভয় হচ্ছিলো। পুলিশের ভয় না থাকলে আমি কিছুতেই আপনার সাথে সফর করতে রাযী হতাম না। পন্ডিচেরী থেকে আসার সময়ে আমার বারবার মনে হয়েছে, কোনো জংগলে অথবা বিজন স্থানে পৌঁছে আপনি আমার গলা টিপে মেরে ফেলবেন।'

ঃ 'আর এখন?'

জিন হেসে বললেনঃ 'এখন আমি দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আপনার সাথে যেতে তৈরী।'

আনওয়ার আলী সেরিংগাপটমের দিকে ইশারা করে বললেনঃ 'ওই আমার দুনিয়ার শেষ প্রান্ত এবং আমি দোআ করছি, যেনো ওখানে পৌঁছে আপনি দেখতে পান যিন্দেগীর তামাম স্বাচ্ছন্দ্য প্রতীক্ষা করছে আপনার জন্য। আমার মা আপনাকে দেখে খুব খুশী হবেন এবং আমার ইচ্ছা, যতোদিন না আপনাদের বিয়ে হয়, ততোদিন আমাদের গৃহেই আপনি থাকবেন। ওখানে পৌঁছামাত্রই হয়তো আমায় কোনো ময়দানে পাঠানো হবে এবং আমার ছোট ভাইও বেশীদিন গৃহে থাকতে পারবে না। আমাদের অনপস্থিতিতে আপনি আমার মাতার মন খুশী রাখতে পারবেন। আমার বিশ্বাস, লা গ্রাঁদও এতে আপত্তি করবেন না।'

জিনের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেনঃ 'আপনার দাওয়াত কবুল না করলে আমার পক্ষে না-শোকরগুযারী হবে। আপনি দাওয়াত না দিলেও সেরিংগাপটমে আপনার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আমার চারা নেই। আপনার গৃহ কোন দিকে?'

আনওয়ার আলী শহরের দিকে ইশারা করে বললেনঃ 'ওই গাছগুলোর পিছনে, কিন্তু এখান থেকে আপনি দেখতে পাবেন না। এবার চলুন।' আনওয়ার আলী

পাহাড় থেকে নীচে নামতে লাগলেন এবং জিন চলতে লাগলেন তাঁর পিছু পিছু। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার পালকিতে সওয়ার হলেন।



সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে ফরহাত ও মুরাদ আলী গৃহের উপর তলার এক কামরায় বসে ছিলেন। মুনাওয়ার খান একটা বাক্স তুলে ছুটতে ছুটতে কামরায় ঢুকে বললোঃ 'বিবিজী, বিবিজী ! আনওয়ার আলী সাহেব এসেছেন। দীলাওয়ার খানও এসেছে। তাঁরা এক মেমকে সাথে এনেছেন।'

মুরাদ আলী কুরসী থেকে উঠে কামরার বাইরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। নীচে প্রাঙ্গণের দিকে যেতেই আনওয়ার আলী ও জিনকে দেখতে পেলেন এবং বে-এখতিয়ার ভ্রাতার সাথে আলিংগন বদ্ধ হলেন।

ফরহাত বারান্দায় বেরুলেন। আনওয়ার আলী জলদী করে এগিয়ে এসে সালাম করে বললেনঃ 'আম্মাজান, আমার সাথে এক মেহমান আছেন।'

ফরহাত বললেনঃ 'এসো বেটী, আমি তোমার ইন্তেযার করছিলাম।'

আনওয়ার আলী ফরাসী ভাষায় বললেনঃ 'আম্মাজান আপনাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।'

জিন পশ্চিমী আদব অনুযায়ী মাথা নত করলেন এবং ফরহাত দু'খানি হাত তাঁর মাথায় রাখলেন।

মা ও ভাইয়ের সাথে জিনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে আনওয়ার আলী প্রশ্ন করলেনঃ 'লা গ্রাঁদ কোথায়?'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেনঃ 'ভাইজান, তিনি ফউজে ভর্তি হবার কয়েকদিন পরে ক্যাম্পে চলে গেছেন। তিনি রোজ ওঁর সম্পর্কে জানতে আসেন এবং মসিয়েঁ লালী সেরিংগাপটম থেকে চলে যাচ্ছেন শুনে তিনি খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন। আমি তাঁকে এক্ষুণি খবর দিচ্ছি।'

ঃ 'থামো। আমিও তোমার সাথে যাবো। সিপাহসালারের কাছে আমায় হাযির হতে হবে। কিন্তু না, তুমি এখানেই থাক। ওঁর সাথে আম্মাজানের কথা বলতে একজন মোতারজেম লাগবে। লা গ্রাঁদকে আমি পাঠিয়ে দেবো।'

মা বললেনঃ 'বেটা, লেবাস বদল করবে না?'

ঃ 'আম্মাজান, আমি যে ফালতু পোশাক সাথে এনেছিলাম, তা' এর চাইতেও ময়লা হয়ে গেছে। পথে তা' ধোয়াবার সুযোগ হয়নি।'

মা বললেনঃ 'তুমি যে কাপড় এখানে রেখে গিয়েছিলে, তা' ঠিক করে রাখা-হয়েছে।

কয়েক মিনিট পর আনওয়ার আলী ফউজী কেন্দ্রের দিকে চলে গেলেন এবং ফরহাত মুরাদ আলীকে তর্জুমান বানিয়ে এক কামরায় বসে জিনের সাথে আলাপ করতে লাগলেন। প্রায় একঘন্টা পর জিন ও লা গ্রাঁদ আনওয়ার আলীর দেওয়ানখানায় বসেছিলেন এবং জিন মরিশাস থেকে সেরিংগাপটম পর্যন্ত সফরের কাহিনী তাঁকে শোনাচ্ছিলেন।

জিনের কাহিনী শুনে লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'জিন, মরিশাস থেকে রওয়ানা হবার পর আমার যিন্দেগীর একটি লমহাও তোমার স্মরণ ব্যতীত কাটেনি। আজ মনে হচ্ছে, এ আমার নতুন জীবনের প্রথম দিন। আমি মহীশূরের ফউজে ভর্তি হয়েছি। চারদিন পর আমাদের ডিবিশন এখান থেকে চলে যাবে। আনওয়ার আলীর ইচ্ছা, আমাদের শাদী পর্যন্ত তুমি তাঁর মাতার কাছে থাকবে, কিন্তু তুমি এখানে থাকতে না চাইলে তোমার জন্য আলাদা বন্দোবস্ত হতে পারে।'

জিন বললেনঃ 'আমি আগেই তাঁর দাওয়াত কবুল করে নিয়েছি। আমার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।'

ঃ 'যুদ্ধ না বাঁধলে আমি ফিরে আসবো। তারপর আমার প্রথম দাবি হবে দেরী না করে আমাদের শাদীর ব্যবস্থা করা।'

জিন কিছুক্ষণ চিন্তা করে জওয়াব দিলেনঃ 'লা গ্রাঁদ, এ প্রশ্ন সম্পর্কে আমার ভাববার সুযোগ হয়নি এখনো। উপযুক্ত সময়ের ইন্তেযার করা আমাদের উচিত।'

কিছুক্ষণ পর তাঁরা আনওয়ার আলী ও মুরাদ আলীর সাথে এক টেবিলে বসে খাচ্ছিলেন। জিনের সফর ছিলো তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু। আহারশেষে জিন প্রকাশ্যে তাঁদের আলোচনায় অংশ নিচ্ছিলেন, কিন্তু ক্লান্তি ও ঘুমে তাঁর দেহ তখন ভেঙে পড়ছে।

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'তোমার শরীর ভালো নেই?

ঃ 'আমি কিছুটা ক্লান্তি অনুভব করছি।' নিজের কপালে হাত বুলিয়ে জিন বললেনঃ

ঃ'তা' হলে তোমার আরাম করা উচিত।'

জিন উঠে দাঁড়ালেন এবং আনওয়ার আলী বললেনঃ 'মুরাদ, ওঁকে আম্মাজানের কাছে নিয়ে যাও।'

তাঁরা কামরা থেকে বেরিয়ে গেলে আনওয়ার আলী লা গ্রাঁদকে বললেনঃ 'শাদী সম্পর্কে আপনারা কি ফয়সালা করলেন?'

ঃ 'আমরা এখনো কোনো ফয়সালা করিনি। আমাদের ব্যাটেলিয়ন চারদিন পর এখান থেকে চলে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আমরা শাদী সম্পর্কে কি চিন্তা করতে পারি?'

ঃ 'মসিয়েঁ লালীকে আমি বলে দেবো, যেনো শাদীর জন্য তিনি আপনাকে খুব

শীগ্‌গিরই ছুটি দিয়ে দেন। জিনের সম্পর্কে আপনার পেরেশানীর কারণ নেই। আম্মাজান আপনার অনুপস্থিতিতে ওঁকে দেখাশোনা করবেন। মাত্র এক সপ্তাহ এখানে থাকার ছুটি মিলেছে আমার। এরপর আমায় মালাবার অথবা উত্তর সীমান্তের কোনো কেল্লার হেফাযতের জন্য পাঠানো হবে।'

লা গ্রাঁদ প্রশ্ন করলেনঃ 'আপনি বলছিলেন, আপনি আপনার জায়গায় অপর কোনো অফিসারের ইন্তেযার না করেই চলে এসেছেন পন্ডিচেরী থেকে। সিপাহ্‌সালার তার জন্য অসন্তুষ্ট হননি তো?'

ঃ 'তিনি খুবই রেগে গিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার ও জিনের কাহিনী শুনিয়ে আমি তাঁর রাগ দূর করেছি।' আমায় বিদায় দেবার সময়ে তিনি বললেনঃ 'আনওয়ার আলী, তোমার উপর আমি খুবই রেগে গিয়েছিলাম। আমার কোনো অফিসারের এরূপ ত্রুটি আমি বরদাশত করি না, কিন্তু যদি তুমি সেই অসহায়া যুবতীর সাহায্য করতে ত্রুটি করতে, তা' হলে আমি আরো বেশী রেগে যেতাম। তুমি মহীশূরের সিপাহীর সাহায্য করেছো। আমি তোমায় প্রশংসার যোগ্য মনে করি।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'এবার আপনারও আরামের প্রয়োজন। আমায় এজাযত দিন। আমি কাল আবার দেখা করবো।'

আনওয়ার আলী উঠে বললেনঃ 'চলুন, আপনাকে দরযা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'

কিছুক্ষণ পর দু'জন দেউড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালেন। লা গ্রাঁদ মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেনঃ 'মসিয়েঁ, আমি আপনার শোকরগুযারী করছি।'

আনওয়ার আলী তাঁর সাথে হাত মিলিয়ে চাঁদের আলোয় তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। লা গ্রাঁদের চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত। তিনি বললেনঃ 'লা গ্রাঁদ, তুমি আমার দোস্ত। আমি তো তোমার কোনো উপকার করিনি।

চার

বিলকিস তাঁর মেয়েদের ও গাঁয়ের কিছুসংখ্যক মহিলার সাথে গৃহের এক প্রশস্ত কামরায় উপবিষ্ট। খাদেমা ভিতরে উঁকি মেরে বললোঃ 'বিবিজী, খান সাহেব আপনাকে ডাকছেন।'

বিলকিস উঠে কামরার বাইরে গেলেন এবং খাদেমা দেউড়ির কাছের এক কামরার দিকে ইশারা করে বললোঃ 'খান সাহেব ওখানে আছেন আর তাঁর সাথে একজন মেহমানও রয়েছেন।'

বিলকিস বিস্তীর্ণ প্রাংগণ পার হয়ে কামরার দরযার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্য উঁকি মেরে পেরেশান হয়ে এক পাশে সরে গেলেন। কামরা থেকে আকবর খানের আওয়ায শোনা গেলোঃ 'বিলকিস, ভিতরে এসো, এ যে আমাদের

মুরাদ আলী।' বিলকিসের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তিনি অন্তরে এক অপূর্ব খুশীর কম্পন অনুভব করে কামরায় প্রবেশ করলেন। মুরাদ আলী তাঁকে সালাম করে আদবের সাথে কুরসি ছেড়ে দাঁড়ালেন। চেষ্টা সত্ত্বেও বিলকিস মুখে কোনো কথা বলতে পারলেন না। একটুখানি দ্বিধা করার পর তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে কম্পিত হাত দু'খানি তাঁর মাথায় রাখলেন। তাঁর চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কাঁপা গলায় তিনি বললেনঃ 'মুরাদ তুমি একা এসেছো?'

ঃ 'হাঁ, চাচীজান! ভাইজান আনওয়ার আলী বাইরে ছিলেন। তিনি ছুটি পাননি।' বিলকিস বললেনঃ 'আমার ধারণা ছিলো, তোমার আম্মাজান অবশ্যি আসবেন।'

ঃ 'চাচীজান, তিনি আসার জন্য তৈরী ছিলেন, কিন্তু তাঁর শরীর দীর্ঘ সফর করার মতো সুস্থ নয়। শাহ্বাযের শাদীর সময়ে তিনি অবশ্যি আসবেন, বলছিলেন।'

আকবর খান বিলকিসকে বসতে বললে তিনি এক কুরসীতে বসলেন। একটি ছোট্ট মেয়ে ছুটতে ছুটতে কামরায় ঢুকলো, কিন্তু মুরাদ আলীকে দেখে সে সংকুচিত হয়ে একদিকে সরে দাঁড়ালো। সে আকবর খানের কুরসীর পেছনে পালাবার চেষ্টা করলো।

আকবর খান সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেনঃ 'সামিনা! এ তোমার সেরিংগাপটমের ভাই মুরাদ আলী। উনি অতদূর থেকে তোমাদের দেখতে এসেছেন আর তুমি ওঁকে সালামও করলে না!

সামিনার চোখ দু'টি আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো। সালাম করে সে বিস্ফোরিত চোখে মুরাদ আলীর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর সে ধীরে ধীরে দরযার দিকে এগিয়ে বাইরে গিয়ে দিলো এক ছুট। দেখতে দেখতে সে আঙিনা পার হয়ে গিয়ে ঢুকলো আর এক কামরায়। তার বড় বোন তানবীর বসেছিলো সখীদের মাঝখানে। সামিনা হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে বোনের গলা ধরে ঝুলে পড়লো। সে তার মুখখানা তানবীরের কানের কাছে নিয়ে গেলো। তানবীর তাকে একদিকে সরিয়ে দিয়ে বললোঃ 'পাগলী ! আমি কিছুই বুঝি না তোমার কান্ডকারখানা! মানুষের মতো কথা বলো।'

সামিনা আবার তার কানের কাছে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললোঃ উনি' এসেছেন, আপাজান!'

ঃ 'কে এসেছেন ?' একটি মেয়ে বললোঃ

আর একজন বললোঃ 'আরে, সামিনা বলছে, বরাতওয়ালা এসে গেছেন।' কামরা তানবীরের সখীদের কলহাস্যে মুখর হয়ে উঠলো। একটি মেয়ে সামিনার হাত ধরে বললোঃ 'ওহে সামিনা, সত্যি করে বলো, কে এসেছেন।'

কিন্তু সামিনা চট করে 'হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তানবীরকে লক্ষ্য করে বললো ঃ শেরিংগাপটমের ভাইজান মুরাদ আলী এসে গেছেন।'

তানবীর হাসি সংযত করতে না পেরে সামিনার হাত ধরে টেনে কাছে বসালো।

অপর কামরায় আকবর খান ও বিলকিস কিছুক্ষণ মুরাদ আলীর সাথে আলাপে

কাটালেন। অবশেষে আকবর খান উঠে বললেনঃ 'আমি একটু সময় বাইরের মেহমানদের দেখে আসি।'

বিলকিস বললেনঃ 'মামুজানকে দেওয়ানখানা থেকে এখানে পাঠিয়ে দিন। তিনি বড়োই অস্থির হয়ে ওর ইন্তেযার করছিলেন।'

আকবর খান জওয়াব দিলেনঃ 'আসামাত্রই মামুজানের সাথে ওর মোলাকাত হয়ে গেছে।'

মুরাদ আলী বললেনঃ 'চাচাজান, ভাই শাহ্‌বায কোথায়?'

ঃ 'সে বাইরে খিমা পাতছে। আমি এক্ষুণি তাকে পাঠাচ্ছি।'

মুরাদ আলী উঠে বললেনঃ 'চাচাজান, আমিও আপনার সাথে যাচ্ছি। 'তারপর তিনি এগিয়ে গিয়ে দরযার কাছে রাখা রেশমী কাপড়ের গাঠ্‌রি তুলে বিলকিসের কাছে এক কুরসীর উপর রেখে বললেনঃ 'চাচীজান এই ক'টি জিনিস আম্মাজান পাঠিয়েছেন।'

আকবর খান বললেনঃ 'দেখো বেটা, এ গাঠ্‌রি তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি বারবার তাঁকে বলেছি, যেনো তিনি তক্‌লীফ না করেন।'

মুরাদ আলী বললেনঃ 'তিনি আপনার জন্য তো কোনো তক্‌লীফ করেন নি, চাচাজান ! তিনি বলছিলেন, তানবীর ও সামিনা তাঁর কাছে নিজের সন্তানের চাইতেও প্রিয়। তিনি এও জানেন যে, খোদা আপনাকে সব কিছুই দিয়েছেন, কিন্তু আপনি যদি আপনার ছেলেমেয়েদের জন্য তাঁর তোহ্‌ফা কবুল না করেন, তা'হলে তাঁর বহুত তক্‌লীফ হবে। আপনি আমাদেরকে বুঝতে দেবেন না যে, আব্বাজানের ওফাতের পর আমাদের কোনো যোগ্যতাই নেই।'

মুরাদ আলীর কথাগুলো ছুরির মতো আকবর খানের অন্তরে বিদ্ধ হতে লাগলো। ভারাক্রান্ত আওয়াযে তিনি বললেনঃ 'বেটা, ও কথা বলো না। তোমাদের তরফ থেকে যে কোনো সামান জিনিস আমার কাছে দুনিয়ার ধনভান্ডারের চাইতেও বেশী মূল্যবান।'

তাঁরা বাইরে বেরিয়ে গেলে বিলকিস কিছুক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় থেকে গাঠ্‌ড়ি খুললেন। গাঠ্‌ড়িতে রেশী ও জড়ির কাপড় ছাড়া আরো ছিলো চন্দন কাঠের একটি ছোট বাক্স। বিলকিস বাক্সের ঢাকনা খুলে দেখলেন, তার ভিতরে রয়েছে মোতির হার, সোনার কংকণ ও বালা-সবগুলোই হীরকখচিত। এসব যেওর ছাড়া তা'তে রয়েছে ফরহাতের হাতের লেখা একখানা চিঠিঃ

প্রিয় ভগ্নী,

আমার আশা, তুমি আমার এ মামুলী তোহ্‌ফা ক'টি কবুল করবে। জড়ির কাপড়ের জোড়াটি সামিনার জন্য। বাকীগুলো তানবীরের। কতোদিন আমি যিন্দাহ থাকবো, খোদাই জানেন। তাই আমি দু'বোনের জন্য কয়েকটি যেওর পাঠাচ্ছি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের খুশীতে শরীক হতে না পেরে দুঃখিত, কিন্তু প্রতি মূহূর্তে আমার দোআ থাকবে তোমাদের জন্য।

তোমার বোন।

সামিনা কামরায় ঢুকে বললোঃ 'আম্মাজান, উনি কোথায় গেলেন?'

বিলকিস হাসিমুখে জওয়াব দিলেনঃ 'বাইরে গেছেন, বেটী!'

সামিনা বাক্সে হাত দিয়ে একটি মোতির হার বের করে প্রশ্ন করলঃ 'আম্মাজান, এটা আপার জন্য ?'

ঃ 'হ্যাঁ বেটী ! এগুলো তোমার সেরিংগাপটমের ভাই নিয়ে এসেছেন। তোমার জন্যও এনেছেন অনেক যেওর। দেখো........।'

ঃ 'আমার জন্য কাপড়ও এনেছেন।'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'হারও?

ঃ 'হ্যাঁ, তোমার জন্য কংকণ, বালা আর আংটিও এনেছেন।'

সামিনা অভিযোগের স্বরে বললোঃ 'কিন্তু শাহবায ভাইয়া তো আমার জন্য কখনো কিছু আনেন না। উলটো আমায় শাসন করেন। এবার আমায় কিছু বললে আমি এখানে থাকবো না।'

কোথায় যাবে তুমি?' ঃ বিলকিস হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'কেন? সেরিংগাপটম যাবো।' বলতে বলতে সামিনা মোতির হারটি গলায় পরলো।

বিলকিস বললেনঃ 'সেরিংগাপটমেও যদি কেউ শাসন করেন, তাঁ' হলে?'

ঃ 'তা হলে ওখানেও থাকবো না। আধুনীতে খালাজানের কাছে চলে যাবো।'

বিলকিস তাকে এরপরও বললেনঃ 'কিন্তু যদি তাঁরা আসতে না দেন?'

ঃ 'কি করে ঠেকাবেন শুনি? আমি ওঁদের বরতন ভেঙে দেবো। বলবো যে, আমি ছাতে উঠে লাফিয়ে পড়বো আর ওঁরা হাতজোড় করে বিদায় করবেন আমায়।'

আকবর খানের বস্তিতে পৌঁছবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে মুরাদ আলীর মন থেকে অপরিচয়ের অনুভূতি কেটে গেলো। সেখানকার কতো লোকের অন্তরে আজো তার পিতার স্মৃতি অংকিত রয়েছে। তাঁরা তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে অতীতের যে সব কাহিনী শোনান, তা'তে রোহিলা সওয়ারদের সাথে মোয়ায্যম আলীর কথাও ওঠে। তাঁর রূপ-আকৃতি, তাঁর শৌর্য-সাহস হয়ে রয়েছে তাঁদের লোকগীতি ও লোককাহিনীর স্থায়ী বিষয়বস্তু। আকবর খানের মুখে যেদিন তাঁর শাহাদতের খবর তাঁরা শুনেছিলেন, সেদিন তাঁরা অনুভব করেছিলেন, যেনো তাঁদের প্রিয়তম স্বজন বিদায় নিয়েছেন

দুনিয়া থেকে।

এই লোকদের কাছে মোয়ায্‌যম আলীর পুত্রের আগমন মামুলী ঘটনা নয়। শিশু, জোয়ান আর বুড়ো তাকিয়ে থাকে মুরাদ আলীর পথের পানে। বাইরে বেরিয়ে এলে অনুরাগীদের দল এসে ভিড় জমায় তাঁর পাশে। তাঁর পিতাকে যাঁরা চোখে দেখেছেন, তাঁরা বলেন, তাঁর আকৃতি, চালচলন ও কথা বলার ভংগী বাপেরই মতো।

আকবর খানের পুত্র শাহ্‌বায খান প্রথম সাক্ষাতেই তার সাথে ভাব জমিয়ে ফেলেছেন। শাহ্‌বায বলিষ্ঠ গঠনের সুদর্শন নওজোয়ান। সরদারের ছেলে বলে গোষ্ঠীর লোকদের কাছে তাঁর মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট। আশপাশের বস্তির লোক তাঁকে মানে শ্রেষ্ঠ সওয়ার ও নিশানাবায বলে। কিন্তু তাঁর এসব গুণও মুরাদ আলীর মনে দাগ কাটবার মতো যথেষ্ট নয়। প্রথম দেখাতেই তিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও শিক্ষাগত যোগ্যতার তেমন কোনো পরিচয় দিতে পারেননি মুরাদ আলীর কাছে। তাঁর সাথে পরিচিত হয়েই তিনি বাড়ির বাইরের দিকে তাঁর শিকার করা বাঘ ও চিতার চামড়া সাজানো কামরাটি দেখালেন। তারপর উঠলো ভালো জাতের ঘোড়ার কথা। তিনি তাঁকে নিয়ে গেলেন আস্তাবলে ঘোড়া দেখাতে। তারপর কিছুক্ষণ কেটে গেলে যখন গাঁয়ের লোক মুরাদ আলীর সাথে আলোচনা শুরু করলো, তখন শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি শাহ্‌বাযের মন থেকে ধীরে ধীরে উবে যেতে লাগলো। পরদিন থেকে মুরাদ আলী হয়ে উঠলেন বস্তির প্রত্যেক বৈঠকেরই আলোচনার বিষয়বস্তু। সাধারণ অবস্থায় মেহ্‌মানের সমাদরে শাহ্‌বাযের খুশী হওয়াই উচিত ছিলো, কিন্তু তাঁর এই ক্ষুদ্র রাজ্যে অপর কোনো বাদশার আবির্ভাব তাঁর কাছে ভালো লাগলো না। এক শ্রেষ্ঠ সওয়ার, এক যোগ্যতম নিশানাবায, এক নির্ভীক শিকারী, এক সফল জমিদার হওয়া ছাড়াও তাঁর যিন্দেগীর সব চাইতে বড়ো আশ্বাস ছিলো এই যে, গোষ্ঠীর ভিতরে তাঁর বাপকে বাদ দিয়ে তাঁরই ছিলো সব চাইতে বেশী ইয্‌যত ও সম্মান। কিন্তু এবার তাঁর মনে হতে লাগলো, এই অল্পবয়স্ক বালক বস্তিতে পা দিয়েই হয়ে উঠেছেন যে কোনো বৈঠকের সভা-দীপ। তাঁর মানসিক উদ্বেগ তখনই সব চাইতে বেড়ে গেলো, যখন মুরাদ আলী শেখ ফখরুদ্দীনের সাথে মহীশূর, দাক্ষিণাত্য, পুণা ও কর্ণাটকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন এবং তাঁর বাপও পূর্ণ নিবিষ্টচিত্তে তাঁর আলোচনা শুনতে থাকলেন।

বৈঠক ভেঙে যাবার পর যখন নির্জনে মুরাদ আলীর সাথে কথা বলার মওকা জুটলো, তখন শাহ্‌বায বললেনঃ 'মুরাদ, তুমি খুবই খোশ-কিসমত। এই বয়সে তুমি এতো কিছু শিখেছো। আমার শিক্ষা অপূর্ণ রয়েছে, তার জন্য আমি দুঃখিত। গাঁয়ের মওলবী আমায় শুধু কয়েকটি কিতাব পড়িয়েছিলেন। আম্মাজান আমায় হায়দরাবাদে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঘর ছেড়ে যেতে আমি রাযী হলাম না। আমার হায়দরাবাদ যাওয়া আব্বাজানের কাছেও ভালো লাগেনি। তারপর আমি বড়ো হলে খালুজান এখানে এসে বিশেষ করে ধরলেন, যেনো আমি আধুনীর ফউজে শামিল হই। তিনি বলছিলেন যে, সেখানে শীগ্‌গিরই আমার তরক্কী হবে।

কিন্তু আব্বাজান আধুনীর ফউজের নাম শুনতেও রাযী ছিলেন না। তিনি বরং খালুজানকে বুঝালেন, যেনো তিনি তাঁর ছেলেকে সিপাহী না বানিয়ে আর কোনো ভালো কাজে লাগান। এখন আমার খালুর ছেলে হাশিম বেগ দু'শো সওয়ারের সরদার হয়ে গেছে আর আমি এখানেই রয়েছি। খালুজান এখানে এলেই আব্বাজানকে বলেনঃ 'তুমি নিজের ছেলের উপর যুলুম করেছো। ওকে ফউজে ভর্তি করলে ও আধুনীর সকল নওজোয়ানের আগে বেরিয়ে যেতে পারতো।'

মুরাদ আলী বললেনঃ 'আপনার সিপাহী হবার শখ রয়েছে?'

শাহ্বায জওয়াব দিলেনঃ 'ঘোড়দৌড় ও শিকার ছাড়া কোনো কিছুর শখ নেই আমার। কিন্তু আধুনী থেকে কোনো স্বজন এলেই প্রথম প্রশ্ন ওঠে, কেন আমি ফাউজে ভর্তি হলাম না এবং আমি অনুভব করি, যেনো তারা আমায় বুয্দীল বলে গাল দিচ্ছে।'

মুরাদ আলী হেসে বললেনঃ 'আধুনীর ফউজে ভর্তি হলেই কোনো লোক বাহাদুর হয় না। বাহাদুর হয় তারাই, যারা কোনো আদর্শের জন্য লড়াই করে। চাচাজান বহুবছর আগে সিপাহীর লেবাস ছেড়েছেন, কিন্তু আধুনী বা হায়দরাবাদের কোনো লোক তাঁর চাইতে বেশী বাহাদুরীর দাবি করতে পারে না।'

শাহ্বায খান আশ্বস্ত হয়ে বললেনঃ 'আমার ধারণা হয়েছিলো যে, হাশিম বেগের মতো তুমিও হয়তো মনে করবে যে, আমি দুর্বল বলেই ফউজে শামিল হইনি।'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেনঃ 'না, ভাইজান! আপনার সম্পর্কে আমি কোনো খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারি না এবং হাশিম বেগ কি লক্ষ্য নিয়ে তলোয়ার ধরেছেন, তা' যদি তিনি চিন্তা করতেন, তা'হলে আপনার বস্তির যে কোনো মামুলী কিষাণের যিন্দেগীই তাঁর কাছে ঈর্ষার বস্তু হত। আমায় যদি কেউ প্রশ্ন করেন, আমি আধুনীর ফউজের সিপাহ্সালার হতে চাই, না মহীশূরের বস্তির এক নাম-না-জানা কিষাণের যিন্দেগী যাপন করতে চাই, তা'হলে আমি কিষাণের যিন্দেগীকেই প্রাধান্য দেবো।'

মুরাদ আলীর এ কথা শাহ্বায খানের ভালো লাগলো না। কিন্তু ফউজের উচ্চপদস্থ কর্মচারী না হওয়া সত্ত্বেও মোয়ায্যম আলীর পুত্র তাঁকে সম্মানের পাত্র মনে করেন, এতেই তার মনে জাগছিলো এক ধরনের আশ্বাস।

তানবীরের বরাত আসার পাঁচদিন আগে মুরাদ আলী সেখানে আসেন। এই পাঁচদিন তাঁর জীবনের এক অবিস্মরণীয় অংশ হয়ে থাকলো। ঘরের ভিতরে ছোট মেয়ে সামিনা তাঁর সাথে থাকে ছায়ার মতো। তানবীর তাঁর কাছ থেকে পর্দায় থাকে, কিন্তু বিলকিস যখন কমবেশী করে অবসর পান, তখন তাঁকে ডেকে নেন নিজের কাছে এবং শুরু করেন অতীত দিনের আলোচনা।

একদিন ভোরে তানবীর দুই সখীর সাথে এক কামরায় বসেছিলো। সামিনা এসে কামরায় প্রবেশ করলো। দুষ্ট হাসি হেসে তানবীর তার দিকে তাকিয়ে বললোঃ 'সামিনা, এ বলছে, তোমার সেরিংগাপটমের ভাইয়ের নাকটা নাকি চ্যাপ্টা।

ঃ কে বললো?' সামিনা গযবের স্বরে বললো।

ঃ 'আমি বলছি।' সামিনার সখী জওয়াব দিলোঃ 'আমি আরো বলেছি যে, লোকটির মাথাভরা টাক।'

দ্বিতীয় সখী বললোঃ 'আমিও তাঁকে দেখেছি। লোকটির গায়ের রং বিলকুল কালো।'

ঃ 'আচ্ছা, দাঁড়াও।' বলে সামিনা পর্দা সরিয়ে রেখে মুখ ভার করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো। তানবীর বললোঃ 'এবার ও গিয়ে আম্মাজানের কাছে আমাদের নামে নালিশ করবে।'

কয়েক মিনিট পর তানবীরের এক সখী আঙিনার দিকে তাকিয়ে ভীত হয়ে বললোঃ 'তানবীর! দুষ্টু মেয়েটা ওঁকে এদিকে নিয়ে আসছে।'

তানবীর পর্দার আড়াল থেকে তাকিয়ে আঙিনার দিকে দেখলো, সামিনা মুরাদ আলীর হাত ধরে দরযার কাছে পৌছে গেছে। তাঁকে সে বলছেঃ 'ভাইজান, আমি মিছে কথা বলেছি। আম্মাজান আপনাকে ডাকেন নি। আপনি এখানে একটুখানি দাঁড়ান। আমি এক্ষুণি আসছি।'

মুরাদ আলীকে দ্বিধা ও পেরেশানীর মধ্যে ফেলে সে এবার কামরায় ঢুকে বললোঃ 'এবার ভালো করে দেখে নাও।'

তানবীর একহাতে তার গর্দান চেপে ধরে, অপর হাতে তার মুখ চেপে বললোঃ 'সামিনা, খোদার দিকে চেয়ে একটু শরম করো। ওঁকে বাইরে নিয়ে যাও। নইলে আজ তোমায় খুব করে পিটবো।'

তানবীরের এক সখী বললোঃ 'যাও, সামিনা, আমরা তোমার সাথে ঠাট্টা করছিলাম। তোমার ভাই খুব সুশ্রী।'

সামিনা তানবীরের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বললোঃ 'আর কোনোদিন তো বলবেন না, ওঁর নাক চ্যাপ্টা।'

ঃ 'খোদার কসম, কক্ষণো না।'

সামিনা বিজয়ের হাসি হেসে কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুরাদ আলীর হাত ধরে বললোঃ 'আসুন, ভাইজান!

ঃ 'ব্যাপার কি, সামিনা?' আঙিনার বাইরে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'কিছু না, ভাইজান ! ওঁরা ঠাট্টা করছিলেন।'

ঃ 'কারা ঠাট্টা করছিলেনে?'

ঃ 'আপাজানের সখীরা।'

ঃ 'কার সাথে?'

ঃ 'আমার সাথে।'

ঃ 'কিন্তু তুমি আমায় কেন বললে যে, আম্মাজান ডাকছেন।'

ঃ 'ওঁরা আপনাকে ভালো করে দেখে নেবেন, তাই।'

ঃ কারা?'

ঃ 'ওই যাঁরা বলছিলেন যেন আপনার নাক চ্যাপ্টা।'

ঃ 'কারা বলছিলেন?'

ঃ 'আপাজানের সখীরা।'

মুরাদ আলী তাঁর পেরেশানী সংযত করে বললেনঃ 'আর তোমার ধারণা আমার নাক চ্যাপ্টা নয়?' সামিনা থেমে তাঁর দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে হেসে বললোঃ 'মোটেই না।'



আকবর খানের প্রস্তুতি দেখে বোঝা যাচ্ছিলো যে, আধুনীর বরাত খুব ধুমধাম করে আসবে। বাড়ির সামনে এক খোলা ময়দানে খিমা ও শামিয়ানা পাতা হচ্ছিলো। আকবর খান ও শাহ্বায দিনভর শাদীর কার্যকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। বেকার বসে থাকা মুরাদ আলীর ভালো লাগে না। তিনি চান তাঁদের কাজে অংশ নিতে, কিন্তু বস্তির লোকেরা এসে বাধা দিয়ে বলেঃ 'না, না, আপনি মেহ্মান, এসব কাজের জন্য আমরা রয়েছি।' এসব লোক-দেখানো আয়োজন আকবর খান পসন্দ করতেন না, কিন্তু আধুনী থেকে তিনি বারংবার খবর পাচ্ছিলেন যে, বরাত খুব ধুমধাম করে আসবে। তিনি সহজ-সরল মানুষ হলেও কারুর মুখে এ কথা শুনতে রাযী ছিলেন না যে, মেয়ের বিয়ের আয়োজনে তিনি কার্পণ্য করেছেন। সুতরাং মেহ্মানদের অভ্যর্থনার জন্য তিনি সব রকম ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিলেন।

পঞ্চম দিন আকবর খানের গোষ্ঠীর লোক গাঁয়ের বাইরে জমা হয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলো বরাতের শাহী আড়ম্বর। ত্রিশটি হাতীর উপর দুলহা ও তাঁর খান্দান ছাড়া আধুনীর ওম্রাহ্ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সওয়ার হয়ে এসেছেন। হাতীর পিছনে প্রায় পাঁচশ ঘোড়সওয়ার আর তাদের পিছনে জিনিসপত্র বোঝাই বিশটি গাড়িসহ পদাতিক সিপাহী; নওকর ও খিমাবরদারের একটি দল চলে আসছে। বরাতের সাথে কতক লোক সানাই বাজাচ্ছে, আতশবাযরা গোলা ও হাওয়াই ছাড়ছে।

মেহ্মানের সংখ্যা এক হাজারের কাছাকাছি, কিন্তু আকবর খান থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছেন দু'হাজার লোকের জন্য। মুরাদ আলী জানতেন যে, দুলহার বাপ আধুনীর শাসক খান্দানের লোক। তাঁর কাছে বরাতের এ শান-শওকত অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। তবু তাঁর কাছে পীড়াদায়ক ব্যাপার ছিলো এই যে, মেহ্মানদের মধ্যে আধুনীর কিছুসংখ্যক সামন্ত মারাঠা সরদারও ছিলো। আকবর খান ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হয়ে শেখ ফখ্রুদ্দীদের কাছে বলছিলেনঃ 'শেখ সাহেব, এঁরা পাগল হয়ে গেছেন।

আমি জানতাম না যে, আমারই মেয়ের বরাতে এঁরা আমার কওমের নিকৃষ্টতম দুশমনদের নিয়ে আসবেন। মারাঠাদের সম্পর্কে আমার মনোভাব মীর্যা তাহির বেগের জানা ছিলো, কিন্তু তা' সত্ত্বেও তিনি এমনি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলেন।' শেখ ফখরুদ্দীন তাঁকে বুঝালেন ঃ 'বেটা! তুমি আধুনীর শাহী খান্দানের সাথে সম্পর্ক পাতিয়েছো। এরা আধুনীর সামন্ত, তুমি যদি তাহির বেগকে পয়গাম পাঠাতে, তা'হলে তিনি অবশ্যি তোমার মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন, কিন্তু এখন তোমার সংযত হয়ে থাকাই উচিত।'

বরাতের লোকেরা ঘোড়া ও হাতী থেকে নেমে বিস্তীর্ণ শামিয়ানার নীচে জমা হতে লাগলো। গাঁয়ের লোকেরা তাদের ঘোড়া ও হাতীর যথাস্থানে রাখার কাজে ব্যস্ত হল।

রাতের খানার শেষে মেহ্মানদের পদমর্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন খিমায় স্থান দেওয়া হল। দুল্হা, তাঁর খান্দানের বিশেষ বিশেষ লোক ও আধুনীর কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বাড়ির বাইরের ঘরগুলোতে রাখা হল। মুরাদ আলী দীর্ঘ সময় মেহ্মানদের আদর-আপ্যায়নে ব্যস্ত থাকলেন। অবশেষে তিনি শামিয়ানার নীচে পড়ে থাকা একটা চারপায়ীর উপর শুয়ে পড়লেন। আচানক তিনি শুনতে পেলেন শাহ্বায খানের আওয়ায। শাহ্বায তাঁর নাম ধরে ডাকছেন। তিনি জলদী উঠে জওয়াব দিলেনঃ 'ভাইজান, আমি এখানে। কি ব্যাপার?'

শাহ্বায তাঁর কাছে এসে বললেনঃ ঃ 'তুমি এখানে কি করছো? চলো, আব্বাজান তোমায় ডাকছেন।'

মুরাদ আলী তাঁর সাথে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বাড়ির বাইরের ঘরের এক কামরায় প্রবেশ করলেন। কামরার ভিতরে শেখ ফখ্রুদ্দনি শয্যার উপর শুয়েছিলেন এবং আকবর খান কাছেই এক চারপায়ীর উপর বসে আলাপ করছিলেন। তিনি মুরাদ আলীকে দেখেই বললেনঃ 'বেটা, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

ঃ 'চাচাজান, আমি বাইরে শামিয়ানার নীচে শুয়ে পড়েছিলাম।'

আকবর খান বললেনঃ 'তুমি ভেবেছো, আজ আমার ঘরে তোমার জায়গা নেই।'

ঃ 'না, চাচাজান! আমার ধারণা ছিলো, এখানে শুধু মেহ্মানদেরই থাকা উচিত হবে।'

ঃ 'আমার কাছে কোনো মেহ্মান তোমার চাইতে বড়ো নয়। তুমি এখানে আরাম করো।'

মুরাদ আলী কিছু না বলে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

পরদিন আকবর খানের পল্লীটি এক মেলায় রূপান্তরিত হল। মেহ্মানদের এক এক দল এক এক শামিয়ানার নীচে জমা হয়ে কাওয়ালী শুনছে। কোনো কোনো মেহ্মান খিমার ভিতরে বসে গল্প জুড়ে দিয়েছে, আবার কতক খোলা ময়দানে নেমে নেযাহ্বাযি ও নিশানাবাযির প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। দুল্হা ও তাঁর বাপ কতক বিশিষ্ট লোকসহ হাবেলীর চার দেওয়ালের ভিতরে এক শামিয়ানার নীচে উপবিষ্ট।

হাশিম বেগ এক সুদর্শন নওজোয়ান। দুল্‌হার লেবাসে তাঁকে মনে হয় এক শাহ্‌যাদা। তাঁর ডানদিকে শেখ ফখ্‌রুদ্দীন আকবর খান এবং বাম দিকে তাহির বেগ ও তাঁর খান্দানের কতিপয় বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি উপবিষ্ট। মুরাদ আলী হাশিম বেগের পিছনে এক কুরসীর উপর আসীন। দেশের অতীত ও বর্তমান ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং আধুনীর রাজনীতিক ও ফউজী অফিসাররা নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করছেন। তাঁদের একজন সুলতান টিপুর প্রসংগের অবতারণা করলে মুরাদ আলী মনে একটা অবাঞ্ছিত কম্পন অনুভব করলেন। অনতিকাল মধ্যে সুলতান টিপু হয়ে পড়লেন তাঁদের বিষাক্ত সমালোচনার লক্ষ্য।

আধুনীর এক সরদার বললেনঃ 'টিপু এ দেশের উদ্ধততম লোক। তিনি কাউকেও তাঁর সমকক্ষ মনে করেন না। নিজেকে তিনি মনে করেন হুযুর নিযামুল-মুলকের চাইতেও বড়ো।'

অপর একজন বললেনঃ 'টিপু হচ্ছেন এ দেশের জন্য সবচাইতে বড় বিপদের কারণ। তিনি আমাদের সভ্যতা ও ঐতিহ্যের নিকৃষ্টতম দুশমন। তিনি উঁচু-নীচুর বিভেদ মিটিয়ে দিতে চান, তাঁর দরবারে কুর্ণিশ অথবা ঝুঁকে সালাম করা নিষিদ্ধ। তাঁর সামনে নীচতম লোকেরও মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়ানো তিনি পসন্দ করেন না। ইসলামের দোহাই দিয়ে তিনি দেশের শরীফ লোকদের নীচ ও ভিখারীদের কাছে ছোট করে দিতে চান। মহীশূরে ছোটবড়ো সবাইকে একই স্তরে আনবার যে চেষ্টা তিনি শুরু করেছেন, তা' দেশের সকল শাসকের জন্যই হবে বিপজ্জনক। তিনি তাঁর তুচ্ছতম প্রজার মনেও এক নতুন অনুভূতি পয়দা করে দিয়েছেন এবং আমার ভয় হয়, আমাদের জনসাধারণও কোনো না-কোনো দিন মহীশূরের অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হবে। হয় আমরা তাদেরকে সমমর্যাদা দিতে বাধ্য হবো নইলে আমাদেরকে নিজস্ব অধিকার রক্ষার জন্য তাদের সাথে এক ধ্বংসকর যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করতে হবে।'

আধুনীর এক ফউজী অফিসার বললেনঃ 'টিপুর মতো অপরিণামদর্শী লোক আমাদের জন্য কি বিপদের কারণ হতে পারেন ? তিনি তো সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে রয়েছেন এবং দীর্ঘকাল ধরে তিনি যে তুফানকে দাওয়াত দিচ্ছেন, খুব শীগ্‌গিরই তা মহীশূর সীমান্তে আঘাত হানবে। এবার আমরা এবং আমাদের ইংরেজ ও মারাঠা মিত্ররা পুরানো ভুলের পুনরাবৃত্তি করবো না। এবার আমাদের প্রথম মন্‌যিল হবে সেরিংগাপটম।'

এক মারাঠা সরদার বললেনঃ 'তাঁর ফউজী শক্তিতে আমাদের কোনো বিপদের আশংকা নেই, কিন্তু আমার ভয় হয়, যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে অবিলম্বে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন না করি, তা'হলে কয়েক বছর পর আমাদেরকে পস্তাতে হবে। মহীশূরের যে সব শরীফ লোক আজ তাঁদের খান্দানী ইয্‌যত বাঁচানোর জন্য আমাদের পক্ষ সমর্থন করতে প্রস্তুত, তাঁরা একে একে দমিত হতে থাকবেন। যে টিপুকে কোনো কোনো লোক অপরিণামদর্শী মনে করেন, তিনি জানেন, কি করে প্রজাদের প্রীতিভাজন হওয়া যায়। আওয়ামের সন্তোষ হাসিল করার জন্য তিনি

সরকারী যমিনের উপর হাজারো পরিবারকে আবাদ করেছেন। যে সব অনাবাদী এলাকায় আনাজের একটি দানাও পয়দা হত না, সেখানে হেসে উঠছে শস্যশ্যামল ক্ষেত। লাখো মানুষকে তিনি লাগিয়ে দিয়েছেন কূপ ও খাল খনন করতে, সড়ক তৈরী করতে। তাই তারা তাঁকে ভালোবাসে দেবতার মতো। আমরা যদি এখনো নির্বিকার বসে থাকি, তা'হলে সেদিন সুদূর নয়, যেদিন আমাদেরকে মহীশূরের ফউজ ও আওয়ামের সম্মিলিত শক্তির মোকাবিলা করতে হবে।

মীর্যা তাহির বেগ আলোচনায় অংশ নিতে গিয়ে বললেনঃ 'আপনি এখনো মনে করছেন যে, আমরা নির্বিকার বসে রয়েছি। আমাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে আপনি বেখবর থাকতে পারেন না। আমরা শুধু হুকুমের ইন্তেযার করছি।'

আকবর খান অধীর অবস্থায় কুরসীর উপর বসে বারবার এপাশ ওপাশ করছিলেন। শেখ ফখরুদ্দীন বারবার তার কানের কাছে বলছিলেনঃ 'না, বেটা, সংযত হয়ে থাক। এখানে তোমার মুখ খোলা ঠিক হবেনা।'

মুরাদ আলীর মুখ জ্বলন্ত আগুনের মতো রক্তিম হয়ে উঠলো। তিনি আচানক উঠে চীৎকার করে বললেনঃ 'মীর্যা সাহেব, হুকুম বলতে যদি আপনি ইংরেজের হুকুম বুঝাতে চান, তা'হলে বেশীদিন আপনাদেরকে ইন্তেযার করতে হবে না। এই মাহ্ফিলে আমার মুখ খুলতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। আপনারা যাঁর মেহমান, তাঁকে আমি বাপের মতো ভক্তি করি।। কিন্তু আপনারা যাঁকে আলোচনার বিষয়বস্তু বানিয়েছেন, তাঁকে আমি মনে করি শুধু মহীশূরের নয়; বরং গোটা দেশের ইয্যত ও আযাদীর সর্বশেষ রক্ষক।'

মাহ্ফিলের উপর একটা শূন্যতা ছেয়ে গেলো। আধুনীর গর্বোদ্ধত ওমরাহ হয়রান, পেরেশান ও বিব্রত হয়ে তাকাতে লাগলেন সেই নওজোয়ানের দিকে, আজো যাঁর মুখে গোঁফের রেখা কালো হয়ে ওঠেনি। মুরাদ আলীর দৃষ্টি যেনো গোটা মাহ্ফিলকে দিচ্ছে যুদ্ধের আহ্বান। তিনি বললেনঃ 'সুলতান টিপু তাঁর দরবারে কুর্ণিশ বন্ধ করে দিয়েছেন, তার জন্য আপনাদের আপত্তি। যেসব লোক হুকুমতের আসনে বসে সমজাতীয় লোকদের ছোট করে দেখতে শিখেছেন, আপনারা সেই মুষ্টিমেয় লোকের দৃষ্টিভংগী নিয়ে সুলতান টিপুকে দেখছেন বলে আমি দুঃখিত। সুলতান টিপু একজন শাসক, কিন্তু শাসকের চাইতে বেশী করে তিনি মানুষ হিসেবে আত্মপরিচয় দেন এবং মানবতার অবমাননা করতে তিনি চান না। তিনি যিন্দেগীর আদব শিখেছেন সেই সর্বোত্তম কল্যাণবাহী মহামানবের কাছ থেকে, যিনি মিটিয়ে দিয়ে গেছেন কালা-ধলা উঁচু-নীচুর সকল পার্থক্য- যিনি হাবসী গোলামকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন কোরায়েশ খান্দানের বিশিষ্টতম ব্যক্তিদের সমপাংক্তেয় করে।

'আপনারা আপত্তি তুলছেন যে, সুলতান টিপু গোটা দুনিয়ার সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে চান, কিন্তু এ ব্যাপার সম্পর্কে আপনারা বেখবর থাকতে পারেন না যে, এই মুহূর্তে তাঁর দূত পুণা ও হায়দরাবাদের শাসকদের কাছে নিয়ে গেছেন শান্তি ও সম্প্রীতির দাওয়াত।

'আপনাদের অভিযোগ, তিনি তাঁর প্রজাদের মধ্যে অন্নহীন-বস্ত্রহীনদের জীবনে এনে দিতে চান স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য, মুক্ত করে দিতে চান তাদের সামনে আর্থিক স্বচ্ছলতার পথ এবং তার ফলে মিটে যাবে উঁচু-নীচুর পার্থক্য আর তা হবে আপনাদের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র; কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছিঃ এ হচ্ছে সেই মানবতার দুশমনদের ষড়যন্ত্রের জওয়াব, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদেরকে বঞ্চিত করে রেখেছে জন্মগত অধিকারে।

'আপনারা নিজেদের এবং ইংরেজ ও মারাঠা মিত্রদের ফউজী কুওত নিয়ে আত্মতৃপ্ত, কিন্তু আমি আপনাদেরকে নিশ্চিত বলে দিচ্ছিঃ আজকের মহীশূর তাদের শিকারভূমি নয়, যারা শিখেছে অন্নহীন, গৃহহীন-অসহায় মানুষকে পায়ের তলায় দলিত করতে; বরং মহীশূর হচ্ছে তাদের প্রতিরক্ষা দুর্গ, যারা শিখেছে ইয্যত ও আযাদীর আবহাওয়ায় বেঁচে থাকতে। সেখানে আপনাদের মোকাবিলা এমন কোনো শাসকের সাথে হবে না, যিনি প্রজাদের অস্থির উপর গড়ে তোলেন বিলাসের প্রাসাদ; বরং মোকাবিলা হবে এমন এক শাসকের সাথে, যিনি নিজের রক্ত ও ঘর্মের বিনিময়ে প্রতিপালন করে যাচ্ছেন তাঁর প্রজাসাধারণকে।

'আমি এ দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু বলতে পারি না, কিন্তু এ কথা আমি অবশ্যি বলবো যে, সুলতান টিপুর বিজয় হবে মানবতার এবং তাঁর পরাজয় হায়দরাবাদ অথবা পুণার সেনাবাহিনীর বিজয় নয়, বরং তা' হবে সেই লুণ্ঠনকারী পথদস্যুদের বিজয়-যারা সাত সমুদ্র পার হয়ে এসে এই দেশের ইয্যত ও আযাদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আজ আপনারা সুলতান টিপুকে মনে করছেন আপনাদের দুশমন, কিন্তু খোদা-না-খাস্তা, মহীশূরে যদি তাঁর পতাকা ধূলিলুণ্ঠিত হয়, তা'হলে সেদিন সুদূর নয়, যেদিন এদেশের সকল শাসককে বলতে হবে যে, তাঁরা যে মুজাহিদের মাথার তাজ কেড়ে এনে ইংরেজের পায়ে লুটিয়ে দিয়েছেন, তিনিই ছিলেন এ দেশের আযাদীর সর্বশেষ রক্ষক।'

মুরাদ আলী তার বক্তব্য শেষ করে ধীর পদক্ষেপে শামিয়ানার বাইরে চলে গেলেন। মাহ্ফিলের প্রশান্তি ভেঙে গেলো। পরস্পরের মধ্যে ফিস্ফিস্ আওয়ায ক্রমে উঁচু হতে লাগলোঃ 'কে এ লোকটি ? টিপুর চর কি করে এলো এখানে? ওর জিভ টেনে বের করে ফেলা উচিত।'

আকবর খান তাঁর কুরসী ছেড়ে উঠে বললেনঃ 'আপনারা যদি এ মাহ্ফিলে টিপুকে নিয়ে বিতর্ক না করতেন, তা'হলে এহেন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি পয়দা হত না। মুরাদ আলী সুলতান টিপুর সিপাহী। তাঁর বাপ ও ভাইরা টিপুর ঝান্ডার তলে দাঁড়িয়ে ইংরেজের সাথে লড়াই করে শহীদ হয়েছেন। তাঁর চাচা, দাদা, মামু ও নানা পলাশীর প্রান্তরে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এ প্রত্যাশা আমার ছিলো না যে, কোনো মাহ্ফিলের ভীতি বা শ্রদ্ধা তাঁকে কোনো অসত্য ভাষণ শুনতে বাধ্য করবে। সেরিংগাপটম, পুণা বা হায়দরাবাদের রাজনীতির সাথে আমার কোনো সংযোগ নেই। আমি আপনাদের আরয করবো, আপনারা এখানে আপনাদের সামরিক যোগ্যতা

দেখাতে আসেন নি, এসেছেন এক শাদী উপলক্ষে।'

আধুনীর এক সরদার বললেনঃ 'কিন্তু এই বালক আমাদেরকে অপমানিত করেছে। কালকের ছেলের মুখে এতো বড়ো কথা আমরা বরদাশত করতে পারি না।'

তাহির বেগের নিকটে উপবিষ্ট এক সুদর্শন বিশিষ্ট ব্যক্তি উঠে বললেনঃ 'ভাই, উনি আমাদেরকে অপমানিত করেন নি। উনি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, যে কোনো মাহ্‌ফিল যে কোনো আলোচনার স্থান নয়। এ নওজোয়ান যদি টিপুর সিপাহী হয়ে থাকেন, তা'হলে তাঁর শৌর্য-সাহসের প্রশংসা করা আমাদের উচিত। তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন এবং আধুনীর ফউজী অফিসারদের সামনে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এখন আমাদের অপর কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা উচিত।'

ইনি ছিলেন মীর নিযাম আলী খানের ভাতিজা ইম্‌তিয়াযুদ্দৌলা। তাঁর কথা সমাগত লোকদের কাছে ছিলো হুকুমেরই মতো।

মুরাদ আলী অন্তহীন উদ্বেগ ও পেরেশানী নিয়ে দেউড়ির বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। শাহ্‌বায খান বেরিয়ে তাঁর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেনঃ 'মুরাদ, তুমি ভালো করোনি।'

মুরাদ আলী দীলের মধ্যে একটা ঝট্‌কা অনুভব করলেন। আচানক কে যেনো পেছন থেকে হাত ধরে বলে উঠলোঃ 'আপনি আপাজানের শাদীর খোরমা খান নি?'

মুরাদ আলী ফিরে দেখলেন। সামিনা তার ঝোলা খুলে তাঁর সামনে এগিয়ে ধরলো। মুখে বললোঃ 'নিন।'

মুরাদ আলী হাসবার চেষ্টা করে একটি খোরমা তুলে নিলেন।

সামিনা বললোঃ 'না, আরো নিন। এসব আপনার জন্য। কিছু খেয়ে নিন। বাকী সেরিংগাপটম নিয়ে যাবেন।

মুরাদ আলী বললেনঃ 'সামিনা, এগুলো তুমি নিজের কাছে রাখ। এখানে থেকে যাবার সময়ে আমি নিয়ে যাবো।'

আকবর খান দেউড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। মুরাদ আলী মনে করলেন, এবার বুঝি তাঁকে একটা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু আকবর খানের মুখে ছিলো একটা অপ্রত্যাশিত হাসি। তিনি কাছে এসে সস্নেহে তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেনঃ 'মুরাদ, আমার ভয় হয়েছিলো যে, তুমি হয়তো ভুল বুঝেছো। শাহ্‌বাযকে আমি বাইরে আসতে দেখেছিলাম। সে কোনো আজেবাজে কথা বলেনি তো?'

মুরাদ আলীর চোখ অলক্ষ্যে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেনঃ 'চাচাজান, আমি বড়োই লজ্জিত। আমার মনোভাব সংযত করা উচিত ছিলো।'

আকবর খান তাঁকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেনঃ 'বেটা, তোমার কর্তব্য তুমি পালন করেছো। তোমায় নিয়ে আমি গর্ব অনুভব করি।'

ঃ 'কিন্তু চাচাজান, ওঁরা আপনার মেহমান।'

ঃ তুমি ওঁদের মাথা ঠিক করে দিয়েছো। ইম্‌তিয়াযুদ্দৌলা তোমার কথায় খুবই প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি নিযামের ভাতিজা এবং তিনি আলাদাভাবে তোমার সাথে মোলাকাতের আকাংখা জানিয়েছেন। চলো, তুমি গিয়ে তোমার কামরায় বসবে, আমি তাঁকে ওখানে নিয়ে আসছি।'

মুরাদ আলী ও আকবর খান পুনরায় হাবেলীর ভিতরে প্রবেশ করলেন। সামিনা সেখান থেকে ছুটে চলে গেলো। আকবর খান শামিয়ানার দিকে চলে গেলেন এবং মুরাদ আলী দেওয়ানখানার এক কামরায় ঢুকলেন। আধুনীর আমীরদের সামনে বক্তব্য পেশ করার পর নিযামের ভাতিজার সাথে মোলাকাতের কল্পনা করে তিনি মনে মনে উদ্বেগ বোধ করতে লাগলেন।

কয়েক মিনিট পরে আকবর খান ও ইমতিয়াযুদ্দৌলা কামরায় প্রবেশ করলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ইম্‌তিয়াযুদ্দৌলা মোসাফাহা করে তাঁর কাছে বসলে আকবর খানা বললেন ঃ 'এবার আপনারা নিশ্চিন্ত মনে আলাপ করুন।

আকবর খান বাইরে চলে গেলেন এবং ইম্‌তিয়াযুদ্দৌলা মুরাদ আলীকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'তোমার নাম মুরাদ আলী?'

ঃ 'জি হ্যাঁ।'

ঃ 'সুলতানের ফউজে তোমার পদ কি?'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'জনাব, ফউজী মক্তবের শিক্ষা শেষ করে আজকাল আমি ছুটি ভোগ করছি। এরপর কয়েক মাস আমার কোনো সেনাদলে ছোট অফিসার হিসাবে কাজ করতে হবে। তারপর আমায় যিম্মাদারীর যোগ্য মনে করা হলে কোনো ডিভিশনের পরিচালনার ভার দেওয়া হবে।'

ইম্‌তিয়াযুদ্দৌলা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন ঃ 'তোমার কথায় আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি এবং আমি তোমায় বলে দিতে চাই, আজকের মাহ্‌ফিলে তুমি যা শুনেছো, সুলতান টিপু সম্পর্কে দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেকটি মানুষের ধারণা তা' নয়। যাঁরা তাঁকে দোস্ত মনে করেন এবং দাক্ষিণাত্য ও মহীশূরের বর্তমান বিরোধকে যাঁরা ভবিষ্যতের জন্য কল্যাণকর মনে করেন না, এমন লোকও দাক্ষিণাত্যে রয়েছেন এবং আমিও তাঁদের অন্যতম। নিযামুল-মুল্‌ক ও সুলতান টিপুর মধ্যে এমন কোনো সাগরের ব্যবধান আমার নযরে পড়ে না, যা' দূর করা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন মহিশূর ও দাক্ষিণাত্যের এমন বাস্তববাদী, সুষ্ঠু ধারণাসম্পন্ন লোক, যাঁরা দক্ষিণ ভারতের মুসলমানদের সামগ্রিক সৌভাগ্যের জন্য উভয় হুকুমতের মধ্যে অনৈক্য দূর করবার অকৃত্রিম চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'এই যদি হয় আপনার ধারণা, তা হলে আপনার সাথে মোলাকাত আমি সৌভাগ্যের কারণ মনে করি। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, মহীশূরের প্রত্যেকটি সচেতন মানুষ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর মহীশূর ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে ঐক্যের জন্য দোআ করছে এবং সেখানে এমন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যিনি প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে শুধু দাক্ষিণাত্য ও মহীশূরের নয়; বরং গোটা হিন্দুস্তানের মুসলমানের জন্য দোআ করছেন। তিনি হচ্ছেন সুলতান টিপু।'

ইম্‌তিয়াযুদ্দৌলা বললেন ঃ 'হায়! আমিও যদি তোমার মতো পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিযামুল-মুল্‌ক সম্পর্কে কিছু বলতে পারতাম! আমাদের দুর্ভাগ্য যে, হুযুর নিযামুল-মূল্‌ক সুলতান টিপুকে মনে করেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী।

'তথাপি আমি হতাশ হইনি। আমার বিশ্বাস, একদিন সুলতান টিপু আমার মতো অসহায় মানুষদের মতোই হুযুর নিযামুল-মুলককে দেখাতে পারবেন নির্ভুল পথ। কুদরত যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে মনোনীত করেছেন, তা' অবশ্যি পূর্ণ হবে। যে পথের দিশারী তোমার মতো বয়সের নওজোয়ানের মধ্যে এই মনোভাব পয়দা করে দিতে পারেন, নিযামুল-মূল্‌ককে প্রভাবিত করতে তাঁর দেরী লাগবে না। আমি আন্তরিকভাবে দোআ করি, যেনো সুলতানের দূত নিযামুল-মুল্‌ককে ইংরেজ ও মারাঠার সাহচর্য থেকে আলাদা করতে সমর্থ হন।

'তুমি যখন এই মাহ্‌ফিলে কথা বলছিলে, তখন আমি অনুভব করছিলাম, খোদা-না-খাস্তা, যদি দাক্ষিণাত্য ও মহীশূরের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়, তা'হলে দাক্ষিণাত্যের লোক আমায় দেখতে পাবে নিযামের সিপাহীদের পুরোভাগে। তাঁর জন্য আমি লড়বো। আমি বুক পেতে গুলীর আঘাত বরণ করে নেবো। কিন্তু মৃত্যুর মুহূর্তেও সুলতান টিপুর পরাজয় কামনা আমি করতে পারবো না। আমার শেষ ইচ্ছে হবে, যেনো আমার বুকের খুনে লিখিত হয় দাক্ষিণাত্য ও মহীশূরের মধ্যে স্থায়ী ঐক্যের চুক্তিপত্র। আমি বারবার চিন্তা করি, আজ পর্যন্ত দক্ষিণ হিন্দুস্তানে এ দেশের বাসিন্দাদের যে রক্তধারা প্রবাহিত হয়েছে, তা' শুধু ফিরিংগী আধিপত্যেরই সহায়ক হয়েছে।'

মুরাদ আলী নির্বাক হয়ে ইম্‌তিয়াযুদ্দৌলার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর কথা শুনে তিনি মনে করছেন, যেনো তিনি অপর কাউকে লক্ষ্য না করে শুধু নিজেকেই কিছু বুঝাবার চেষ্টা করছেন।

শেখ ফখ্‌রুদ্দীন কামরায় ঢুকে বললেনঃ 'আমি মনে করেছিলাম, আপনি বুঝি বাইরে কাওয়ালী শুনছেন।'

ইম্‌তিয়াযুদ্দৌলা চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকিয়ে জওয়াব দিলেনঃ 'শেখ সাহেব, কাওয়ালী শোনার দিন এ নয়। আমি এই নওজোয়ানের সাথে কওমের বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম।'

শেখ ফখ্‌রুদ্দীন ফিরে দরযার দিকে যেতে যেতে বললেনঃ 'তা' হলে আমার এ মাহ্‌ফিলে শরীক হওয়া উচিত নয়। আমার ভবিষ্যতের মঞ্জিল খুব কাছে মনে হয় এবং আমি এখন অতীতের কথাই চিন্তা করছি।'

ইম্‌তিয়াযুদ্দৌলা বললেনঃ 'না, শেখ সাহেব, আপনি তশ্‌রীফ রাখুন। হয়তো অতীত সম্পর্কে আপনার কথা শুনে আমরা বর্তমান ও ভবিষ্যতের তিক্ততা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যাবো।'

শেখ ফখ্‌রুদ্দীন হেসে ইমতিয়াযুদ্দৌলার সামনে বসে বললেনঃ 'কিন্তু যদি আমার অতীত দিনের তিক্ততা আপনাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের তিক্ততার চাইতেও বেশী হয়, তা'হলে?'

ইমতিয়াযুদ্দৌলা হেসে বললেনঃ 'তা' হলে আমরা আপনার বুকের বোঝা হালকা করবার চেষ্টা করবো।'

শেখ ফখ্‌রুদ্দীন বললেনঃ 'জনাব, আমার তো মনে হয়, আমার বুকের মধ্যে দীল বলে কিছু নেই, নইলে কি করে সম্ভব হল যে, মোয়ায্‌যম আলীর মতো লোক দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, আর আমি এখনো এখানে হোঁচট খাচ্ছি ?'

ঃ 'মোয়ায্‌যম আলী কে ছিলেন?

ঃ 'মুরাদ আলীর ওয়ালেদ।'

ঃ 'আপনি তাঁকে জানতেন?'

ঃ 'জি হ্যাঁ। আমার ভবিষ্যতের কয়েকটি স্বপ্নসাধের অন্যতম হচ্ছে, যদি আল্লাহ্ পাক আমায় জান্নাতে প্রবেশের এজাযত দেন, তা'হলে যেনো একদিন সেই নওজোয়ানের দেখা পাই, যাঁর সাথে পরিচিত হওয়া ছিলো আমার জীবনের সর্বোত্তম সৌভাগ্য।'

ঃ 'আপনি কবে তাঁর দেখা পেয়েছিলেন?

ঃ 'আমাদের মোলাকাত হয়েছিলো তখন, যখন আমি আমার বোন-ভগ্নীদের নিয়ে দিল্লী থেকে হায়দরাবাদ আসছিলাম এবং পথে ডাকাতরা আমাদের কাফেলার উপর হামলা করেছিলো। তখন আমরা চারদিকে দেখছিলাম শুধু মৃত্যু আর মৃত্যু। আচানক কয়েকজন লোক আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁদের একজন ছিলেন মোয়ায্‌যম আলী, আর অপরজন আকবর খান। ডাকাতরা কতকগুলো লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে গেলো এবং আমি মোয়ায্‌যম আলী ও আকবর খানকে দেখে অনুভব করলাম, বুঝি খোদা আমাদের সাহায্যের জন্য ফেরেশ্‌তা পাঠিয়েছেন।'

মোয্‌যম আলী ও আকবর খানের ব্যক্তিত্ব হল এবার শেখ ফখরুদ্দীনের আলোচনার বিষয়বস্তু। মুরাদ ও ইমিতিয়াযুদ্দৌলা তাঁর কথায় অনুভব করতে লাগলেন এক মুগ্ধকর রঙিন কাহিনীর হৃদয়গ্রাহিতা।

শাহ্‌বায খান কামরায় প্রবেশ করে বললেনঃ 'জনাব, মেহ্‌মান দস্তরখানে আপনাদের ইন্তেযার করছেন।'

তাঁরা উঠে বেরিয়ে গেলেন। মুরাদ আলী দ্বিধাকুণ্ঠিত অবস্থায় ইমতিয়াযুদ্দৌলা ও ফখ্‌রুদ্দীনের পিছু পিছু চললেন। শাহ্‌বায মুরাদ আলীর হাত জড়িয়ে ধরে বললেনঃ 'মুরাদ, আমি আমার ব্যবহারের জন্য লজ্জিত। আব্বাজান আমার উপর খুব রাগ করেছেন। তোমার কাছে আমি মাফ চাই।'

মুরাদ আলীর মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো। তিনি জওয়াব দিলেনঃ 'আপনার মাফ চাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি অনুভব করছি যে, আপনাদের খাতিরে এ মাহ্‌ফিলে আমার মনোভাব সংযত করে রাখা উচিত ছিলো।'

ইমতিয়াযুদ্দৌলার সাথে মোলাকাতের পর মুরাদ আলীর মানসিক অশান্তি অনেকখানি দূর হয়ে গেলো। তবু আধুনীর বাকী মেহ্‌মানদের আচরণে তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর কথার তিক্ততা এখনো তাঁদের মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বিশেষ করে ফউজী অফিসাররা তাঁর সাথে আলাপ করতে অনিচ্ছুক। সাধারণ মেহ্‌মানদের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ নেই। কিন্তু তাহির বেগ ও হাশিম বেগের অস্বস্তি ছিলো তাঁর কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তিনি কয়েকবার তাঁদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিই ছিলো অত্যন্ত নিরুৎসাহব্যঞ্জক।

তাহির বেগ সম্পর্কে তিনি মনে করতে পারেন যে, তিনি এক প্রৌঢ় ব্যক্তি। তা'ছাড়া তিনি আধুনীর এক বড়ো জায়গীরদার ও ফউজের বড়ো অফিসার হিসেবেও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিন্তু হাশিমকে তিনি শাহ্‌বাযের মতোই এক ভাই বলে মনে করেন। আকবর খানের জামাতার কাছে তিনি প্রীতি ও আন্তরিকতার পরিচয় দেবার সুযোগটুকুও পেলেন না, তার জন্য তাঁর মন পীড়িত হচ্ছিলো। তিনি বারবার হাশিম বেগের দিকে তাকান আর মনে মনে বলেনঃ 'ভাই আমার! তুমি আকবর খানের জামাতা। এ কথা সত্যি যে, তুমি আধুনীতে পয়দা হয়েছো আর আমি চোখ খুলেছি সেরিংগাপটমে, কিন্তু আমরা একে অন্যের দুশমন হতে পারি না।'

পরদিন বরাত বিদায় হয়ে গেলো। শেখ ফখ্‌রুদ্দীন বরাতীদের সাথে আধুনী চলে গেলেন। মুরাদ আলীও ফিরে যাবার ইরাদা প্রকাশ করলেন, কিন্তু আকবর খান আরো দু'দিন তাঁকে কাছে রাখলেন। তৃতীয় দিন বিদায় বেলায় মনে হল, যেনো দীর্ঘকালে তিনি আকবর খানের গৃহে কাটিয়েছেন। বিলকিসের দোআ নিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরুলেন। আকবর খান, শাহ্‌বায ও সামিনা দরযা পর্যন্ত সাথে এলেন। দেউড়ির বাইরে গাঁয়ের কতক লোক তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য দন্ডায়মান। আকবর খান দু'জন নওজোয়ানকে হুকুম দিয়েছেন মহীশূর সীমান্ত পর্যন্ত তাঁর সাথে যেতে। তারাও ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দরযায়। আকবর খান, শাহ্‌বায ও গাঁয়ের লোকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সামিনার দিকে মনোযোগ দিতেই বালিকার চোখ দু'টি অলক্ষ্যে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তিনি সামিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

সামিনার মুখে কথা ফুটলো না। কিন্তু তিনি যখন ঘোড়ায় সওয়ার হলেন, তখন সামিনা এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ার রেকার ধরে বললোঃ 'আমি সেই খোরমা ও মিঠাই রেখেছি আপনার থলের মধ্যে।'

পাঁচ

ফরহাতের গৃহের যে কামরাটিতে তাঁর স্বামী ও পুত্রদের স্মরণচিহ্ন সাজিয়ে রাখা হয়েছিলো, জিন একদিন সেই কামরাটির দেখাশুনা করতে গেলেন। দেওয়ালে টাঙানো একখানা তলোয়ারের খুবসুরত হাতল কিছুটা ধুলিমলিন। জিন সামনের কামরা থেকে এক টুকরা কাপড় নিয়ে এলেন। তারপর তিনি একে একে ক'টি জিনিসের সাফাই শুরু করলেন। তলোয়ার, বন্দুক ও অন্যান্য হাতিয়ারের ধূলো ঝাড়ার পর তিনি এক আলমারী খুলে শুরু করলেন কিতাব-পত্র সাফ করতে।

ফরহাত কামরায় প্রবেশ করে বললেনঃ 'বেটী, তুমি এখানে কি করছো? ভিতরে গরম। এসো, বাইরে বসবে।'

জিন দু'তিনটি শব্দের বেশী বুঝতে পারলেন না এবং একখানা কিতাবের ধূলো ঝেড়ে আলমারীতে রাখতে রাখতে ফরহাতকে ফরাসী ভাষায় কিছু বুঝাবার চেষ্ট করলেন।

ফরহাত বললেনঃ 'হায় ! আমি যদি তোমার ভাষা বুঝতে পারতাম। এই দেখো, আনওয়ার আলীর চিঠি এসেছে। বুঝলে? আনওয়ার আলীর চিঠি।

ফরহাতের হাতে কাগজ দেখে ও আনওয়ার আলীর নাম শুনে জিনের বুঝতে অসুবিধা হল না যে, তিনি চিঠি সম্পর্কেই কিছু বলছেন। তিনি কাগজটা হাতে নিয়ে বললেনঃ 'আনওয়ার আলী------?

'আনওয়ার আলীর চিঠি।' ঃ বলে ফরহাত তাঁর কথাটি পুরো করে দিলেন।

জিন 'আনওয়ার আলীর চিঠি' কথাটি উচ্চারণ করে হেসে ফেললেন।

ফরহাত তাঁর বাহু জড়িয়ে ধরে বললেনঃ 'আহা ! এতে কি লেখা আছে, তা' যদি আমি তোমায় বুঝাতে পারতাম। চলো, বাইরে বসি, এখানে বড়ো গরম।'

জিন কিছু না বুঝেই তাঁর সাথে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁরা এক গাছের নীচে একটি ঢিবির উপর বসলেন। মুরাদ আলী বাইরের দরযা দিয়ে এসে দেখা দিলেন। তাঁদের কাছে এসে তিনি বললেনঃ 'আম্মাজান, আমি একটা জরুরী খবর নিয়ে এসেছি। আমাদের ফউজ পরশু এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে।' তারপর জিনকে লক্ষ্য করে ফরাসী ভাষায় বললেনঃ 'আমি আম্মাজানকে খবর দিলাম যে, আমাদের ফউজ পরশু এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাচ্ছে। আপনার জন্যও আমি একটি খোশখবর এনেছি। লা গ্রাঁদ দেওয়ানখানায় আপনার জন্য ইন্তেযার করছে।'

জিন হয়রান হয়ে বললেনঃ 'তিনি এসে গেছেন? কিন্তু আমায় তো তিনি কোনো খবর দেন নি। তিনি যে সেরিংগাপটম আসবেন, আগের চিঠিতে তো সে কথা ছিলো না।'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেনঃ 'ওঁদের ফউজ উত্তরদিকে যাচ্ছে আর উনি এক হফতার ছুটি নিয়ে এসেছেন। পথে আমার সাথে ওঁর দেখা।'

আনওয়ার আলীর চিঠিখানা এতক্ষণ জিনের হাতে ছিলো। মুরাদ আলীর দিকে চিঠিখানা এগিয়ে ধরে তিনি বললেনঃ 'এই যে তোমার ভাইয়ের চিঠি।'

মুরাদ আলী কাগজখানা হাতে নিয়ে মাকে বললেনঃ 'আম্মাজান, এ চিঠি কখন এলো?'

ঃ 'এক্ষুণি এলো, বেটা! আমার সব চাইতে বড়ো পেরেশানী, তোমাদের অনুপস্থিতিতে আমি জিনের সাথে কথা বলতে পারি না। চিঠিখানা পড়ে ওঁকে শুনিয়ে দাও।'

মুরাদ আলী চিঠি খুলে দেখলেন এবং জিনের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ আপনি লা গ্রাঁদের সাথে দেখা করে আসুন। তারপর ভাইজানের চিঠি আমি আপনাকে পড়ে শোনাবো।'

ঃ' না, আমি এক্ষুণি শুনবো।'

মুরাদ আলী আনওয়ার আলীর চিঠির ফরাসী তরজমা শুনাতে শুরু করলেন। চিঠিতে তিনি লিখেছেনঃ

'আম্মাজান, আমি ভালোই আছি। আশা করি, মুরাদ চাচা আকবর খানের সাহেবযাদীর শাদী থেকে ফিরে এসেছে। জিন আপনার সাথে বেশ হাসিখুশীতে রয়েছেন এবং তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে, জেনে আমি খুশী হয়েছি। আজ আমরা আমাদের কেন্দ্র থেকে উত্তর সীমান্তের দিকে যাচ্ছি। যুদ্ধের বিপদ-সম্ভাবনা খুব বেড়ে গেছে। আমার প্রতি মুহূর্তে আপনার দোআর প্রয়োজন।

'দীলাওয়ার খানের স্বাস্থ্য খারাব যাচ্ছে। আমার ইচ্ছা, তাকে ঘরে পাঠিয়ে দেবো। এ বয়সে তার বিশ্রামের প্রয়োজন খুব বেশী। আশা করি, আগামী মাসে সে আপনার কাছে পৌছে যাবে। গত দু'মাসে লা গ্রাঁদের কোনো খবর পাইনি। জিনের কাছে তাঁর কোনো চিঠি এসে থাকলে আমায় অবশ্যি জানাবেন। আমার সালাম নিন।

আপনার দোআর ভিখারী
আনওয়ার আলী।'

ফরহাত জিনকে বললেনঃ 'যাও বেটি, উনি তোমার ইন্তেযার করছেন।'

মুরাদ আলী তাঁকে ফরাসী ভাষায় বুঝিয়ে দিলে জিন উঠে বাইরের ঘরের দিকে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি গিয়ে লা গ্রাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'মাফ করবেন। আপনাকে দেরী করতে হয়েছে। আনওয়ার আলীর চিঠি এসেছে। মুরাদ আলীর কাছ থেকে আমি তার তরজমা শুনছিলাম।'

ঃ 'তিনি ভালো আছেন তো?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'জিন, বসো। তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

জিন বসলেন।

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'আমার সাথীরা বাংগালোর থেকে উত্তরদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি সেরিংগাপটম থেকে তাদের সাথে মিলিত হবো, এই শর্তে আমায় এক হফতার ছুটি দেওয়া হয়েছে। তারা পরশু পর্যন্ত এখানে পৌঁছবে। তিনচার দিন তারা থাকবে এখানে। মসিয়েঁ লালী আমায় বলেছেন যে, যুদ্ধের সম্ভাবনা খুব বেড়ে গেছে। সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল আমায় সেরিংগাপটম থেকে দূরে থাকতে হবে। এ অবস্থায় শাদী করতে চাইলে এই তার সুযোগ। জিন, তুমি ইচ্ছা করলে চারদিন পর আমার সকল ফরাসী বন্ধু আমাদের শাদীতে শরীক হতে পারবেন। আমাদের সেনাদলের পাদরী যাবতীয় অনুষ্ঠান সমাধা করবেন। আনওয়ার আলীর অনুপস্থিতির জন্য আমার দুঃখ হবে, কিন্তু আমরা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি, তা' তুমি বুঝতে পারো।'

জিন কয়েক মুহূর্তে মাথা নত করে চিন্তা করলেন। লা গ্রাঁদ তাঁর মুখ দেখে তাঁর সঠিক মনোভাব বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি বললেনঃ 'জিন, পেরেশানীর কোনো কারণ নেই। তোমার আপত্তি থাকলে আমরা উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে পারি। কিন্তু আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। আমাদের মিলন কতকগুলো দুর্ঘটনার ফল। তবু আমি ভেবে দেখেছি, আমরা পরস্পরের জন্য আর তোমাকে ছাড়া এ দুনিয়া আমার কাছে অর্থহীন। মরিশাস থেকে রওয়ানা হবার সময়ে আমি এ কল্পনাও করতে পারিনি যে, পুনরায় মিলিত হবার পর একদিনের জন্যও আমরা পরস্পর আলাদা হয়ে থাকবো, কিন্তু এখন আমি অনুভব করতে পারি যে, তোমার জন্য আমার সাহচর্য যিন্দেগীর একটি প্রশ্ন তো হতেই পারে, কিন্তু যিন্দেগীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হতে পারে না।'

জিন বললেনঃ 'লা গ্রাঁদ, আমি এখানে কেন থাকলাম, এই যদি হয় তোমার অভিযোগ, তা'হলে এই মুহূর্তেই আমি তোমার সাথে চলে যেতে প্রস্তুত।'

ঃ 'না, না, তুমি আমার কথার অর্থ বোঝনি। এঁদের সাথে পরিচিত হওয়া আমার কাছে খোদার সব চাইতে বড়ো অনুগ্রহ। আমি শুধু বলতে চাই যে, আমরা ছিলাম একই দরিয়ার দুই কিনারে। খোদা আমাদেরকে এনে দিয়েছেন একই

দরিয়ার তুফানের মাঝখানে। আমরা নিরুপায় হয়ে একে অপরের হাত ধরেছি। এখন সে তুফান কেটে গেছে আর আমরা উপকূলে এসে গেছি। যিন্দেগীর নতুন মনযিলের দিকে এগিয়ে যেতে আর তোমার প্রয়োজন নেই আমার হাত ধরার। আমি আর তোমার পথের অবলম্বন হতে পারি না। এখন আমি তোমায় দিতে চাই অতীতের সকল ঘটনা ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতের ফয়সালা করবার মওকা। যদি তোমার ফয়সালা এই হয় যে, তুমি আমার জীবন-সংগিনী হয়ে খুশী থাকতে পারবে, তা'হলে গৃহহারা হয়েও আমি মনে করবো, দুনিয়া আমার পায়ের তলায়; কিন্তু তুমি যদি আমায় তার অযোগ্য মনে কর, তা'হলে তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না আমার।'

জিন বললেনঃ 'লা গ্রাঁদ, আজ তুমি কি ধরনের কথা বলছো? আমার যতোটা মনে পড়ে, তোমার মনে দুঃখ দেবার মতো কোনো কথা তো আমি বলিনি।'

ঃ 'না জিন, তেমন কোনো কথা তুমি বলো নি। তেমন কথা তুমি বলতেই পারো না। তুমি বড়োই রহমদীল। কিন্তু আমার ইচ্ছা এ নয় যে, তুমি কেবল রহম ও সদাচরণের খাতিরে তোমার ভবিষ্যত এমন এক ব্যক্তির হাতে সঁপে দেবে, যার সাহচর্যে তোমার বুকের ভিতরে সবটুকু প্রাণচাঞ্চল্যের মৃত্যু ঘটবে।'

জিন হেসে বললেনঃ 'আমি যদি বলি যে, আমার দীলের মধ্যে কোনো জীবন-চাঞ্চল্যের অস্তিত্বই নেই, তা'হলে তুমি কি বলবে?'

লা গ্রাঁদ জওয়াব দিলেনঃ 'জিন, আমার কথাগুলোকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিও না। আমি তোমায় বলে দিতে চাই, আমার সাথে শাদী সম্পর্কে তোমায় কোনো পুরানো ফয়সালা মানতে হবে না। তোমার প্রত্যাশা আমি কতোটা পূরণ করতে পারবো, সে সম্পর্কে তোমায় ভালো করে ভেবে দেখতে হবে।'

জিন অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে বললেনঃ 'লা গ্রাঁদ আজ কি হল তোমার? খোদার দিকে চেয়ে ভেবে দেখো, তুমি ছাড়া দুনিয়ায় কেই বা অছে আমার।'

লা গ্রাঁদ পেরেশান হয়ে বললেনঃ 'আমায় মাফ করো, জিন। আমি কি বলছি, জানি না। যিন্দেগীর সকল মুসীবত আমি বরদাশত করতে পারি, কিন্তু তোমার চোখের অশ্রু আমি দেখতে পারছি না।'

জিন বললেনঃ 'লা গ্রাঁদ, আমার কোনো আচরণে যদি তুমি দুঃখ পেয়ে থাক, তা'হলে আমি তোমার কাছে মাফ চাই। আমার পেরেশানীর বড়ো কারণ ছিলো অপর কিছু। এইমাত্র মুরাদ আলী আমায় বললেন যে, তিনিও পরশু এখান থেকে চলে যাচ্ছেন। এহেন অবস্থায় কোন মুখে আমি মাকে জানাবো যে, এক্ষুণি আমরা শাদীর ফয়সালা করে বসেছি। আনওয়ার আলী, মুরাদ আলী ও তাঁদের মার চাইতে বড়ো স্বজন দুনিয়ায় আমার আর কেউ নেই। ওঁরা দু'ভাই যখন গৃহে থাকবেন, আর তাঁদের মা-যাঁকে আমিও মা বলেই মেনে নিয়েছি- যখন আমাদের -খুশীতে হিসসা নিতে পারবেন, সেদিনের অপেক্ষা করাই কি আমাদের উচিত নয়?'

লা গ্রাঁদের মুখের উপর থেকে দুঃখ-বিষাদের মেঘ সরে গিয়েছিলো। তিনি বললেনঃ 'জিন, প্রিয় জিন, আমায় মাফ করে দাও। এমন দিনের জন্য আমি কিয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। আমি ওয়াদা করছি, যতোদিন না অনুকূল অবস্থা ফিরে আসে, ততোদিন এ প্রশ্ন আমি আর তুলবো না।

ইসায়ী ১৭৮৫ সালের গ্রীষ্মকালে গণেশ পন্থের নেতৃত্বে এক মারাঠা লশ্‌কর কৃষ্ণা নদীর তীরে তাঁবু ফেললো। পেশোয়া ও নানা ফার্ণাবিসের চেষ্টায় মারাঠাদের মধ্যে তেমনি প্রাণচাঞ্চল্য জেগে জেগে উঠলো, যা' পঁচিশ বছর আগে তাদেরকে টেনে এনেছিলো পুণা থেকে পানিপথের ময়দানে। হিন্দুস্তানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল মারাঠা সরদার নিজ নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে জমা হতে লাগলো পেশোয়ার পতাকাতলে। নাগপুর থেকে মাধোজী ভোঁসলে বারো হাজার অভিজ্ঞ সিপাহী নিয়ে যুদ্ধে শরীক হবার ওয়াদা করলেন। ইন্দোরের টিকুজী হোলকার তাঁর তোপখানা, বিশ হাজার নিয়মিত ও দশ হাজার পিন্ডারা ফউজ নিয়ে মহীশূরের উপর হামলার জন্য প্রস্তুত হলেন। পরশুরাম ভাও ও রঘুনাথ রাওর সেনাবাহিনীও মহীশূরের দিকে অগ্রগতির জন্য নানা ফার্ণাবিসের হুকুমের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

এই ব্যাপক প্রস্তুতির পর নানা ফার্ণাবিসের দূত মীর নিযাম আলীকে দলে ভিড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। মীর নিযাম আলী ছিলেন টিপুর প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ ও তাঁর নিকৃষ্টতম অশুভাকাংখী। তথাপি মহীশূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে নিজস্ব ক্ষতির সম্ভাবনা তাঁর কাছে কঠিন উদ্বেগের কারণ হোল। নিজস্ব শক্তি সম্পর্কে তিনি আত্মতুষ্ট ছিলেন, কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা তাঁকে এ কথা বুঝাবার জন্য যথেষ্ট ছিলো যে, শক্তি প্রদর্শনের জন্য মহীশূর উপযুক্ত স্থান নয়। তিনি কিছুকাল নানার প্রতিনিধিকে স্পষ্ট করে কিছু বললেন না, কিন্তু তিনি যখন নিশ্চিত বুঝলেন যে, মারাঠা, মহীশূরের উপর হামলা করবে এবং তারা নিজস্ব শক্তি দিয়েই খোদাদাদ সালতানাতের উপর আঘাত হানতে পারবে, তখন তিনি যুদ্ধে শরীক হবার জন্য তৈরী হলেন। সম্মিলিত সেনাবাহিনীর প্রারম্ভিক কেন্দ্র হিসাবে উদয়গিরে নির্বাচন করা হল এবং তিনি নভেম্বরের শেষদিকে পঁচিশ হাজার সিপাহী নিয়ে সেখানে রওয়ানা হলেন।

নিযামের উদয়গিরে পৌছবার কয়েকদিন পর দেশের সবদিক থেকে অসংখ্য মারাঠা সৈন্য এসে জমা হল সেখানে। মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে পড়লো মারাঠা তাঁবু। মারাঠা ফউজকে উৎসাহিত করার জন্য পুরোহিত, যোগী ও সাধুদের পাঠানো হল। দক্ষিণ হিন্দুস্তানে হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথে তারা সবচাইতে বড়ো অন্তরায় মনে করতো সুলতান টিপুর ব্যক্তিত্বকে। মহীশূরের সম্পদের প্রতি আকর্ষণ ছিলো যেসব বর্গী দস্যুদের, তাদেরকেও শামিল করা হল সেনাবাহিনীতে।

নিযামের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিলো স্বভাবতঃই একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন। তথাপি দরবারের গায়ক, কবি ও খোশামুদে দল তাঁর মনে আস্থা জন্মাবার চেষ্টা করেছিলো যে, তিনিই সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গাযী। বিজয়ের সম্ভাবনার উপর বিজয়োৎসব পালিত

হচ্ছিলো। মীর নিযাম আলী নৃত্য-গীতের মাহ্ফিলে মারাঠা রাজা ও বিশিষ্ট সরদারদের মাঝখানে বসতেন জলসার নায়ক হয়ে। শরাব চলতে থাকতো। নর্তকী, গায়ক ও বাদ্যকরদের উপর সোনাচাঁদির মুদ্রা বর্ষণ করা হোত। তারপর জলসা ভাঙবার পর তাঁরা এক খিমায় জমা হয়ে যখন যুদ্ধ সংক্রান্ত পরামর্শ বিবেচনা করতেন, তখন সব চাইতে বেশী আলোচনা হত বিজয়ের পর যমিন ও ধনভান্ডার বন্টনের পদ্ধতি নিয়ে। প্রায় দেড় মাসের আলোচনার পর নিযাম ও মারাঠা শাসকদের মধ্যে যুদ্ধের খুঁটিনাটি বিষয় ও গণিমতের মাল বন্টন সম্পর্কে সমঝোতা হল এবং তাঁবুর মধ্যে চললো নতুন আনন্দোৎসব। হায়দরাবাদ ও পুণার সাধারণ সিপাহী থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো অফিসার পর্যন্ত সবারই মুখে এক আওয়াযঃ 'সুলতান টিপুর আর বাঁচার পথ নেই।'

কয়েকদিন পর উদয়গির থেকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রবল বন্যাবেগ দক্ষিণদিকে এগিয়ে চললো। মারাঠা লশ্করে ছিলো আশি হাজার সওয়ার ও চল্লিশ হাজার পদাতিক। মীর নিযাম আলীর নেতৃত্বে ছিলো চল্লিশ হাজার সওয়ার ও পঞ্চাশ হাজার পদাতিক। নানা ফার্ণাবিস মীর নিযাম আলীর মতোই ইংরেজদের যুদ্ধে শামিল করার সর্বপ্রকার সম্ভাব্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের পুরানো যখম তখনো মিলিয়ে যায়নি। এবং তারা কৌশলে কার্য উদ্ধার করার পক্ষপাতী ছিলো। তবু নানা ফার্ণাবিস ও মীর নিযাম আলীর বিশ্বাস ছিলো যে, সুলতান টিপু তাঁদের অসংখ্য সৈন্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করতে পারবেন না বলে যখন ইংরেজের দৃঢ় বিশ্বাস হবে, তখন মহীশূর বিভাগে অংশ নেবার জন্য তারা বিনাদ্বিধায় ময়দানে নেমে আসবে। পূণা ও হায়দরাবাদে ইতিমধ্যে ইংরেজের প্রতিনিধি তাঁদেরকে আশ্বাস দিয়েছে যে, কোম্পানী সুলতান টিপুর সাথে শুধু ততোক্ষণ তাদের পুরাতন চুক্তি মেনে চলবে, যতোক্ষণ মহীশূরের আত্মরক্ষা শক্তি অবশিষ্ট থাকবে।

মীর নিযাম আলী খান তাঁর ফউজের নেতৃত্ব তাহাওয়ার জঙের উপর সমর্পণ করে হায়দরাবাদে ফিরে গেলেন। নানা ফার্ণাবিসও বেশীদিন পুণার বাইরে থাকা পসন্দ করলেন না। পেশোয়ার দরবারে তাঁর কিছুসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো, কিন্তু মারাঠা লশ্করের নিরুৎসাহ হবার আশংকায় তিনি কিছুকালের জন্য পুণা গমনের সংকল্প ত্যাগ করলেন।

শাহ্বায তানবীরকে নিয়ে আসার জন্য আধুনী গিয়েছিলেন। তাঁর বাপ-মা তাঁর জন্য অত্যন্ত অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। একদিন আকবর খান শাহ্বায খানের সন্ধানে গাঁয়ের দু'জন সওয়ারকে পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু কয়েক ঘন্টা পর তারা ফিরে এসে জানালো যে, পথে শাহ্বায খান ও তানবীরের সাথে তাদের দেখা হয়েছে এবং তাঁরা কিছুক্ষণের মধ্যেই গৃহে ফিরে আসবেন।

বিকাল বেলায় শাহ্বায খান একটি ছোট কাফেলা সাথে নিয়ে ঘরে ফিরলেন। কাহার তানবীরের ডুলি নিয়ে গেলো বসতবাড়ির আঙিনায়। সেখানে জমা হয়েছিলো

গাঁয়ের মেয়েদের ভিড়। তানবীর শরম সংকোচে জড়সড় হয়ে ডুলি থেকে নামলো এবং গাঁয়ের মেয়েরা এগিয়ে গিয়ে তাকে কোল দিতে লাগলো। শাহ্বায খান কিছুক্ষণ গৃহের বহির্ভাগে তাঁর পিতার সাথে কথাবার্তা বললেন। গাঁয়ের মেয়েরা চলে গেলে তিনি মাকে সালাম করার জন্য ভিতর বাড়িতে প্রবেশ করলেন। বিলকিস তানবীর ও সামিনাকে নিয়ে এক কামরায় বসেছিলেন। বিলকিস তাঁকে দেখে অভিযোগ করে বলে উঠলেনঃ 'বেটা, তুমি আমাদেরকে বড়োই পেরেশান করেছো। আধুনী যদি তোমার এতই ভালো লেগে থাকে, তা'হলে কম-সে-কম একটা চিঠি তো লিখতে পারতে।'

শাহ্বায মায়ের কাছে বসতে বসতে বললেনঃ 'আম্মাজান, আমি বেকসুর, তানবীরকে জিজ্ঞেস করুন। আমি নিরুপায় হয়ে পড়েছিলাম, নইলে আমার তিনদিনের বেশী থাকার ইচ্ছা ছিলো না।'

ঃ 'কি জন্য নিরুপায় হয়ে পড়লে?' মা প্রশ্ন করলেন।

শাহ্বায জওয়াব না দিয়ে সামিনার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ সামিনা, তুমি বাইরে যাও। আমি আম্মার কাছে ক'টা কথা বলবো।'

সামিনা মুখ ভার করে কামরার বাইরে চলে গেলো।

শাহ্বায ইতস্ততঃ করে বললেনঃ 'আম্মাজান, আপনি ওয়াদা করুন, আমার উপর রাগ করবেন না।'

বিলকিস বললেনঃ 'বেটা, আমার বিশ্বাস, তুমি এমন কোনো কায করো নি, যাতে তোমার বাপ-মাকে শরম পেতে হয়। কেন তুমি পেরেশান হচ্ছো?'

শাহ্বায জওয়াব দিলেনঃ 'আম্মাজান, আমার ভয়, আব্বাজান জানলে খুব রাগ করবেন। আমি-- আমি আধুনীর ফউজে শামিল হয়েছি।'

বিলকিসের মুখ সহসা পান্ডুর হয়ে গেলো। তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

শাহ্বায খান বললেনঃ 'আল্লাহর কসম, আমার দিকে অমন করে তাকাবেন না। আমার কাছে ওঁদের বিদ্রুপ ছিলো অসহনীয়। আমার আব্বাজান যুদ্ধ দেখে ভয় পান, এ কথা আমি শুনতে পারছিলাম না। খালুজান ও তাঁর স্বজনদের কথায় আমি অনুভব করছিলাম যে, ওঁরা আমাদেরকে বুয্দীল মনে করেন।'

বিলকিসের মুখ ক্রোধে রক্তিম হয়ে উঠলো। তিনি বললেনঃ 'শাহ্বায হায়দরাবাদ ও আধুনীর কোনো মায়ের বাচ্চা তোমার আব্বাকে বুয্দীল বলে বিদ্রুপ করতে পারে না। পানিপথের ময়দানে যাঁরা তার সাহস ও শৌর্যের পরিচয় পেয়েছেন, এমন লোক এখনো যিন্দাহ্ রয়েছেন। বলো, তোমার খালুজান কি বলেছেন?'

ঃ'খালুজান কিছু বলেন নি, আম্মাজান! তিনি শুধু আফসোস করে বলেছেন যে, আব্বাজানের উচিত ছিলো কোনো ফউজের সিপাহ্সালার হওয়া আর তিনি এখন

এক কিষাণের যিন্দেগী যাপন করেই খুশী রয়েছেন।'

ঃ 'তোমার আব্বাজান বিশ বছর বয়সে আধুনীর সিপাহ্‌সালারের চাইতেও বেশী জানতেন।'

ঃ 'আম্মাজান, আমার ফউজে শামিল হওয়ার ব্যাপারে খালুজান বেকসুর।

' এটা আমার নিজেরই ফয়সালা। তাঁর খান্দানের প্রত্যেকটি নওজোয়ান ফউজের কর্মচারী। আমার চাইতে বয়সে ছোট অনেকেই রয়েছে তাদের মধ্যে। তাদের সাথে দেখা হলেই তারা প্রথম প্রশ্ন করতোঃ "তুমি কেন ফউজে ভর্তি হচ্ছো না?" তানবীরের কাছে জিজ্ঞেস করুন, ওঁর খান্দানের মেয়েরাও আমায় ঠাট্টা করেছে।'

বিলকিস বললেনঃ 'আর তোমার আত্মসম্ভ্রমে আঘাত লাগলো? কিন্তু তুমি ভুলে গেলে, এ কাজটি তোমার বাপের কাছে কতোটা পীড়াদায়ক হবে।'

তানবীর বললোঃ 'আম্মাজান, ভাইজান এ ব্যাপারে বেকসুর। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, ফউজে ভর্তি হবার আগে দু'তিন রাত উনি ঘুমোতে পারেন নি।'

ঃ 'ফউজের চাকুরি সম্পর্কে তোমার আব্বার ধারণা তোমার খালাজান জানেন। ওঁর উচিত ছিলো একে বুঝিয়ে দেওয়া।'

ঃ 'আম্মাজান, তিনি বুঝিয়েছিলেন। তিনি খুবই বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের গৃহের পরিবেশ এমন যে, ভাইজানের মতো অবস্থায় পড়ে গেলে আমিও এই ফয়সালা করতাম। আব্বাজান যখন এখানে হিজরত করে এসেছিলেন, তখনকার পরিস্থিতি ছিলো ভিন্ন রকম, কিন্তু এখন আধুনীর কোনো বড়ো খান্দানের ছেলের পক্ষে ফউজী চাকুরি করতে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।'

বিলকিস বললেনঃ 'এখন এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। শাহ্‌বায, তুমি একটা ভুল করেছো এবং এ ভুলের কাফ্‌ফারা কি হবে, আমি জানি না। তোমার আব্বাজানের জন্য ব্যাপারটি হবে নিশ্চিতরূপে অসহনীয়। তিনি কোনো অবস্থায়ই তোমায় ফউজে শামিল হবার এজাযত দেবেন না।'

শাহ্‌বায বললেনঃ 'আম্মাজান, আমি ভর্তি হয়ে গেছি। এখন শামিল না হবার প্রশ্নই ওঠে না। ওরা আমায় গেরেফতার করে নিয়ে যাবে। খোদার ওয়াস্তে আব্বাজানকে বুঝাবার চেষ্টা করুন, আর যদি এ ব্যাপারে আপনি কিছু করতে পারবেন না মনে করেন, তা'হলে চুপ করে থাকুন। আমি আধুনী গিয়ে তাঁর খেদমতে চিঠি লিখে দেবো। তারপর যতোদিন তাঁর রাগ দূর না হয়, ততোদিন আমি ঘরে ফিরে আসবো না। কিন্তু এ কথাটি আমি বুঝে উঠতে পারি না, আধুনীর প্রত্যেকটি নওজোয়ান যখন ফউজে শামিল হয়ে গেছে, খালুজান ও হাশিম বেগ ফউজে চাকুরি করছেন, তখন আমার ফউজে শামিল হওয়ায় দোষের কি আছে? আব্বাজান এ সত্য অস্বীকার করতে পারবেন না যে, আমরা মহাবৎ জঙের প্রজা এবং আধুনীর হেফাজতের জন্য তাঁর ফউজের প্রয়োজন।'

বিলকিস জওয়াব দিলেনঃ 'শাহ্বায, বেটা! আমার বুঝানোতে কিছু হবে না। এ ব্যাপারে আমায় শুধু মায়ের কর্তব্য পালন করতে হবে। আমায় এখন চেষ্টা করতে হবে, যেনো আমার পুত্র ও আমার স্বামীর মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর মাথা না তোলে। যতোক্ষণ না আমি তোমার বাপের সাথে আলাপ করি, এ কথা কারুর কাছে প্রকাশ করো না।'

পরদিন ভোরে নামাযের খানিকক্ষণ পর আকবর খান দেওয়ানখানার এক কামরায় উপবিষ্ট। শাহ্বায খান কম্পিত পদে কামরায় প্রবেশ করে কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা-সংকোচে পিতার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি বললেনঃ 'আব্বাজান, আপনি আমায় ডেকেছেন?'

আকবর খান তাঁর দিকে না তাকিয়ে একটি কুরসীর দিকে ইশারা করে বললেনঃ 'বসো।'

শাহ্বায বসে পড়লেন। বাপের অসন্তোষ লক্ষ্য করে তিনি মনের মধ্যে অন্তহীন ভীতির কম্পন অনুভব করলেন। আকবর খান সহসা গর্দান তুলে তাঁর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেনঃ 'শাহ্বায, রোহিলাখন্ডে আমাদের গোষ্ঠীর রেওয়ায ছিলো, যখন কোনো সরদারের ছেলে অভিযানে কামিয়াব হয়ে ফিরে আসতো, তখন গোষ্ঠীর সকল লোক খুশীর উৎসব করতো। তুমি নিজের ধারণা অনুযায়ী আধুনীতে এক অতি বড়ো কৃতিত্ব অর্জন করে এসেছো এবং গোষ্ঠীর লোকেরা তা জানতেও পারেনি। আমি তোমায় বলে দিতে চাই যে, এরা গৃহহারা হয়েও আমায় মনে করে তাদের সরদার এবং আমার সুখ-দুঃখের শরীক হওয়াকে মনে করে তাদের কর্তব্য। যখন তারা জানবে যে, আমার পুত্র তার জীবনের প্রথম সাফল্যের খুশীতে তাদেরকে শরীক হবার যোগ্য মনে করেনি, তখন তাদের কতোটা আফসোস হবে?'

আকবর খানের কথা বলার এ ভংগী শাহ্বায খানের কাছে নতুন এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, এ ভূমিকা আসন্ন জড়ের পূর্বাভাস। আকবর খান আচানক তাঁর কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে বললেনঃ 'আধুনীর ফউজের কর্মচারীদের মর্যাদা তোমার মনে ঈর্ষা জাগিয়ে দিয়েছিলো এবং এখন হয়তো তুমি মনে করছো যে, তুমি গিয়ে সিংহের কাতারে দাঁড়িয়েছো; কিন্তু আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, তুমি মিলিয়ে হয়েছো সেই শৃগালের দলে, যারা পেট ভরবার জন্য হামেশা সন্ধান করে ফেরে মৃতদেহ। রোহিলাখন্ড থেকে হিজরত করার পর আমার যিন্দেগীর সব চাইতে বড়ো আকাঙ্খা ছিলো, যেনো আমার গোষ্ঠীর লোকেরা এমন এক আশ্রয়স্থলের সন্ধান পায়, যেখানে তারা কঠোর মেহ্নত ও কষ্ট স্বীকার করে জীবিকার সংস্থান করতে পারে। মোয়ায্যম আলী আমাদেরকে মহীশূরে আবাদ হওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ, মারাঠা ও মীর নিযাম আলীর যুদ্ধের সংকল্পের দরুন মহীশূরের ভবিষ্যত ছিলো আমার কাছে অনিশ্চিত। রোহিলাখন্ডের ধ্বংসের পর আমি চেয়েছিলাম তাঁদেরকে

যুদ্ধের আগুন থেকে দূরে রাখতে। এই শর্তে আমি এখানে আবাদ হয়েছিলাম, যে, আমায় কখনো হায়দরাবাদ বা আধুনীর জন্য ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহ করতে বাধ্য করা হবে না। আজ এই বুড়ো বয়সে তুমি আমার মনে অনুভূতি জাগিয়ে দিয়েছো যে, আমার ফয়সালা ছিলো ভুল এবং মোয়ায্যম আলী যে পথ এখ্তিয়ার করেছিলেন, তাই হচ্ছে এদেশে নিরাপত্তার পথ। তাঁর কাছে যে অর্থ সম্পদ ছিলো, তা' নিয়ে এক নিরাপদ গৃহকোণে নিঃসংগ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য ও নির্ভাবনার যিন্দেগী কাটিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেরিংগাপটম গিয়ে ভর্তি হলেন হায়দর আলীর ফউজে। তিনি জানতেন, মহীশূরে আযাদীর পরিবেশে বেঁচে থাকার পরিবর্তে তাঁকে কোরবানী দিতে হবে যিন্দেগীর সংখ্যাহীন স্বাচ্ছন্দ্য। যেদিন আমি তাঁর ও তাঁর দুই পুত্রের শাহাদতের খবর শুনলাম, সেদিন আমি ভাবলামঃ হায়! তিনি যদি সেরিংগাপটম যাওয়ার মতো ভুল না করতেন। কিন্তু আজ আমি বুঝতে পারছি, তাঁর মরণ-যন্ত্রণা এত কষ্টদায়ক হয়নি, তেমন আজ আমি ভোগ করছি। তিনি যে মৃত্যু কামনা করতেন, তা আমার জীবনের চাইতে হাজার গুণ শ্রেয়। তাঁর অবশিষ্ট দুই পুত্রও তাঁরই বাঞ্ছিত পথের অনুসারী হয়েছে, তাতে আজ তাঁর রূহ্ শান্তি পাচ্ছে। তুমি আধুনীর ফাউজের সিপাহ্সালার হলেও মৃত্যুর মুহূর্তে আমি অনুভব করবো যে, এ দুনিয়ায় গর্ব করার মতো কোনো স্মরণচিহ্ন আমি রেখে যেতে পারলাম না। যে পুঁজি আমি খোদার পথে লুটিয়ে দিতে পারিনি, তা' আমার কাছ থেকে চোর-ডাকাত ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তুমি তোমার খালু ও হাশিম বেগকে দেখেছো ফউজে সিপাহী হবার জন্য অধীর এবং আমার যিন্দেগীর দ্বিতীয় ভুল, আমি এমন এক খান্দানে তানবীরের সম্পর্ক পাতিয়েছি, যাঁদের প্রধান কর্তব্য হয়েছে এ দেশে ইসলামের নিকৃষ্টতম দুশমনের জন্য ভাড়াটে সিপাহী সংগ্রহ করা।--

'কিন্তু এখন আর তর্কে কোনো লাভ নেই। তুমি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছো, তা ফিরিয়ে আনতে পারবো না। লোক তোমায় বুয্দীল বলে নিন্দা করুক এ আমি চাই না। তুমি যে পথ এখ্তিয়ার করেছো, তার আখেরী মঞ্জিল কি হবে, জানি না। কিন্তু হায়, তুমি যদি সেই বাপের অসহায় অবস্থা বুঝতে পারতে, যার পুত্র যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করছে, অথচ সে নিজে তার বিজয়ের জন্য হাত তুলে দোআ করতে পারছে না। আজ তোমার মা আমার কাছে এলেন তোমার সুপারিশ নিয়ে এবং আমায় অনুনয় করে বললেন, যেনো আমি তোমার উপর রাগ না করে তোমার কামিয়াবীর জন্য দোআ করি, কিন্তু জওয়াবে আমি তাঁকে বললামঃ "শাহ্বায আধুনীর ফাউজে কর্মচারী। আধুনীর বিজয় হবে সেই মহান উদ্দেশ্যের পরাজয়, যার জন্য মোয়ায্যম আলী ও তাঁর পুত্রেরা জান দিয়েছিলেন। তুমি কি দোআ করতে পারো যে, তোমারই পুত্রের হাত একদিন আনওয়ার মুরাদের রক্তে রঞ্জিত হোক?" আমার কথার কোনো জওয়াব ছিলো না তাঁর কাছে।"দাক্ষিণাত্য ও মহীশূরের মধ্যে যুদ্ধ হবে না। মীর নিযাম আলী মারাঠা ও ইংরেজের প্ররোচনায় মহীশূরের উপর হামলা করবেন, এ কথা আমি ভাবতে পারি না।"-এই বলে তিনি নিজের অন্তরকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন।

শাহ্‌বাযের দেহে কাঁপন ধরে গিয়েছিলো। তিনি অনুনয়ের স্বরে বললেনঃ আমি যখন ভর্তি হলাম, তখন এসব প্রশ্ন আমার মাথায় আসেনি। আমি আপনাকে নিশ্চিত বলে যাচ্ছি, মোয়ায্‌যম আলীর পুত্রদের বিরুদ্ধে আমি কক্ষণো হাত তুলবো না।'

আকবর খান চীৎকার করে উঠলেনঃ ' খোদার ওয়াস্তে এমন কথা বলো না। ফউজে ভর্তি হবার সময়ে তুমি মহাবৎ জঙ ও নিযামের আনুগত্যের হলফ নিয়েছো। গাদ্দারীর শিক্ষা আমি তোমায় দিতে পারবো না। আমি জানি, তুমি কারুর নিন্দায় বিব্রত হয়ে ফউজে ভর্তি হওনি; বরং দীর্ঘকাল তুমি এই আগ্রহ পোষণ করেছো। তুমি তাহির বেগের খান্দানের লোকদের কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভের লোভে কোনো লড়াইয়ে অংশ নিতে কুণ্ঠিত হবে না। আজ থেকে তুমি আধুনীর ফউজের সিপাহী। ভবিষ্যতে আমি তোমায় ভাবতে বলবো না যে, তুমি আমার পুত্র। আজ থেকেই আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেলো।'

সামিনা এসে কামরায় প্রবেশ করলো। শাহ্‌বাযের চোখে অশ্রু দেখে অবস্থা আন্দায করতে তার অসুবিধা হল না। সে এগিয়ে এসে আকবর খানের বাহু জড়িয়ে ধরে বললোঃ 'আব্বাজান, চলুন। খানা তৈরী।'

আকবর খান কোনো জওয়াব দিলেন না। তাই সে মুখ ভার করে বললোঃ 'আব্বাজান, ভাইজান কি কসুর করেছেন?'

ঃ 'কিছু না। যাও, বাইরে গিয়ে খেলা করো।'

সামিনা অশ্রুসজল চোখে শাহ্‌বাযকে বললোঃ 'ভাইজান, আপনি বাইরে চলে যান। আব্বাজান খুব রেগে গেছেন।'

তারপর কয়েক মুহূর্ত আকবর খানের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বললোঃ 'চলুন, আব্বাজান। খানা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। আম্মাজান আপনার ইন্তেযার করছেন।'

আকবর খান তার হাত ধরে তাকে কোলে তুলে নিলেন। ছোট্ট বাহু দু'টি দিয়ে সে তার বাপের গলা জড়িয়ে ধরলো।

শাহ্‌বায খান বাপের মুখের উপর খানিকটা প্রশান্ত ভাব দেখে বুঝলেন, এবার ঝড় কেটে গেছে।

ছয়

নিয়াম ও মারাঠাদের সেনাবাহিনী মহীশূরের দিকে এগিয়ে গেলো এবং উত্তর সীমান্তের বস্তিগুলোয় লুটতরাজ করে বাদামী অবরোধ করলো। বাদামী হেফাজতে নিযুক্ত ছিলো তিন হাজার সিপাহী। প্রায় তিন হফতা ধরে তাদের মিলিত ফউজ শহরের আশ্রয়স্থানগুলোর উপর গোলাবর্ষণ করতে লাগলো অবিরাম, কিন্তু পাঁচিল ভাঙতে তারা পারলো না। অবশেষে ইসায়ী ১৭৮৬ সালের ২০শে মে তারা এগিয়ে গিয়ে পাঁচিল দখল করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু চারদিক থেকে যখন হাজারো লোক

খন্দক পার হয়ে সিঁড়ির সাহায্যে পাঁচিলের উপর চড়বার চেষ্টা করছিলো, তখন তাদেরকে মোকাবিলা করতে হল অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির। মহীশূরের ফউজ জায়গায় জায়গায় বিস্ফোরক বারুদ বিছিয়ে রেখেছিলো। একদিক থেকে বারুদ বিস্ফোরণের ধারা শুরু হয়ে গেলো এবং দেখতে দেখতে হামলাকারী ফাউজকে ঘিরে ফেললো ধুলিধোঁয়ায়। হামলাকারীরা অসংখ্য লাশ ও যখমীকে পাঁচিলের ধারে ফেলে রেখে পিছু হটে গেলো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে। কিছুক্ষণ পর তারা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে পাঁচিলের উপর হামলা করলো। শহরের রক্ষীদল অমিত সাহসে মোকাবিলা করলো। কিন্তু হামলাকারীদের সয়লাবের সামনে তারা টিকতে পারলো না। তারা বন্দুক, সংগীন, নেযাহ্ ও তলোয়ার নিয়ে পাঁচিলে উঠতে বাধা দিলো দুশমনদের। কিন্তু দুশমনের একজন সিপাহী যখমী হয়ে পড়ে গেলে দশজন তার জায়গা দখল করতে এগিয়ে আসে। কিছু সময়ের মধ্যে শহরের কোনো কোনো অংশ দুশমনের দখলে চলে গেলো এবং মহীশূরের জীবনপণ যোদ্ধারা লড়াই করতে করতে কেল্লার দিকে হটে গেলো। তারা যখন কেল্লায় প্রবেশ করছিলো, তখন দুশমন পূর্ণ বিক্রমে হামলা করে দরযা দখল করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কেল্লার পাঁচিল থেকে তীব্র গোলা বর্ষণের ফলে তারা এগুতে পারলো না। হামলাকারীরা ক্রমাগত অগ্রগতি অব্যাহত রেখে কেল্লার পাঁচিলে চড়বার চেষ্টা করলো, কিন্তু মহীশূরের জীবনপণ যোদ্ধারা তাদের উদ্যম ধুলোয় মিশিয়ে দিলো। নিযাম ও পেশোয়ার লশকরকে প্রায় ষোলো শ মানুষের লাশ ফেলে পিছপা হয়ে যেতে হল। এ ছিলো কেল্লার রক্ষীদের এক বিরাট কৃতিত্ব। কিন্তু দুশমনের সংখ্যা বিবেচনায় তাদের অধিনায়কের ধারণা হয়েছিলো যে, তাঁরা বেশী সময়ে মোকাবিলা করতে পারবেন না। কেল্লার ফউজ যে তালাব থেকে পানির সংস্থান করতো, তা' ছিলো শহরের মধ্যে এবং দুশমন শহর দখল করেই পানি বন্ধ করে দিলো। পানির অভাবে কয়েকটি লোক মারা গেলো এবং সেনাধিনায়কের দৃঢ় ধারণা হল যে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কোনো সেনাসাহায্য পাওয়া যাবে না। তাই তিনি তাঁর সিপাহীদের জীবন রক্ষার শর্তে কেল্লা দুশমনের হাতে ছেড়ে দিলেন।

বাদামী জয়ের পর নানা ফার্ণাবিসের মারাঠা বাহিনীর নেতৃত্ব হরিপন্থের উপর ন্যস্ত করা হল এবং নানা পুণায় চলে গেলেন। হরিপন্থ গজনন্দরা গড়ের কেল্লার উপর হামলা করলো। কেল্লাটি যথেষ্ট মযবুত ছিলো, কিন্তু মহীশূরের এক নিমকহারাম অফিসার দুশমনের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে কেল্লার দরযা খুলে দিলো।

এর আগে আর একটি মারাঠা লশকর কাঠওয়ার কেল্লার উপর উপর হামলা করেছিলো গনেশ পন্থের নেতৃত্বে। কিন্তু সেখানে তাদের মোকাবিলা হয়েছিলো টিপুর নামযাদা সালার বুরহানুদ্দীনের সাথে। বুরহানুদ্দীন মারাঠাদের উপর্যুপরি পরাজিত করলেন। পুণার হুকুমত টিকুজী হোলকারের অধীনে একদল সাহসী যোদ্ধাকে গনেশ পন্থের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাবার হুকুম দিলো। হোলকার সোজাসুজি কাঠওয়ারের কেল্লার উপর হামলা না করে আশপাশের এলাকায় লুটপাট শুরু করে দিলো। ইতিমধ্যে শাহনূরের নওয়াব আব্দুল হাকীম খান* সুলতানের সাথে গাদ্দারী

করে মারাঠার সাথে মিলিত হোলেন। হোলকার ও গনেশ পন্থের সেনাবাহিনী কাঠওয়ার থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে নতুন মিত্রের সাহায্যের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে গেলো শাহ্নূরের দিকে। বুরহানুদ্দীন মারাঠাদের অনুসরণ করলেন এবং শাহ্নূরের কাছে তাদের উপর হামলা করলেন। কিন্তু শাহনূরের নওয়াব ও মারাঠাদের মিলিত শক্তির সামনে তিনি টিকে থাকতে পারলেন না, পিছু হটে গেলেন। এরপর মারাঠারা কাঠওয়ার ও লক্ষেশ্বর এলাকার কয়েকটি কেল্লা দখল করে নিলো। খোলা ময়দানে মোকাবিলা করার মতো ফউজ বুরহানুদ্দীনের সাথে ছিলো না।

সেনা সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তিনি আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ময়দানে দুশমনদের যথাসাধ্য বিব্রত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকলেন।

এই সময়ে নিযাম ও মারাঠাদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে কুর্গের যুদ্ধপিয়াসী নায়ার পুনরায় বিদ্রোহ করলো এবং সুলতান টিপুকে উত্তরের ময়দানের দিকে নযর দেবার আগে তাদেরই দিকে মনোযোগ দিতে হলো। কুর্গের বিদ্রোহ দমনের পর সুলতান বাংগালোরে পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে এগিয়ে গেলেন উত্তরদিকে। বাংগালোর থেকে রওয়ানা হওয়ার সময়ে তাঁর সাথে ছিলো চল্লিশ হাজার জীবনপণ যোদ্ধা। তারা বহু ময়দানে দিয়েছে তাদের বীরত্বের পরিচয়। পথে করদ ও সামন্ত সরদাররা তাদের সৈন্যদল নিয়ে শামিল হতে থাকলেন তাঁর সাথে। বর্ষার মওসুম শুরু হয়ে গিয়েছিলো এবং সুলতান টিপু মারাঠাদের রসদ ও সেনা সাহায্যের পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নদী-নালায় প্লাবনের পুরোপুরি সুযোগ নেবার জন্য সচেষ্ট হলেন।

হায়দরাবাদ ও পুণার সেনাবাহিনীর সিপাহ্সালারদের বিশ্বাস ছিলো যে, সুলতানের প্রধান উদ্দেশ্য বুরহানুদ্দীনের সাহায্য করা, কিন্তু একদিন পুণা ও হায়দরাবাদের শাসকরা হয়রান হয়ে খবর শুনলেন যে, শেরে মহীশূরের সেনাবাহিনী আঘাত হেনেছে আধুনীর দরযায়। আধুনীর শাসনকর্তা মহাবৎ জঙ ছিলেন নিযামের ভাতিজা ও জামাতা। সুলতান টিপুর মতো বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোকের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা ছিলো না যে, মীর নিযাম আলী তুংগভদ্রার দক্ষিণে তাঁর সব চাইতে মযবুত কেল্লা নিরাপদ রাখার দিকে মনোযোগী হবেন অবিলম্বে। সুলতানের বাহিনী যখন আধুনীর কেল্লার উপর গোলাবর্ষণ করছিলো, তখন মহাবৎ জঙের দূত নিযাম ও পেশোয়ার দরবারে ফরিয়াদ করছিলো যে, আধুনীর হেফাযতের প্রশ্ন দাক্ষিণাত্যের শাসক খান্দানের উয্যত ও সৌভাগ্যের প্রশ্ন।

** হায়দর আলী ঈসায়ী ১৭৭৬ সালে মারাঠাদের সাথে চক্রান্তের অভিযোগে আবদুল হাকীম খানকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে শাহনূর দখল করলেন। তারপর তাঁর কাছ থেকে আনুগত্যের ওয়াদা নিয়ে বার্ষিক চার লক্ষ টাকা খেরাজের বিনিময়ে শাহনূরের আধিপত্য তাঁর হাতে প্রত্যর্পণ করলেন। তারপর নওয়াব হায়দর আলী আবদুল হাকীমের সাথে সম্পর্ক মযবুত করার জন্য নিজ সাহেবযাদীকে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সাথে বিবাহ দিলেন এবং শাহনূরের নওয়াবের কন্যার সাথে নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র করীম সাহেবের শাদী করালেন। তা' ছাড়া হায়দর আলী শাহনূরের মারাঠা অধিকৃত অংশ জয় ক'রে নওয়াব আবদুল হাকীমের হাতে ন্যস্ত করে দিলেন। কিন্তু শাহ্নূরের নওয়াব যখন বুঝলেন যে, মহীশূরের উপর নিযাম ও মারাঠাদের লশ্করের বিজয় নিশ্চিত, তখন পুরানো উপকার ভুলে সুলতান টিপুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন।*

মহাবৎ জঙ আসন্ন ধ্বংসের আশংকায় প্রচুর অর্থ দিয়ে সুলতানের হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সুলতান টিপু তাঁর দূতকে জওয়াব দিলেনঃ 'মহাবৎ জঙ যদি আমার বন্ধুত্ব কামনা করেন, তা'হলে স্বয়ং তিনিই আমার কাছে আসবেন। তিনি যদি মারাঠাদের সংগ ত্যাগ করেন তা'হলে আমার কোনো দুশমনী নেই তাঁর সাথে।'

কিন্তু মহাবৎ জঙের নিযাম ও মারাঠার তরফ থেকে সাহায্য লাভের পুরো আশা ছিলো এবং তাঁর লক্ষ্য ছিলো শুধু কিছুদিনের জন্য সুলতানকে যুদ্ধ মুলতবী রাখতে রাযী করা। সুলতান টিপুরও পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো যে, নিযাম ও মারাঠা আধুনীকে বিপদের মুখে রেখে নির্বিকার থাকবেন না। তাই মহাবৎ জঙের সেনাসাহায্য প্রাপ্তির আগেই তিনি আধুনী দখল করে নেবার ইচ্ছা করলেন।

তাহির বেগের বিবি আতিয়া ও পুত্রবধূ তানবীর তাদের আলীশান বাসভবনের দ্বিতলের এক কামরায় জানালার সামনে দন্ডায়মান। শহরের চারদিকে শুধু তোপ ও বন্দুকের মুহুর্মুহু আওয়ায শোনা যাচ্ছে। ধূম্রমেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে সারা আকাশ। সিঁড়ির দিকে কার পদশব্দ শোনা গেলো এবং তারা রুদ্ধনিশ্বাসে দরযার দিকে তাকাতে লাগলেন।

হাশিম বেগ হাঁপাতে হাঁপাতে কামরায় প্রবেশ করে বললেনঃ 'আব্বাজানের হুকুম, আমি আপনাদেরকে কেল্লার ভিতরে পৌঁছে দেবো। শহরের উপর দুশমনের হামলা খুব তীব্র হয়ে উঠেছে। আপনারা আমার সাথে চলুন। নওকররা জিনিসপত্র নিয়ে আসবে।'

আতিয়া-বললেনঃ 'তোমার আব্বাজান তো বলছিলেন যে, শহরে কয়েক হফতার জন্য কোনো বিপদ নেই।'

হাশিম বেগ বললেনঃ 'আম্মাজান, আপনারা জলদী করুন। আপনাদের ওখানে যাওয়া এজন্যও প্রয়োজন যে, শাহবায খান যখমী হয়েছেন। তাঁর দেখাশোনার জন্য কোনো ভালো হাকীমের প্রয়োজন। তাই আমরা তাঁকে গৃহে না এনে কেল্লার ভিতরে পৌঁছে দিয়েছি।'

আতিয়া ও তানবীর কিছুক্ষণ মোহাচ্ছন্নের মতো হাশিম বেগের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে তানবীর চীৎকার করে উঠলোঃ 'খালাজান, কি ভাবছেন আপনি? আল্লার ওয়াস্তে জলদী করুন।' তারপর সে ক্রমাগত, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো হাশিম বেগের কাছেঃ 'ভাইজান কখন যখমী হলেন? ওঁর অবস্থা এখন কেমন? সত্যি, করে বলুন, তিনি যিন্দা আছেন তো?'

হাশিম বললেনঃ 'এইমাত্র দুশমনের গোলাবর্ষণে শহরের পাঁচিলের এক বুরুজ ভেঙে পড়েছে। তখন তিনি নীচে এসে পড়েছেন। ইঁটের স্তূপের ভিতর থেকে তাঁকে

আমরা টেনে এনেছি। তাঁর মাথা থেকে রক্ত ঝরছিলো। এখনও তাঁর হুঁশ রয়েছে। অস্ত্রচিকিৎসকের ধারণা, তাঁর যখম তেমন সাংঘাতিক নয়। খুব শীগ্‌গিরই ভালো হয়ে যাবেন।'

কিছুক্ষণ পর আতিয়া ও তানবীর কেল্লার এক কামরায় শাহ্‌বাযের পাশে গিয়ে বসলেন। শাহ্‌বায খান শয্যার উপর শায়িত। তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা। রক্ত বন্ধ না হওয়ায় মাথায় পট্টির একাংশ লাল হয়ে গেছে। শাহ্‌বাযের মুখে অসহনীয় দৈহিক ক্লেশের আভাস সুস্পষ্ট। তবু তিনি বারবার বলেনঃ তানবীর, আমি ভালো আছি। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। তুমি পেরেশান হয়ো না।'

খানিকক্ষণ পর তিনি পানি চাইলেন। তানবীর ছুটে গিয়ে এক পেয়ালা পানি আনলো। আতিয়া তাঁকে ধরে তুললেন। শাহ্‌বায হাত বাড়িয়ে পেয়ালা ধরবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হাত ঠিক পেয়ালার দিকে না গিয়ে এদিক ওদিক ঢলে পড়ে যায়। তানবীর খালার দিকে তাকিয়ে কান্নার বেগ সংযত করে পানির পেয়ালা মুখে তুলে দিলো। পানি পান করিয়ে আতিয়া তাঁর মাথা বালিশের উপর রাখলেন। তানবীর তাঁর কম্পিত হাতখানি তাঁর চোখের সামনে এনে ভাইয়ের সিনার উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

শাহ্‌বায তার মাথায় হাত বুলিয়ে হাসবার চেষ্টা করে বললেনঃ 'খালাজান, ওকে বুঝিয়ে দিন, দেখুন, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

তানবীর বললোঃ 'ভাইজান, আপনি আমার কাছে কিছু গোপন করবার চেষ্টা করবেন না। আমি আপনার বোন। কামরার ভিতরে ঢুকেই সব কিছু জানতে পেরেছি।'

ঃ 'বলো, কি জানতে পেরেছো? শাহ্‌বায দিশাহারা হয়ে বললেন।

ঃ 'ভাইজান, আপনার চোখ!'

শাহ্‌বায কয়েক মুহূর্ত নির্বাক থাকলেন। অবশেষে তিনি বললেনঃ 'তানবীর, মাথায় আঘাতের দরুন কখনো কখনো চোখে অন্ধকার নেমে আসে। কিন্তু হাকীম বলছিলেন যে, কোনো বিপদের আশংকা নেই। দেখো, এখন আমি কামরার সব কিছুই দেখতে পাই। উঠে আমার সামনে বসে আমার পরীক্ষা নেও।'

আতিয়া বললেনঃ 'মাথায় আঘাত লাগলে কখনো কখনো অমন হয়। তুমি একটু নিশ্চিন্ত থাক।'

শাহ্‌বায বললেনঃ 'তানবীর, আমার কাছে ওয়াদা করো, আব্বাজানকে আমার যখমী হবার খবর দেবে না। তিনি আমায় এমন অবস্থায় এসে দেখেন, তা' আমি চাই না। আমার বিশ্বাস, আমি খুব শীগ্‌গিরই ভালো হয়ে যাবো। হাকীম আমায় বহুত আশ্বাস দিয়ে গেছেন।'

সন্ধ্যাবেলায় তাহির বেগ ও হাশিম বেগ কামরায় এসে প্রবেশ করলেন।

তাঁদের পায়ের আওয়ায পেয়ে শাহ্বায চোখ খুলে বললেনঃ 'খালাজান, এখন আমার চোখ ভালো হয়ে গেছে। খালুজান ও হাশিম বেগকে দেখতে পাচ্ছি।'

তাহির বেগ এগিয়ে এসে এক কুরসীর উপর বসে বললেনঃ 'শাহ্বায, আমি তোমার জন্য খুব ভালো খবর নিয়ে এসেছি। তাহ্ওয়ার জঙ ও হরিপন্থ চল্লিশ হাজার সওয়ার নিয়ে এখানে পৌছাবন। তা'ছাড়া হুযুর নিযাম হায়দরাবাদ থেকে পঁচিশ হাজার সওয়ারসহ মোগল আলী খানকে পাঠিয়েছেন। মহীশূরের ফউজ শীগ্গিরই অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হবে।'

কিন্তু শাহ্বাযের কাছে এ খবরের কোনো গুরুত্ব নেই। তিনি অধীর হয়ে বলে উঠলেনঃ 'খালুজান, হাকীমকে ডাকুন। আমার চোখের সামনে আবার অন্ধকার নেমে আসছে।'

তাহ্ওয়ার জঙ, হরিপন্থ ও মোগল আলী খানের সেনাবাহিনীর আগমন সংবাদ শুনে সুলতান টিপু অবিলম্বে আধুনী দখল করে নেবার জন্য কয়েকবার তীব্র হামলা চালালেন, কিন্তু আধুনীর আত্মরক্ষা ব্যবস্থার দরুন তিনি সফল হলেন না। তারপর যখন পঁয়ষট্টি হাজার সওয়ার আধুনীর কাছে পৌছে গেলো, তখন সুলতান শহর দখলের ইরাদা মুলতবী রেখে তাদের পথরোধ করার চেষ্টা করলেন।

নিযাম ও মারাঠাদের দ্রুত হস্তক্ষেপের ফলে সুলতান টিপু যদিও আধুনীর কেল্লার উপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে পারলেন না, কিন্তু তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কৌশল সফল হয়েছিলো। তিনি দুশমনের জন্য একটি নতুন ফ্রন্ট খুলে দিয়ে ঠিক বর্ষা শুরু হবার প্রাক্কালে তাদের বেশীর ভাগ সৈন্যকে তুংগভদ্রা নদী পার হয়ে এগিয়ে যেতে বাধ্য করলেন। সম্মিলিত সেনাবাহিনী যদি তাদের সামরিক পরিকল্পনা কার্যকরী করতো, তা'হলে তারা তুংগভদ্রার তীরে রসদ ও বারুদের ভান্ডার জমা করতো এবং ফউজী আড্ডা কায়েম করার আগে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হত না। কিন্তু এখন তারা জরুরী ব্যবস্থাপনা ছাড়াই এগিয়ে চলে এসেছে। বর্ষা তখন আসন্ন এবং যে এলাকা দিয়ে প্লাবনের দিনে তারা রসদ পাবার আশা করতো, তুংগভদ্রা ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী সেই এলাকার বেশীর ভাগই তখন সুলতান টিপুর সেনাবাহিনীর অধিকারে। হরিপন্থ ও মোগল আলী খান উপলব্ধি করলো যে, বর্ষার প্লাবনের দরুন তাদের রসদ ও সেনা সাহায্যের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যাবে। মহাবৎ জঙকে খবর পাঠানো হল, যেনো তিনি তার পরিবারবর্গসহ আধুনী থেকে বেরিয়ে রায়চুর চলে যান। মহাবৎ জঙ আধুনীর আমীরদের সাথে পরামর্শ করে হরিপন্থের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলেন। সুতরাং একদিন আধুনীর কেল্লার দরযায় এসে দাঁড়ালো হাতী, ঘোড়া, পালকি ও বলদের গাড়ির সারি। মহাবৎ জঙ ও অন্যান্য রইস সন্তান সন্ততি নিয়ে তা'তে সওয়ার হচ্ছেন। কতক মহিলা ডুলি চড়ে কেল্লার বাইরে যাচ্ছিলেন। কেল্লার ভিতরে একটি গৃহের প্রশস্ত কামরায় তাহির বেগের

খান্দানের কতক লোক সমবেত হয়েছেন। শাহ্বায খান শয্যায় শায়িত এবং তানবীর কাতর অনুনয় করে তাহির বেগ, আতিয়া ও খান্দানের অন্যান্য মহিলাদের বললোঃ খোদার ওয়াস্তে ভাইজানকে সফর করতে বাধ্য করবেন না। হাকীম আপনাদের সামনেই বলেছেন যে, উনি কয়েক হফতা চলাফেরায় বিরত না থাকলে চিরদিনের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলতে পারেন।'

তাহির বেগ বললেনঃ 'বেটি, চিন্তা করো না। পথে যাতে ওঁর কোনো তকলীফ না হয়, তার জন্য সতর্কতা, অবলম্বন করা হবে। আমার নওকররা ওঁকে বিছানাসহ তুলে নিয়ে যাবে।'

তানবীর বললোঃ 'খালুজান, খোদার দিকে চেয়ে এ ব্যাপারে যিদ করবেন না। আমি জানি, দুশমন পথে অবশ্যি হামলা করবে এবং ওঁর হেফাযত আপনাদের জন্য এক সমস্যা হয়ে পড়বে। ওঁকে এখানেই থাকতে দিন।'

তাহির বেগ বললেনঃ 'কিন্তু মহীশূরের ফউজ যখন শহরে প্রবেশ করবে, তখন ওঁর কি হবে?'

ঃ 'মহীশূরের সিপাহীদের আমি জানি। যখমী ও অসহায় মানুষের উপর তাঁরা হাত তোলেন না।'

এক প্রৌঢ় বয়স্কা মহিলা বললেনঃ 'মীর্যা সাহেব, আপনার পুত্রবধূর ধারণা নির্ভুল। শাহ্বাযের পক্ষে এ অবস্থায় সফর করা খুবই পীড়াদায়ক হবে। ওঁর চোখের দৃষ্টি হারাবার ভয় থাকলে আপনি যিদ করবেন না। তারপর আপনারা এখানে থাকলে ওঁর থাকতে ভয় কি?'

তাহির বেগ বললেনঃ 'আচ্ছা বেটি, তোমার ধারণা এই হলে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তুমি জলদী করো। কাফেলা তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

তানবীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভংগীতে বললোঃ 'আপনি খালাজানকে পাঠিয়ে দিন। আমি এখানেই থাকবো। ভাইজানকে এ অবস্থায় ফেলে যেতে আমি পারবো না। আমায় তাঁর প্রয়োজন হবে।'

শাহ্বায প্রশান্ত হয়ে এই বিতর্ক শুনছিলেন। তিনি উঠে বসলেন এবং চীৎকার করে বললেনঃ 'তানবীর তোমায় আমার মোটেই প্রয়োজন নেই। খোদার দিকে চেয়ে তুমি এক্ষুণি খালাজানের সাথে চলে যাও।'

সাথে সাথেই শাহ্বায দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরলেন। তানবীর জলদী এগিয়ে গিয়ে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললেনঃ 'ভাইজান, খোদার নাম করে আপনি শুয়ে থাকুন তো।'

শাহ্বায খান বললেনঃ 'তানবীর, তুমি পাঁচ মিনিটের ভিতর এখান থেকে বেরিয়ে না গেলে আমি পায়দল কাফেলার সাথে যেতে তৈরী হবো। খালাজান, ওকে নিয়ে যান, নইলে আমি পাগল হয়ে যাবো।'

আতিয়া বললেনঃ 'বেটি তানবীর, এখন আর যিদ করো না। দুশমন যখন শহর দখল করবে, তখন তোমার এখানে থাকা তোমার ভাইয়ের কাছে কতোটা পীড়াদায়ক হবে, তা' তুমি জানো। কিন্তু তুমি যদি না মানো, তা'হলে আমায়ও এখানেই থাকতে হবে।'

খান্দানের বয়স্কা মেয়েদের উপদেশ ও শাহ্বাযের কড়া তাকিদে তানবীর তার খালা ও অন্যান্য মহিলার সাথে যেতে রাযী হল। কিন্তু কামরার বাইরে বেরুতেই তাঁর চোখ দিয়ে নেমে এলো অশ্রুর সয়লাব।

কাফেলা চলে যাওয়ার খানিকক্ষণ পরেই তাহির বেগ ও হাশিম বেগ নিজ নিজ ঘাঁটি সামলে নিলেন। শাহ্বায আধোঘুমের অবস্থায় শয্যার উপর পড়ে রইলেন। তাঁর শুশ্রুষায় নিযুক্ত এক নওকর তাঁর শয্যা থেকে কয়েক কদম দূরে মেঝের উপর পড়ে নাক ডাকাচ্ছিলো। দুপুর বেলায় শাহবাযের পিপাসা লাগলো এবং তিনি নওকরকে আওয়ায দিলেন। কিন্তু জওয়াবে ঘুমন্ত নওকরের নাকের আওয়ায তাঁর কাছে বড়োই অবাঞ্ছিত মনে হল। পানির সোরাহী ছিলো তাঁর শয্যা থেকে কয়েক কদম দূরে। তিনি শয্যা থেকে উঠে বসলেন এবং ধীরে পা ফেলে সোরাহীর দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি চার কদম যেতেই তিনি মস্তকে তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন এবং সাথে সাথেই তাঁর চোখে নেমে এলো অন্ধকার। এমনি অসহায় অবস্থায়ও তিনি নওকরকে পুনরায় আওয়ায দিতে চাইলেন না।

একটুখানি দেরী করে তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে পা ফেললেন সামনের দিকে। তারপর মেঝের উপর বসে হাত দিয়ে সোরাহী হাতড়াতে লাগলেন। আচানক কারুর পায়ের শব্দ এলো তাঁর কানে।

'কে ওখানে?' ঃ তিনি যন্ত্রণাপীড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

কোনো জওয়াব এলো না। তিনি অনুভব করলেন, কে যেনো নিঃশব্দ পদক্ষেপে আসছে তাঁর কাছে। তারপর শুনতে পেলেন সোরাহী থেকে পানি ঢালার আওয়ায। ভরা পেয়ালা এসে লাগলো তাঁর মুখে। তিনি এক হাতে পেয়ালা ও অপর হাতে তার হাত ধরে বললেনঃ 'খোদার কসম, বলো, তুমি কে?'

জওয়াবে ফুঁপিয়ে কাঁদার আওয়ায এলো তাঁর কানে। পানির পেয়ালা মেঝের উপর রেখে তিনি জোরে চীৎকার করে বললেনঃ 'তানবীর, তানবীর, তুমি? তুমি এখানে কি করে এলে? এতক্ষণে তোমার তো বহুক্রোশ দূরে যাবার কথা।

তানবীর আবার পেয়ালাটি তাঁর মুখে তুলে ধরে বললেনঃ 'ভাইজান ! আপনি আগে পানিটুকু পান করে নিন।'

শাহ্বায আরো খানিকটা পানি পান করে উঠে দাঁড়ালেন এবং বাহু ধরে তানবীর তাঁকে শয্যার উপর নিয়ে গেলো। শাহ্বায বারবার প্রশ্ন করলেনঃ 'তানবীর,

খোদার ওয়াস্তে বলো, তুমি কোথায় পালিয়েছিলে? কেন তুমি গেলে না? খোদা-না-খাস্তা, দুশমনের সিপাহীরা এখানে পৌঁছে গেলে কি হবে?'

তানবীর কান্নার বেগ সংযত করে বললোঃ 'ভাইজান, আপনি আমায় কাফেলার সাথে যেতে হুকুম দিয়েছিলেন, কিন্তু পথে আমি কাফেলা ছেড়ে ফিরে আসবো না, এমন হুকুম তো দেননি। শহর থেকে বেরিয়েই আমি গাড়ি থেকে নেমে এক ঘোড়ায় সওয়ার হলাম। শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে গিয়ে আমি খালাজানকে বললাম যে, আমি ফিরে যাচ্ছি। দু'জন নওকর কিছুদূর আমার পিছনে এসেছিলো, কিন্তু আমি তাদেরকে ধমক দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছি।'

শাহ্বায বললেনঃ 'তানবীর, জানি না, তোমার এ ভুলের পরিণাম কি হবে কিন্তু তোমায় আমার প্রয়োজন নেই বলে আমি ভুল করেছিলাম। এখনই আমি ভাবছিলামঃ হায় ! তুমি যদি আমার কাছে থাকতে। আমি শৌর্য সাহসের পরিচয় দেবার জন্য আধুনীর ফউজে যোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আমি বাহাদুর নই। তোমার ফিরে আসার কয়েক মুহূর্ত আগে শিশুর মতো চীৎকার করে কাঁদতে চেয়েছি। চিকিৎসক আমায় বিলকুল মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছেন। আমার মনে হয়, খুব শীঘ্‌গিরই আমি চিরকালের জন্য দৃষ্টিহীন হয়ে যাবো।'

ঃ 'ভাইজান, আমার দৃঢ় অবিশ্বাস, খুব শীঘ্‌গিরই আপনি ভালো হয়ে যাবেন। আমার ভয় হয়েছিলো যে, আপনি আমায় দেখে খুব রেগে যাবেন।'

ঃ 'আমি তোমার উপর রাগ করিনি, কিন্তু খালুজান ও হাশিম কি বলবেন?'

ঃ 'তাঁদের সম্পর্কে কোনো পেরেশানী নেই আমার। আমি শাহবাযের বোন, এ জওয়াব আমি তাদেরকে দিতে পারবো।'

মহাবৎ জঙ আধুনী ছেড়ে চলে যাবার পর মোগল আলী খান ও তাহ্ওয়ার জঙ তুংগভদ্রা নদীর দক্ষিণে সুলতান টিপুর সাথে যুদ্ধের বিপদ বরণ করে নেওয়া অপ্রয়োজনীয় মনে করলেন। সুতরাং শাহ্যাদা মোগল আলী খান ফিরে গেলেন হায়দরাবাদে এবং তাহ্ওয়ার জঙের নেতৃত্বাধীন মোগল ও মারাঠা সেনাবাহিনী কাঞ্চনগড়ের পথ ধরলো। হরিপন্থের অধিকাংশ সৈন্য সেখানে তাঁবু ফেলে অবস্থান করছিলো।

সুলতান টিপু কালবিলম্ব না করে আধুনীর দিকে ফিরে এলেন। মহাবৎ জঙ ফেরার হওয়ায় এবং মোগল আলী খান ও তাহ্ওয়ার জঙ পিছু হটে যাওয়ায় আধুনী ফউজের অফিসার ও সিপাহীরা আগেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। তাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য বাধা না দিয়েই তারা হাতিয়ার সমর্পণ করলো।

এহেন পরিস্থিতি আধুনীর শাসক গোষ্ঠীর কাছে ছিলো এক নিকৃষ্টতম বিপর্যয়ের ঘটনা। কিন্তু আওয়ামের মনোভাব ছিলো ভিন্নরূপ। মহীশূরের লশকরের তরফ থেকে কোনো বিপদের আশংকা তাদের ছিলো না; বরং তাদের বিপদাশংকা ছিলো আধুনীর হেফাজতের জন্য প্রেরিত মারাঠা ও হায়দরাবাদী সিপাহীদের তরফ থেকে।

তারা জানতো, যখন শাহ্যাদা মোগল আলী খান ও তাহ্ওয়ার জঙের ফউজের সাথে হাজারো মারাঠা এসে প্রবেশ করবে আধুনীতে, তখন আধুনীর শাসক তবকার সম্পর্কিত কয়েকটি খান্দান ছাড়া কারুরই জান, মাল ও ইয্যত সুরক্ষিত থাকবে না। তাদের দৃষ্টিতে সুলতানের বিজয় ছিলো মানবতার বিজয় এবং সুলতানের লশকর যখন শহরে প্রবেশ করলো তখন নিজ গৃহের কুঠরীতে অথবা গোপন কক্ষে তারা আত্মগোপন করলো না; বরং গৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে তারা অভ্যর্থনা জানালো মহীশূরের ফউজকে। মহীশূরের কোনো সিপাহীর তলোয়ার কোষমুক্ত হল না। কারুর মুখে ছিলো না বিজয়ের অহমিকা। আনন্দ-কোলাহল ও খুশীর অট্টহাস্যের পরিবর্তে তাদের মুখে ছিলো নির্বাক দোআ। যারা ছিলো দাক্ষিণাত্যের আমীরদের স্বেচ্ছাচার ও আত্মম্ভরিতার সাথে সুপরিচিত; তাদের কাছে মহীশূরের শাসকের সরলতা ও বিনয় ছিলো একটা নতুন অভাবনীয় দৃশ্য। মহত্ব ও মর্যাদার মূর্ত প্রতীক ছিলেন একটি খুবসুরত ঘোড়ায় সওয়ার। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি বিজয়গর্বে দর্শকদের দিকে নিবন্ধ না হয়ে ছিলো নীচে যমিনের উপর স্থির। মুসলমানরা তাঁকে মনে করতো এক দরবেশ, এক অলী ও বুযর্গ। হিন্দুদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন এক দেবতা এবং আধুনীর নারীরা তাকে মনে করতো তাদের ইয্যতের রক্ষক।

শাহ্বায বালিশে ঠেস দিয়ে শয্যার উপর বসে রয়েছেন। তানবীর এক জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কেল্লার প্রশস্ত আঙিনার দিকে উঁকি মেরে দেখছেন। মহীশূরের সিপাহীরা সেখানে এসে জমা হচ্ছে।

শাহবায বললেনঃ 'তানবীর, এখানে এসে বসো। পেরেশান হয়ে কোনো ফায়দা নেই। যা হবার, তা তো হবেই।

তানবীর এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে এক মোড়ার উপর বসলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেনঃ 'ভাইজান, ওঁরা এখনো এলেন না। খালুজান বলছিলেন, কয়েদ করলেও আমরা এখানেই থাকবার চেষ্টা করবো।'

শাহ্বায জওয়াব দিলেনঃ 'বিজয়ী লশকর তাদের কয়েদী কোথায় রাখবে, তার পরামর্শ তাদের কাছ থেকে নেবে না। এখনো কয়েদীদের দেখাশুনা করতে অনেক সময় লাগবে। তানবীর, তোমাদের উপর এ মুসীবত আমারই জন্য, তার জন্য আমি লজ্জিত। আর দেখো, কি আশ্চর্য ব্যাপার, যতোক্ষণ তোমাদের এখান থেকে পালিয়ে যাবার মওকা ছিলো, আমার ততোক্ষণ বিছানা থেকে মাথা তোলাই ছিলো দুঃসাধ্য। আজ আমি দুটি ঘন্টা এমনি করে বসে রয়েছি, কিন্তু আমার কোনো তকলীফ হচ্ছে না। আজ আমার মনে হচ্ছে, যেনো আমার দৃষ্টিশক্তি কক্ষণো খারাপ হয়নি। তুমি এজাযত দিলে আমি বাইরে গিয়ে ওঁদের খোঁজ নেই।'

তানবীর বললেনঃ 'না ভাইজান, আমি আপনাকে বিছানা থেকে উঠবার এজাযত

দেবো না। চিকিৎসক বারবার তাকিদ করেছেন, কেবল পূর্ণ বিশ্রামই আপনাকে বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে।

বাইরে পদশব্দ শোনা গেলো। তানবীরের বুক কাঁপতে লাগলো। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

হাশিম বেগ কামরায় প্রবেশ করে বললেনঃ 'দুশমন সাধারণ সিপাহীদের মুক্ত করে দিয়েছে, কিন্তু অফিসারদের সম্পর্কে স্থির হয়েছে যে, যুদ্ধের সময়ে তাঁদেরকে আটক রাখা হবে। এক্ষুণি আমাদেরকে কেল্লার বাইরে কোনো ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে। আমায় মাত্র দু'মিনিটের জন্য আপনাদের কাছে আসার এজাযত দেয়া হয়েছে। আমার সাথে দু'জন সিপাহী এসে দরযায় অপেক্ষা করছে। আপনাদের সাথে ওরা কিরূপ আচরণ করবে, জানি না। শুধু এতটা জানা গেছে যে, কেল্লার ভিতর যেসব নারী ও শিশু রয়েছেন, আপাতত তাঁদেরকে শহরের কতকগুলো বাড়িতে সরিয়ে নেওয়া হবে। কেল্লা খালি করবার কারণ এখনো জানা যায়নি। দুশমন কেল্লা তাদের ফউজের জন্য ব্যবহার করবে, এমন কোনো স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সুলতান টিপু কেল্লা তদন্ত করে তাঁবুতে চলে গেছেন। তিনি এখান থেকে ফউজের মাত্র কয়েকটি দল সাথে নিয়ে গেছেন। দুশমন এখানকার ভারী তোপগুলোও বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। আব্বাজানের বিশ্বাস, সুলতানের ফউজ আপনাদের সাথে যবরদস্তি করবে না, আর তিনি যদি সুলতান অথবা তার কোনো বড়ো অফিসারের কাছে হাযির হবার মওকা পান, তা'হলে তিনি আবেদন জানাবেন, যেনো আপনাকে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে দেওয়া হয়। আমি আপনাকে আর একটি খবর শোনাচ্ছি। তা'হচ্ছে, এক্ষুণি আমি মুরাদ আলীকে দেখেছি।'

শাহ্বায চমকে উঠে বললেনঃ 'মুরাদ আলী- সেরিংগাপটমের মুরাদ আলী ? আপনি তাঁর সাথে কথা বলেছেন ?'

ঃ 'না, তাঁর মনোযোগ ছিলো অপরদিকে। তখন তাঁর সাথে দেখা করাটা আমি ভালো মনে করলাম না।'

তানবীর প্রশ্ন করলেনঃ 'আপনি ঠিক জানেন যে, তিনি আর কেউ নন?'

ঃ 'হ্যাঁ, আমি পাঁচছয় কদমের দূরত্ব থেকে তাঁকে দেখেছি। আমার চোখ আমায় ধোকা দিতে পারে না।'

বাইরে থেকে দরযায় করাঘাতের আওয়ায এলো। হাশিম বেগ বলে উঠলেনঃ 'সিপাহীরা আমায় ডাকছে।'

তানবীরের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। হাশিম বেগ এক মুহূর্ত দেরী করে দরযার দিকে এগিয়ে গিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন। শাহ্বায ও তানবীর দীর্ঘ সময় পেরেশানী ও উদ্বেগের অবস্থায় বসে থাকলেন।

প্রায় এক ঘন্টা পর নওকর পেরেশান হয়ে কামরায় প্রবেশ করে শাহ্বাযকে বললোঃ 'হুযুর, মহীশূর ফউজের এক অফিসার ও তিনজন সিপাহী দরযায় দাঁড়ানো।

তারা দশ মিনিটের মধ্যে ঘর খালি করে দিতে বলছে। কেল্লার সব বাড়িই খালি করা হচ্ছে। আমি তাদেরকে বহুত বুঝিয়েছি যে, এ বাড়িতে এক পর্দানশীন বিবি তাঁর ভাইকে নিয়ে রয়েছেন, যাঁর পক্ষে দু'কদম চলাও দুঃসাধ্য। কিন্তু অফিসার বললেনঃ 'যে কোনো অবস্থায় এ বাড়ি খালি করতে হবে। চলাফেরা করতে অসমর্থ কোনো লোক এখানে থাকলে আমার সিপাহীরা তাকে বয়ে নিয়ে যাবে।'

'আমি নিজে তাঁদের সাথে কথা বলবো'ঃ বলে তানবীর তাঁর দোপাট্টা সামলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ঃ 'তানবীর ! তানবীর ! দাঁড়াও, তুমি বাইরে যেয়ো না।' বলে শাহ্বায বিছানা থেকে উঠলেন এবং দরযার কাছে গিয়ে আচানক পেছন ফিরে দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে মেঝের উপর বসে পড়লেন।

নওকর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দরযার সামনে দাঁড়িয়েছিলো। সে ছুটে এসে শাহবাযের বাহু ধরে তাঁকে নিয়ে বসিয়ে দিলো একটা মোড়ার উপর।

বাড়ির বাইরে মহীশূর ফউজের এক অফিসার তানবীরের সাথে বলছিলেনঃ 'মোহ্তারেমা, এ কেল্লা কেন, কি কারণে খালি করা হচ্ছে, তা' আমি আপনাকে বলতে পারছি না। আমি শুধু আমার সিপাহ্সালারের হুকুম তামিল করছি। আপনার ভাই যদি চলাফেরা করতে না পারেন, তা'হলে তাঁকে বয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু এখন আমাদের আলাপ করার বেশী সময় নেই।

তানবীর বললেনঃ 'আপনি মুরাদ আলীকে জানেন? তিনি আছেন আপনাদের ফউজে?'

ঃ 'আমাদের ফউজে এ নামের কয়েকজন থাকতে পারেন। আপনি কোন মুরাদ আলী সম্পর্কে প্রশ্ন করছেন?'

ঃ 'তিনি সেরিংগাপটমের বাসিন্দা। তাঁর বড়ো ভাইয়ের নাম আনওয়ার আলী। তাঁর পিতার নাম ছিলা মোয়ায্যম আলী। তিনি মহীশূর ফউজের খুব বড়ো অফিসার ছিলেন। তাঁর দুই বড়ো ভাই সিদ্দীক আলী ও মাসউদ আলী কয়েক বছর আগে ইংরেজের সাথে লড়াই করে শহীদ হয়েছেন।'

ঃ 'মুরাদ আলী এখন এখানেই আছেন এবং তাঁর ভাই আনওয়ার আলী আমাদের অফিসার, কিন্তু তাঁদের সাথে আপনার সম্পর্ক?'

ঃ তাঁরা আমার ভাই।'

অফিসার পেরেশান হয়ে সাথীদের দিকে একবার তাকিয়ে তাঁকে বললেনঃ 'আপনি মুরাদ আলী ও আনওয়ার আলীর বোন হলে আমায়ও আপনার ভাই মনে করবেন।'

ঃ 'আপনি মুরাদ আলীকে আমার পয়গাম পৌঁছে দেবেন। তাঁকে বলবেনঃ আকবর খানের বেটি তানবীর আপনাকে দেখতে চান। শাহবায খান শয্যাশায়ী

হয়ে গেছেন এবং চিকিৎসক তাঁকে চলাফেরা করতে মানা করেছেন।'

অফিসার বললেনঃ 'আমি আপনার পয়গাম নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আপনাদেরকে যে কোনো অবস্থায় এ গৃহ খালি করে দিতে হবে।'

নওজোয়ান অফিসার ও সিপাহীরা চলে গেলে তানবীর ফিরে এসে ভাইয়ের কামরায় প্রবেশ করলেন। শাহ্বায দু'হাতে মাথা চেপে ধরে মোড়ার উপর বসে রয়েছেন। তানবীর তাঁকে হাত ধরে তুলবার চেষ্টা করে বললেনঃ 'আইজান, আপনি বিছানায় শুয়ে পড়ুন। এখন আপনার বসবার চেষ্টা না করাই ভালো।'

শাহ্বায তাঁর গায়ে ভর করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

তানবীর তাঁর মুখ দেখে তাঁর তকলীফ আন্দায করে নিয়ে বললেনঃ 'কি হল, ভাইজান? আবার আপনি ব্যথা অনুভব করছেন?'

ঃ আমি সুস্থই আছি।' শাহ্বায অভিযোগের স্বরে বললেনঃ 'তোমার বাইরে যাওয়া উচিত হয়নি। ওঁরা কি বলছিলেন?'

ঃ 'বলছিলেন যে, আমরা এখানে থাকতে পারবো না।'

ঃ 'আর তুমি মুরাদ আলীর কাছে দয়ার আবেদন জানিয়েছো?'

ঃ 'ভাইজান, এ ব্যাপারে আপনার দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। মুরাদ ও আনওয়ার মহীশূর ফউজের সিপাহী হওয়া সত্ত্বেও আমার ভাই। এক বোনের অধিকার আমি তাঁদের কাছে দাবি করতে পারি।'

শাহ্বায কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেনঃ 'তানবীর, তাঁদের সাথে আমাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। তুমি জানো, আমি যখমী হওয়ার আগে মহীশূরের চারজন সিপাহীকে গুলী করেছি এবং এটা শুধু একটা আকস্মিক ব্যাপার যে, তাদের মধ্যে মুরাদ বা আনওয়ার ছিলেন না, নইলে বন্দুক চালাবার সময়ে আমি তাঁদের সাথে আমার সম্পর্কে চিন্তা করবার প্রয়োজন বোধ করিনি। তুমি যদি এখন তাঁদের কাছে পয়গাম পাঠিয়ে থাক, তা'হলে আমার বিশ্বাস, তাঁরা অবিলম্বে এখানে আসবেন। হয়তো আমায় এ অবস্থায় দেখে তারা ভুলে যাবেন যে, আমি তাঁদেরই বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। কিন্তু আমি কোন মুখে বলবো যে, আমি তাঁদের কাছ থেকে মানবোচিত আচরণের হকদার। তানবীর, তুমি তাঁদের কাছ আমারই জন্য করুণাপ্রার্থী হবে, এ আমি বরদাশত করতে পারবো না। যদি তুমি এ অবস্থায়ও তাঁদেরকে ভাই বলে মনে করো, তা'হলে তাঁদেরকে বলো তোমায় আব্বাজানের কাছে পৌঁছে দিতে। কিন্তু আমার জন্য কৃপা ভিক্ষা করে আমায় তাঁদের কাছে লজ্জিত করো না। হায় ! তুমি যদি এখানে ফিরে না আসতে! হায় ! ওরা যদি আমায় ভগ্নস্তূপের ভিতর থেকে বের করে না আনতো আর আজ আমি আমার বোনের অসহায় অবস্থা দেখার জন্য যিন্দা না থাকতাম! আমার উপর হয়তো এটা কুদরতের শেষ অনুগ্রহ যে, মুরাদ আলীর সামনে আমায় লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেবার প্রয়োজন হবে না। এখন তিনি

এলে আমি অন্ধকারে শুধু তার মুখের কথাই শুনতে পাবো। আজ ভোর থেকে আমি খুশী হয়ে ভাবছিলাম, বুঝি আমার চোখ ভালো হয়ে যাচ্ছে। আমার ধারণা ছিলো, আমি নিজের পায়ে হেঁটে কেল্লার বাইরে যেতে পারবো, কিন্তু আমার মাথার ব্যথা আগের চাইতেও দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে এবং এখন আর সেই আলোর রশ্মিরেখাটুকুও দেখতে পাচ্ছি না।'

তানবীর বললেনঃ 'ভাইজান, আপনি কিছু সময় শুয়ে থাকুন। একটুখানি বিশ্রাম করলেই আপনি সুস্থ হবেন।'

শাহ্‌বায কয়েক মিনিট চোখ বন্ধ করে নির্বাক পড়ে থাকলেন। অবশেষে তিনি চোখ খুলে বললেনঃ 'এখন আমার মনে হয়, আমার চোখের সামনে থেকে আঁধারের মেঘ ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে, তানবীর! জানালার ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ আলোর রেখা আমার নযরে আসছে। তোমার আবছা আভাস আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্ত মুরাদ আলী এলে আমার চোখের কথা কিছু বলো না যেনো।'

তানবীর অশ্রুসজল চোখে বললেনঃ 'ভাইজান ! আপনার চিকিৎসা সাহায্যের প্রয়োজন না হলে আমি আব্বাজানের বন্ধুপুত্রদের আমাদের অসহায়তার দৃশ্য দেখবার জন্য দাওয়াত দিতাম না। আত্মসম্ভ্রমবোধহীনা আমি নই। আমাদের দেহে একই পিতার রক্তধারা প্রবাহিত। আমরা একই মায়ের দুধ পান করেছি। কিন্তু আপনি আমায় বোনের কর্তব্য পালন করতে বাধা দেবেন না। আর আমি তো শুধু আপনার কথাই ভাবছি না, আব্বাজান, আম্মাজান ও সামিনার কথাও ভাবছি।

ঃ 'সামিনা-আমার ছোট্ট বোন সামিনা!' বেননাব্যঞ্জক স্বরে শাহ্‌বাযের কণ্ঠে উচ্চারিত হল এবং তাঁর চোখ দু'টি অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি তখন কল্পনায় বহু ক্রোশ দূরে নিজ বস্তির ঘন গাছপালার ছায়ায় শুনতে পাচ্ছেন সামিনার আনন্দমুখর হাস্যকোলাহল।

নওকর দরযা দিয়ে উঁকি মেরে বললোঃ 'হুযূর, মহীশূর ফউজের দু'জন অফিসার ভিতরে আসার এজাযত চাইছেন। একজন তাঁর নাম বললেন মুরাদ আলী।

তানবীর বললেনঃ ' তাঁদেরকে নিয়ে এসো।'

নওকর বাইরে বেরিয়ে এলো।

তানবীর কুরসি থেকে উঠে বললেনঃ 'ভাইজান, আমি অপর কামরায় যাচ্ছি। কিন্তু ওঁরা এলে আপনি উঠবার চেষ্টা করবেন না।'

শাহ্‌বায কোনো জওয়াব দিলেন না। তানবীর ধীরে ধীরে পা ফেলে মুখোমুখি কামরায় চলে গেলেন এবং আধখোলা দরযার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মুরাদ ও আনওয়ার কামরায় প্রবেশ করলেন। তাঁরা 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে এগিয়ে এলেন। শাহ্‌বায তাঁদের অস্পষ্ট আভাসমাত্র দেখতে পেলেন। শয্যায়

শুয়ে শুয়ে তিনি ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেনঃ 'ওয়া আলাইকুম আস্‌সালাম। মাফ করবেন, আমি কষ্টের দরুন উঠতে পাচ্ছি না।'

মুরাদ আলী তাঁর সাথে মোসাফাহা করে বললেনঃ 'এই যে ভাইজান আনওয়ার আলী।'

আনওয়ার শাহ্‌বাযের হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন ঃ 'আপনার সাথে মোলাকাত ছিলো আমার যিন্দেগীর অতি বড়ো আকাঙ্খা, কিন্তু অবস্থায় আমাদের মোলাকাত হবে, সে আশা করিনি।'

ঃ 'আপনারা তশ্‌রীফ রাখুন।' শাহ্‌বায বললেনঃ

তাঁরা শয্যাপার্শ্বে কুরসীর উপর বসলেন।

মুরাদ আলী বললেনঃ 'বোন তানবীরের খবর শুনে আমি পেরেশান হয়ে পড়েছিলাম। আপনার অবস্থা কেমন ? আপনি এখানে কবে এলেন ? আপনার মাথায় কেন পট্টি বেঁধেছেন? হাশিম ও তাঁর বাপ কোথায়?'

ঃ 'হাশিম ও তাঁর বাপ আপনাদের কয়েদখানায়। আমার মামুলী যখম হয়েছিলো। যখম প্রায় মিটে এসেছে, কিন্তু মাথায় প্রায়ই ব্যথা থাকে। হাকিম বালিশ থেকে মাথা তুলতে মানা করেছেন।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'মাথার যখম মিটে যাওয়া সত্ত্বেও যদি আপনি কষ্ট অনুভব করেন, তা'হলে আপনার খুবই সতর্ক থাকতে হবে। আপনার চিকিৎসার জন্য আমাদের ফউজের শ্রেষ্ঠ হাকীম ও অস্ত্রচিকিৎসকের খেদমত হাসিল করতে পারবো।

শাহ্‌বায বললেনঃ 'কিন্তু আমার জন্য আপনার কোনো তকলীফ করবার আগে আমি বলে দিতে চাই যে, আমি আধুনীর ফউজের সিপাহী এবং আপনাদের ফউজের সাথে লড়াইয়ে আমি যখম হয়েছি।'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'মহীশূরের চিকিৎসক এলাজ করার সময়ে দোস্ত-দুশমনের পার্থক্য করেন না। আধুনী বিজয়ের পর আপনাদের হেফাযত আমাদের কর্তব্য। আমাদের সামনে প্রথম সমস্যা আপনাদেরকে কোনো নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা। হাশিম ও তাঁর বাপ গেরেফতার হয়ে থাকলে তাঁদেরকে অন্যান্য কয়েদীর সাথে শহরের বাইরে এক শিবিরে পাঠানো হয়েছে। সেখানে আপনাদের জন্য এক আলাদা খিমার ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং এলাজেরও সর্বপ্রকার সুবিধা করে দেওয়া হবে।'

শাহ্‌বায প্রশ্ন করলেনঃ 'কয়েদীদের শিবির এখান থেকে কতো দূর?'

ঃ 'শিবির এখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে কিন্তু আপনাদের জন্য বলদের গাড়ির ইন্তেযাম হতে পারে, আর যদি আপনারা বলদের গাড়িতে সফর পসন্দ না

করেন, তা'হলে আমাদের লোক আপনাদেরকে খাটিয়ার উপর তুলে সেখানে নিয়ে যাবে।'

শাহ্‌বায প্রশ্ন করলেনঃ 'আপনারা আমাদেরকে এ গৃহ খালি করবার জন্য কতোটা সময় দেবেন?'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'আমরা আপনাদেরকে পনেরো মিনিটের বেশী সময় দিতে পারবো না বলে দুঃখিত।'

সামনের কামরার দরযা খুলে গেলো এবং তানবীর এক সাদা চাদর মাথায় দিয়ে বেরিয়ে এলেন। চোখ দু'টি ছাড়া তাঁর মুখের সবটুকুই চাদরে ঢাকা। আনওয়ার ও মুরাদ সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালেন।

তানবীর বললেনঃ 'ভাইজান আপনাদেরকে বলেন নি যে, তাঁর জন্য সফর করা বিপজ্জনক।'

শাহ্‌বায উদ্বিগ্ন হয়ে বললেনঃ 'তানবীর, খোদার কসম, তুমি চুপ থাক।'

কিন্তু তানবীর তাঁর রাগের দিকে আমল দিলেন না। তিনি বললেনঃ 'কেল্লা খালি করার ভিতরে আপনাদের কি উদ্দেশ্য রয়েছে, জানি না, কিন্তু এ যদি সুলতানের হুকুম হয়ে থাকে, তা'হলে আপনি তাঁকে বলবেন, এখানে এক অসহায় যখমী তাঁর ফউজের জন্য কোনো বিপদের কারণ হবে না।'

আনওয়ার আলী পেরেশান হয়ে বললেনঃ 'আমার তরফ থেকে আপনি আশ্বস্ত থাকতে পারেন যে, আমরা ওঁকে কোনো তকলীফই দেবো না।'

ঃ 'যদি কোনো মামুলী তকলীফের হাত থেকে বাঁচার প্রশ্ন হত, তা'হলে আপনাদেরকে কোনো অনুরোধই করতাম না। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, উনি চিরকালের জন্য দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে না যান। ভাইজান এখনো আপনাদেরকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন না।'

আনওয়ার ও মুরাদ কয়েক মুহূর্ত মোহাচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন। অবশেষে আনওয়ার আলী বললেনঃ 'শাহ্‌বায, এ কেল্লা বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে আমরা অসহায়, কিন্তু আমি আপনাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, আপনাদের এখানে থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।'

তানবীর বললেনঃ 'কেল্লা খালি করা জরুরী হলে আমাদেরকে কয়েদী শিবিরে না পাঠিয়ে শহরে আমাদের নিজ গৃহে থাকার এজাযত দেওয়া কি সম্ভব হতে পারে না?'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'শহরে যদি আপনাদের বাড়ি থাকে, তা'হলে এতটা পেরেশান হবার কি প্রয়োজন? আপনারা এক্ষুণি তৈরী হয়ে নিন। আমি কয়েকজন লোক ডেকে আনছি।'

শাহ্‌বায বললেনঃ 'একটি কথা বলে দেওয়া আমি জরুরী মনে করছি। আকবর

খানের পুত্র হিসাবে আমার যে হক ছিলো আপনাদের উপর, তা' সেদিনই খতম হয়ে গেছে, যেদিন আমি আধুনীর ফউজে ভর্তি হয়েছি। আমার খাতিরে আপনারা কোনো ব্যক্তিগত বিপদ বরণ করে নেন, এটা আমি কোনো অবস্থাতেই চাইবো না। সাধারণ যুদ্ধবন্দীর চাইতে ভালো ব্যবহার পাবার যোগ্য আমি নই। তাই যদি কেল্লা খালি করতে হয়, তা'হলে আমার পরোয়া করবেন না। আমি কয়েদী শিবিরে যাবার জন্য তৈরী।'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'আমি আপনাকে নিশ্চিত বলে দিচ্ছি, প্রত্যেক, যখমী লোককে যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, আপনাকেও তার চাইতে বেশী কিছু দেওয়া হচ্ছে না। আপনারা যদি শহরে থাকতে পারেন, তা'হলে আপনাদেরকে কয়েদী-শিবিরে পাঠাবার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। হয়তো মহিমান্বিত সুলতান আপনার খাতিরে হাশিম ও তাঁর বাপকে শহরেই থাকার এজাযত দেবেন। তাঁদেরকে শুধু এই ব্যাপারে যামানত দিতে হবে যে, তাঁরা যুদ্ধ চলাকালে ফেরার হয়ে পুনরায় দাক্ষিণাত্যের ফউজে শামিল হবার চেষ্টা করবেন না। এও সম্ভব যে, মহীশূর ও দাক্ষিণাত্যের দুই হুকুমতের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়ে যাবে এবং মহিমাণ্বিত সুলতান কয়েদীদের মুক্তির হুকুম জারী করবেন। কিন্তু এখন কথার সময় নেই। মুরাদ, তুমি কয়েকজন লোক ডেকে এনে এঁদেরকে বাড়িতে পৌছে দেবার ইন্তেযাম করো। আমি ওঁর এলাজের জন্য কোনো যোগ্য হাকীমের খেদমত হাসিল করবার চেষ্টা করছি।'

এক ঘন্টা পর শাহ্‌বায ও তানবীর শহরের একটি সুদৃশ্য গৃহে স্থানান্তরিত হলেন। শাহ্‌বাযকে খাটিয়ার উপর তুলে আনা হয়েছে শহরে। মহীশূর ফউজের একজন শ্রেষ্ঠ হাকীম তাঁর চোখের দেখাশোনা করলেন। মুরাদ আলী ও আনওয়ার আলী তাঁর শয্যার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর সামনের কামরায় তানবীর মাথা নুইয়ে বসে আছেন এক কুরসীর উপর। হাকীম আনওয়ার আলীর সাথে চাপা গলায় কয়েকটি কথা বলে বেরিয়ে গেলে তানবীর অর্ধোন্মুক্ত দরযার আড়ালে দাঁড়িয়ে কম্পিত আওয়াযে প্রশ্ন করলেনঃ 'ভাইজান ! হাকীম কি বলছিলেন?'

আনওয়ার আলী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জওয়াব দিলেনঃ 'হাকীম বলছিলেন, কয়েক হফতা ওঁর পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।'

ঃ 'ভাইজানের চোখ ভালো হয়ে যাবে না ?'

আনওয়ার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিষণ্ন কণ্ঠে বললেনঃ 'বোন, হাকীমের দিক থেকে কোনো ত্রুটি হবে না।'

ঃ 'ওঁর চিকিৎসায় উনি ভালো হবেন বলে আপনি বিশ্বাস করেন?'

ঃ 'তিনি নিশ্চিত কিছু বলেন নি। এরূপ অবস্থায় চিকিৎসকের যোগ্যতার চাইতে বেশী করে খোদার রহমতের উপর নির্ভর করা উচিত।'

মুরাদ আলী বললেনঃ 'আমার বিশ্বাস, উনি ভালো হয়ে যাবেন।'

আনওয়ার ও মুরাদ কিছুক্ষণ বসে থাকলেন শাহ্বাযের কাছে। অবশেষে তাঁরা পরদিন আসার ওয়াদা করে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মিনিট পর তানবীর ভাইয়ের কাছে বসে কেল্লার দিক থেকে ভয়াবহ আওয়ায শুনতে পেলেন।

শাহ্বায বললেনঃ 'তানবীর ! যুদ্ধ শুরু হবার আগে আধুনীর ফউজের এক সিপাহী হিসাবে আমি দেখেছি ভবিষ্যতের কতো স্বপ্ন। আমার মাথায় কখনো ধারণা জেগেছে, কোনো ময়দানে যখমী হবার পর দুশমনের ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে যাচ্ছে আমার দেহ, অথবা কোনো যুদ্ধে আমি গেরেফতার হয়েছি এবং দীর্ঘকাল দুশমনের কয়েদখানায় আবদ্ধ থাকার পর গৃহে ফিরে যাচ্ছি আর আমার অবস্থা দেখে আব্বাজানের মনে জেগে উঠছে করুণা, তিনি বুকে টেনে নিচ্ছেন আমায় অতীতের সকল তিক্ততা ভুলে। কিন্তু এ কথা তো আমি ভাবিনি কখনো যে, এমনি অসহায় অবস্থায় মুরাদ ও তাঁর ভাইয়ের কাছে আমায় অনুগৃহীত হতে হবে আর আমারই জন্য তোমায় এমনি করে তকলীফ বরণ নিতে হবে। আমার উপর আল্লাহ্র শেষ অনুগ্রহ, দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত হবার পর আমি আনওয়ার ও মুরাদের মুখের উপর বিজয়ের হাসি দেখতে পাইনি আর তাঁদের সামনে লজ্জা ও কুণ্ঠায় মাথা নত করবার প্রয়োজন হয়নি আমার।'

তানবীর বললেনঃ 'ভাইজান, আমি তাঁদের মুখে বিজয় ও কৃতিত্বের হাসি দেখিনি, তাঁদের চোখে দেখেছি অশ্রু। আমার বিশ্বাস, সুলতান টিপু যখন শহরে প্রবেশ করতে গিয়ে পথে পড়ে থাকতে দেখেছেন আধুনীর সিপাহীদের লাশ, তখন তাঁরও এমনি অবস্থাই হয়েছিলো। আমাদের দুর্ভাগ্য, নিযাম এমন একটি লোককে দুশমন বলে ধরে নিয়েছেন, যিনি শুধু মহীশূরেরই নন; বরং গোটা হিন্দুস্তানের মুসলমানদের শেষ আশার আলো। বর্তমান অবস্থায় আমরা শুধু এই দোআই করতে পারি যে, খোদা নিযামুল-মুলককে সঠিক পথে চলবার তওফীক দিন, অথবা আমাদেরকে তাঁর ভুলের পথে সমর্থন দিতে অস্বীকার করার হিম্মৎ ও শক্তি দান করুন।'

শাহ্বায বললেনঃ 'তানবীর, আমি তোমায় বলেছি যে, যখমী হবার আগে আমি মহীশূরের চারজন সিপাহীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি। তাঁরা আমার চাইতে ভালো মুসলমান ছিলেন আর আজ মহীশূরের ফউজের কোনো লোকের উপকার গ্রহণ করতে যদি লজ্জাবোধ না করি, তা'হলে তুমি আমায় ঘৃণ্য মনে করবে না?'

তানবীর অশ্রুসজল চোখে বললেনঃ 'আমি শুধু জানি, আপনি আমার ভাই।'

ঃ 'হ্যাঁ, আমি তোমার ভাই আর তুমি আমারই জন্য নিরুপায় হয়ে এখানে থেকেছো। আমার বোন বলেই তুমি আমার কোন ভুলত্রুটিকে সাজার যোগ্য মনে করবে না। আমার সম্পর্কে এখন তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো যে, সিপাহী হিসাবে আমার যিন্দেগী খতম হয়ে গেছে। কুদরৎ আর আমায় সুলতান টিপুর বিরুদ্ধে তলোয়ার উত্তোলন করবার মওকা দেবেন না, কিন্তু হাশিম তোমার স্বামী। তাঁরই

সাথে তোমার সারা যিন্দেগী কাটবে। তাঁর খান্দান আধুনীর পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের কোনো সুযোগই ছেড়ে দেবে না। হাশিমকে আমি ভালো করেই জানি। সুলতান টিপুর সদাচরণ তাঁর মনে কোনো পরিবর্তন আনবে না। তোমার বিবেক বারবার পীড়ন করবে যে, তিনি এক ভুলের বশবর্তী হয়ে লড়াই করে যাচ্ছেন। কিন্তু বিবি হিসাবে তাঁর ত্রুটি ও ভুল তোমায় বরদাশত করে যেতে হবে। শ্বশুরের খান্দানের ইয্যত ও সৌভাগ্যের চিন্তা তোমার মনে আসবে। তাই তুমি দোআ করবে নিযাম ও তাঁর মিত্রদের বিজয়ের জন্য। কিন্তু যখন তুমি চিন্তা করবে যে, সুলতান টিপু ইসলাম ও মানবতার সমৃদ্ধি কামনা করেন এবং তাঁর ডানে-বাঁয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আনওয়ার ও মুরাদের মতো লোক, তখন এই ধরনের দোআ করা কতোটা পীড়াদায়ক হবে, ভেবে দেখেছো?'

তানবীর বললেনঃ 'ভাইজান, শাদীর আগে কখনো আমি আমার ভবিষ্যতের চিন্তা করিনি। আমি শুধু জানতাম যে, আমি খালার ঘরে যাচ্ছি। আপনি যখন আব্বাজানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আধুনীর ফউজে ভর্তি হলেন, তখন আমি মনে করলাম যে, খালুজানের খান্দানের লোকদের বিদ্রুপ আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং আমি দোআ করেছি, যেনো সিপাহী হিসাবে আপনার সুনাম-সুখ্যাতি আধুনীর বড়ো বড়ো লোকদের কাছেও ঈর্ষার বস্তু হয়। কিন্তু এ ধারণা আমার মনে আসেনি যে, সিপাহী হিসাবে কৃতিত্ব দেখাবার সময়ে আমার ভাই ও স্বামীকে কোনো ভুলের উপর লড়াই করতে হবে। এখন আমার কাছে দোআ ছাড়া আর কিছু নেই, আর আমার দোআ হবে শুধু এই যে, খোদা আমার স্বামীকে যেনো মিথ্যার পরিবর্তে সত্যের সমর্থন করবার শক্তি-সাহস দান করেন।'



মুরাদ ও আনওয়ার ক্রমাগত এসে শাহ্বাযের শুশ্রুষা করতেন। শাহ্বায তাঁদের প্রীতি ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারলেন না। অসহায়তা ও লজ্জার অনুভূতি দূর হয়ে জেগে উঠলো কৃতজ্ঞতার মনোভাব। মহীশূর ফউজের যোগ্যতম হাকীমের এলাজের ফলে তাঁর মাথায় ব্যথার তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে তিনি এতটা পার্থক্য অনুভব করেন যে, আলো-অন্ধকারের লুকোচুরি তার মনে কখনো যে আশা আর কখনো নিরাশা সৃষ্টি করতো, তা' শেষ হয়ে গেছে; এখন তাঁর দৃষ্টির সামনে প্রায় স্থায়ীভাবে ভেসে বেড়ায় একটা অস্পষ্ট আভাস। তা'তে তিনি নিজের আশপাশে কয়েক কদম দূরের অস্পষ্ট দৃশ্য দেখতে পান।

আনওয়ার ও মুরাদ কখনো আসেন কয়েক মিনিটের জন্য, আবার কখনো বা দু'-এক ঘন্টা এসে থাকেন তাঁর কাছে। তানবীর প্রথম সাক্ষাতের সময়ে বাধ্য হয়ে সামনে এসেছেন, এখন পাশের কামরার দরযার আড়ালে বসে তাঁদের কথা শোনেন। মুরাদ আলী একা এলে তিনি অনেকটা অবাধে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেন কিন্তু আনওয়ার আলীর সামনে এক-আধটা কথার বেশী বলতে সাহস হয় না। সামরিক বা রাজনৈতিক প্রসংগ নিয়ে আলাপ হয় না তাঁদের, হয় শুধু ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে।

শাহ্বায তাঁদেরকে কখনো শোনান তাঁর ভ্রমণ ও শিকারের কাহিনী এবং কখনো সামিনার নিষ্পাপ দুষ্টুমির কথা। আনওয়ার ও মুরাদ তাঁকে শোনান তাঁদের ছেলেবেলার ঘটনা। একদিন জিনের কথা উঠলো এবং শাহ্বাযের অনুরোধে তাঁর কাহিনী বর্ণনা করলেন। প্রত্যেক মোলাকাতের শেষে আনওয়ার ও মুরাদ শাহ্বায ও তাঁর বোনের মনে রেখে যান এই ধারণা যে, মোয়ায্যম আলী ও আকবর খানের সন্তান-সন্ততির সম্পর্কের উপর সমসাময়িক বিপ্লব কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

একদিন আনওয়ার ও মুরাদ অপ্রত্যাশিতভাবে সারা দিনে শাহ্বাযকে দেখতে এলেন না, কিন্তু ইশার নামাযের পর নওকর এসে খবর দিলো যে, আনওয়ার আলী কয়েক মিনিটের জন্য হাযির হবার এজাযত চান। তানবীর তাঁর শয্যা ছেড়ে অপর কামরায় চলে গেলেন। শাহ্বায আনওয়ার আলীকে কাছে ডাকলেন।

আনওয়ার কামরায় ঢুকে কোনো ভূমিকা না করেই বললেনঃ 'ভাই, আজ আমি বড়োই ব্যস্ত ছিলাম। তাই আপনাকে দেখার জন্য আসতে পারিনি। মুরাদ আলী ভোরে এক অভিযানে চলে গেছে। আমিও রাত্রির শেষ প্রহরে চলে যাচ্ছি এখান থেকে। আমাদের সিপাহ্সালার আধুনীর কেল্লাদারকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন সর্বপ্রকারে আপনাদের প্রতি খেয়াল রাখতে। আজ আপনার খালু ও হাশিমকে কয়েদী শিবির থেকে এখানে পাঠাবার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার জন্য কোনো বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়নি। যে সব কয়েদীর সন্তান-সন্ততি এখানে রয়েছে, কেল্লাদার তাঁদের সবাইকে শহরে পাঠাবার হুকুম দিয়েছেন। বাকী কয়েদীদের আর কোনো কেল্লায় পাঠানো হবে। আপনারা ইচ্ছা করলে খালাজান ও অন্যানা স্বজনকে এখানে আনাতে পারেন। আপনার সাথে পরামর্শ না করেই আপনার আব্বাজানের কাছে আমি চিঠি লিখেছি। শহরের এক ব্যবসায়ী তাঁর কাছে চিঠি পৌছাবার দায়িত্ব নিয়েছেন। সফর করার যোগ্য হবার পর যদি আপনি তাঁর কাছে যেতে চান, তা'হলে কেল্লাদারের তরফ থেকে এজাযত পাবেন।'

শাহ্বায বললেনঃ 'কিন্তু আমি আপনাকে মানা করেছিলাম যে, এখন আব্বাজানকে আমার কোনো খবর দেবেন না।'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'আপনার আব্বাজানের সাথে আমারও তো সম্পর্ক রয়েছে। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে আমি চিঠি লেখার ফয়সালা করেছি।'

তানবীর দরযার আড়াল থেকে বললেনঃ 'ভাইজান, আপনার কথায় বোঝা যাচ্ছে যে, যুদ্ধ এখন শেষ হয়ে গেছে।'

ঃ 'যুদ্ধ শেষ হয়নি, কিন্তু নিযাম সম্পর্কে আমরা এতটা নিশ্চিন্ত হয়েছি যে, তিনি আমাদের জন্য কোনো পেরেশানীর কারণ হবেন না। এখন শুধু মারাঠাদের চরম পরাজয় দেবার প্রয়োজন। তারপর নিযাম আলী খানের কাছে আমাদের শান্তি-প্রস্তাব এতটা অবাঞ্ছিত মনে হবে না।'

তারপর তিনি শাহ্বাযকে বললেনঃ 'ভাই, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমার

আশা, খুব শীগ্‌গিরই আপনি গৃহে পৌছে যাবেন। চাচাজান ও চাচীজানকে আমার সালাম বলবেন। আমার বিশ্বাস, এ আমাদের আখেরী মোলাকাত নয়।'

শাহ্‌বায শয্যা ছেড়ে উঠে হাত বাড়িয়ে দিলে বললেনঃ 'খোদা হাফিয। হায়! আমি যদি আপনাকে ভালো করে দেখতে পেতাম!'

ঃ 'খোদা হাফিয।' আনওয়ার আলী তাঁর সাথে মোসাফাহা করে বললেনঃ দরযার দিকে দু'তিন কদম এগিয়ে যাবার পর তিনি একটুখানি চিন্তা করে থামলেন। বললেনঃ 'তানবীর, বোন! খোদা হাফিয। আমি আপনাদেরকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাচ্ছি বলে দুঃখিত।'

ঃ 'খোদা হাফিয। ভাইজান, খোদা আপনাকে----

তানবীর কথা শেষ করার আগেই আনওয়ার আলী বেরিয়ে গেলেন।

শাহ্‌বায বললেনঃ 'তানবীর, কেন থেমে গেলে। বুলন্দ আওয়াযে তোমার বলা উচিত ছিলোঃ 'খোদা আপনাদেরকে বিজয় দান করুন।'

সাত

আধুনীর হেফাজতের দায়িত্ব কুতবুদ্দীন নামক এক অভিজ্ঞ সালারের হাতে ন্যস্ত করে সুলতান মনোযোগ দিলেন নিকটবর্তী সামন্তদের দিকে, যারা যুদ্ধের সময়ে নিযাম ও মারাঠা ফউজের বিজয় নিশ্চিত জেনে বিদ্রোহ করেছিলো। এই অভিযান শেষ করে কয়েকদিনের মধ্যে সুলতানের সেনাবাহিনী তুংগভদ্রা নদীর কিনারে পৌছে গেলো। তখন আগস্ট মাস। দরিয়ায় প্রচন্ড প্লাবন। মিলিত সেনাবাহিনী বর্ষার মওসুমে দক্ষিণদিকে অগ্রগতির ইরাদা ত্যাগ করে তুংগভদ্রা ও কৃষ্ণা নদীর মাঝখানে এসে জমা হতে লাগলো। হরিপন্থের বিশ্বাসে ছিলো, সুলতান বর্ষার দিনে তুগংভদ্রা পার হয়ে আসার বিপদ বরণ করে নেবেন না। তাঁর পূর্ণ মনোযোগ নিবন্ধ ছিলো ধাড়ওয়াড়ের তামাম এলাকা জয় করার দিকে। কিন্তু তিনি যখন বাহাদুর বান্দার কেল্লা অবরোধ করে বসেছিলেন, তখন তাঁর কাছে এই অবিশ্বাস্য খবর পৌছলো যে, সুলতানের অগ্রগামী সৈন্যদল দরিয়া পার হয়ে এসেছে। খবর শুনে মিলিত সেনাবাহিনীর মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হল এবং হরিপন্থ সুলতানের অগ্রগতি রোধ করার জন্য বাজীপন্থের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার দ্রুতগামী সওয়ারের একটি ফউজ রওয়ানা করে দিলেন। কিন্তু এ লশকর পৌছবার আগেই সুলতানের পুরো ফউজ দরিয়া পার হয়ে এলো।

হরিপন্থ সুলতান টিপুর শিবির থেকে আট মাইল দূরে তাঁবু ফেললেন। কয়েকদিন উভয় পক্ষের মধ্যে মামুলী যুদ্ধ চললো। এই সময়ের মধ্যে টিকুজী হোলকার ও রঘুনাথ রাও পটবর্ধনের সেনাবাহিনী এসে হরিপন্থের সাথে মিলিত হল এবং তাঁর ঝান্ডাতলে এসে জমা হল এক লক্ষ মারাঠা ফউজ। বর্ষার মওসুমে এত বড়ো সেনাবাহিনীর জন্য রসদের সংস্থান ছিলো এক উদ্বগজনক সমস্যা। তুংগভদ্রা নদী

ও একটি দুস্তর বর্ষাতি নালার মাঝখানে সুলতান টিপুর শিবির ছিলো দুশমনদের তাঁবুর তুলনায় অনেকখানি নিরাপদ। দক্ষিণে তাঁদের রসদ ও সেনাসাহায্য পৌছবার পথ ছিলো খোলা এবং তাঁর পিন্ডারা ফউজের সওয়াররা মারাঠাদের সাথে নিয়মিত যুদ্ধ না করে তাদের রসদ ও সেনা সাহায্য লাভের ব্যবস্থা বিশৃংখলা করে দেওয়ার কার্যে লিপ্ত ছিলো। মারাঠা ফউজ সুলতানের তাঁবুর উপর চূড়ান্ত হামলা করে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারতো, কিন্তু বর্ষাতি নালা পার হবার সময়ে তাদের সুলতানের তোপখানার গোলাবর্ষণের মোকাবিলা করা ছিলো নিশ্চিত।

হরিপন্থ তাঁর তাঁবুতে খাদ্যভাব ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখে শাহ্নূরের দিকে এগিয়ে চললেন। সুলতান তাদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং শাহ্নূরের পাঁচ মাইল দূরে তাঁবু ফেললেন। এখানে বুরহানুদ্দীন ও বদরুজ্জামান খানের সেনাবাহিনীর সুলতানের সাথে শামিল হল। তার সাথে সাথেই সুলতানের লশকরের জন্য বীজনোর থেকে রসদ বোঝাই অসংখ্য বলদের গাড়ি এসে পৌঁছলো। মারাঠা শাহ্নূরের কাছে তাঁবু ফেলে মহীশূরের সেনাবাহিনীর অগ্রগতির প্রতীক্ষা করতে লাগলো। তাহ্ওয়ার জঙ ও শাহনূরের নওয়াবের সেনাবাহিনী তাদের সাথে মিলিত হয়েছিলো। তাদের সংখ্যা ছিলো এত বেশী যে, মহীশূরের প্রত্যেক সিপাহীর মোকাবিলা করতে তারা পাঁচ জন করে সিপাহী ময়দানে এনে হাযির করতে পারতো। কিন্তু বিপুল সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও এই বিশাল সেনাবাহিনী মহীশূরের সুসংহত, ঐক্যবদ্ধ ও সুশিক্ষিত ফউজের সামনে ছিলো এক বিরাট মেলার ভিড়ের মতো। তাদের মধ্যে চিন্তা ও কর্মের কোনো ঐক্য ছিলো না। মারাঠা যুদ্ধের ময়দানে নিযামের সেনাবাহিনীকে দেখতে চাইতো পুরোভাগে, কিন্তু নিযামের সেনাবাহিনী যে কোনো বিপদের মুখে মারাঠাদের কয়েক কদম পিছনে থাকতেই চাইতো। মারাঠা ফউজের অবস্থাও ছিলো এই যে, তাদের কোনো রাজা বা সরদার বাকী সাথীদের তুলনায় বেশী ক্ষতি স্বীকার করতে রাযী ছিলেন না।

তা'ছাড়া নিজস্ব সীমান্তের নিকটবর্তী স্থানে থাকায় মহীশূর বাহিনীর রসদ ও সেনা সাহায্য প্রাপ্তির যে সুযোগ-সুবিধা ছিলো, নিযাম ও মারাঠা বাহিনীর তা' ছিলো না। সুলতান টিপু তাঁর তোপখানা ও পদাতিক ফউজকে যুদ্ধের জন্য এক চূড়ান্ত শক্তি বলে মনে করতেন এবং সওয়ারদের ময়দানে না এনে তাদেরকে দুশমনের উপর সব দিক থেকে কড়া নযর রাখার কাজে লাগিয়ে রাখা অধিকতর ফলপ্রসূ বিবেচনা করতেন। পক্ষান্তরে নিযাম ও মারাঠাদের বেশীর ভাগ ফউজই ছিলো সওয়ার এবং তাদের ফউজের একটি বড়ো অংশকে দূর-দরায এলাকা থেকে খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্য সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত রাখতে হত। তারপর তোপ ও বন্দুকের যুদ্ধে পলায়মান দুশমনের উপর হামলা করতে অভ্যস্ত সওয়ারদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা সহকারে লড়াই করার মতো পদাতিক সিপাহীর সংখ্যা হামেশাই বেশী থাকতো।

পুণা ও হায়দরাবাদের সেনাবাহিনীর সাথে যথারীতি খেদমতগার, খিমাবরদার, বাদ্যকর, নর্তক-নর্তকী ও গায়ক-গায়িকার একটি বড়ো দল থাকতো। বড়ো বড়ো

রাজা ও সরদারদের বিবিরাও তাদের সাথে থাকতো। শাহ্নূরে খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্যের গুদাম খালি হয়ে গিয়েছিলো। আশপাশের কিষাণদের ক্ষেত তখন বরবাদ হয়ে গেছে। এর সব কিছুই ছিলো সুলতান টিপুর অনুকূল।



এক রাত্রে প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হচ্ছিলো। দাক্ষিণাত্য ও মহারাষ্ট্রের রইসদের খিমায় চলছিলো নৃত্যগীতের জলসা। সুলতান টিপু তাঁর লশকরকে চার অংশে বিভক্ত করে দুশমনের তাঁবুর দিকে এগিয়ে চললেন। কিন্তু রাতের অন্ধকার ও বর্ষণের তীব্রতার দরুন বুরহানুদ্দীন, মাহা মীর্যা খান ও মীর মুঈনুদ্দীনের নেতৃত্বে তাঁর ফউজের তিনটি দল পথ ভুলে এদিক ওদিক বেরিয়ে গেলো। সুলতান দুশমনের তাঁবুর কাছে গিয়ে তাঁর সালারদের সংকেত দেবার জন্য একবার গুলীবর্ষণ করলেন। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর নিজস্ব দল ব্যতীত বাকী তামাম ফউজ পিছনে পড়ে রয়েছে। সুলতান কিছুক্ষণ ইন্তেযার করলেন। তারপর ভোরের আভাস দেখা দেবার সাথে সাথেই তিনি দুশমনের তাঁবুর উপর হামলা করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই মারাঠারা পালিয়ে গিয়ে টিলায় ও পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে।

ভোরের আলোয় মারাঠারা সুলতানের সাথে মুষ্টিমেয়সংখ্যক সৈন্য দেখে ফিরে এসে তীব্র হামলা চালালো। কিন্তু অনতিকাল মধ্যে সুলতানের বাকী লশকরও পৌঁছে গেলো এবং তারা কয়েক ঘন্টা প্রচন্ড লড়াইর পর দুশমনকে পিছু হটতে বাধ্য করলো। চারদিন পর সুলতান আর একবার হামলা করে অসংখ্য দুশমন সিপাহীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন। হরিপন্থ একদিকে মহীশূর ফউজের উপর্যুপরি হামলায় ও অপরদিকে রসদ ও পশুখাদ্যের সংকটের দরুন শাহ্নূর থেকে বিদায় নিয়ে চললেন পূর্বদিকে। তিনি ময়দান থেকে পালানোমাত্রই নওয়াব আবদুল হাকীম খান শাহনূরের দায়িত্ব পুত্রের হাতে ন্যস্ত করে পালিয়ে গিয়ে লোক-লশ্কর সহ মিত্রবাহিনীর সাথে মিলিত হলেন।

সুলতান টিপুর ফউজ শহরে প্রবেশ করলে মারাঠা যুলুমে নিপীড়িত আওয়াম আনন্দধ্বনি করে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালো।

শাহ্নূর বিজয়ের ফলে যুদ্ধের ধারা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। সুলতানের সেনাবাহিনী মারাঠাদের জন্য নতুন নতুন ফ্রন্ট খুলতে লাগলো। একদল মীর মুঈনুদ্দীনের নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছিলো হায়দরাবাদের সীমান্ত এলাকার দিকে। অপর একদল সুলতানের শ্রেষ্ঠ সিপাহ্সালার বুরহানুদ্দীনের নেতৃত্বে চলেছিলো বাঁকাপুর ও মিসরীকোটের দিকে। আর এক লশকর মাহা মীর্যাখানের পরিচালনায় রায়চুর ও কাথিওয়াড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। হোসায়েন আলী খানের পথ-নির্দেশে এক লশকর পাটনের আশপাশের এলাকায় পেশোয়া ও নিযামের সামন্তদের দমন কার্যে নিযুক্ত ছিলো এবং বাকী লশকর সুলতানের নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছিলো মারাঠাদের নতুন শিবিরের দিকে।

হরিপন্থ সুলতানের আগমন বার্তা পেয়েই তাহ্‌ওয়ার জঙ, ভোঁসলে এবং হায়দরাবাদ ও পুণার সেনাবাহিনীর বিশিষ্ট সরদারদের এক বৈঠকে আহবান করলেন এবং তাঁদের সাথে পরামর্শ করে কালকিরির দিকে সরে যাবার ফয়সালা করলেন। সুলতানের ফউজ তখনো কয়েক ক্রোশ দূরে এবং মিলিত সেনাবাহিনী বেশ নিশ্চিন্ত মনে অতিক্রম করে যাচ্ছিলো কালকিরির পথের মন্‌যিলগুলো। আচানক খবর পাওয়া গেলো যে, সুলতানের অগ্রগামী সেনাদল অসাধারণ দ্রুতগতিতে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে।

এ খবর শুনই লশ্‌করের সাথে গায়ক, বাদ্যকর, ভাঁড় ও নর্তক-নর্তকীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো ত্রাসের ভাব এবং তারা পৃষ্ঠপোষকদের সাহচর্য ত্যাগ করে চললো নিজ গৃহের পথে। হরিপন্থ মারাঠা রাজা ও সরদারদের পরামর্শ দিলেন, যেনো তাঁরা তাঁদের বিবিদের ফেরত পাঠিয়ে দেন। কোনো কোনা লোক তাঁর উপদেশ মানলেন। কিন্তু কিছুসংখ্যক রাজা ও সরদার বিবিদের সাহচর্য ত্যাগ করতে রাযী হলেন না। ফউজের বড়ো বড়ো অফিসারদের সাথে বেকার নওকর ও খেদমতগারের সংখ্যা ছিলো বেশ ভারী এবং আরো আরাম-আয়েশের অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীতে বোঝাই উট আর গাড়ি। এসব তাঁদের দ্রুতগতিতে বাধা জন্মাতো বলে হরিপন্থের ছিলো প্রবল আপত্তি। কিন্তু কেউ তার বোঝা কমাতে রাযী ছিলেন না। একদিকে মহীশূরের ফউজের সিপাহী ক্ষুধা পেলে ঘোড়ার পিঠে বসেই থলে থেকে কিছুটা শুকনো রুটি অথবা সিদ্ধ চাউল খেয়ে নিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতো, অপরদিকে পুণা ও হায়দরাবাদের ওমরাহ্‌ শুধু হাজামত বানাতেই কয়েক ঘন্টা করে সময় নষ্ট করতেন।

একদিন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিলো। আনওয়ার আলী মহীশূর ফউজের পনেরোজন সিপাহী সাথে নিয়ে এক টিলার মাথায় উঠে ঘোড়ার বাগ ধরে দাঁড়ালেন। এক সিপাহী নীচে ঘন জংগলে ভরা উপত্যকার দিকে ইশারা করে বললোঃ 'ওই যে ওরা এসে গেছে।'

আনওয়ার আলী উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দেখলেন অগ্রগামী ফউজের কয়েকটি দল। তিনি তাঁর সাথীদের ঘোড়ায় চড়বার হুকুম দিলেন। টিলা থেকে নামার সময়ে ঘোড়ার ধীরগতি ও নত মস্তক প্রকাশ করছিলো যে, তাদেরকে অনেক বেশী খাটানো হয়েছে। অগ্রগামী ফউজের দল ক'টি আনওয়ার আলী ও তাঁর সাথীদের দেখে উপত্যকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ পর আনওয়ার আলী অগ্রগামী ফউজের সালার সৈয়দ গফ্‌ফারের সামনে দন্ডায়মান ছিলেন এবং ফউজের বিশিষ্ট অফিসাররা এসে জমা হয়েছিলেন তাঁদের পাশে।

সৈয়দ গফ্‌ফার বললেনঃ 'বলো, কি খবর নিয়ে এসেছো?'

আনওয়ার আলী হাত দিয়ে টিলার দিকে ইশারা করে বললেনঃ 'ঐ টিলা থেকে

দু'মাইল আগে একটি পাহাড় এবং সেখান থেকে চার মাইল দূরে এক খোলা ময়দান। সেই ময়দানে দুশমন লশকর তাঁবু ফেলেছে। কাল তারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করে দু'টি মন্‌যিল অতিক্রম করে এসেছে, কিন্তু আজ তারা বিশ্রাম করছে।'

সৈয়দ গফ্‌ফার ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে বললেনঃ 'এরপর আমাদের আগে যাবার প্রয়োজন নেই। আমরা এখানেই থাকবো মহিমান্বিত সুলতান রাত পর্যন্ত এখানে পৌঁছে যাবেন। আমাদের তোপ যথাসময়ে পৌঁছে গেলে আমরা শেষরাত্রে হামলা করতে পারবো। এখন আমার একটি বিপজ্জনক অভিযানের জন্য প্রয়োজন তিনজন নেহায়েত হুঁশিয়ার ও বাহাদুর লোকের। এ অভিযান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বিপজ্জনক এবং তার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার জন্য আমি কোনো সিপাহীকে হুকুম দিতে পারি না। সে জন্য আমার চাই রেযাকার।'

আনওয়ার আলী বিনাদ্বিধায় হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেনঃ 'আমি নিজের নাম পেশ করছি।' তারপর সব অফিসারই নিজ নিজ হাত উঁচু করে ধরলেন।

সৈয়দ গফ্‌ফার বললেনঃ 'আনওয়ার আলী, আমি শোক্‌রিয়ার সাথে তোমার প্রস্তাব কবুল করছি। বাকী দু'জনের নির্বাচনের দায়িত্ব আমি তোমরই উপর ছেড়ে দিচ্ছি। যেসব রেযাকার হাত উঁচু করেছেন, তাঁরা একসারিতে দাঁড়িয়ে যান।'

যেসব অফিসার হাযির ছিলেন, তাঁরা এসে একসারিতে দাঁড়ালেন। আনওয়ার আলী সারির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টি সঞ্চালন করলেন। আচানক এক নওজোয়ানের উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। তিনি তাঁর ভ্রাতা মুরাদ আলী।

আনওয়ার আলী কয়েক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত ও পেরেশান হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললেনঃ 'মুরাদ, এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? আমি তো তোমায় হাত উঁচু করতে দেখিনি।'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেনঃ 'আমি আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আপনি সাক্ষ্য নিতে পারেন, আপনার পরেই ছিলো আমার হাত।'

আনওয়ার আলী সারির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এসে পুনরায় এক নওজোয়ানকে ইশারা করলে তিনি সারি থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর আনওয়ার আলী কিছুক্ষণ বাকী রেযাকারের দিকে তাকালেন এবং নিজের দিলে এক অসহ্য বোঝা অনুভব করে বললেনঃ 'মুরাদ, তুমিও এসো।'

মুরাদ হাসিমুখে এগিয়ে গেলেন এবং অপর রেযাকারটির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ালেন।

সৈয়দ গফ্‌ফার এগিয়ে এসে বললেনঃ 'আমি একই বিপদসংকুল অভিযানে যাবার জন্য দু'ভাইকে এজাযত দিতে পারি না।'

সৈয়দ গফ্‌ফার আর একজন অফিসারের দিকে ইশারা করে বললেনঃ 'শমশের খান, তুমি এদিকে এসো।' তারপর তিনি মুরাদ আলীর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ

'মুরাদ! শোন, মোয়ায্যম আলীর পুত্রদের আমার সামনে প্রমাণ পেশ করতে হবে না যে, তাঁরা বাহাদুর। তুমি অবিলম্বে মহিমান্বিত সুলতানের কাছে গিয়ে খেদমতে আরয করো যে, আমরা এখানে তাঁর হুকুমের ইন্তেযার করবো। তিনি রাতের বেলায় কয়েকটি হালকা তোপ এখানে পৌঁছে দিতে পারলে আমরা শেষরাত্রে হামলা করতে পারবো দুশমনের উপর। তোমার দলের পাঁচজন সওয়ার সাথে নিয়ে যাও।'

মুরাদ আলী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গফ্ফারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি বললেনঃ 'আপনি গোস্তাখী মনে না করলে রওয়ানা হবার আগে জানতে চাই, ভাইজান কোন্ অভিযানে যাচ্ছেন?'

সৈয়দ গফ্ফার জওয়াব দিলেনঃ 'তিনি এক মারাঠা সিপাহীর বেশে দুশমন শিবির যাচাই করে দেখতে যাচ্ছেন।'

কিছুক্ষণ পর আনওয়ার আলী ও তাঁর সাথীরা মারাঠা সিপাহীর ছদ্মবেশে এসে দাঁড়ালেন গফ্ফারের সামনে। সৈয়দ গফ্ফার তাঁদেরকে বললেনঃ 'আমরা রাত হলেই এই টিলা থেকে আগের পাহাড়ের কোলে পৌঁছে তোমাদের নির্দেশের ইন্তেযার করবো। মধ্যরাত্রের মধ্যে তোমাদের ফিরে আসা জরুরী। আমার বিশ্বাস, সুলতানও এরই মধ্যে এসে যাবেন। সন্ধ্যা হতেই তোমাদেরকে দুশমন শিবিরে প্রবেশের চেষ্টা করতে হবে। দুশমন যথেষ্ট সতর্ক থাকবে। তোমাদেরও হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করতে হবে, কিন্তু একবার দুশমন শিবিরে প্রবেশ করতে পারলে যাবতীয় জরুরী তথ্য সংগ্রহ করা তোমাদের পক্ষে মুশ্কিল হবে না। শিবিরের মধ্যে দুশমনের তোপ ও বারুদ সম্পর্কে তোমাদের তথ্য যতো নির্ভুল হবে, আমাদের কাজও ততো সহজ হবে।

'দুশমনের শিবিরে প্রবেশ করার সহজতম পন্থা আমি তোমাদেরকে বলে দিতে পারছি না, কিন্তু আমার ধারণা, শিবিরের বাইরে পাহারাদার দল টহল দিতে থাকবে, আর তোমাদের পক্ষে তাদের শামিল হওয়া কঠিন হবে না। যদি তোমরা দেখো যে, রাতের বেলা দুশমন শিবির থেকে বেরিয়ে আসা মুশ্কিল, তা'হলে রাত আড়াইটায় বন্দুক চালিয়ে আমাদেরকে খবরদার করে দেবার চেষ্টা করবে। তখন পর্যন্ত আমাদের ফউজের এক হিস্সা শিবিরের সন্নিকটে তোমাদের ইশারার ইন্তেযার করতে থাকবে।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'এহেন পরিস্থিতিতে আমরা শুধু বন্দুক চালিয়েই নিরস্ত থাকবো না; বরং কোনো বারুদের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করবো।'

সৈয়দ গফ্ফার বললেনঃ 'কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে এই ওয়াদা নিতে চাই যে, অকারণে তুমি তোমার জীবন বিপদের মুখে ঠেলে দেবে না। যদি তুমি মধ্যরাত্রের ভিতরে ফিরে এসে সুলতানের খেদমতে শিবিরের সঠিক নক্শা পেশ করতে পারো, তা'হলে তার অর্থ হবে, আমরা অর্ধেক যুদ্ধ জয় করেছি।'

আনওয়ার আলী হাসলেন। বললেনঃ 'আমরা ঠিক এগারোটায় আপনার খেদমতে হাযির হবো।'

রাত এগারোটা বেজে গেছে, সৈয়দ গফ্ফার, গাযী খান, ওয়ালী মহাম্মদ, সৈয়দ হামীদ, রেযা খান ও আরো কয়েকজন বড়ো বড়ো অফিসার এক খিমায় বসে আনওয়ার আলী ও তাঁর সাথীদের ইন্তেযার করেছেন। এক পাহারাদার খিমায় প্রবেশ করে বললো ঃ 'আনওয়ার আলী পৌছে গেছেন।'

গাযী খান বললেনঃ 'তাঁকে এক্ষুণি এখানে হাযির করো।'

পাহারাদার চলে গেলে কিছুক্ষণ পরেই আনওয়ার আলী পানি কাদায় লটপট হয়ে খিমায় প্রবেশ করলেন।

সৈয়দ গফ্ফার প্রশ্ন করলেনঃ 'তোমার সাথীরা কোথায়?'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'আমি তাদেরকে দুশমন শিবিরে রেখে এসেছি। তারা এই সময়ে শিবিরের ঠিক মাঝখানে বারুদের এক বড়ো স্তুপের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক তিনটায় তারা বারুদে আগুন ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে।'

গাযী খান বললেনঃ 'আনওয়ার আলী, মহিমান্বিত সুলতানের সামনে তোমার পুরো বিবরণ পেশ করতে হবে। তার জন্য তৈরী হও। তিনি এক্ষুণি পৌছবেন।' আনওয়ার আলী বললেনঃ 'জনাব, আমি দশ মিনিটের মধ্যে দুশমন শিবিরের পুরো নক্শা তৈরী করে দিতে পাবো।'

গাযী খানের ইশারায় এক অফিসার খিমার কোণ থেকে একটি কাঠের বাক্স এনে খুললেন এবং এক টুকরা কাগজ ও কয়েকটি রং-শলাকা বের করে দিলেন আনওয়ার আলীর হাতে। আনওয়ার আলী সেখানেই ফরাসের উপর বসে নক্সা বানাতে শুরু করলেন।

কিছুক্ষণ পর খিমার বাইরে ঘোড়ার পদধ্বনি শোনা গেলো এবং ফউজী অফিসারদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল খিমার দরযার দিকে।

সুলতান টিপু মসিয়েঁ লালী ও ফউজের অন্যান্য অফিসারদের সাথে নিয়ে খিমায় প্রবেশ করলেন এবং তিনি দেরী না করে প্রশ্ন করলেনঃ 'দুশমন শিবিরের কোনো খবর এলো?'

সৈয়দ গাফ্ফার বললেনঃ হুযূর, আনওয়ার আলী এসে গেছেন।'

আনওয়ার আলী পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে নকশা তৈরী করছিলেন। তিনি চট করে উঠে এসে নক্শাটি সুলতানের সামনে পেশ করে বললেনঃ 'আলীজাহ্, নকশাটি আমি এখনো শেষ করতে পারিনি।'

সুলতান মশালের কাছে ফরাসের উপর বসে এক মিনিট নকশার উপর দৃষ্টি সঞ্চালন করে বললেনঃ 'তুমি নিশ্চিন্ত মনে বসে পড়ো এবং আমার প্রশ্নের জওয়াব দাও।'

আনওয়ার আলী সুলতানের সামনে বসে পড়লে সুলতান আঙুল দিয়ে একটি লাল দাগের দিকে ইশারা করে বললেনঃ 'এটা কি?'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'এটা হরিপন্থের ফউজের অবস্থান।'

ঃ 'হায়দারাবাদের ফউজ কোথায়?'

আনওয়ার আলী জলদী করে নক্‌শার উপর কয়েকটি চিহ্ন এঁকে বললেনঃ 'আলীজাহ্! এখানে তাদের ফউজ। এই জায়গায় তাদের তোপখানা রয়েছে। এখানে রয়েছে তাহ্ওয়ার জঙের খিমা। এখানে দাঁড়িয়ে আছে রসদ ও বারুদের গাড়ি। এই জায়গায় তাদের সওয়ার ও এখানে তাদের পদাতিকের অবস্থান। আর কয়েক মিনিট সময় দিলে আমি আপনার খেদমতে পূর্ণাংগ নক্‌শা পেশ করতে পারি।' সুলতান বললেনঃ 'নকশা পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়োজন নেই। এখন তুমি শুধু আমার প্রশ্নের জওয়াব দিতে থাক। হোলকারের ফউজ কোথায়?'

ঃ 'আলীজাহ্! এখানে- শিবিরের ঠিক মাঝখানে। তার ডানে ভোঁসলের ফউজ। এই জায়গায় শাহ্নূরের নওয়াবের কয়েকটি সৈন্যদল। এই কালো রঙের চিহ্নগুলো দুশমনের তোপখানা। এহ হলদে চিহ্নগুলো অন্যান্য মারাঠা সরদার ও রাজার ফউজের অবস্থান। বাইরের চিহ্নগুলো শিবিরের রক্ষী বাহিনীর বাইরে চৌকি।'

সুলতান বললেনঃ 'আমার যতোটা মনে পড়ে, এই শিবিরের আশপাশে একটি বর্ষাতি নালা রয়েছে।'

আনওয়ার আলী জলদী করে একটি নীল রঙের রেখা টেনে বললেনঃ 'আলীজাহ্, এই সে নালাটি।'

ঃ 'আর হরিপন্থের ফউজ রয়েছে এই নালারই পারে?'

ঃ 'জি হ্যাঁ।'

ঃ 'হরিপন্থ অবশ্যি এদের সবার চাইতে হুঁশিয়ার। কম-সে-কম কিছুটা জ্ঞান সে রাখে। রাতের অন্ধকারে পালাতে হলে কোন্ রাস্তা তাকে ধরতে হবে, তা' তার নখদর্পনে।'

আনওয়ার আলী নক্‌শার উপর একটা দাগ কেটে বললেনঃ 'আলীজাহ্! যদি আমরা কয়েকটি তোপ এখানে পৌঁছাতে পারি, তাহলে হরিপন্থের ফউজেরও যথেষ্ট ক্ষতি করা যেতে পারে।'

ঃ 'আমাদের অন্যান্য জায়গায় তোপের বেশী প্রয়োজন। হরিপন্থের পথরোধ না করে তাকে পালাবার মওকা দেওয়াই আমাদের জন্য বেশী লাভজনক হবে। ফউজের আর কোনো অফিসারের কাছে আমি এ কৃর্তিত্ব আশা করতে পারতাম না। আজ থেকে কয়েক বছর আগে আমার বয়স যখন খুব কম, তখন পানিপথের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক নামযাদা মুজাহিদ এলে সেরিংগাপটমে এবং আমি তাঁর কাছে পানিপথের ময়দানের একটা নকশা এঁকে দেবার দাবি জানালাম। সেই উলুল-

আযম মুজাহিদ ছিলেন তোমার বাপ। তিনি যে নক্শা তৈরী করে দিয়েছিলেন, তা' আজো আমার মনে অংকিত রয়েছে।'

এই কথা বলে সুলতান উঠে গিয়ে ফউজী অফিসারদের নির্দেশ দিতে ব্যস্ত হলেন। আনওয়ার আলী অনুভব করতে লাগলেন, যেনো তাঁর নকশার খুঁটিনাটি সবকিছু আঁকা হয়ে গেছে সুলতানের মস্তিষ্কে।

সওয়ার ও পদাতিক ফউজের অফিসারদের জরুরী নির্দেশ দেবার পর সুলতান মসিয়েঁ লালীকে বললেনঃ 'রাত ঠিক আড়াইটায় দুশমনের ডান বাহুতে তোমার তোপখানা থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হওয়া চাই। আনওয়ার আলী তোমায় পথনির্দেশ দেবেন। বাম বাহুর উপর সৈয়দ হামীদের তোপের গোলাবর্ষণ হবে।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'আলীজাহ্! গোসতাখী মাফ করবেন। আমরা তিনটা বাজার আগে হামলা করতে পারবো না।'

ঃ 'কেন? কি কারণে?'

ঃ 'আলীজাহ্! আমার দু'জন সাথী রয়েছে দুশমন শিবিরে, তারা ঠিক তিনটার সময়ে দুশমনের সব চাইতে বড়ো বারুদের স্তূপে আগুন লাগাবার চেষ্টা করবে।'

সুলতান হেসে বললেনঃ 'তুমি ইনামের দাবিদার হয়েছো। যাও, কাপড় বদলে এসো। মারাঠা সিপাহীর লেবাস তোমায় মানাচ্ছে না।'

তারপর সুলতান মসিয়েঁ লালী ও তোপখানার অন্যান্য অফিসারকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'এখন আমি আমার হুকুম বদল করার প্রয়োজন বোধ করছি। এখন আমার নয়া হুকুম, বারুদের স্তূপে আগুন লাগাবার পনেরো মিনিট পর তোপখানা থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করা হবে। আরা আমাদের লোক বারুদের স্তূপে আগুন লাগাতে যদি না-ও পারে, তা'হলে আমাদেরকে সোয়া তিনটায় হামলা করতেই হবে।'

কয়েক মিনিট পর আনওয়ার আলী একটি ছোট্ট খিমার মধ্যে পোশাক বদল করছিলেন। বাইরে থেকে মুরাদ আলী আওয়ায দিলেনঃ 'ভাইজান, ভিতরে আসতে পারি?'

ঃ এসো।

মুরাদ আলী ও লা গ্রাঁদ খিমায় প্রবেশ করলেন।

আনওয়ার আলী কোমরে তলোয়ার বাঁধতে বাঁধতে বললেনঃ 'মুরাদ! আমি জানি, আমার সম্পর্কে তুমি খুব পেরেশান হয়েছিলে। কিন্তু এখন আলাপের সময় নেই। দুশমন শিবিরে আমার কোনো বিপদ ঘটেনি। আমি কোন্ রাজা বা সরদারের ফউজের লোক, সে কথা ওখানে কেউ আমায় জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন বোধ করেনি। লোক শুধু বৃষ্টির কথাই বলছিলো। আমার সফর খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছে। এক খিমার কাছ দিয়ে যাবার সময়ে তবলা ও সারেংগীর আওয়াজের সাথে নর্তকীর নুপুর নিক্কণ শুনতে পেয়েছি। সে গাইছিলো একটি মুগ্ধকর সংগীত। কিন্তু তার

কয়েকটি শব্দই মাত্র মনে আছে।'

মুরাদ আলী হেসে বললেনঃ 'ভাইজান, একবার শুনিয়ে দিন না।'

ঃ 'সে গাইছিলোঃ আয়ী হায় বরসাত বালম আয়ী হায় বরসাত। এর পরের কথাগুলো আমার মনে নেই। এবার চলো।'

আনওয়ার আলী লা গ্রাঁদের হাত ধরে ফরাসী ভাষায় বললেনঃ 'পথে কথা বলার অনেক সময় আমরা পাবো।'



আড়াইটা বাজার কাছাকাছি সময়ে বৃষ্টির তীব্রতা কমে এলো। আনওয়ার আলী ফরাসী তোপখানার অধিনায়ক মসিয়ে' লালীকে বললেনঃ 'এখন দুশমন শিবিরের বাইরের চৌকি এখান থেকে খুব কাছে। আমাদের আরো এগিয়ে যাবার বিপদ বরণ করে নেওয়া ঠিক হবে না। আপনার তোপের গতি আমার ডান দিকে হওয়া প্রয়োজন। তিনটা পর্যন্ত আপনার সম্পর্কে দুশমন যাতে খবরদার না হতে পারে, তার চেষ্টা করা দরকার। শিবির যদি আপনার তোপের নাগালের বাইরে থাকে, তাহলেও আপনাকে তার পরোয়া করতে হবে না। আপনার বড়ো লক্ষ্য হচ্ছে শিবিরে ত্রাসের সঞ্চার করা। তোপখানা এখান থেকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বাঞ্ছিত সময়ের প্রতীক্ষা করতে হবে। এখন আমায় এজাযত দিন, আমি হামলা শুরু করবার আগে আমার নিজস্ব সেনাদলের শামিল হতে চাই।'

মসিয়ে' লালী বললেনঃ 'বহুত আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন।'

যেসব সিপাহী আনওয়ার আলীর সাথে এসেছিলো, তারা কিছুদূরে ঘোড়ার বাগ ধরে দাঁড়িয়েছিলো। আনওয়ার আলী দ্রুতগতিতে তাদের দিকে চলে গেলেন।

আচানক এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়িয়ে অস্ফুটস্বরে বললেনঃ 'মসিয়েঁ আনওয়ার আলী দাঁড়ান। আমি আপনার সাথে একটা জরুরী কথা বলতে চাই।'

ঃ 'কে, লা গ্রাঁদ?' আনওয়ার আলী থেমে বললেন।

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'পথে আমি আপনার সাথে কথা বলবার মওকা পাইনি।'

ঃ 'কিন্তু এ তো কথা বলার সময় নয়।'

ঃ 'আমি বেশী সময় নেবো না।'

ঃ বহুত আচ্ছা, বলুন।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'আমি আপনার কাছ থেকে ওয়াদা নিতে চাই, যদি এ যুদ্ধে আমার কোন বিপদ ঘটে, তাহলে জিনকে আপনি অনুভব করতে দেবেন না যে, এ দুনিয়ার তার কোনো অবলম্বন নেই।'

কয়েক মুহূর্ত আনওয়ার আলীর মুখ থেকে কোনো কথা বেরুলো না। তারপর তিনি লা গ্রাঁদের কাঁধে হাত রেখে বললেনঃ 'দোস্ত, জিনের সম্পর্কে তোমার পেরেশান হবার প্রয়োজন নেই। আমার বিশ্বাস, এ যুদ্ধে তোমার দেহে আঘাত লাগবে না। তুমি খুব শীগগিরই সেরিংগাপটম যেতে পারবে।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'আমার জীবন-মৃত্যুর কোনো পরোয়া নেই। আপনি ওর অবলম্বন হতে পারবেন, এই আশ্বাসটুকু পেলে মৃত্যুর মুখ আমার কাছে এতটা ভয়ংকর মনে হবে না।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'এ স্থান ও কাল এই ধরনের কবিত্বের উপযোগী নয়। তোমার মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি যে, অতীত দুর্ঘটনা তোমায় দুঃখবাদী করে তুলেছে। যুদ্ধ শেষ হবার সাথে সাথেই যা'তে তোমাদের শাদী হয়ে যায়, তার চেষ্টা আমি করবো।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'আনওয়ার আলী, আমার সম্পর্কে জিনের ধারণা আমি জানি না, কিন্তু আমি এতটুকু অবশ্যি জানি যে, আমার কোনো বিপদ ঘটলে আপনি তার যিন্দেগীর শেষ অবলম্বন হতে পারবেন। আমি তাকে যা দিতে পারি না, তা' আপনি দিতে পারবেন। ভবিষ্যতের অবস্থা যদি প্রমাণ করে দেয় যে, আমার তুলনায় জিনের আপনাকেই বেশী প্রয়োজন, তা'হলে আপনি তাকে হতাশ করবেন না, আপনার মুখ দিয়ে এই কথাটিই আমি শুনতে চাই।'

ঃ 'লা গ্রাঁদ, এক বন্ধুর মুখের উপর চাপড় মারবার সাহস তোমার না হওয়াই উচিত ছিলো। আমি যে জিনকে জানি, তিনি তোমারই এবং তিনি তোমারই থেকে আমার দৃষ্টিতে ইয্‌যত লাভ করবেন। এ বিষয় নিয়ে আমি আর কোনো আলোচনা পসন্দ করি না।' এই কথা বলে আনওয়ার আলী এগিয়ে গিয়ে এক সাথীর হাত থেকে ঘোড়ার বাগ ধরে তার উপর সওয়ার হলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি ও তাঁর সাথীরা রাতের অন্ধকারে গায়েব হয়ে গেলেন। লা গ্রাঁদ আপন মনে বলতে লাগলেনঃ 'জিন, নিজস্ব দৈন্যের অনুভূতি আমার আছে। আমি জানি, শুধু দুর্ঘটনার বন্যাবেগ পরস্পরকে অবলম্বন হিসাবে ধরতে আমাদেরকে বাধ্য করেছিলো। নইলে আমার পথ ছিলো আলাদা। আমি যে তোমায় আশা-আকাংখার কেন্দ্র বানিয়ে নিয়েছি, এটা আমার আত্মপ্রতারণা। কিন্তু যদি তুমি তোমার ভবিষ্যত সম্পর্কে আনওয়ার আলীর কাছে কোনো প্রত্যাশা করে থাক, তা'হলে তুমি আমার চাইতেও নির্বোধ।'

রাত তিনটায় দুশমন শিবিরের মাঝখানে ভয়াবহ আগুনের লেলিহান শিখা সহস্র সর্পজিহ্বা বিস্তার করে জেগে উঠলো আসমানের দিকে। সিপাহীরা ভয়াবহ বিস্ফোরণের আওয়াযে বিশৃংখলভাবে খিমা থেকে বেরুতে লাগলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একদিক থেকে অসংখ্যা ঘোড়ার পদধ্বনি শোনা গেলো। মহীশূরের বিদ্যুৎগতি

সেনাদল দেখতে দেখতে হামলা করে এগিয়ে গেলো শিবিরের পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত। তারপর চললো দু'দিক থেকে তোপের মুহূর্মুহু গোলাবর্ষণ আর অপরদিকে শোনা গেলো বন্দুকের আওয়ায।

সাথীদের তুলনায় অধিকতর সতর্ক হরিপন্থ মামুলী ক্ষতি স্বীঝার করে পলায়নের পথ ধরলো। বাকী লশকরের অবস্থা হল এমন যে, সিপাহীরা অফিসারদের সম্পর্কে আর অফিসাররা সিপাহীদের সম্পর্কে ছিলো বে-খবর। প্রত্যেক নওয়াব, প্রত্যেক রাজা আর প্রত্যেক সরদার নিজ তাঁবুর বদলে সাথীদের তাঁবুকেই অধিকতর নিরাপদ মনে করলেন। পূব দিকের সেনাদল পশ্চিমে ছুটলো আর যারা ছিলো পশ্চিমে তারা ছুটলো পূবদিকে সেদিকটাকে বেশী নিরাপদ মনে করে। একদল ছোটে উত্তর থেকে দক্ষিণে, আর একদল ছোটে দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

এমনি বিশৃংখল অবস্থায় দোস্ত-দুশমনের পার্থক্য থাকলো না। এক মারাঠা ফউজ অপর মারাঠা ফউজের সাথে, এক হায়দরাবাদী সৈন্যদল অপর হায়দরাবাদী সৈন্যদলের সাথে জড়াজড়ি করছিলো। যেসব সিপাহী কিছুটা হুঁশ জ্ঞান ও সাহস নিয়ে ঘাঁটিতে গিয়ে বসেছিলো, তারাও বুঝতে পারছিলো না, কোন্‌দিকে তোপ আর বন্দুক চালানো যাবে। অসংখ্য মারাঠা ও হায়দরাবাদী সিপাহী হোল হতাহত। ডান ও বামদিক দিয়ে মহীশূরের তোপখানা এত কাছে এসে গেলো যে, শিবিরের মধ্যে কোনো জায়গা গোলাবর্ষণ থেকে নিরাপদ থাকলো না এবং শিবিরের বাইরে বহু মাইল ধরে ছড়িয়ে রইলো মিলিত সেনাবাহিনীর সিপাহীদের লাশ।

তাহওয়ার জঙ, ভোঁসলে, হোলকার প্রভৃতি যেসব মারাঠা ও মোগল সরদার নিঃসম্বল অবস্থায় রাতের অন্ধকারে পালিয়েছিলেন, তাঁরা দিনের আলোয় কয়েক ক্রোশ দূরে দরিয়ার কিনারে ভীত-শংকিত সাথীদের জমা করতে লাগলেন। তাঁদের যেমন ছিলো নিজস্ব পরাজয় ও ধ্বংসের জন্য আফসোস, তেমনি আফসোস ছিলো এই জন্য যে, হরিপন্থ বেশীর ভাগ ফউজ ও যুদ্ধ সম্ভার বাঁচিয়ে নিয়ে ময়দান ছেড়ে চলে গেছেন।

ভোর আটটার মধ্যে মারাঠা ও হায়দরাবাদের সিপাহীদের অবশিষ্ট বাধাও দূর হল। বিজয়ী লশকর দুশমনের খালি ঘোড়া, রসদ ও বারুদ বোঝাই বলদের গাড়ি ও উটগুলোকে জমা করছিলো। সুলতানের ঝটিকা বাহিনী কয়েক মাইল পলায়নপর দুশমনের পিছু ধাওয়া করে ফিরে আসছিলো। ভূমি শয্যায় শয়ন করতে অভ্যস্ত মহীশূরের সিপাহীদের কাছে দুশমনের প্রশস্ত বহুমূল্য সাজসরঞ্জামে সজ্জিত খিমাগুলো ছিলো যাদুঘরের মতোই বিচিত্র।

আট

দিনে দশটার কাছাকাছি সময়। সুলতান টিপু মোগল আলী খানের শূন্য খিমায় উপবিষ্ট। মখমলের পর্দা ও বহু মূল্য গালিচায় সজ্জিত এ খিমা। সুলতানের সামনে মেঝের উপর ছড়ানো একটি প্রকান্ড নকশা এবং কয়েকজন অভিজ্ঞ জেনারেল

দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর পাশে। সুলতান কলম দিয়ে নক্শার উপর কয়েকটি চিহ্ন ও রেখা এঁকে সাথীদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'এখন দুশমনদের নয়া শিবির কোথায় পড়বে, তা জানার প্রয়োজন নেই আমাদের। এখন তারা কোনো ময়দানেই আমাদের সামনে আসতে চাইবে না। আমাদের পরবর্তী মনযিল কোপাল ও বাহাদুর বান্দার কেল্লা। এসব জায়গা হারাবার পর দুশ্মনের অবশিষ্ট হিম্মতও ভেঙে পড়বে।'

আনওয়ার আলী খিমায় প্রবেশ করে আদব সহকারে সালাম করে বললেনঃ 'আলীজাহ্, আমি এইমাত্র জানতে পারলাম যে, কয়েদী নারীদের মধ্যে হোলকার পত্নীও রয়েছেন। বড়ো বড়ো খান্দানের আরো নারী রয়েছেন তাদের মধ্যে।

সুলতান বললেনঃ 'এ খবর অবিলম্বে পাওয়া উচিত ছিলো এবং আমি হুকুম দিয়েছিলাম, যেনো মহিলাদের কোনো তকলীফ না হয়। তোমরা তাঁদের আরামের কি ব্যবস্থা করেছো?'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'আলীজাহ্ ! আমি তাঁদেরকে শিবিরের সব চাইতে ভালো খিমায় রাখবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তাঁরা বললেনঃ যতোক্ষণ না তাঁরা জানতে পারেন যে, তাঁদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে, ততোক্ষণ তাঁরা আর সব কয়েদীদের সাথেই থাকবেন।'

সুলতান উঠে দরযার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেনঃ 'তুমি এসো আমার সাথে।'

কিছুক্ষণ পর সুলতান কয়েকজন অফিসার সাথে নিয়ে কয়েদী নারীদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মারাঠা নারীরা মাথার চুল খুলে হারিয়ে যাওয়া স্বামী ও স্বজনদের জন্য শোক করছিলেন। সুলতানের মুখে দীপ্ত প্রশান্তি ও মহিমার প্রকাশ তাঁদেরকে সাময়িকভাবে শান্ত করলো।

সুলতান বললেনঃ 'আপনাদের মধ্যে হোলকার পত্নী কে?'

কয়েদী মহিলারা কিছুক্ষণ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। কিন্তু কেউ কোন জওয়াব দেন না। শেষ পর্যন্ত এক অর্ধবয়সী মহিলা এগিয়ে এসে বললেনঃ 'আমিই হোলকার পত্নী ।' আপনি যদি সুলতান টিপু হন, তাহলে আমি জানতে চাইঃ আমাদের সম্পর্কে আপনি কি ফয়সালা করলেন?'

সুলতান জওয়াব দিলেনঃ 'এক ভাই তার বোনের সাথে কিরূপ আচরণ করতে পারে? আপনারা আমার হাতে বন্দী, আপনাদের এ ধারণা ভুল। আপনারা খিমার ভিতরে আরাম করুন। আমি আপনাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছি, খুব শীগ্গিরই আপনাদেরকে স্বজনদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

সুলতান নিজের কোমর থেকে ধূষর রঙের রেশমী কোমরবন্দ খুলে হোলকার পত্নীর মাথার উপর দিয়ে বললেনঃ 'হোলকার পত্নীর আমার সামনে শূন্য মস্তকে দাঁড়ানো ঠিক নয়।' এ দেশের কোনো মহিলাকে আমি এ অবস্থায় দেখতে পারি না।'

তারপর সুলতান আনওয়ার আলীর দিকে ফিরে বললেনঃ 'আনওয়ার আলী, তুমি এক ইযযতের দাবিদার বাপের বেটা.। আমি তোমার উপর এক গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদারী সমর্পণ করছি। তুমি এঁদের আরামের দিকে পূরা খেয়াল রাখবে।'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'আলীজাহ্ ! আমার দিক থেকে কোনো ত্রুটি হবে না।'

সুলতান আর কিছু না বলে খিমার দিকে ফিরে চললেন। হোলকার পত্নী র চোখ কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ছলছল করে উঠলো। তিনি এক মারাঠা সরদারের পত্নীর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আমার মনে হচ্ছে যেনো আমি এক স্বপ্ন দেখছি। ইনি তো মানুষ নন, দেবতা, আর এঁর সাথে যুদ্ধ করতে আসা পাপ।'

কিছুক্ষণ পর এক ফউজী অফিসার প্রত্যেক কয়েদী মহিলার জন্য একখানা করে চাদর ও দুটো করে মোহর বন্টন করে গেলেন।

পরদিন সুলতান টিপু বিভিন্ন শাসনকর্তা ও বিভিন্ন ময়দানে কর্মরত সেনাবাহিনীর সালারদের চিঠি পড়ে জওয়াব লিখাবার কাজে ব্যস্ত হলেন। দু'জন কাতিব গালিচার উপর বসে সুলতানের বলে যাওয়া চিঠির মর্ম লিখে তৈরী করেছিলেন। সুলতান কুরসীর উপর উপবেশন না করে ধীরে ধীরে টহল দিচ্ছেন খিমার ভিতরে। মীর মুন্শী একটি প্রশস্ত মেযের পাশে এবং সুলতানের দেহরক্ষী দলের এক অফিসার খিমার দরযার ধারে দণ্ডায়মান।

সুলতান টহল দিতে দিতে এক চিঠির জওয়াব লিখিয়ে নিয়ে তাকান মীর মুন্শীর দিকে। অমনি মীর মুন্শী আর একখানি চিঠি তুলে দেন তাঁর হাতে। এসব চিঠিতে হুকুমতের প্রত্যেক বিভাগের ছোট বড়ো নানা সমস্যা উত্থাপন করা হয়েছে। সুলতান প্রত্যেক চিঠি মাত্র এক নযর দেখেন এবং সাথে সাথেই দেরী না করে জওয়াব লিখাতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর চিন্তা ও শব্দ সংযোজনের গতি এমন দ্রুত চলতে থাকে যে, কাতিব অতি কষ্টে তাঁর গতির সাথে তাল রেখে লিখে যান। তিনি কখনো কোনো সালারকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ চৌকি বা কেল্লার উপর হামলা করবার নির্দেশ দেন; কখনো কোনো মযলুমের আবেদন পড়ে স্থানীয় হাকীমকে তার প্রতিকারের নির্দেশ দেন; কখনো কোনো আদালতের ভুল ফয়সালার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন; আর কখনো বা শিল্প বা কৃষি পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের হুকুম জারী করেন।

সুলতান টহল দিতে দিতে খিমার এক খিড়কির সামনে দাঁড়ালেন। বাইরে থেকে আনওয়ার আলী খিমার দরযায় এসে দেখা দিলেন। সুলতানের দেহরক্ষীর ইশারায় তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। সুলতান আরো কয়েকটি কথা লিখিয়ে নেবার পর মীর মুনশীর দিকে তাকালে দেহরক্ষী বললোঃ 'আলীজাহ্, জওকদার আনওয়ার আলী হাযির হয়েছেন।'

সুলতান মুখের উপর এক সস্নেহ হাসি টেনে এনে বললেনঃ 'আনওয়ার আলী জওকদার নন, রিসালাদার।*

আনওয়ার আলী অন্তরে এক খুশীর কম্পন অনুভব করলেন এবং কৃতজ্ঞতার ভাবে অভিভূত হয়ে দৃষ্টি অবনত করে বললেনঃ 'আলীজাহ্, এজাযত হলে আমি দু'জন সাথী সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।'

সুলতান বললেনঃ 'আমি তাঁদের কৃতিত্ব স্বীকার করি এবং আমি তাঁদের তরক্কীর হুকুম দিয়েছি। সৈয়দ গফ্ফার যে অফিসারদের সম্পর্কে আমায় বলেছেন, তাঁদের মধ্যে তোমার ভাইও আছেন। তাঁকে আমি তোমার জায়গায় নিযুক্ত করেছি। এখন আমি তোমায় এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পাচ্ছি। কয়েদী মহিলাদের দুশমন শিবিরে পৌঁছে দেবার জন্য একজন হুঁশিয়ার ও কর্তব্যনিষ্ঠ লোকের প্রয়োজন এবং তোমাকেই আমি সে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মনোনীত করেছি। কাল ভোরে তুমি তাঁদের সাথে রওয়ানা হয়ে যাবে। বিশজন সওয়ার তুমি সাথে নিয়ে যেয়ো। তাঁদের জন্য পালকির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পালকি বয়ে নেবার জন্য কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দী দুশমন সিপাহীকে মুক্ত করে দাও। এ কথা আমার বলে দেবার প্রয়োজন নেই যে, পথে যেনো এঁদের কোনো তকলীফ না হয়।'

ঃ 'আলীজাহ্, আমার তরফ থেকে কোনো ত্রুটি হবে না।'

ঃ বহুত আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো।'

আনওয়ার আলী সালাম করে খিমার বাইরে চলে গেলেন।

পুণা ও দাক্ষিণাত্যের পরাজিত সেনাবাহিনী তুংগভদ্রা নদীর আশপাশের সকল এলাকা বিপজ্জনক মনে করে কৃষ্ণা নদীর ধারে, এসে জমা হতে লাগলো।

একদিন লশকরের সরদাররা এক খিমার মধ্যে জমা হয়ে নয়া পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন। তাহ্ওয়ার জঙ, হোলকার ভোঁসলে এবং অন্যান্য রাজা ও সরদার একে একে সম্মিলিত সেনাবাহিনীর সিপাহ্সালার হরিপন্থের আচরণ সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। যাঁরা তাঁদের বিবিদের ছেড়ে এসেছেন যুদ্ধের ময়দানে, আলোচনার বৈঠকে তাদেরই মুখ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে সব চাইতে বেশী তিক্ততা।

হরিপন্থ রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বুলন্দ আওয়াযে চীৎকার করে বলতে লাগলেন ঃ 'আমায় বুযদীল বলে নিন্দা করতে পারেন, এমন কেউ নেই আপনাদের মাঝে। আমি আপনাদেরকে বারংবার বুঝাবার চেষ্টা করেছি যে, আমরা প্রমোদ ভ্রমণ ও অবসর বিনোদনের জন্য এখানে আসিনি, এসেছি যুদ্ধ করতে এবং আমাদের যুদ্ধ এমন এক দুশমনের সাথে, যিনি অনেক ময়দানে ইংরেজ ফউজের বড়ো বড়ো সালারের যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দিয়েছেন। তাই নারীদের সাথে নেওয়া আমাদের

** জওকদার জওক বা কোম্পানীর প্রধান কর্মচারী এবং রিসালদার আধুনিক যুগের কর্নেলের সমমর্যাদা সম্পন্ন পদ।*

উচিত নয়। আপনাদেরকে আমি বারংবার সর্তক করে দিয়েছি যে, যে সব আরাম আয়েশের সামগ্রী আপনারা সাথে এনেছেন, তারই জন্য আমাদের গতিবিধির অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। আপনাদের নওকর ও খেদমতগারদের দেখাশুনা ও হেফাযত এক সমস্যা হয়ে পড়েছিল। আমাদের মোকাবেলা হয়েছে এমন এক লোকের সাথে, যাঁর সিপাহীরা থলের মধ্যে রেখে দেওয়া দুটো শুকনো রুটি অথবা এক মুঠো চাউলকেই মনে করে দু'বেলার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট। আর আপনাদের সাথে হাজারো উট ও অসংখ্য বলদের গাড়ি বোঝাই অপ্রয়োজনীয় জিনিস বয়ে বেড়াতে হয়েছে গুরুতর প্রয়োজনের সময়ে যে পথ আমরা কয়েক সপ্তাহে অতিক্রম করেছি, মহীশূরের সিপাহী তা' কয়েকদিনে অতিক্রম করে থাকে। দুশমনের হামলার দু'দিন আগে আমি আপনাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে, অপ্রয়োজনীয় জিনিস বোঝাই বলদের গাড়ি ও উট এবং অগুনতি খেদমতগারকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া যাক। কিন্তু আপনারা নারীদেরও সাথে রাখবার যিদ ধরলেন। ফল হল এই যে, যে গতিতে আমরা সফর করছিলাম, তার চাইতে দ্রুততর গতিতে দুশমন তাদের ভারী তোপ নিয়ে এগিয়ে এলো।

'তারপর কালকিরির দিকে অগ্রগতির সময়ে আমি চেষ্টা করেছিলাম, যা'তে আমাদের পুরো লশকর একই সাথে এগিয়ে না গিয়ে ছয় ভাগে বিভক্ত হয়ে সফর করে। কিন্তু আপনারা সে পরামর্শ কবুল করার যোগ্য মনে করলেন না। রাতের বেলায় যখন বৃষ্টি হতে লাগলো, তখন আমি বলেছিলাম যে, দুশমন মাত্র কয়েক মাইল দূরে রয়েছে এবং আমাদের আরাম না করে তাদের মোকাবিলার জন্য তৈরী থাকা উচিত। কিন্তু আপনারা সটান ঘুমিয়ে থাকলেন, আর যেসব সিপাহীকে আপনাদের তাঁবুর হেফাজতের জন্য রাখা হয়েছিলো, তারা নিমকহারাম প্রমাণিত হল।

'আমার দোষ কেবল এতটুকু যে, দুশমনের আকস্মিক হামলার সময়ে আমি সজাগ ছিলাম এবং আমার সিপাহীরা আপনাদের সিপাহীদের তুলনায় সতর্ক ছিলো, তাই নিজস্ব সিপাহীদের জান বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসার সুযোগ আমি পেয়েছি। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ সাহস করে লড়াই করে থাকতেন, তা হলে তিনি আমার নিন্দাও করতে পারতেন। কিন্তু আপনাদের কেউ ময়দানে থাকার ইরাদা করেছিলেন, এ দাবি করতে পারেন না। তখন আমাদের সবারই সামনে ছিলো জান বাঁচানোর প্রশ্ন। পার্থক্য হচ্ছে এই, শিবিরের আশপাশে দুশমনের বেষ্টনী পূর্ণ হবার আগেই আমি ফউজ বের করে নিয়ে এসেছি আর আপনারা চারিদিক থেকে পূর্ণ বিক্রমে দুশমনের হামলা শুরু হবার পরে শয্যা ছেড়ে উঠেছেন।

'দিনের বেলায় দুশমনের হামলা যতোই আকস্মিক হোক না কেন, আমাদের জন্য এ হেন পরিস্থিতির উদ্ভব হত না। আমরা শিবির থেকে এগিয়ে গিয়ে মোকাবিলা করতাম। কিন্তু রাতের অন্ধকারে এমনি অপ্রত্যাশিত হামলার পর আমাদের ফউজ সংহত করার কোনো উপায় ছিলো না। এখন অতীতের চিন্তা করে আর পরস্পর ঝগড়া করে কোনো লাভ হবে না। স্বীকার করি, আমাদের পরাজয় ঘটেছে। আমরা

এই পরাজয় থেকে কি শিক্ষা লাভ করেছি, তাই ভাববার জন্য আমরা আজ এখানে জমা হয়েছি।

'বন্ধুগণ! এক লড়াইয়ে আমরা পরাজয় বরণ করেছি। কিন্তু যুদ্ধ এখনো খতম হয়নি। আমাদের কাছে এখনো এত ফউজ রয়েছে যে, এখনো হিম্মত করে কাজ করলে আমরা কয়েক হফতায় সেরিংগাপটম পৌঁছে যেতে পারি। আমার বিশ্বাস, কয়েক দিনের মধ্যে পুণা ও হায়দরাবাদ থেকে আরো সেনা সাহায্য পৌঁছে যাবে এবং আমরা পরাজয়ের বদলা নিতে পারবো।'

এক মারাঠা সরদার উঠে বললেনঃ 'আমাদের যে সব নারী এই মুহূর্তে দুশমনের কয়েদখানায় বন্দী, তাদের সম্পর্কে কি চিন্তা করেছেন আপনারা, আমি জানতে চাচ্ছি।'

হরিপন্থ জওয়াব দিলেনঃ 'দোস্ত, এ শুধু আপনার ইয্যতের প্রশ্ন নয়, সবারই ইয্যতের প্রশ্ন। আমাদের নারীদের মুক্ত করার জন্য আমরা দুশমনকে পরাজিত করবো।'

সরদার বললেনঃ 'এর অর্থ হচ্ছে, যদি আমরা দুশমনকে পরাজিত করতে না পারি, তা'হলে আমাদের নারীরা তাদেরই হাতে থাকবে?'

অপর এক সরদার উঠে বললেনঃ 'এখন আলোচনা নিরর্থক। আমার বিশ্বাস, যদি আমরা সুলতান টিপুর সাথে শান্তি আলোচনা করে সেই বন্দিনীদের মুক্ত করে আনি, তা'হোলেও কোনো আত্মসম্ভ্রমশীল মারাঠা তাদেরকে নিজ গৃহে প্রবেশের অনুমতি দেবেন না।'

হোলকার উঠে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেনঃ 'যদি তোমাদের মধ্যে কেউ আমাদের মহিলাদের সম্পর্কে কোনো অবাঞ্ছিত মন্তব্য কর, তা'হলে তার জিভ টেনে বের করবো। আমার স্ত্রীও মুসলমানদের হাতে বন্দিনী এবং আমি তোমাদের সবার সামনে ঘোষণা করছি যে, তাঁর চাইতে আর কোনো মারাঠা নারীই বেশী ইয্যতের দাবিদার নয়।'

এর ফলে কয়েকজন মারাঠা রাজা ও সরদারের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হল এবং তাঁরা হোলকারের সাথে অশ্লীল আলোচনায় লিপ্ত হলেন।

আচানক একজন মারাঠা নওজোয়ান খিমার ভিতরে এসে হোলকারকে প্রণাম করে বললোঃ 'মহারাজ! রাণী সাহেবা অন্যান্য বন্দিনীর সাথে পিছনের চৌকিতে পৌঁছে গেছেন। মহীশূর ফউজের এক অফিসার ও বিশজন সশস্ত্র সিপাহী তাঁদের সাথে এসেছেন। রাণী সাহেবা আমাদের চৌকিতে রয়েছেন এবং তাঁর সাতে আগত সকল মহিলা বলছেন যে, তাঁদের পুরুষরা যতোক্ষণ না সেখানে তাঁদেরকে আনতে যাচ্ছেন, ততোক্ষণ তাঁরা ফিরে আসবেন না।'

এক মারাঠা সরদার বললেনঃ 'যাও, তাদেরকে বলো যে, এখানে তাদের কোন স্থান নেই।'

হোলকার ক্রুদ্ধ হয়ে বললেনঃ 'তাদের সম্পর্কে বলবার তুমি কে?'

সরদার জওয়াব দিলেনঃ 'আমার নিজের স্ত্রী সম্পর্কে বলতে আপনি আমায় বাধা দিতে পারেন না।'

হোলকার লা-জওয়াবের মতো মজলিসে সমবেত লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আমি তাঁদেরকে অভ্যর্থনা করে আনতে যাচ্ছি। আমার সাথে যেতে চান, এমন কে আছেন আপনাদের মধ্যে ?'

খিমার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য একটা স্তব্ধতা ছেয়ে গেলো। তারপর একে একে ছয়জন মারাঠা সরদার এগিয়ে এসে হোলকারের সাথে খিমার বাইরে চলে গেলেন।

যে নওজোয়ান দূত বন্দিনীদের খবর নিয়ে এসেছিলো, সে কিছুক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর বললোঃ 'দুশমনরা সকল নারীকেই পাঠিয়ে দিয়েছে।'

ভোঁসলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে বললেনঃ 'চলে যাও এখান থেকে। এখানকার সকল মারাঠা আত্সম্ভ্রমবোধহীন হতে পারে না।'

নওজোয়ান ক্ষুণ্ন মনে খিমার বাইরে গিয়ে ছুটতে ছুটতে হোলকার ও তাঁর সাথীদের সাথে মিলিত হল। খিমা থেকে কিছুদূর গিয়ে হোলকার তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'মহিলারা পায়ে হেঁটে এসেছেন?'

ঃ 'না মহারাজ, দুশমন তাঁদেরকে পালকিতে সওয়ার করে পাঠিয়েছে। আমাদের ফউজের লোকেরাই তাঁদেরকে বয়ে এনেছে। দুশমন তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছে।'

মারাঠা মহিলারা পালকি থেকে নেমে গাছের ছায়ায় বসে আপন লোকদের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। মহীশূরের সওয়ার ও তাদের সাথে আগত কয়েদীরা ছিলো কয়েক কদম দূরে দাঁড়ানো। উত্তরদিক থেকে প্রায় দেড়শ' সওয়ার দেখা দিলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যে চৌকির কাছে এসে পৌছলো।

চৌকির এক সিপাহী উঁচু গলায় বললোঃ 'মহারাজ হোলকার নিজেই এসেছেন।'

মহীশূরের সিপাহীর নওজোযান সালারের হুকুমে এগিয়ে গিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়ালো।

হোলকারের সাথীদের বেশীর ভাগ ছিলো তাঁর ফউজের বড়ো বড়ো অফিসার। তিনি কিছুটা দূরে তাদেরকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিলেন। তারপর তিনিও অপর ছয়জন সরদার ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং সোজা এগিয়ে গেলেন মহিলাদের দিকে। কয়েক মুহূর্ত পরে তাঁদেরকে দেখা গেলো বিবিদের সামনে অপরাধীর মতো দন্ডায়মান।

হোলকারের ঠোঁট শুকিয়ে এসেছে। বহু কষ্টে তিনি অশ্রু সংযত করলেন। অবশেষে তিনি ব্যথাতুর কণ্ঠে বললেনঃ 'রাণী, আমি বড়োই লজ্জিত। অবমাননার

যিন্দেগী আমার কাছে মৃত্যুর চাইতেও পীড়াদায়ক ছিলো, এর বেশী আর কিছু আমি বলতে পারি না।

হোলকার পত্নী এবার আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন। তিনি প্রশ্ন করলেনঃ 'আর সবাই কেন এলেন না?'

হোলকার আসল কারণটি প্রকাশ না করে জওয়াব দিলেনঃ 'আমরা তাঁদের ইন্তেযার করতে পারিনি। আমি সবাইর সওয়ারীর জন্য হাতী আনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মনে হল, হাতী তৈরী করতে দেরী লেগে যাবে।'

রাণী বললেনঃ 'আমাদের আগে আপনার মহীশূরের সিপাহীদের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিলো। তাঁরা কোনো বড়ো পুরস্কারের যোগ্য না হলেও আপনার শোকরিয়ার হকদার নিশ্চয়ই।'

হোলকার লম্বা লম্বা পা ফেলে সিপাহীদের দিকে এগিয়ে গেলেন। মহীশূরের সিপাহীরা তাঁকে সালাম জানালো এবং তাঁদের অফিসার এগিয়ে এসে আদবের সাথে হোলকারের সামনে দাঁড়ালেন।

হোলকার প্রশ্ন করলেনঃ 'আপনি এদের অফিসার।'

ঃ 'জি হ্যাঁ।'

ঃ 'আপনার নাম?'

ঃ 'আনওয়ার আলী।'

ঃ 'মহীশূরের ফউজে আপনার পদমর্যাদা কি?

ঃ ' আমি রিসালদার।'

ঃ 'আমার নাম হোলকার। আমি আপনার কাছে শোকরগুযারী করছি।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'আমরা শুধু আমাদের কর্তব্য পালন করেছি এবং আপনাদের এজাযত পেলে আমরাা এখান থেকেই ফিরে যেতে চাই।'

'আপনাদের কম-সে-কম একদিন আমার এখানে থাকতে হবে। আমার তাঁবু খুব দূরে নয়।'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'জনাব, আমাদেরকে অবিলম্বে ফিরে যাবার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। কেবল মহারাণী সাহেবার হুকুমে খানিকক্ষণ দেরী করলাম এখানে।'

হোলকার তাঁর গলা থেকে এক মোতির মালা এবং বহুমূল্য হীরকখচিত সোনার কণ্ঠি খুলে আনওয়ার আলীর সামনে তুলে ধরে বললেনঃ 'আমি আপনাদেরকে থাকতে বাধ্য করবো না। এ মালাটি আপনার সিপাহীদের জন্য আর এ কণ্ঠিটি আপনার পুরস্কার।'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'শোকরিয়া, কিন্তু মহীশূরের সিপাহী কেবল সুলতানের কাছ থেকেই পুরস্কার গ্রহণ করতে পারে। আপনি আমাদেরকে লজ্জিত করবেন না।'

হোলকার খানিকটা ইতস্ততঃ করে বললেনঃ আপনি আমার তরফ থেকে সুলতান টিপুকে বলবেন যে, তিনি আমার গর্দানের উপর এক পাহাড় চাপিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি আমায় অকৃতজ্ঞ দেখতে পাবেন না।'

আনওয়ার আলী হোলকারকে সালাম করলেন এবং সিপাহীদের ঘোড়ায় সওয়ার হবার হুকুম দিলেন।

যে মহিলাদের স্বজনরা তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে রাযী হল না, তারা হোলকার পত্নীর কাছেই থেকে গেলো। পরদিন হোলকারের চাপে পড়ে আরো কয়েকজন নিজ নিজ স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে রাযী হল। কিন্তু কতক লোক কোনমতেই ভুলতে পারলো না যে, তাদের নারীরা মুসলমানের হাতে পড়েছিলো। যেসব মারাঠা কয়েদী মহিলাদের সাথে এসেছে, তারা তাদের সতীত্বের সাক্ষ্য দিলো, কিন্তু মারাঠা তাঁবুর গোঁড়া বামুনরা সুলতান টিপুর বিরুদ্ধে মানসিক বিদ্বেষ সৃষ্টির কোনো মওকাই ছাড়তে রাযী ছিলো না। এবার তারা এই নারীদের সম্পর্কে মনগড়া কাহিনী তৈরী করে ঘটনাটিকে গোটা মারাঠা কওমের ইয্যতের প্রশ্ন বানাবার চেষ্টা করলো।

তিনদিন পর মহীশূরের বিরুদ্ধে জওয়াবী ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে আলাপ আলোচনার জন্য হায়দরাবাদী ও মারাঠা সেনাবাহিনীর পথ প্রদর্শকরা হরিপন্থের খিমায় জমা হলেন। মিস্টার ইউন নামে এক ইংরেজ অফিসারও জলসায় হাযির থাকলেন। দু'দিন আগে পূণায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট স্যার চার্লস্ মিলটের কাছ থেকে বিশেষ নির্দেশ নিয়ে তিনি সেখানে এসেছেন। হোলকার এই বৈঠকের আলোচনায় অংশ নিতে অস্বীকার করেছেন এবং বৈঠকে সমাগত ব্যক্তিগণ তাঁর অনুপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভব করেছেন। এক মারাঠা সরদার উঠে প্রস্তাব করলেন, হোলকারকে রাযী করার জন্য এক প্রতিনিধিদল পাঠানো হোক।

এই প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক চলছে। ইতিমধ্যে ইন্দোরের এক ফউজী অফিসার খিমায় প্রবেশ করে বললোঃ 'হোলকার মহারাজ তশরীফ আনছেন।'

কয়েক মিনিট পর হোলকার খিমায় প্রবেশ করলেন। মজলিসে হাযির লোকেরা পরস্পরের দেখাদেখি দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। হরিপন্থ তাঁকে নিজের ডান পাশে বসাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হোলকার তাঁর দিকে ফিরে না তাকিয়ে কয়েক কদম দূরে বসে গেলেন।

বৈঠকের আলোচনা শুরু হল এবং হরিপন্থ বক্তৃতা প্রসংগে বললেনঃ

'বন্ধুগণ! আমরা যে অবস্থার মোকাবিলা করছি, তা' আপনাদের কাছে গোপন নেই। আমাদেরকে অবিলম্বে ফয়সালা করতে হবে। অগ্রগতিতে যদি আমরা আরো বিলম্ব করি, তা'হলে তুংগভদ্রা ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী কয়েকটি কেল্লা দুশমনের দখলে চলে যাবে। অতীতে কয়েকটি যুদ্ধে আমরা যে ক্ষতি স্বীকার করেছি, তার বড়ো কারণ, বর্ষার মওসুমে আমাদের রসদ ও সেনা সাহায্যের ব্যবস্থা বিশৃংখল হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এখন আমাদের পথে তেমন কোনো সংকট নেই। যদি আমরা এখন তুংগভদ্রা নদী পার হয়ে দক্ষিণদিকে দুশমনের জন্য নতুন ময়দান খুলে দিতে পারি, তা'হলে তাদের পক্ষে তুংগভদ্রার ওপারে টিকে থাকা মুশকিল হবে। বর্ষার মওসুমে দুশমনের সাফল্যের মূলে ছিলো তাদের পদাতিক সেনাবল। কিন্তু এবারকার সূচনা আমাদের সওয়ারদের হাতে। যদি আমরা আগামী কয়েক মাস আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেই তুষ্ট থাকি, তা'হলে আগামী বর্ষার মওসুমে কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থানও মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। আমরা সময়ের অপচয় না করলে যুদ্ধের ফয়সালা এখনো আমাদের হাতে।'

হোলকার উঠে বললেনঃ 'আমার ভয় হয়, যদি আগামী বর্ষা পর্যন্ত আমাদেরকে কেবল বাহুবলের উপর ভরসা করতে হয়, তাহলে হয়তো দুশমনের লশকর পুণা ও হায়দরাবাদের দরযায় আঘাত হানবে।'

ভোঁসলে উঠে বললেনঃ 'হোলকার মহরাজ, এ ধরনের আলোচনা আপনার পক্ষে শোভন নয়। আপনার কাছে এর চাইতে ভালো কোনো যুক্তি থাকলে আমরা তা শুনতে তৈরী।'

হোলকার জওয়াব দিলেনঃ 'আমি এখানে কোনো যুক্তি নিয়ে আসিনি। আমি শুধু জানতে চাই, যে ইংরেজের ভরসা করে আমরা যুদ্ধ শুরু করেছিলাম, তারা এখন কি ভাবছে। তারা এখনো কেন ময়দানে নেমে আসছে না। স্যার চার্লস্ মিল্ট আপনাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য দূত পাঠিয়েছেন এবং আমি জানতে চাই, দূত কি পয়গাম নিয়ে এসেছেন?'

মজলিসে সমবেত ব্যক্তিদের দৃষ্টি মিঃ ইউনের উপর কেন্দ্রভূত হল। তিনি উঠে হোলকারকে সম্বোধন করে বললেনঃ 'ইওর হাইনেস, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যদি কোনো ওয়াদা করে থাকেন, তা' হলে তা অবশ্যি পূর্ণ করা হবে। কিন্তু আপনাদের এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, আপনাদের ময়দানে নামার আগে আমরা নিঃসংগ অবস্থায় দুশমনের সাথে লড়াই করে এসেছি। এখন আমাদের পুনরায় ময়দানের আসার আগে প্রস্তুতির প্রয়োজন।'

হোলকার বিদ্রুপের স্বরে বললেনঃ 'আমাদের দেহের শেষ রক্তবিন্দু বয়ে যাবার পর হয়তো তোমাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে। তখন তোমরা শুধু সুলতান টিপুকেই নয়; বরং পুণা ও হায়দরাবাদের হুকুমতকেও তোমাদের শর্ত মানিয়ে নিতে পারবে। স্যার চার্লস্ আমাদেরকে বহুবার আশ্বাস দিয়েছেন যে, লর্ড কর্ণওয়ালিস এক মযবুত ব্যক্তি এবং তিনি গভর্নর জেনারেল থাকাকালেই মহীশূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণা করবেন। আমি জানতে চাইঃ আর কতো কাল আমাদেরকে লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রস্তুতির প্রতীক্ষায় থাকতে হবে?'

ইউন বললেন ঃ 'ইওর হাইনেস, আপনাদের হতাশ হওয়া ঠিক হবে না। আমাদের বেশী বিলম্ব হবে না। আমি আপনাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, লর্ড কর্ণওয়ালিস এক মযবুত ব্যক্তি এবং সুলতান টিপুর সাথে বোঝাপড়া করার হিম্মৎ তিনি রাখেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এমন লোক রয়েছেন, যাঁরা মাংগালোর চুক্তি ভংগ করে সুলতান টিপুর সাথে যুদ্ধ বাধানোর বিরোধী। তাঁদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চিন্তা করছেন, যাতে মহীশূরের সাথে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।'

হোলকার বললেনঃ 'এর অর্থ হচ্ছে, কেবল মাংগালোর চুক্তিই তোমাদেরকে যুদ্ধে বিরত রেখেছে এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস এ চুক্তি ভংগ করবার জন্য উপযুক্ত বাহানার সন্ধান করছেন।'

ইউন জওয়াব দিলেনঃ 'ইওর হাইনেস, বাহানা সন্ধান করা তেমন মুশকিল নয়, কিন্তু আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছি যে, যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য আমাদের সময়ের প্রয়োজন।

ঃ 'তা'হলে এর অর্থ, যতোক্ষণ না লর্ড কর্ণওয়ালিস যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছেন, ততোক্ষণ তিনি সুলতান টিপুকে বন্ধুত্বের আশ্বাস দেবেন। আর যখন তাঁর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে, কোনো না-কোনো বাহানায় তিনি মহীশূরের উপর হামলা করবেন। কিন্তু আমরা কেন এ কথাটি বুঝবো না যে, আজ যে কওম সুলতান টিপুকে ধোকা দিতে পারে, কাল তারা আমাদেরকেও ধোকা দেবে এবং যে বাহানা অবলম্বন করে তোমরা টিপুর সাথে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি ভংগ করবে, আমাদের বিরুদ্ধেও একদিন অনুরূপ বাহানা খুঁজে পাওয়া যাবে।'

বৈঠকে একটা নিস্তব্ধতার ভাব ছড়িয়ে পড়লো। হোলকার খানিকক্ষণ চুপ থেকে কণ্ঠস্বর আরো উঁচু করে বললেনঃ 'ভাইরা! মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। লর্ড কর্নওয়ালিস টিপুর দুশমন আর আমাদের দোস্ত নন। তিনি আমেরিকায় ইংরেজের এক বিশাল রাজ্য হারিয়ে এসেছেন এখানে এবং ইংরেজ তাঁকে এজন্য এখানে পাঠায়নি যে, তিনি মহীশূর জয় করে আমাদের হাতে সমর্পণ করে যাবেন, বরং তাঁকে পাঠানো হয়েছে এই জন্য যে, ইংরেজ আমেরিকায় যে ক্ষতি স্বীকার করে এসেছে, হিন্দুস্তানে তা'পূর্ণ করা যাবে এবং শুধু মহীশূরের সালতানাতই তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। আজ মহীশূরের পালা এসে থাকলে কাল আমাদেরও পালা আসবে।

'সুলতান টিপুর সাথে ইংরেজের দুশমনির কারণ শুধু এই যে, তারা তাঁকে মনে করে তাদের পথের এক দুর্লংঘ্য প্রাচীর এবং তাদের পথ সাফ করে দেবার জন্য সে প্রাচীর ভূপতিত করবার মতো নির্বুদ্ধিতা করা আমাদের উচিত হবে না। এ দুনিয়ায়

কারুর শরীফ দোস্ত নাও মিলতে পারে, তবু তার কামনা করা উচিত, যেনো তার দুশমন শরীফ হয়। সুলতান টিপু এক শরীফ দুশমন। তাঁর শরাফতের এর চাইতে বড়ো প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, আমাদের কওমের যে নারীরা তাঁর হাতে বন্দী হয়েছিলো, তারাই তাঁকে আপন ভাই ও বাপ বলে গর্ব করে। আর ইংরেজ যখন মহীশূরের উপর হামলা চালিয়েছিলো, তখন অনন্তপুরের বিজয় উৎসব উপলক্ষে অগুনতি অসহায় নারী ও শিশু বন্দীকে ঠেলে দিয়েছিলো ভয়াল মৃত্যুর গহ্বরে।'

হরিপন্থ বললেনঃ 'আপনার ধারণায় এ পরিবর্তন এসেছে শুধু এই কারণে যে, টিপু আমাদের নারীদের সাথে শরীফ জনোচিত আচরণ করেছেন, কিন্তু আপনি এ কথা কেন ভাবেন না যে, এও ছিলো শুধু তাঁর একটা রাজনৈতিক চাল। তিনি জানতেন যে, এই নারীদের সাথে অসদাচরণ করলে সকল মারাঠা রাজ্য জ্বলে উঠবে এবং এ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য সেরিংগাপটমে পৌঁছবার হিম্মৎ আমাদের আছে।'

এক যুবতী খিমায় প্রবেশ করে বুলন্দ আওয়াযে বললেনঃ 'যে বাহাদুর সেরিংগাপটম পৌঁছবার হিম্মৎ রাখেন, বিপদের সময়ে বিবি-বোনদের ফেলে পালিয়ে আসা তাঁদের উচিত হয়নি।'

মজলিসে একটা শূন্যতা ছেয়ে গেলো। আরো কয়েকটি মহিলা খিমার মধ্যে প্রবেশ করলেন। যুবতী এসে এক মারাঠা সরদারের দিকে ইশারা করে বললেনঃ 'আমার পতি এখানে হাযির। আমি তাঁর কাছে জানতে চাইঃ কি পাপ আমি করেছি? আমার অপরাধ কি এই যে, আমি এক নারী আর পালাবার সময়ে আমি পিছনে পড়েছিলাম? আমি ও আমার বোনেরা মনে করেছিলাম যে, আমাদের পতিরা দুশমনের সাথে লড়াই করে মারা গেছেন আর আমরা খালি মাথায় তাঁদের জন্য মাতম করেছি। সুলতান টিপু আমাদের দুশমন, কিন্তু মাথা ঢাকবার জন্য তিনি আমাদেরকে এনে দিলেন চাদর। আমরা ছিলাম বন্দিনী, কিন্তু মহীশূরের কোনো সিপাহীর সাহস হয়নি আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার। সুলতান আমাদেরকে সসম্মানে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এখানে আমরা আমাদের সম্পর্কে এমন সব কথা শুনতে পাচ্ছি যা কোনো শরীফ লোক দেহপসারিণী নারীদের সম্পর্কেও বলতে পারেন না। আমি জিজ্ঞেস করিঃ তোমরা যখন আমাদেরকে দুশমনের হাতে ফেলে রেখে পালিয়ে এলে, তখন তোমাদের আত্মসম্মানবোধ কোথায় ছিলো?'

রাজা ভোঁসলে যুবতীর কথায় মুগ্ধ হয়ে বললেনঃ 'বোন! তোমাদের এখানে আসার প্রয়োজন ছিলো না। তোমাদের সম্পর্কে কেউ কোনো কুকথা বলে থাকলে সে অতি বড়ো পাপ করেছে এবং এই লশকরের প্রত্যেক সিপাহীর পক্ষ থেকে আমি মার্জনা ভিক্ষা চাইছি।'

এক আধাবয়সী নারী বললেনঃ 'মহারাজ, এখান থেকে আমরা ততোক্ষণ নড়বো না, যতোক্ষণ না আমরা আমাদের সম্পর্কে স্বামীদের ফয়সালা জানতে পারবো।'

ঃ 'আপনারা স্বজনদের খিমায় চলে যান। যদি কারুর পতি আপত্তি করেন, তাঁর সাথে আমরা বোঝাপড়া করবো। আমাদের দৃষ্টিতে আপনারা দেবী।' ভোঁসলে তারপর এগিয়ে গিয়ে এক সরদারকে হাত ধরে বললেনঃ 'তোমরা কি ভাবছো? উঠে স্ত্রীদের সাথে নিয়ে চলে যাও। যুদ্ধের আলোচনা কাল হবে।'

যাদের আপত্তি ছিলো, তারা এবার মূক হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর সকল নারী নিজ নিজ স্বামীর খিমায় চলে গেলেন।

নয়

পুণা ও হায়দরাবাদের সেনাবাহিনী তখনো জওয়াবী হামলার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। সুলতান অংগভদ্রা নদীর আশপাশের কয়েকটি চৌকি ও কেল্লা দখল করার পর বাহাদুর বান্দা অবরোধ করলেন। অবস্থান ও আত্মরক্ষা ব্যবস্থার দিক দিয়ে বাহাদুর বান্দার কেল্লা ছিলো মারাঠাদের এক শক্তিশালী কেন্দ্র। সম্মিলিত দুশমন বাহিনীর লক্ষাধিক ফউজ যখন মাত্র কয়েক মাইল দূরে তাঁবু ফেলে অবস্থান করছিলো, তখনই সুলতান এই কেল্লার উপর হামলা করলেন। ইসায়ী ১৭৮৭ সালের ৮ই জানুয়ারী প্রত্যুষে মহীশূরের ফউজ তীব্র হামলার পর কেল্লা দখল করবার চেষ্টা করলো, কিন্তু দুশমনের প্রবল বাধার দরুন তাদেরকে পিছু হটতে হল।

কয়েক ঘন্টা পর সুলতানের লশকর দ্বিতীয়বার হামলার জন্য তৈরী হচ্ছিল। তখন সম্মিলিত দুশমন বাহিনীর তাঁবু থেকে এক দূত সাদা ঝাণ্ডা নিয়ে দেখা দিলো। সে এসে সুলতানের সাথে শান্তি আলোচনা শুরু করলো। সুলতান অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির হুকুম দিলেন কিন্তু চারদিনের মধ্যে সম্মিলিত বাহিনীর সাথে সন্ধির শর্ত স্থির হল না। সুলতান বুঝতে পারলেন যে, দুশমনের শান্তি আলোচনা শুরু করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাপক প্রস্তুতির জন্য সময় নেওয়া। সুতরাং ১৩ই জানুয়ারী প্রত্যুষে মহীশূরের লশকর বাহাদূর বান্দার কেল্লার উপর পুনরায় গোলবর্ষণ শুরু করলো। কেল্লার মারাঠা কমাণ্ডার মারা গেলো। সিপাহীরা বাইরের সাহায্য লাভে হতাশ হয়ে হাতিয়ার সমর্পণ করলো।

বাহাদুর বান্দার কেল্লা হাতছাড়া হ'য়ে যাবার ফলে সম্মিলিত দুশমন বাহিনীর শিবিরে আতংক ছড়িয়ে পড়লো। এক রাজা অপর রাজাকে ও এক সরদার অপর সরদারকে অভিশাপ দিচ্ছিলো। নিযামের সিপাহীরা মারাঠাদের এবং মারাঠা সিপাহী নিযামের লশকরকে নিন্দা করছিলো ভীরু, বেশরম ও বুযদীল বলে। হায়দরাবাদ ও পুণার দরবারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উকীল সম্মিলিত সেনাবাহিনীকে বুঝাচ্ছিলো যে, তখনো তাদের এমন কিছু অনিষ্ট হয়নি। তখনো যদি তারা সকল পারস্পরিক বিরোধ ভুলে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হয়, তাহলে যুদ্ধের ধারা পালটে যাবে। মহীশূরের ফউজ তাদের সীমাবদ্ধ সামরিক শক্তি নিয়ে কয়েক হফতা বা কয়েক মাসের বেশী মোকাবিলা করতে পারবে না। আরো কিছুদিন যদি তারা হিম্মৎ করে টিকে থাকতে

পারে ,তা'হলে অচিরেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ময়দানে নেমে আসবে। কিন্তু ফউজের তাঁবুতে হোলকার প্রমুখ সরদাররা প্রকাশ্যে মত প্রকাশ করছিলেন যে, ইংরেজ তাঁদের সাথে প্রতারণা করছে। তারা শুধু চায় যে, মারাঠারা মহীশূরকে আধমরা করে তাদের সামনে এনে দেবে, কিন্তু মারাঠাদের এ কথা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে, যুদ্ধ বিলম্বিত হলে তাদের অবস্থাও মহীশূরেরই অনুরূপ হবে। তারপর ইংরেজ মারাঠার মিত্র হয়ে মহীশূরের এক অংশ দখল করে নেবার অথবা টিপুর মিত্র হয়ে মারাঠা শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার আযাদী লাভ করবে।

সুলতান টিপুও জানতেন যে, যুদ্ধ বিলম্বিত হওয়ার সুযোগে ইংরেজ প্রস্তুতির অবকাশ পেলে তাঁকে দ্বিমুখী যুদ্ধের মোকাবিলা করতে হবে। নিযাম ও পেশোয়াকে সন্ধি করতে রাযী করার একমাত্র পন্থা ছিলো অবিলম্বে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানো। মারাঠা শিবিরের অবস্থাও তাঁর অজানা ছিলো না। চর প্রতি মূহূর্তে খবর দিচ্ছিলো। সুতরাং বৃথা কালক্ষেপ না করে তিনি সম্মিলিত দুশমন বাহিনীর শিবিরের উপর হামলা করলেন। এ হামলা ছিলো যেমন আকস্মিক ও অপ্রতাশিত, তেমনি তীব্র। হোলকার যুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথেই তাঁর সিপাহীদের ময়দানের বাইরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। অবশিষ্ট মারাঠা সেনাবাহিনীকে কঠিন ধ্বংসের মোকাবিলা করতে হল।

কয়েক ঘন্টার ভিতরে ময়দান সাফ হ'য়ে গেলো এবং সুলতানের ঝটিকা বাহিনী পলায়নপর দুশমনের পিছু ধাওয়া করলো। নিযামের লশকর এতক্ষণ দর্শক হিসাবে ময়দানে দাঁড়িয়ে দেখছিলো দু'পক্ষের কার্যকলাপ। প্রথমবার তারা উপলব্ধি করতে পারলো মহীশূরের শক্তি। তাহ্ওয়ার জঙ ময়দান ছেড়ে পালাবার বেলায় আগে আগে থাকা সত্ত্বেও দেখতে পেলেন যে, তাঁর হিসাব নিকাশের দিন এসে গেছে। মহীশূরের ফউজ এতদিন তাঁদের সাথে নরম পন্থা অনুসরণ করে চললেও এবার নিযামের পুরানো পাপের হিসাব চুকিয়ে নেবার ফয়সালা করে ফেলেছে। মহীশূর বাহিনী সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহতভাবে তাদের পিছু ধাওয়া করলো। রাতের অন্ধকারে যখন তাহ্ওয়ার জঙ যুদ্ধের ময়দান থেকে বহুদূরে অবশিষ্ট সাথীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষতির হিসাব নিচ্ছিলেন, তখন জানা গেলো যে, তোপছাড়া তাঁদের অধিকাংশ অস্ত্রশস্ত্র, বারুদ ও রসদ বোঝাই গাড়ি দুশমনের হাতে চলে গেছে। কিছুক্ষণ পর বনের মধ্যে ভোঁসলে ও হরিপন্থের সাথে তাঁর মোলাকাত হলে তিনি তীব্র অভিযোগের স্বরে বললেনঃ 'ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনাদের ইরাদা আমার জানা নেই, কিন্তু হায়দরাবাদের দিক থেকে আমি পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে বলতে পারি যে, আমাদের জন্য এ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।'

যশোবন্ত রাও বললেনঃ 'বন্ধু! হোলকার আপনার চাইতে বেশী হুঁশিয়ার। তিনি এ কথা কয়েক মাস আগে বুঝেছেন। আপনি আজ বুঝলেন আর আমরা হয়তো কয়েকদিন অথবা কয়েক হফতা পরে বুঝবো।'

হরিপন্থ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেনঃ আমরা এ হামলার জন্য তৈরী ছিলাম

না। হোলকার দুশমনের পথ থেকে তাঁর ফউজ সরিয়ে না নিলে আমাদেরকে এ হেন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হত না। এখন দুশমন বাহিনী যতো এগিয়ে আসবে, তাদের সংকটও ততো বাড়তে থাকবে। আমরা পদে পদে তাদের মোকাবিলা করবো।'

এই বিজয়ের পর সুলতান তুংগভদ্রা ও কৃষ্ণার মাঝখানে কোনো জায়গায়ই দুশমনকে দম ফেলবার সুযোগ দিলেন না। তাহ্‌ওয়ার জঙ প্রত্যেক ময়দানেই নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চাইতেন এবং মারাঠা সিপাহীরা কোনো এক জায়গায় জমা না হয়ে মহীশূর ফউজের আগে আগে ভেড়ার পালের মতো ছুটে পালাচ্ছিলো। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট লর্ড কর্ণওয়ালিসের কাছে খবর পাঠাচ্ছিলো যে, তাদের বন্ধুরা হিম্মৎ হারিয়ে ফেলেছে। পূণা ও হায়দরাবাদের দরবারে হরিপন্থ ও তাহ্‌ওয়ার জঙের দূত জানাচ্ছিলো যে, তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। এখন সুলতানের সাথে সম্মানজনক শর্তে সন্ধি হলেই তারা তাকে বিজয় মনে করবে।

মহীশূরের সিংহ তখন বাসভূমি থেকে বহু দূরে এগিয়ে এসেছেন। হায়দরাবাদ ও পুনার দিকে অগ্রগতির পথ তাঁর সামনে উন্মুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে নিযাম ও পেশোয়ার শক্তি চিরকালের জন্য খতম করে দিতে পারেন, কিন্তু তাঁরা যখন শান্তির হস্ত প্রসারিত করলেন, সুলতান তখন অকুণ্ঠচিত্তে তলোয়ার কোষবদ্ধ করলেন। তার কারণ এ নয় যে, তিনি তাঁদের দিক থেকে প্রবল বাধার আশংকা করছিলেন। ভবিষ্যতে তিনি তাঁদের দিক থেকে শান্তিপ্রিয়তার প্রত্যাশাও করতেন না; বরং তার একমাত্র কারণ, তাঁর দৃষ্টিতে মহীশূরের আসল দুশমন ছিলো ইংরেজ এবং তিনি যুদ্ধ বিলম্বিত করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন না, যা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামরিক সংকল্প সিদ্ধির অনুকূল হতে পারে।

এ সন্ধি করতে হয়েছিলো নিরুপায় অবস্থায়। এমন এক মানুষের নিরুপায় অবস্থায়- যাঁকে শৃগাল শকুনের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে পিছন থেকে মেষপালের হামলার ভয় করতে হচ্ছিলো। কয়েক বছর আগে সুলতান টিপুর পিতা এমন সময়ে তলোয়ার কোষবদ্ধ করেছিলেন, যখন তাঁর সেনাবাহিনী মাদ্রাজের দরযায় আঘাত হানছিলো এবং তার কারণ ছিলো এই যে, তাঁর এ পশ্চাদভাগ ছিলো নিযাম ও মারাঠাদের ষড়যন্ত্রের দরুন অরক্ষিত। তারপর সুলতান টিপুর যিন্দেগীতেও এসেছিলো এমন এক পর্যায়, যখন ইংরেজ দেখতে পাচ্ছিলো যে, দক্ষিণ হিন্দুস্তানে কোথাও তাদের জন্য এতটুকু নিরাপদ স্থান নেই। কিন্তু পিছন থেকে নিযাম ও মারাঠা শক্তির হামলার বিপদ সম্ভাবনা তাঁকে ইংরেজের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য করেছিলো। তারপর যখন নিযামের মিল্লাতবিরোধী কার্যকলাপ ও মারাঠার দেশদ্রোহিতার হিসাব চুকানোর দিন এলো, তখন তাঁর জন্য ইংরেজ একটি বড়ো বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধের পর সন্ধির খাতিরে সুলতান যে মহৎ প্রাণের পরিচয় দিলেন, তা ছিলো

মারাঠাদের প্রত্যাশার অতীত। সুলতান তুংগভদ্রা ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী বাদামী, নারগণ্ড ও কাথিওয়াড় এলাকা মারাঠাদের ফিরিয়ে দিলেন এবং তার বিনিময়ে মারাঠা সুলতানের সাথে এক দেশরক্ষা ও সামরিক চুক্তি সম্পাদনে রাযী হল। নিযামের বন্ধুত্ব লাভের জন্য সুলতান আধুনীর বিজিত এলাকা মহাবৎ জঙকে ফিরিয়ে দিলেন।

ফরহাত আসরের নামাযের পর এক কামরায় বসে কোরআন তিলাওয়াত করছেন। জিন বাইরের প্রাংগণে এক গাছতলায় মোড়ার উপর উপবিষ্ট। আচানক বাড়ির বাইরের দিকে ঘোড়ার পদধ্বনি শোনা গেলো এবং জিন উঠে বাইরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কয়েকদিন আগে সেরিংগাপটমে যুদ্ধ সমাপ্তির খবর রটেছে, কিন্তু এক মাসের মধ্যে পুত্রদের ও লা গ্রাঁদের কোনো খবর না পেয়ে ফরহাত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। জিন দরযা থেকে কয়েক কদম দূরে থাকতেই নওকর ছুটে এসে বললোঃ 'মেম সাহেব, সাহেব এসেছেন।

জিন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরযার বাইরে তাকাতে লাগলেন।

দেউড়ির কাছে লা গ্রাঁদ তাঁর ঘোড়াটি এক নওকরের কাছে সোপর্দ করছেন। এগিয়ে যাবেন, না পিছু ফিরবেন, কয়েক মুহূর্ত জিন তার ফয়সালা করতে পারলেন না। তারপর লা গ্রাঁদ যখন দেওয়ানখানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন তিনি হঠাৎ বেরিয়ে এলেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে না হেঁটে ছুটে চলেছেন, সে অনুভূতিও তাঁর নেই। লা গ্রাঁদ দেওয়ানখানায় প্রবেশ করে পিছনে কারুর পায়ের আওয়ায শুনে ফিরলেন এবং নিজের অলক্ষ্যে দু'হাত প্রসারিত করলেন, কিন্তু তাঁর প্রত্যাশার বিরুদ্ধে জিন দরযার কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন।

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'জিন, আমি এসে গেছি। ফউজে আমার তরক্কী হয়েছে। তুমি অমন হতভম্ব হলে কেন, জিন? তুমি আমায় দেখে খুশী হওনি?'

জিন বেদনাতুর কণ্ঠে বললেনঃ 'তুমি একা এসেছ? ওঁরা কেন এলেন না?'

ঃ 'কারা? আনওয়ার ও মুরাদ? ওহ্, আমি জানতাম না, আমায় একা দেখে তুমি এতটা ঘাবড়ে যাবে। ওঁরা এক হফতার মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবেন। যুদ্ধ শেষ হতেই মসিয়েঁ লালী আমায় ছুটি দিয়ে দিলেন। আনওয়ার ও মুরাদকে নিয়ে তোমার এতটা পেরেশান হবার প্রয়োজন নেই। তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ। বসো, তোমার সাথে আমার অনেক কথা রয়েছে।'

জিন বললনেঃ 'আমি তাঁদের মাকে সান্ত্বনা দিয়ে আসছি। তিনি বড়ো পেরেশান। আমি এক্ষুণি আসছি।'

জিন চলে গেলে লা গ্রাঁদ আহতের মতো এক কুরসির উপর বসে পড়লেন। কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে জিন তার সামনে বসলেন।

লাগ্রাঁদ পকেটে হাত দিয়ে একটি থলে বের করে তাঁর সামনে রেখে বললেনঃ

'বিজয়ের খুশীতে আমাদেরকে দু'মাসের অতিরিক্ত বেতন দেওয়া হয়েছে। তা'ছাড়া আমার তিন মাসের ছুটি মিলেছে। আরওয়ার আলী ওয়াদা করেছেন, তিনি ফিরে এসেই আমাদের জন্য আলাদা গৃহের বন্দোবস্ত করে দেবেন।'

জিন বললেনঃ 'না, এটা নিজের কাছেই রেখে দাও। আমার কাছে তোমার পাঠানো সব টাকাই জমা রয়েছে। পুরো বেতন আমায় পাঠাও বলে আনওয়ার আলীর মা অসন্তুষ্ট হয়েছেন।'

লা গ্রাঁদ ক্ষুব্ন হয়ে বললেনঃ 'জিন, আমায় মনে করতে দিও না যে, আমি গরীব এবং তোমায় দেবার মতো কিছু আমার নেই।'

জিন মার্জনা ভিক্ষার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থলেটি তাঁর হাত থেকে নিয়ে বললেনঃ 'তোমায় অসন্তুষ্ট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, আমার জন্য তোমার এতটা টানাটানির মধ্যে দিন কাটানো ঠিক হয়নি। আনওয়ার আলীর মাতা আমায় নিজের টাকা থেকেও এক কপর্দক ব্যয় করতে দেন না।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'জিন, প্যারীতে যদি কেউ আমায় বলতো যে, দুনিয়ায় এমন লোকও আছেন, যাঁরা অপরিচিত মানুষকে তাঁদের রুটির ভাগ দেন, তা'হলে আমি তা বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এঁদের উপর এখন আরো বোঝা চাপানো আমি ভালো মনে করি না। খুব শীগ্‌গিরই এঁদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে আমাদেরকে। তোমার কাছে আমার আবেদনের যদি কোন অর্থ থাকে, তা'হলে আমার ইচ্ছা, আনওয়ার ও মুরাদ এখানে পৌঁছলেই আমাদের শাদী সম্পন্ন করা উচিত। প্রত্যেক লড়াইয়ের আগে আমি ভেবেছি, তোমার সাথে হয়তো আর আমার দেখা হবে না। আমার দারিদ্র্য সম্পর্কে আমি সচেতন। কিন্তু তা'সত্বেও আমরা পরস্পরের জন্য, এই আত্মপ্রতারণায় ডুবে থাকবার চেষ্টা আমি করেছি।

জিন ঘাড় নীচু করে বললেনঃ 'লা গ্রাঁদ, আমি অকৃতজ্ঞ নই। আমার ভবিষ্যত সম্পর্কে তোমার কোনো ফয়সালা আমার কাছে গ্রহণের অযোগ্য হবে না।'

শিশুর সামনে খেলনার স্তূপ রেখে দিলে যেমন হয়, লা গ্রাঁদের অবস্থাও তখন তেমনি।

বিশ দিন পর মসিয়েঁ লালীর বাসভবনের কাছে একটি ক্ষুদ্রায়তন গৃহে লা গ্রাঁদ ও জিনের শাদীর অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছিলো। গৃহটি কয়েক বছর আগে থেকে সুলতানের ফউজের ইউরোপীয় ও ইসায়ী সিপাহীদের জন্য গির্জা হিসাবে ব্যবহার করা হত। ইউরোপীয় অফিসার ছাড়া আনওয়ার, মুরাদ ও তাঁদের কতিপয় বন্ধু সেখানে হাযির। বিবাহ অনুষ্ঠান করলেন এক ফরাসী পাদরী।

দুলহা-দুলহান গৃহের বাইরে এলে মসিয়ে' লালী লা গ্রাঁদকে বললেনঃ 'লা গ্রাঁদ, তুমি খুব ভাগ্যবান, কিন্তু দুলহানের জন্য তোমার কামরাটি উপযোগী নয়। তুমি পসন্দ করলে তোমাদের মধুযামিনী যাপনের জন্য আমার গৃহের একাংশ খালি

করে দিতে আমি প্রস্তুত।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'শোকরিয়া। কিন্তু আনওয়ার আলী আমাদের জন্য একটি আলাদা বাড়ির বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। এখন আমরা সোজা সেখানেই চলে যাচ্ছি।'

গৃহের বাইরে আটজন কাহার একটি প্রশস্ত পালকী নিয়ে দণ্ডায়মান। জিন পালকীতে উঠে বসলেন।

আনওয়ার আলী লা গ্রাঁদকে বললেনঃ 'আপনিও তাশরীফ রাখুন। পালকীটি আপনাদের দুজনেরই জন্য।'

লা গ্রাঁদ পায়ে হেঁটে যেতে চাইলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আনওয়ার আলী ও তাঁর বন্ধুদের অনুরোধে জিনের পাশে গিয়ে বসলেন।

কাহাররা পালকী তুলে নিলে আনওয়ার ও মুরাদ তাঁদের সাথে সাথে চললেন। শহরের প্রশস্ত বাজার অতিক্রম করে কাহাররা এক সংকীর্ণ গলির মুখে এসে থামলো এবং পালকী নীচে নামালো।

আনওয়ার আলী এগিয়ে এসে বললেনঃ ' এ গলি খুবই সংকীর্ণ। এবার আপনাদের কয়েক কদম পায়ে হেঁটে চলতে হবে। অনেক চেষ্টা করেও আপনাদের জন্য কোনো বড়ো সড়কের উপর বাড়ি পাইনি বলে দুঃখিত।'

লা গ্রাঁদ ও জিন পালকী থেকে নেমে তাঁদের সাথে চললেন। জিনকে দুলহানের সাদা পোশাকে মনে হচ্ছিলো যেনো এক পরী। গলিপথের পায়ে চলা পথিকরা হয়রান হয়ে তাকাচ্ছিল তাঁর দিকে।

আনওয়ার আলী একটি মোড়ের কাছে থেমে বামদিকে একটি বাড়ির প্রশস্ত দরযার দিকে ইশারা করে বললেনঃ 'এই যে আপনার বাড়ি।'

লা গ্রাঁদ ইতস্তত করে বললেনঃ ব্যাপারটা আপনাদের কাছে বিচিত্র মনে হবে, কিন্তু আমরা একে শাদীর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করি।' তারপর তিনি দ্বিধা না করে সামনে ঝুঁকে জিনকে বাহুবন্ধনে ধরে তুলে নিয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন।

জিন বললেনঃ 'খোদার কসম, আমায় ছেড়ে দাও। এ দেশের লোকেরা এই ধরনের কার্যকলাপ পসন্দ করে না।'

প্রাংগণে আনওয়ার আলীর এক নওকর হাযির ছিলো। তার ভীতি ও পেরেশানী ছিলো দেখার বিষয়।

জিন বললেনঃ 'খোদার কসম, আমায় নামিয়ে দাও। এরা আমাদেরকে ঠাট্টা করবে।'

ঃ 'মাফ করুন।' বলে পেরেশান নওকর এক কামরার দিকে পালিয়ে গেলো। পিছন থেকে আনওয়ার আলী ও মুরাদ আলীর অট্টহাস্য জিনের কানে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত বোধ হোল। লা গ্রাঁদ তখনো তাঁকে ছেড়ে দেননি। কিন্তু জোর করে তিনি তাঁর হাত ছাড়িয়ে আলাদা হয়ে গেলেন।

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'জিন, আমাদের জন্য তোমার অমন করা উচিত হয়নি। পণ্ডিচেরীতে আমি তোমাদের চলতি রীতির সাথে পরিচিত হয়েছি।'

লা গ্রাঁদ সুন্দর দোতলা বাড়িটি মোটামুটি দেখে এসে বললেনঃ 'এ বাড়ি আমাদের প্রয়োজনের চাইতে অনেক বড়ো। এর ভাড়া আমার বেতনের চাইতে বেশী না হলে বাঁচি। আমায় বাড়িটা আগে দেখালে আমি এটা নেবার পরামর্শ দিতাম না।'

ঃ 'এ বাড়িটি কিনে নেওয়া হয়েছে। আজ থেকে আপনারা এর মালিক। এটি জিনের শাদীতে আম্মাজানের তোহফা।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'না, না, এটা খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আমাদের গর্দানের উপর আপনারা এত বড়ো বোঝা চাপাবেন না।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'দোস্ত, এতে তোমার নারায হওয়া উচিত হবে না। আমরা শুধু তোমাদের প্রয়োজনের দিকই ভেবেছি এবং এর চাইতে ভালো কোনো বাসগৃহ পাওয়া যায়নি বলে আমরা দুঃখিত।'

ঃ 'আনওয়ার আলী, আমি নারায হইনি।' লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'কিন্তু এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়েছে।'

আনওয়ার আলী জিনের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ জিন, এটা ছিলো আম্মাজানের আকাংখা এবং তাঁর আকাংখার প্রতি তোমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে বলে আমি আশা করি।'

জিন অশ্রুসজল চোখে বললেনঃ 'আমি তাঁকে আপন মা বলেই মনে করি। আমি শোকরিয়ার সাথে তাঁর এ তোহফা কবুল করছি। আমার জন্য এ বাড়ির প্রত্যেকটি ঈট সোনার চাইতেও মূল্যবান।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'এখন আপনাদের আরাম প্রয়োজন। আমাদেরকে এজাযত দিন। সরওয়ার খান এখন আপনাদের খেদমতে থাকবে। আপনাদের কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে অবাধে আমাদের ওখানে খবর পাঠাবেন।'

তারপর তিনি বুলন্দ আওয়াযে বললেনঃ 'সরওয়ার 'তুমি ভিতরে কি করছো? বাইরে এসো।'

সরওয়ার ছুটে এলো কামরার বাইরে।

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'ঘর থেকে তুমি ওঁদের সব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছো?'

ঃ 'জি হ্যাঁ, ওঁদের সিন্দুক আমি উপরে রাখিয়েছি। এক সিন্দুকের চাবি রয়েছে আমার কাছে। সরওয়ার খান পকেট থেকে একটা চাবি বের করে জিনের হাতে দিলো।

জিন পেরেশান হয়ে বললেনঃ 'আমার চাবি আমার কাছেই রয়েছে।'

সরওয়ার খান বললোঃ 'এ চাবি খোদ বিবিজী আমায় দিয়েছেন। তিনি বলছিলেন,

এটি বড়ো সিন্দুকের চাবি।'

জিন তার হাত থেকে চাবিটি নিয়ে নিলেন।

আনওয়ার আলী সরওয়ার খানকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'আজ থেকে এঁদের খেদমতের দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করা হল। আশা করি, নওকর হিসাবে তুমি তোমার গুণের প্রমাণ দেবে।'

ঃ 'জনাব, ভবিষ্যতে আমার কোন ভুল হবে না।' ক্ষমা ভিক্ষার আওয়াযে সরওয়ার খান বললো।

মুরাদ আলী হাসি চেপে রাখতে পারলেন না। তিনি প্রশ্ন করলেনঃ 'এর আগে তুমি কি ভুল করেছিলে?'

ঃ 'কিছু না, জনাব' পেরেশানী সংযত করে সরওয়ার খান বললো।

আনওয়ারও মুরাদকে বিদায় দিয়ে জিন ও লা গ্রাঁদ তাঁদের গৃহের কামরাগুলো ঘুরে দেখতে গেলেন। নীচ তলার পাঁচটি কামরা জরুরী জিনিসপত্রে সাজানো, উপরের দুটি কামরায় খুবসুরত গালিচা ও পালংক বিছানো রয়েছে।

এক কামরা দেখে অপর কামরায় ঢুকেই জিন এক কাঠের সিন্দুকের দিকে ইশারা করে বললেনঃ 'এ সিন্দুকটি তো আমার নয়। নওকর হয়তো ভুল করে তুলে এনেছে।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'এত বড়ো একটা সিন্দুক ভুল করে এখানে আসতে পারে না। আমার ধারণা, এরই চাবি তোমায় দিয়ে গেছেন ও'রা।'

জিন এগিয়ে গিয়ে সিন্দুকের তালা খুললেন। লা গ্রাঁদ তার ভারী ঢাকনাটা উপরে তুললেন। সিন্দুকটি রেশমী কাপড়ে বোঝাই।

লা গ্রাঁদ একটি জোড়া তুলে পালংকের উপর ছড়িয়ে ধরে বললেনঃ 'দেখো জিন, এটা কোনো ফরাসী দরযীর সেলাই মনে হচ্ছে।'

জিন জওয়াব দিলেনঃ 'আমার কাপড়ের মাপ ওঁদের দরযীর জানা ছিলো। কিন্তু ওঁদের সাথে থেকেও আমি জানতে পারিনি, এ কাপড় কখন তৈরী হয়ে এলো। আমাদের বাড়ির জন্য এতসব জিনিসপত্রের বন্দোবস্ত হচ্ছে, তাও আমি জানতে পারিনি। আমার জন্য এত তোহ্‌ফা জমা করা হচ্ছে, তা কোনো নওকরও আমায় বলে নি। লা গ্রাঁদ, খোদার কসম, সিন্দুকটা বন্ধ করো। আমি আর বরদাশত করতে পারছি না। এতখানি অনুগ্রহের যোগ্য আমি ছিলাম না। আহা! আমি যদি ওঁর মেয়ে হতাম!' জিনের দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুর সয়লাব।

লা গ্রাঁদ পেরেশান হয়ে বললেনঃ 'জিন, আমার বিশ্বাস, আনওয়ার ও মুরাদ আপন বোনের চাইতে এবং তাঁদের মা আপন মেয়ের চাইতে তোমায় কম মনে করেন নি।'

ঃ 'কিন্তু এ যে আমার কাছে অসহনীয়। আহা! এক অজানা মানুষ অপর অজানা মানুষের সাথে যে ব্যবহার করে থাকে, তাই যদি ওঁরা করতেন।'

দশ

নিযাম ও মারাঠার সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধ সুলতান টিপুর বিজয় মামুলী কৃতিত্ব ছিলো না। সুলতান এই যুদ্ধে সাফল্য গৌরবের অধিকারী হবেন, ইংরেজের মতো পণ্ডিচেরীর ফরাসী সরকারও তা' মোটেই বিশ্বাস করতে পারেনি। এ যুদ্ধে ফরাসীদের কাছ থেকে সক্রিয় সাহায্য লাভের প্রত্যাশা সুলতানের ছিলো, কিন্তু ঔপনিবেশিক ফরাসী সরকার ইংরেজের সাথে ভার্সাই চুক্তির দোহাই দিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে অস্বীকার করলো।

ভার্সাই চুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিলো এই যে, ইংরেজ ও ফরাসী হিন্দুস্তানের শাসকদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে। কিন্তু ফরাসীদের এ যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার কারণ শুধু এই চুক্তিই ছিলো না। তারা এ বাস্তব সত্য সম্পর্কে বেখবর ছিলো না যে, নিযাম ও মারাঠা ইংরেজেরই প্ররোচনায় যুদ্ধ শুরু করেছে এবং তারা যখন এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা নিজেদের জন্য লাভজনক মনে করবে, তখন ভার্সাই চুক্তি তাদের কাছে একটা কাগজের টুকরার বেশী মর্যাদা লাভ করবে না। তাদের পক্ষে যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার বড়ো কারণ ছিলো এই যে, এ যুদ্ধে তারা সুলতান টিপুকে মনে করতো দুর্বল পক্ষ। তাদের আন্তরিক বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, সুলতান বেশী দিন নিযাম ও মারাঠার মিলিত শক্তির মোকাবিলা করতে পারবেন না। ইংরেজও যদি ময়দানে এসে যায়, তা'হলে তারা সুলতানের মিত্র হ'য়ে নিজেদের জন্য কখনো সুফল সৃষ্টির প্রত্যাশা করতে পারবে না। সুতরাং পন্ডিচেরীর ফরাসী গভর্নর মসিয়ে' কাস্‌গিনী প্রথম চেষ্টা করলেন পুণ্য ও হায়দরাবাদের হুকুমতকে সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে। সে প্রচেষ্টা নিস্ফল হলে তাঁর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হল, যাতে ফ্রান্স সুলতান টিপুর পরিবর্তে মারাঠাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে, কেননা মারাঠাদের তাঁরা সুলতানের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী মনে করেছিলেন এবং এক দুর্বল বন্ধুর সাহায্য করতে গিয়ে তাঁরা এক শক্তিশালী দুশমনের সাথে সংঘর্ষ বাধাতে রাযী ছিলেন না।

সুতরাং পণ্ডিচেরীর হুকুমতের এক বিশেষ প্রতিনিধি যুদ্ধারম্ভের কয়েক মাস পর মারাঠাদের সাথে বন্ধুত্বের পয়গাম নিয়ে পৌছলো পেশোয়ারের কাছে, কিন্তু পুণার দরবারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট স্যার চার্লস্ মিলটের প্রভাব-প্রতিপত্তির দরুন তার সাফল্য লাভ সম্ভব হল না। ফরাসীদের ব্যর্থতার একটা বড়ো কারণ এও ছিলো যে, নানা ফার্ণাবিস তাদের বন্ধুত্বের পরিবর্তে ইংরেজের বন্ধুত্বের উপর অধিকতর বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর এ বিশ্বাসও ছিলো যে, ইংরেজ যে কোনো সময়ে যুদ্ধে অবশ্যি শামিল হবে।

পণ্ডিচেরীর হুকুমতের এই কর্মনীতির দরুন যুদ্ধের আমলে কেবল সেইসব ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় সিপাহী সুলতানের পক্ষ সমর্থন করলো, যারা মহীশূরের ফউজে নিয়মিত সিপাহী হিসাবে চাকুরী গ্রহণ করেছিলো।

মারাঠা ও নিযামের বিরুদ্ধে গৌরবময় বিজয় অর্জন করেও সুলতান টিপু মহীশুরের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশ্বস্ত ছিলেন না। এক বিপদজ্জনক ঝড় কেটে গেছে। কিন্তু বাস্তববাদী সুলতান ভবিষ্যতের আসমানে দেখতে পাচ্ছিলেন এক নতুন ঝড়ের পূর্বাভাস। তিনি জানতেন যে, মীর নিযাম আলী ও নানা ফার্ণাবিসের নাকের রশি রয়েছে ইংরেজের হাতে এবং তারা যখন খুশী' তাদেরকে নামিয়ে আনবে ময়দানে। তিনি আরও উপলব্ধি করেছিলেন যে, মহীশূর নিজস্ব শক্তিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অব্যাহতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে না এবং ইংরেজ, মারাঠা অথবা নিযামের মতো তাঁরও এমন এক শক্তিশালী মিত্রের প্রয়োজন, যার বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করা যেতে পারে। দক্ষিণ হিন্দুস্তানের আত্মরক্ষা দুর্গের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হিসেবে ইংরেজ তাঁকে প্রধান দুশমন বলে ঘোষণা করেছিলো। ফরাসীদের সম্পর্কেও তাঁর ভুল ধারণা ছিলো না। তথাপি হিন্দুস্তানে ফরাসী ও বৃটিশের স্বার্থ ছিলো স্বতন্ত্র ধরনের এবং সুলতান ভবিষ্যত সংঘর্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে হতাশ ছিলেন না। তাই তিনি গত যুদ্ধের শেষের দিকে ফরাসী হুকুমতের সাথে সরাসরি আলোচনার জন্য এক প্রতিনিধিদল প্যারী রওয়ানা করে দিয়েছিলেন।

যুদ্ধাবসানের পর সুলতান টিপুর জন্য সংগঠন ও সংস্কারমূলক কার্যকলাপের অবকাশ ছিলো অতি সংক্ষিপ্ত। তিনি যখন মারাঠা ও নিযামের সাথে যুদ্ধরত, তখন ইংরেজ মালাবারের নায়ার ও মোপলাদের বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়ে তাঁর জন্য নতুন ময়দান খুলে দেবার চেষ্টা করছিলো। ত্রিবাংকুরের রাজা ইংরেজের হাতের যন্ত্র হয়ে বিদ্রোহীদের উৎসাহ দান করেছিলো। কিন্তু ইংরেজের প্রত্যাশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সময়ের পূর্বে শেষ হ'য়ে যাওয়ায় ষড়যন্ত্রের বাঞ্ছিত ফললাভ হল না এবং মহীশূর ফউজের কয়েকটি দল অসুবিধার মোকাবিলা না করেই বিদ্রোহীদের দমন করলো। বিদ্রোহী নেতাদের কতক গেরেফ্‌তার হল এবং কতক পালিয়ে গেলো ত্রিবাংকুরে।

সুলতান ত্রিবাংকুরের রাজাকে নিষেধ করলেন বিদ্রোহীদের আশ্রয় ও উৎসাহ দান করতে। কিন্তু ত্রিবাংকুরের রাজা ইংরেজের সাহায্যের ভরসায় মহীশূরের বিরুদ্ধে দুশমনী কার্যকলাপ তীব্রতর ক'রে তুললেন। ত্রিবাংকুরের রাজা ছিলেন ইংরেজের মিত্র। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জন্য মাংগালোর চুক্তি ভংগ করে সুলতানের বিরুদ্ধে নতুন ক'রে যুদ্ধের সূচনা করার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি ব্যতীত সুলতান টিপুর বিরুদ্ধে ত্রিবাংকুরের দুশমনী কার্যকলাপের আর কোনো লক্ষ্য ছিলো না।

'বিগত কয়েক বছরের ঘটনাবলী আমাদের সামনে এ তিক্ত সত্য বারংবার স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে যে, আমরা সুলতান টিপুর আত্মরক্ষা শক্তি খতম না করে হিন্দুস্তানে পা ছড়াতে পারবো না। হায়দর আলী ও টিপুর হাতে আমাদের শোচনীয় পরাজয় স্পষ্ট প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মহীশূরই এদেশের সব চাইতে মযবুত কেল্লা। এবার নিযাম ‐ মারাঠাদের সম্মিলিত শক্তিকে বিপর্যস্ত ‐ার পর টিপুর

উদ্যম ও সাহস অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। তাঁর দূত পৌঁছে গেছে প্যারী ও কনস্তানতুনিয়ায়। নিযাম ও মারাঠা শাসকদের রাজ্যের ভিতরও এমন লোক পয়দা হ'য়ে গেছে, যাঁরা টিপুকে মনে করেন হিন্দুস্তানের আযাদীর রক্ষক। আমেরিকার উপনিবেশ হারানোর পর এহ দেশের বিশাল এলাকা দখল করে আমরা তার ক্ষতিপূরণ করে নিতে পারতাম, কিন্তু এদেশেও যদি আমরা এক জর্জ ওয়াশিংটনের জন্ম কামনা না করি, তা'হলে সুলতান টিপুকে আমরা আর অবকাশ দিতে পারি না। যদি আমরা তাঁকে পরাজিত করতে না পারি, তাহলে এ যাবত হিন্দুস্তানে আমরা যা' কিছু হাসিল করেছি, তা' আমাদের হাতছাড়া হ'য়ে যাবে। এখানে ব্যবসায়ী হিসাবেও আমাদের কোনো স্থান থাকবে না। টিপু প্রত্যেক ময়দানে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব তিনি জানেন। হিন্দুস্তানের বাজারে মহীশূরের তৈরী শিল্পের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে এবং ভয় হয় যে, সুলতান টিপু যদি আরো কয়েক বছর শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করে যেতে পারেন, তা'হলে শিল্প-বাণিজ্যে মহীশূর আমাদেরকে ছাড়িয়ে যাবে। এখনও এমন অবস্থা রয়েছে যে, বস্ত্র ও কাঁচশিল্পের মতো এখানকার কোনো কোনো শিল্প ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কারখানার তৈরী শিল্পকেও হার মানাতে পারে।

'এ যাবত হিন্দুস্তানে আমাদের সাফল্যের বড়ো কারণ ছিলো আমাদের নৌ-শক্তি। কিন্তু সুলতান টিপুই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তিত্ব, যিনি হিন্দুস্তানের এই দুর্বলতার অনুভূতি পোষণ করেন। বর্তমানে মহীশূরের বিভিন্ন দলের হাজারো লোক তেজারতী ও জংগী জাহাজ তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং আমার আশংকা রয়েছে যে, এক অপরাজেয় নৌ-শক্তির মালিক হতে সুলতান টিপুর খুব বেশী দিন লাগবে না। জাহাজ বানানোর জন্য যে কাঠের প্রয়োজন, মহীশূরের বনেই তা' প্রচুর পরিমাণে মওজুদ রয়েছে এবং মহীশূরের মেহনতী মানুষ সুলতান টিপুর হুকুমে জান দিতে প্রস্তুত। মহীশূরের আওয়ামের স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির প্রতি বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের আওয়ামের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে এবং আমরা আরো কয়েক বছর যুদ্ধে বিরত থাকলে এরূপ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, টিপুর ঝাণ্ডাতলে শুধু মহীশূরেরই নয়; বরং গোটা হিন্দুস্থানের সমবেত আত্মরক্ষা শক্তির মোকাবিলা করতে হবে আমাদেরকে।

'মোগল সালতানাতের পতনের পর যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, মহীশূরের শাসককে তা' পূর্ণ করবার সুযোগ দেওয়া আমাদের উচিত হবে না। আমাদের সামনে রয়েছে দু'টি বিকল্প পন্থা। হয় আমরা আমেরিকার মতো হিন্দুস্তান থেকেও সরে যাবো, নয়তো অবিলম্বে মহীশূরের উপর হামলা করবো। আমি স্বীকার করি যে, আমরা কেবল নিজস্ব শক্তিদ্বারা সুলতানের মোকাবিলা করতে পারবো না, কিন্তু আমি নিশ্চিত বলতে পারি, যদি আমরা নিযাম ও মারাঠাদের আশ্বাস দিতে পারি যে, আমরা এবার পিছনে থাকবো না, তা'হলে তারা আমাদেরকে সমর্থন দান করবে। কোম্পানী যুদ্ধের ব্যয় সম্পর্কে ভয় করেন, কিন্তু কোম্পানীকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, কেবল কালিকট, কাহনানর ও মাংগালোরের বন্দরগাহের মূল্যই হবে

যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয়ের চাইতে বেশী এবং কেবলমাত্র মালাবারের গরম মশলা, চন্দন ও সেগুন কাঠের ব্যবসায়ের ইজারাদারী থেকে যে লাভ হবে, তা' আমাদেরকে আমেরিকার অতীত ক্ষতি ভুলিয়ে দেবে।

'নিযাম ও মারাঠার সাথে গত যুদ্ধের কঠিন ক্ষতির ফলে সুলতানের শক্তিতে যথেষ্ট ঘাটতি পড়েছে। এঁরা টিপুকে দুশ্‌মন মনে করেন, এটা আমাদের সৌভাগ্য, কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব ও সাহায্য লাভে হতাশ হলে তাঁরা নিশ্চিতরূপে সুলতান টিপুর সাথে মৈত্রী সম্পর্ক কায়েম করার চেষ্টা করবেন। টিপু যখন তাঁদের তরফ থেকে আশ্বস্ত হবেন, তখন আমাদেরকে এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য তাঁর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না। তাই হিন্দুস্তানে ইংরেজের ভবিষ্যত সম্পর্কে চোখ বন্ধ ক'রে রাখার জন্য আমাদের ভার্সাই চুক্তির দোহাই দেওয়া উচিত হবে না।'

এই দলীল পেশ ক'রে লর্ড কর্ণওয়ালিস ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও বৃটিশ সরকারকে তাঁর সাথে একমত করে যুদ্ধ প্রস্তুতির এজাযত লাভ করেছিলেন। সুতরাং ইসায়ী ১৭৮৭ সালের শেষদিকে পুণা, নাগপুর, গোয়ালিয়র ও হায়দরাবাদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দূত লর্ড কর্ণওয়ালিসের তরফ থেকে নির্দেশ পেলো যে, তাঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এবং নিযাম ও মারাঠা শাসকদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে আত্মরক্ষামূলক ও সামরিক চুক্তি সম্পাদন করতে রাযী করার সময় সমাগত।

নানা ফার্ণাবিস ও মার্ধোজী ভোঁসলার কাছে লর্ড কর্ণওয়ালিস ব্যক্তিগত পত্রে লিখলেনঃ 'যদি আপনারা সুলতান টিপুর উপর অতীতের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চান, তা'হলে আমরা আপনাদেরকে সমর্থন দান করবো। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আপনাদের সাথে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদন করতে প্রস্তুত যে, তাঁরা তাঁদের মিত্রদের অজ্ঞাতে টিপুর সাথে সন্ধি করবার চেষ্টা করবেন না এবং মহীশূর কৃষ্ণা ও তুংগভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী যে সব এলাকা মারাঠাদের অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

লর্ড কর্ণওয়ালিস অন্যান্য মারাঠা রাজার মতো হোলকারকেও লিখলেনঃ 'আপনি হিন্দুধর্মের গৌরব রক্ষার জন্য অন্যান্য মারাঠা শাসকের সাথে ঐক্যবদ্ধ হউন এবং নিজস্ব প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা পুণার হুকুমাতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে চুক্তি করতে উৎসাহিত করুন।' কিন্তু হোলকারের জওয়াব ছিলো খুবই নিরুৎসাহব্যঞ্জক। তিনি শুধু সুলতানের বিরুদ্ধে কোম্পানীর মিত্র হতে অস্বীকার ক'রেই নিরস্ত হলেন না; বরং নিযাম ও মারাঠা রাজাদের টিপুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ায়ও বাধা দিতে চেষ্টা করলেন এবং জোরের সাথে তাঁদেরকে জানালেন, যদি হিন্দুস্তানের আযাদী তাঁদের কাম্য হয়, তা'হলে ইংরেজের পরিবর্তে সুলতান টিপুর সাথে মিলিত হওয়াই তাঁদের কর্তব্য। পুণা ও হায়দরাবাদের হুকুমতের কাছে তাঁর উপদেশ ব্যর্থ হলে তিনি হুমকি দিলেন: 'তোমাদের পরিবর্তে আমি সুলতান টিপুর পক্ষ সমর্থন করবো।'

ইংরেজের মতো নানা ফার্ণাবিস ও মীর নিযাম আলী মহীশূরের সুলতানকে মনে করতেন তাঁদের আধিপত্যের পক্ষে এক বড়ো বিপদ-সম্ভাবনার কারণ। কিন্তু আগের যুদ্ধে ইংরেজের নিরপেক্ষতার দরুন তাঁদেরকে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিলো, তা' বিবেচনা করে পুনরায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ওয়াদার উপর নির্ভর ক'রে যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে তাঁরা ভয় করছিলেন। তারপর যখন কয়েক মাসের প্রাণপণ চেষ্টার পর পুণা ও হায়দরাবাদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট তাঁদের মনের সন্দেহ দূর ক'রে দিলো, তখন লর্ড কর্ণওয়ালিসকে তাঁদের সাথে সন্ধির শর্ত স্থির করার ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হল। মীর নিযাম আলী ও নানা ফার্ণাবিস তাঁদের সহযোগিতায় চড়া দাম উসুল করে নেবার যিদ ধরলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস কোনো বিশেষ পক্ষের সন্তোষ বিধানের ফলে অপর পক্ষের অসন্তোষের বিপদ-সম্ভাবনা বরণ ক'রে নিতে তৈরী ছিলেন না। এই সওদাবাযীতে নিজের দাম বাড়ানোর জন্য নানা ফার্ণাবিস একদিন এই ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন যে, তাঁর দাবী না মেনে নিলে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে সুলতান টিপুর সাথে চুক্তি করবেন এবং অপরদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে আশ্বাস দিলেন যে, চুক্তির যেসব শর্ত মারাঠাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, মীর নিযাম আলীকেও তা' অবশ্যি স্বীকার ক'রে নিতে হবে।

মীর নিযাম আলীর দরবারে চুক্তির শর্ত নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজের বড়ো পৃষ্ঠপোষক ব'লে খ্যাত নিযামের হুঁশিয়ার উযির মীর আলম তাঁকে বুঝানোর জন্য পুরো জোর দিয়ে বললেন যে, নানা ফার্ণাবিস ইংরেজের সাথে সন্ধির শর্ত স্থির করতে গিয়ে দাক্ষিণাত্যের স্বার্থের প্রতি পুরো খেয়াল রেখেছেন। তিনি বললেনঃ 'আলীজাহ্! এ যুদ্ধে টিপুর পরাজয় নিশ্চিত। ইংরেজ তাঁকে চিরদিনের জন্য খতম করার ফয়সালা করেছে। এবার তারা ব্যাপক প্রস্তুতি সহকারে ময়দানে নেমে আসছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস যে সেনাবাহিনী জমা করেছেন, তা' এর আগে হিন্দুস্তানে কখনো দেখা যায় নি। মারাঠা তাদের সাথে যোগ দেবার ফয়সালা করেছে। একমাত্র হোল্‌কারের আলাদা হ'য়ে থাকায় তেমন কিছু পার্থক্য হবে না। এখন আমাদের ভাববার বিষয় হচ্ছে, টিপুর পরাজয়ের পর মহীশূরের মালে গণিমতের কতো অংশ আমরা পাবো। যুদ্ধ থেকে দূরে থেকে দূরে থেকে আমরা মারাঠা ও ইংরেজের অসন্তোষভাজন হতে পারি না এবং আমাদের জন্য সুলতান টিপুর সাথে শামিল হওয়াও সম্ভব নয়। চুক্তির কোনো শর্ত সম্পর্কে হুযুরের আপত্তি থাকলে তা'তে এখনো রদবদল করা যেতে পারে। মিস্টার কেনিয়াদে আমায় আশ্বাস দিয়েছেন যে, চুক্তির ব্যাপারে হুযুরের মনে যদি কোনো ভুল ধারণা জন্মে থাকে, তাহলে তা' দূর করবার পুরো চেষ্টা করা হবে।

'হুযুরের অবগতির জন্য আমি এ কথাও ব'লে দেবার প্রয়োজন মনে করি যে, এ যুদ্ধে টিপুকে কেবল দাক্ষিণাত্য, পুণা ও ইংরেজেরই মোকাবিলা করতে হবে না; বরং যুদ্ধ শুরু হতেই চারদিক থেকে উঠে আসবে এক ভীষণ ঝড়। কর্ণাটকের

মুহাম্মদ আলী ওয়ালাজাহ্, কুর্গ, ত্রিবাংকুর, কোচিনের হিন্দু রাজণ্যবর্গ ও মালাবারের সামন্তেরা লর্ড কর্ণওয়ালিসের ইশারা পেলেই সুলতানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করবে। তারপর সুলতানের পরাজয়ের লক্ষণ দেখলেই মহীশূরের অধিকাংশ হিন্দু সেখানকার সাবেক রাজার খান্দানকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবে। তা'ছাড়া কোনো অবস্থায়ই আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, আমরা যুদ্ধে বিরত থাকলেও টিপুর পরাজয় নিশ্চিত।'

মীর আলমের বক্তব্য শোনার পর দরবারের সবাই কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। অবশেষে মীর নিযাম আলীর রক্ষী বাহিনীর সালার ও দাক্ষিণাত্যের বিশিষ্ট জায়গীরদার নওয়াব শামসুল উমারা উঠে বললেনঃ 'আলীজাহ্, মীর আলম গত যুদ্ধের সময়েও বলেছিলেন যে, টিপুর পরাজয় নিশ্চিত, তাই আমাদের অবশ্যি মারাঠাদের সাথে যোগ দেওয়া কর্তব্য। আমি তখনো বলেছি যে, যাঁকে আমরা সহজেই আমাদের বন্ধু বানিয়ে নিতে পারি, তেমন লোকের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করা আমাদের উচিত নয়। আমরা যখনই সুলতান টিপুর দিকে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করেছি, তখনই তিনি শরাফতের প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু সুলতান টিপুকে সহজে পরাজিত করা হবে, এই আশা নিয়েই যদি আমরা যুদ্ধে শরীক হই, তা'হলেও এই চুক্তিতে এমন কতকগুলো কথা রয়েছে, যা নিয়ে আমাদের ঠান্ডা মনে চিন্তা করা উচিত।

'আমার প্রথম আপত্তি হচ্ছেঃ আমরা মারাঠাদের ভাড়াটে নই এবং আমাদের তরফ থেকে ইংরেজের সাথে চুক্তির শর্ত স্থির করার কোনো হক নানা ফার্ণাবিসের ছিলো না।

'আমার দ্বিতীয় আপত্তি হচ্ছে, এ চুক্তি শুধু টিপুরই বিরুদ্ধে। তাতে আমাদের কাছে দাবি করা হয়েছে যে, মহীশূরের বিরুদ্ধে আমরা ইংরেজ ও মারাঠাদের সমর্থন করবো, কিন্তু এতে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি নেই যে, যুদ্ধ সমাপ্তির পর চুক্তির কোনো পক্ষ আমাদের উপর হামলা করলে অপর পক্ষ আমাদের সাহায্য করবে। বিশেষ করে মারাঠাদের অতীত কার্যকলাপ এমন নয় যে, তাদের কোনো ওয়াদার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। আমি শুধু জানতে চাই, মহীশূরের সাথে বোঝাপড়া করার পর যদি তারা আমাদের উপর হামলা করে, সে ক্ষেত্রে ইংরেজ আমাদের কি সাহায্য করবে? আমি টিপুর সমর্থক হিসাবে নয়; বরং দাক্ষিণাত্যের সালতানাতের শুভাকাংখী হিসাবে প্রশ্ন করছিঃ এ চুক্তিতে আমাদের নিরাপত্তার যামানত কোথায়?

'এরপর আর একটি প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে এবং তা' হচ্ছেঃ যখন মহীশূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হিস্‌সা নেবার বেলায় আমাদের ফউজ মারাঠাদের সমান থাকবে, সেখানে এমন কি কারণ থাকতে পারে, যার জন্য মারাঠা মালে গণিমতের এক-তৃতীয়াংশ ছাড়াও পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বেশী উসূল করতে চাচ্ছে? আজই যদি

ইংরেজ এই চুক্তির শর্ত নির্ধারণের সময়ে মারাঠাদের প্রাধান্যসূচক আচরণের হকদার মনে করে, তা'হলে যুদ্ধ সমাপ্তির পর যে তারা আমাদেরকে সদাচরণের যোগ্য মনে করবে, তার কি এমন যামানত রয়েছে?

'নানা ফার্ণাবিসের অতীত কার্যকলাপ আমাদের দৃষ্টির অগোচর নয় এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি ইংরেজদের সম্পর্কেও কোনো মিথ্যা আশা পোষণ করি না। আলীজাহ্, আপনি আমার এ ধারণা ভিত্তিহীন মনে করবেন না যে, মহীশূর বিভাগের পর যদি ইংরেজ ও মারাঠা তাদের রাজ্যের অধিকতর প্রসার সাধনের জন্য দাক্ষিণাত্যের উপর হামলা করে বসে, তা'হলে আমরা সুলতান টিপুর চাইতেও অসহায় হয়ে পড়বো। এই হচ্ছে আমাদের সুযোগ, এখন আমরা সুলতান টিপুকে বানাতে পারি আমাদের শক্তিমান মিত্র। প্রতি মুহূর্তে তিনি আমাদের সাথে সম্মানজনক সমঝোতা করার জন্য তৈরী। আমি যখন দক্ষিণ হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন ইংরেজ ও মারাঠাদের পরিবর্তে সুলতান টিপুর সাথে আমাদের ভবিষ্যত জড়িত করার চেষ্টা ব্যতীত আর কোনো পন্থাই আমার নযরে আসে না। তিনি খুশীর সাথে এমন এক সমঝোতা করতে রাযী হবেন, যার শর্ত হবে মহীশূর ও দাক্ষিণাত্যের পক্ষে সমভাবে আশ্বাসপ্রদ।

'আলীজাহ্! আজ দাক্ষিণাত্যে ও মহীশূরের ঐক্যের ফলেই যুদ্ধের সম্ভাবনা সমাপ্ত হয়ে যেতে পারে। যদি আমরা এক মুসলমান শাসককে সমর্থন না-ও দিতে পারি, তা'হলেও এটা জরুরী নয় যে, আমরা ইংরেজ ও মারাঠার সমর্থন করে দক্ষিণ হিন্দুস্তানে এমন এক যুদ্ধের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবো, যা আমাদেরই আযাদী ও সৌভাগ্যের জন্য বিপদ-সম্ভবনা সৃষ্টি করবে।'

মীর আলম বললেনঃ 'আলীজাহ্! আমি শামসুল উমারার আন্তরিকতা ও নেক নিয়তের উপর হামলা করছি না। আমার ভয় হয়, সুলতান টিপু সম্পর্কে তিনি অতি বড়ো আশার স্বপ্ন দেখছেন। আমরা যদি যুদ্ধে বিরত থাকি, তা'হলে টিপু যে আমাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ ও মারাঠার সাথে চুক্তি করবার চেষ্টা করবেন না, তার কি যামানত রয়েছে?'

নিযামের ভ্রাতুষ্পুত্র ইমতিয়াযুদ্‌দৌলা সহসা দাঁড়িয়ে অন্তহীন ক্রোধের সাথে বললেনঃ 'কোনো সৎ মানুষই সুলতান টিপুর সম্পর্কে এই ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে না। তিনি যদি ইংরেজের সাথে মিলিত হবার পক্ষপাতীই হতেন, তা'হলে দক্ষিণ হিন্দুস্তানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও মহীশূর ব্যতীত আর কোনো তৃতীয় শক্তির অস্তিত্ব সম্ভব হত না। তিনি ইংরেজের সাথে হিন্দুস্তানের ইয্যত ও আযাদীর সওদা করতে রাযী নন বলেই ইংরেজ চায় তাঁকে মিটিয়ে দিতে। মহীশূরের ভবিষ্যত সম্পর্কে আমরা চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি, কিন্তু নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে চোখ বন্ধ করতে পারি না। আলীজাহ্, আপনার এজাযত পেলে আমি সুলতান টিপুর সাথে সর্বোতোভাবে সম্মানজনক শর্ত নির্ধারণ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করছি।'

মীর নিযাম আলী বললেনঃ 'আমরা লর্ড কর্ণওয়ালিসের দোস্ত ও সুলতান টিপুর দুশমন নই। টিপু অবশ্যি এক মুসলমান। যদি তুমি তাঁর সাথে কোনো সম্মানজনক চুক্তি করতে পারো, তা'হলে আমার দোআ থাকবে তোমার জন্য।'

ইমতিয়াযুদ্‌দৌলা বললেনঃ 'আলীজাহ্‌! এজাযত হলে আমি নিজেই সেরিংগাপটম যাবার জন্য প্রস্তুত।'

ঃ 'না, এখন তোমার যাওয়া ঠিক নয়।'

শামসুল উমারা বললেনঃ আলীজাহ্‌, তা'হলে এজাযত দিন।'

ঃ 'না, তোমার পদমর্যাদা এমন নয় যে, তুমি এক দূত হিসাবে সুলতান টিপুর দরবারে যাবে। আমি এ অভিযানের দায়িত্ব হাফিয ফরীদুদ্দীনের উপর সোপর্দ করতে চাই।' এই কথা বলেই মীর নিযাম আলী মসনদ থেকে উঠে পিছনের কামরায় চলে গেলেন।'

সেদিনই বিকাল বেলা অপর এক কামরায় উযিরে আযম মুশীরুল মুলক ও মীর আলম নিযাম আলীর সাথে আলাপ করছিলেন। মীর নিযাম আলী বললেনঃ 'মীর আলম! তোমার এতটা পেরেশান হওয়া উচিত হবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের টিপুর দিকে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করা জরুরী।'

ঃ 'আলীজাহ্‌। যদি আপনার মনে হয় যে, এতেই দাক্ষিণাত্যের কল্যাণ হবে, তাহলে আমার পেরেশানীর কোনো কারণ নেই।'

মীর নিযাম আলী হেসে বললেনঃ 'ইংরেজের ও মারাঠার সাথে সমতার ভিত্তিতে চুক্তি করতে পারলেই দাক্ষিণাত্যের কল্যাণ। মারাঠারা টিপুর সাথে সহযোগিতার হুমকি দিয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের কাছে তাদের দাম বাড়িয়ে নিয়েছে এবং আমার বিশ্বাস, লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন হাফিয ফরীদুদ্দীনের সেরিংগাপটম পৌছবার খবর পাবেন, তখন আমরাও পুরো দাম উসুল করে নিতে পারবো।'

মুশীরুল মুলক পেরেশান হয়ে বললেনঃ 'আলীজাহ্‌, তা'হলে আপনার মতলব, আপনি টিপুর সাথে শান্তি চুক্তির কোনো ইরাদা পোষণ করেন না।'

ঃ 'তুমি বিলকুল নাদান। মীর আলম, কাল ভোরে তুমি কলকাতা চলে যাও এবং লর্ড কর্ণওয়ালিসকে জানিয়ে দাও যে, সন্ধিচুক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

মীর আলম বললেনঃ 'আলীজাহ্‌, আমার বিশ্বাস, লর্ড কর্ণওয়ালিস আপনার সকল শর্তই মেনে নিতে রাযী হবেন। আমি হুযুরের খেদমতে হাযির হবার আগে কেনিয়াদের সাথে দেখা করেছি। তিনি খুব পেরেশান ছিলেন। তিনি বললেনঃ হুযুর টিপুর সাথে চুক্তির ইরাদা বদল করলে লর্ড কর্ণওয়ালিস আপনাদের সাথে এক আলাদা চুক্তি করতে রাযী হবেন এবং কোম্পানী মালে গণিমত থেকে মারাঠাদের যে অতিরিক্ত অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তার বিনিময়ে নিজের অংশ থেকে হুযুরকে উপযুক্ত অর্থ দান করতে রাযী হবেন।'

নিযাম হেসে বললেনঃ 'তুমি সফরের জন্য তৈরী হও এবং আমার বিশ্বাস, তুমি যখন কলকাতা যাবে, তখন কর্ণওয়ালিসকে কেনিয়াদের চাইতে কম পেরেশান দেখবে না।'

হাফিয ফরীদুদ্দীন সেরিংগাপটম থেকে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক খবর নিতে ফিরে এলেন। সুলতান টিপু একজন মুসলমান শাসকের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শনের জন্য শুধু মীর নিযাম আলীকে তাঁর অধিকৃত এলাকা প্রত্যাপর্ণ করতেই রাযী হলেন না; বরং তিনি দাক্ষিণাত্য ও মহীশূরের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ়তর করার জন্য মীর নিযাম আলীর কন্যা ও নিজ পুত্রের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব পেশ করলেন। এই শান্তি প্রচেষ্টায় অন্তহীন আনন্দ প্রকাশ করলেন। শামসুল উমারা, ইমতিয়াযুদ্দৌলা ও তাঁদের সমধারণাসম্পন্ন লোকেরা মীর নিযাম আলীর উপর চাপ দিতে লাগলেন, যে কোনো বিলম্ব না করে সুলতান টিপুর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ চিন্তা চুক্তি করা উচিত। অপরদিকে হায়দরাবাদে পুণা ও কোম্পানীর দূত নানা ফার্ণাবিসও লর্ড কর্ণওয়ালিসের নির্দেশে শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য সর্বপ্রকার সম্ভাব্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলো।

নিজস্ব ভবিষ্যত যাঁরা ইংরেজ ও মারাঠাদের সাথে জড়িত করে ফেলেছিলো, এরূপ সুযোগ সন্ধানীর অভাব ছিলো না হায়দরাবাদে। স্যার জন কেনিয়াদে সোনা-চাঁদির বিনিময়ে তাদের বিবেক কিনে নিয়েছিলেন এবং তাদের সাথে ক্রমাগত ওয়াদা করে যাচ্ছিলেন যে, মহীশূর জয় করা হলে তাদেরকে দেওয়া হবে সেখানকার বড়ো বড়ো জায়গীর। এইসব জাতিদ্রোহীদের স্ত্রী-কন্যাদের মাধ্যমে ইংরেজ ও মারাঠাদের দালালরা শাসক খান্দানের বেগমদের সাথে যোগাযোগ করেছিলো। সুতরাং ঘুষ, নযরানা ও তোহ্ফার মাধ্যমে তাদের প্রভাব মীর নিযাম আলীর হেরেম পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো।

'টিপু আমাদের সমমর্যাদা দাবি করছেন। টিপু নিযামুল-মূলক ও তাঁর নিজস্ব খান্দানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব করে আমাদের অবমাননা করেছেন। দাক্ষিণাত্যের শাহযাদীরা তাঁর পুত্রদের যিন্দেগী গুযরান করার চাইতে বিষ খেয়ে মরে যাওয়া ভালো মনে করবেন।'- উঁচু তবকার মহিলাদের মুখ থেকে এই ধরনের উক্তি যে কোনো সাধারণ লোকের ভিতরে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু মীর নিযাম আলী সর্বপ্রকার দুষ্কৃতি সত্ত্বেও আবেগপ্রবণ লোক ছিলেন না। তাঁর কাছে রাজনীতি ছিলো এক পাশা খেলা এবং তিনি কোনো ঘুঁটির উপর হাত রাখার আগে চিন্তা করতেন শতবার। টিপুর সাথে তাঁর অতীত বিরোধ কোনো আবেগপ্রধান উত্তজনার ফল ছিলো না; বরং তার কারণ ছিলো শুধু এই যে, তিনি শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ইংরেজ ও মারাঠাদের সমর্থন করা ভালো মনে করেছিলেন। যদি তিনি টিপুর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূল মনে করতেন, তা'হলে গোটা দুনিয়ার নিন্দার জন্যও তিনি পরোয়া করতেন না। কিন্তু তিনি সুলতান টিপুর বন্ধু হয়ে কয়েকটি হারানো এলাকা ফিরে পাওয়ার চাইতে ইংরেজ ও মারাঠার সমর্থন করে মহীশূর সালতানাতের তৃতীয়াংশ হাসিল করাকে মনে করছিলেন অধিকতর লাভজনক।

তাঁর কাছে সুলতান টিপুর সাথে মৈত্রী আলোচনা ছিলো লর্ড কর্ণওয়ালিস ও নানা ফার্ণাবিসের কাছে তাঁর দাম বাড়িয়ে নেবার একটি সফল চাল, নইলে তিনি গোড়া থেকেই ইংরেজ ও মারাঠার সাথে মিলিত হবার ফয়সালা করে বসেছিলেন। তথাপি সুলতান টিপুকে সরাসরি জওয়াব না দিয়ে কলকাতায় লর্ড কর্ণওয়ালিসের সাথে মীর আলমের আলোচনার ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত সুলতানের সাথে নামেমাত্র খবর আদান-প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখতে চাইলেন। তাই কয়েকদিন চিন্তা-ভাবনার পর তিনি এই চুক্তি সম্পর্কে জওয়াবী প্রস্তাব নিয়ে হাফিয ফরীদুদ্দীনকে পাঠালেন সুলতানের কাছে। মীর নিযাম আলীর এই পদক্ষেপে হায়দরাবাদে সুলতান টিপুর সমর্থকরা যেমন খুশী হলেন, ইংরেজ ও মারাঠার সমর্থকরা হলেন তেমনি পেরেশান ও বিষণ্ন।

একদিন সিপাহ্‌সালার বুরহানুদ্দীন তাঁর দফ্‌তরে বসে কিছু লিখছেন। আন্‌ওয়ার আলী কামরায় প্রবেশ করে তাঁকে সালাম করে মেয়ের সামনে দাঁড়ালেন।

ঃ 'কি খবর?' বুরহানুদ্দীন প্রশ্ন করলেন।

ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, নিযামের দূত কাল ফিরে চলে যাচ্ছে এবং সুলতান সন্ধির শর্ত নির্ধারণের জন্য আলী রেযা খান ও কুতবুদ্দীনকে তার সাথে পাঠাচ্ছেন।'

বুরহানুদ্দীন বেপরোয়া হ'য়ে জওয়াব দিলেনঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু তার সাথে তোমার কি সম্পর্ক?'

ঃ 'জনাব, আমি আরয করতে চাচ্ছি, আপনি প্রতিনিধিদলের সাথে ফউজের যে লোক পাঠাচ্ছেন, তাদের মধ্যে আমার ভাইয়ের নাম শামিল ক'রে দিন।'

ঃ 'কিন্তু আমি তো এর কারণ বুঝতে পারছি না। আমি জানি, তোমার ভাই এক দক্ষ সিপাহী, কিন্তু এ কাজের জন্য সুলতান হয়তো কোনো অভিজ্ঞ ও প্রৌঢ় অফিসারকে মনোনীত করবেন।'

ঃ 'জনাব, এসব ক্ষেত্রে কখনো কখনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক কাজে আসে। মুরাদ আলী আমায় বলেছে যে, ইম্‌তিয়াযুদৌলার সাথে তার পরিচয় রয়েছে এবং দাক্ষিণাত্য মহীশূরের মধ্যে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিলো।'

বুরহানুদ্দীন বিস্মিত হ'য়ে বললেনঃ 'কোন ইমতিয়াযুদ্‌দৌলা? নিযামের ভাতিজা?'

ঃ 'জি হ্যাঁ, আপনি হয়তো এতে বিস্ময়বোধ করেছেন। কিন্তু মুরাদ দাবি করছে যে, তিনি তার দোস্ত।'

ঃ ইমতিয়াযুদ্দৌলার সাথে তাঁর দেখা হোলো কবে?

ঃ 'জনাব, যুদ্ধের আগে আব্বাজনের এক ঘনিষ্ট বন্ধুর সাহেবযাদীর শাদী হয়েছিলো আধুনীর এক প্রতিপত্তিশালী খান্দানে! মুরাদ সেখানে গিয়েছিলো। বরাতের

সাথে আধুনী ও হায়দরাবাদের বড়ো বড়ো ওম্‌রাহ ছাড়া ইম্‌তিয়াযুদদৌলাও এসেছিলেন। সেখানে এক মজলিসে সুলতানে মোয়ায্‌যম সম্পর্কে বির্তক হচ্ছিলো এবং মুরাদের কতকগুলো কথায় ইমতিয়াযুদ্‌দৌলা মুগ্ধ হয়েছিলেন। মুরাদ বলে যে, সুলতান সম্পর্কে ইমতিয়াযুদদৌলার ধারণা খুবই ভালো এবং মুরাদকে হায়দরাবাদ যাবার মওকা দেওয়া হলে সে তাঁর পুরো সাহায্য লাভ করতে পারবে।'

বুরহানুদ্দীন হেসে বললেনঃ 'ইমতিয়াযুদ্‌দৌলার সাহায্য আমরা আগে থেকেই পেয়েছি, কিন্তু তোমার ভাই ওখানে গিয়ে যদি কোনো কল্যাণকর কাজ করতে পারেন, তা'হলে সুলতানের কাছে আমি তাঁর নাম পেশ করতে তৈরী। ব্যক্তিগতভাবে আমি মীর নিযাম আলীর কাছে কোনো ভালাইয়ের প্রত্যাশা করি না। কিন্তু তোমার ভাই যদি ইম্‌তিয়াযুদদৌলার সাহায্য লাভ করতে পারেন, তা'হলে আমাদের পক্ষে তাঁর সঠিক ধারণা উপলব্ধি করা সহজতর হবে।'

তৃতীয় দিন সুলতানের প্রতিনিধিদল মীর নিযাম আলীর জন্য বহুমূল্য উপহারসামগ্রীসহ হায়দরাবাদের পথে রওয়ানা হলেন এবং রক্ষী বাহিনীর সালার হিসাবে তাঁদের সাথে চললেন মুরাদ আলী।

এগারো

হায়দরাবাদের এক আলীশান বাসভবনের উপরতলার এক কামরায় তানবীর ও হাশিম বেগ উপবিষ্ট। তান্‌বীরের কোলে কয়েক মাসের একটি শিশু খেলছে। দুপুর বেলা। বাইরে হাল্‌কা হাল্‌কা বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এক পরিচারিকা কামরায় প্রবেশ করে বললোঃ 'জনাব, একটি লোক আপনার সাথে দেখা করতে চান।'

ঃ 'কে লোকটি?'

' আমি জানি না, জনাব ! নওকর তাঁকে দেওয়ানখানায় বসিয়ে দিয়েছে।'

হাশিম বেগ কামরা থেকে বাইরে গেলেন। নীচে নেমে দেওয়ানখানার কাছে গেলে এক নওকর এগিয়ে এসে বললোঃ 'হুযুর, মেহ্‌মান ভিতরে বসে আছেন।'

ঃ 'কি নাম তার?'

ঃ 'হুযুর, নাম আমি জিগগেস করিনি। কোনো অপরিচিত লোক।'

হাশিম বেগ বললেনঃ 'যে কোনো অপরিচিত লোককে তোমরা মেহ্‌মান মনে করো।'

ঃ 'জনাব, তাঁর লেবাস দেখে মনে হয়, কোনো বিশিষ্ট লোক।'

হাশিম বেগ কামরায় প্রবেশ করলে এক সুদর্শন নওজোয়ান উ'ঠে দাঁড়ালেন। মুহূর্তের জন্য হাশিম বেগ তাঁর চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তারপর তিনি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে বললেনঃ 'মুরাদ আলী, আপনি এখানে এলেন কি করে?'

ঃ 'আমি মহীশূরের প্রতিনিধিদলের সাথে এসেছি। চারদিন আমরা এখানে আছি। চাচা আকবর খানের চিঠিতে জেনেছিলাম যে, আপনি আজকাল হায়দারাবাদে। আমি এখানে পৌছেই সবার আগে শেখ ফখরুদ্দীনের বাসভবনের সন্ধান করেছিলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম, তিনি হজ্জে চ'লে গেছেন।'

হাশিম বেগ বললেনঃ 'আপনার সোজা আমার এখানে আসা উচিত ছিলো।'

ঃ 'আমি এক সিপাহী হিসাবে সুলতানের প্রতিনিধিদলের সাথে এসেছি এবং তাঁদের সাথে থাকা আমার পক্ষে জরুরী। আপনার আব্বাজান কোথায়?'

ঃ 'তিনি আধুনী ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি হায়দরাবাদ এসেই নিযামের রক্ষীবাহিনীতে শামিল হয়েছিলাম এবং ফিরে যাবার এজাযত আমি পাইনি।'

ঃ 'আর বোন তান্‌বীর কোথায়?'

ঃ ' সে এখানেই আছে। কি আশ্চর্য, এই তো কিছুক্ষণ আগে তান্‌বীর আপনার কথা বল্‌ছিলো।'

মুরাদ আলী বললেনঃ 'কয়েক হফ্‌তা আগেও আমি কল্পনা করতে পারিনি যে, আমি হায়দরাবাদে আসবো এবং এখানে আপনাদের সাথে মোলাকাত হবে।'

ঃ 'তান্‌বীর আপনাকে খুবই মনে করছিলো। আসুন, সে আপনাকে দেখে খুব খুশী হবে।'

মুরাদ আলী তাঁর সাথে চললেন।

পথে হাশিম বেগ বললেনঃ 'আপনি দু'মাস আগে আসলে শাহ্‌বাযের সাথে মোলাকাত হত।'

ঃ 'তিনি এখানে এসেছিলেন?'

ঃ 'আমি নিজে গিয়ে এলাজের জন্য তাঁকে এখানে এনেছিলাম। কিন্তু কোনো ফায়দা হল না। তিনি চিরদিনের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।'

মুরাদ আলী অবশিষ্ট পথ কোনো কথা বললেন না। তান্‌বীরের কামরার দরযার কাছে পৌছে হাশিম বেগ হাতের ইশারায় তাঁকে থামিয়ে নিজে হাসতে হাসতে ভিতরে গেলেন।

ঃ 'তাণবীর, তোমার ভাই এসেছেন।' তিনি বললেন।

ঃ 'আমার ভাই! নওকরগুলো কতো বদ্‌তমীয যে, তাঁকে সোজা উপরে নিয়ে আসেনি'।

তান্‌বীর উঠে শিশুটিকে হাশিম বেগের কোলে তুলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন।

মুরাদ আলী 'আসসালামু আলাইকুম' বলে চোখ নত করলেন এবং তান্‌বীর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

হাশিমকে কামরা থেকে বেরিয়ে শিশুটিকে মুরাদ আলীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ 'এই আপনার ভাগ্নে।'

মুরাদ আলী সস্নেহে শিশুটির মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'এর নাম কি?'

ঃ 'এর নাম নসরৎ বেগ।' হাশিম জওয়াব দিলেন। 'চলুন, ভিতের বসা যাক।'

কিছুক্ষণ পর কামরার ভিতরে অবাধে কথাবার্তা চলতে লাগলো। তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলেন শাহ্‌বায। মুরাদ আলী তানবীরকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন।

ঃ 'বোন, এ তক্‌দীরের ব্যাপার। এখন সবর ও সাহস ছাড়া কোনো চারা নেই। শাহ্‌বাযের তোমার অশ্রুর চাইতে বেশী প্রয়োজন তোমার দোআর।'

তান্‌বীর বললেনঃ 'ভাইজান, কি আযাবের ভিতরে আমাদের দিন কাটছে, আপনি জানেন না। সেইদিন থেকে আব্বাজান আমাদের সাথে কথা বলেন না। আম্মাজানের পক্ষেও এ দুঃখ অসহনীয়। প্রায়ই তিনি থাকেন অসুস্থ। আব্বাজানের স্বাস্থ্যও খারাপ হ'য়ে গেছে। একদিন তিনি ভাইজানের হাত ধরে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন, তখনই আমি প্রথম দেখলাম তাঁর চোখে অশ্রু। আব্বাজান আমার সাথে কথা বলেন না, কিন্তু তাঁর নির্বাক দৃষ্টি আমার মনে হামেশা এই অনুভূতি জাগিয়ে দেয় যে, এর সব কিছুই ঘটেছে আমার কারণে। আমি ইচ্ছা করলে ভাইজানকে ফউজে শামিল হতে বাধা দিতে পারতাম। আহা! আমি যদি আমার দু'টো চোখ তাঁকে দিয়ে দিতে পারতাম!'

মুরাদ আলী বিষণ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেনঃ 'সামিনা কেমন আছে?'

ঃ 'সামিনার ধৈর্য প্রশংসার যোগ্য। আজ পর্যন্ত কেউ তার চোখে অশ্রু দেখেনি। সে সবাইকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। আব্বাজান তাকে মনে করেন তাঁর যিন্দেগীর সব চাইতে বড়ো অবলম্বন, আর ভাইজান সামিনাকে বলেন তাঁর চোখের রোশনী।'

ছোট্ট শিশুটি এতক্ষণ চুপচাপ মুরাদ আলীর কোলে পড়েছিলো। এবার সে কান্না জুড়লো। হাশিম বেগ জলদী করে তাকে তুলে নিয়ে পরিচারিকাকে আওয়ায দিলেন। পরিচারিকা এসে শিশুটিকে বাইরে নিয়ে গেলো।

হাশিম বললেনঃ 'মুরাদ আলী, আমার আফসোস হচ্ছে, আমাদের প্রথম মোলাকাত বড়ো বেশী আনন্দপ্রদ হয়নি। তখন আমার ধারণা ছিলো ভিন্নরূপ, কিন্তু পরবর্তী পরিস্থিতি অনেক কিছুতেই আমায় আপনার সমধারণাসম্পন্ন ক'রে দিয়েছে। এখন আব্বাজানও অনুভব করছেন যে, দক্ষিণ হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সমৃদ্ধির জন্য নিযামুল মুল্‌কের ও সুলতান টিপুর মধ্যে ঐক্য অপরিহার্য। আমরা ইংরেজ ও মারাঠার সাথে যুক্ত হ'য়ে যিল্লত ছাড়া আর কিছুই পাইনি। খোদার শোকর, এখন নিযামুল-মুল্‌ক ও সুলতান টিপু পরস্পরের দিকে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করতে রাযী হয়েছেন।'

ঃ 'সুলতান টিপু হামেশা এই ঐক্যের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, তিনি নিযামুল-মুলককে তাঁর সাথে একমত করতে পারেন নি।'

ঃ 'আমার বিশ্বাস, এবার শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে না। হায়দরাবাদের ওমরাহের একটা প্রতিপত্তিশালী দল ইংরেজ অথবা মারাঠার পরিবর্তে সুলতান টিপুর সমর্থক হয়ে গেছেন। শামসুল উমারা ও ইমতিয়াযুদ্‌দৌলা তো পূর্ণ শক্তিতে দাক্ষিণাত্য ও মহীশূরের ঐক্য প্রচেষ্টার সহায়তা করছেন এবং এই সৎ প্রচেষ্টায় দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেকটি সত্যনিষ্ঠ মুসলমানের দোআ রয়েছে তাঁদের জন্য।

মুরাদ আলী বললেনঃ 'এখানে পৌছেই আমি ইমতিয়াযুদদৌলার খেদমতে হাযির হয়েছিলাম। আমার ভয় ছিলো, তিনি বড়ো লোক; এত দীর্ঘকাল পরে তিনি হয়তো আমায় চিনতেই পারবেন না। কিন্তু তিনি আমায় দেখেই চিনলেন। আমি তাঁর সাথে আলোচনা করেছি, এর মধ্যে শামসুল উমারাও এসে গেলেন। আমি মনে করলাম, আমি অবাধে কথা বলতে থাক্‌লে তাঁরা কিছু মনে করবেন। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরই মনে হল, আমরা যেনো কতোকালের চেনা। তাঁরা দু'জনেই নির্ভুল ধারণাসম্পন্ন মুসলমান; আর যদি দক্ষিণ হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ভাবী বংশধরদের ভাগ্যে ইংরেজের গোলামী নির্ধারিত না থাকে, তা' হলে তাঁদের যুক্তিসংগত প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য আমাদের প্রত্যেকেই দোআ করা উচিত।'

হাশিম বেগ বললেনঃ 'দাক্ষিণাত্যের ওমরাহের মধ্যে একমাত্র শামসুল উমারাই নির্ভয়ে নিযামুল-মুল্‌কের সামনে মনের কথা বলতে পারেন। তাঁরই অনুরোধে নিযামুল-মুল্‌ক হাফিয ফরীদুদ্দীনকে সুলতানের খেদমতে পাঠিয়েছিলেন।'

মুরাদ আলী বললেনঃ 'এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি তেমন অবহিত নই। শামসুল উমারা ও ইমতিয়াযুদ্‌দৌলার কথাবার্তা আমার কাছে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক মনে হয়েছে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমি অনুভব করছি যে, নিযামের দরবারে একটি প্রভাবশালী দল রয়েছে ইংরেজ ও মারাঠার সমর্থক। হায়! আমরা যদি জানতে পারতাম, তখন কলকাতায় মীর আলম ও লর্ড কর্ণওয়ালিসের মধ্যে কি কথাবার্তা হচ্ছিলো আর নিযাম কি লক্ষ্য নিয়ে তাঁকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন।'

হাশিম বেগ হেসে বললেনঃ 'দোস্ত, মীর আলম সম্পর্কে পেরেশান হবেন না। এখন হায়দরাবাদে বহু প্রভাবশালী ওমরাহ শান্তি স্থাপনের স্বপক্ষে এবং মীর আলম এই সৎকর্মের পথে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করলেও কামিয়াব হতে পারবেন না।'

মুরাদ আলী বললেনঃ 'সে বাধা শুধু মীর আলমের তরফ থেকে এলে আমার চিন্তিত হবার কারণ ছিলো না; কিন্তু, আমার আশংকা হয়, মীর নিযাম আলী এবারও অভ্যাসমতো দুই কিশতিতে পা রাখবার চেষ্টা না করেন। খোদা করুন, আমার এ আশংকা যেনো ভুল প্রমাণিত হয়। কাল আমাদের প্রতিনিধিদল নিযামের সাথে মোলাকাত করবেন। আমরা দাক্ষিণাত্যের হুকুমাতের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করতে যতোটা অধীর, মহীশূর সম্পর্কে মীর নিযাম আলীর সঠিক সংকল্প জানবার

জন্যও আমরা ততোটা অধীর। আমি আপনাদেরকে নিশ্চিত বলতে পারি যে, নিযামের নিয়ত সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে আমাদের বিলম্ব হবে না। এবার আমায় এজাযত দিন। এখানে থাকার সময়ে মাঝে মাঝে আমি আপনাদের সাথে দেখা করবো।'

তানবীর বললেনঃ 'ভাইজান, এ কথা ঠিক নয়। আমাদের এখানে থাকাই আপনার উচিত।'

ঃ 'যদি আমি আযাদ হতাম, তাহলে নিশ্চয়ই এখানে থাকতাম। কতোগুলো কর্তব্য আমার যিম্মায় রয়েছে। তুমি এ অভিযানে আমাদের কামিয়াবীর জন্য দোআ করো।

এরপর আমায় না ডাকতেই এখানে চলে আসবো। তোমরা দাবি করলে তখন আমি এখানে মাসখানেক থেকে যাবো।' এই বলে মুরাদ আলী দাঁড়িয়ে গেলেন।

হাশিম উঠে বললেনঃ 'বহুত আচ্ছা, ভাই! আমি পীড়াপীড়া করবো না, কিন্তু কাল সন্ধ্যায় আমাদের এখানে আপনার দাওয়াত। আমার বন্ধুরা আপনার সাথে দেখা করে খুব খুশী হবেন। নওয়াব শামসুল উমারা আমাদের সালারে আলা। তাঁকেও আমি ডেকে আনার চেষ্টা করবো।'

মুরাদ আরী বললেনঃ 'এখন কিছুকাল দাওয়াতের ব্যবস্থা করবেন না। আমি খুবই ব্যস্ত থাকবো। কিন্তু আমি ওয়াদা করছি, মওকা পেলেই এখানে হাযির হবার চেষ্টা করবো। সম্ভবত কোনোদিন খাওয়ার সময়েই আসতে পারবো। এবার আমায় এজাযত দিন।'

মুরাদ আলী মোসাফাহার জন্য হাত বাড়ালেন। কিন্তু হাশিম বেগ বললেনঃ 'আমি দরযা পর্যন্ত আপনার সাথে যাচ্ছি।

একদিন বিকালে শামসুল উমারার পালকী নিযামের দরযায় এসে থামলো এবং তিনি পালকী থেকে নেমে ধীর পদক্ষেপে দরযার দিকে এগিয়ে গেলেন। জ্বরে তাঁর মুখ পান্ডুর হয়ে গেছে। মহলের পাহারাদার তাঁকে সালাম করলো এবং এক নওজোয়ান অফিসার এগিয়ে এসে তাঁকে ধরে চলতে সাহায্য করার চেষ্টা করে বললোঃ 'জনাব, আপনার আরাম করার প্রয়োজন ছিলো।'

শামসুল উমারা তাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বললেনঃ 'আমি বেশ সুস্থ আছি। তুমি হুযুর নিযামকে খবর দাও, আমি তাঁর দেখা করতে চাই।'

ঃ 'আলীজাহ্, আমি আপনার পয়গাম ভিতরে পৌঁছে দিচ্ছি। কিন্তু এই মুহূর্তে মুশীরুল মুলক ও মীর আলম তাঁর খেদমতে হাযির রয়েছেন।'

ঃ 'তা আমি জানি এবং তারই জন্য আমি এসেছি। তুমি খবর পাঠাও।'

পাহারাদারদের অফিসার সালাম করে ভিতরে চলে গেল। শামসুল উমারা কম্পিত পদে দেউড়ির আগে এক কামরায় প্রবেশ করলেন এবং নিশ্চলের মতো বসে থাকলেন এক কুরসির উপর।

কয়েক মিনিট পর নওজোয়ান অফিসার ফিরে এসে বললোঃ 'আমি খবর পাঠিয়ে দিয়েছি এবং এও বলে দিয়েছি যে, আপনার তবিয়ৎ ভালো নয়।'

খানিকক্ষণ পর এক সিপাহী এসে আদব সহকারে সালাম করে বললোঃ 'আলীজাহ্, তশরীফ আনুন।'

শামসুল উমারা উঠে তার সাথে চললেন। পথে কোথাও কোথাও পাহারাদার দাঁড়ানো ছিলো। শামসুল উমারা হাত তুলে তাদের সালামের জওয়াব দিচ্ছিলেন। দ্বিতীয় দেউড়ির কাছে মহলের দারোগা তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন এবং তাঁর সাথে সাথে চললেন। একটি খুবসুরত বাগিচা পার হয়ে তাঁরা গিয়ে প্রবেশ করলেন এক প্রশস্ত বারান্দায়। দারোগা হাত দিয়ে একটা দরযার দিকে ইশারা করতেই শামসুল উমারা অবিলম্বে ভিতরে চলে গেলেন। মীর নিযাম আলী ছিলেন এক স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট এবং মুশীরুল মুলক ও মীর আলম তাঁর সামনে আদব সহকারে দন্ডায়মান। শামসুল উমারা কুর্ণিশ করে এগিয়ে গেলেন।

নিযাম আলী খানিকটা সোজা হয়ে বসলেন। তারপর বললেনঃ 'এ অবস্থায় তোমার এখানে আসা ঠিক হয়নি। তোমার মুখই বলে দিচ্ছে যে, তোমার তবিয়ৎ খুব খারাব।'

শামসুল উমারা বললেনঃ 'আলীজাহ্! আমার এই অবাঞ্ছিত প্রবেশের জন্য মাফ করবেন। আপনার তকলীফ না হলে আমি গোপনে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

মীর নিযাম আলী মুশীরুল মুল্ক ও মীর আলমের দিকে তাকিয়ে শামসুল উমারাকে বললেনঃ 'এখানে ইংরেজ বা মারাঠার কোনো লোক নেই। এঁদের সামনে তুমি অবাধে কথা বলতে পারো।'

ঃ 'আলীজাহ্, আমার আশংকা হচ্ছে যে, আমার কথা এঁদের কাছে অবাঞ্ছিত মনে হবে। তথাপি আমি আমার কর্তব্য পালন করছি। টিপুর প্রতিনিধি আপনার সাথে সাক্ষাত করেছেন। আমি জেনেছি যে, হুযুর তাঁদের সাথে কোনো উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলেননি এবং তাঁরা খুবই হতাশ হয়ে গেছেন।

ঃ 'তাঁদের হতাশার কোনো কারণ নেই। আমাদের আলোচনা মাত্র শুরু হল এবং এ ধরনের সমস্যার সমাধান একদিনেই হতে পারে না।'

ঃ 'কিন্তু আলীজাহ্, আমার ধারণা ছিলো যে, সুলতান আপনার সকল দাবিই মেনে নিয়েছেন। এই নেককাজে অযথা বিলম্ব করা আমাদের উচিত নয়।'

ঃ 'কিন্তু আমি তোমায় খোশখবর দিচ্ছি যে, লর্ড কর্ণওয়ালিসও আমার সকল দাবি মেনে নিয়েছেন। মীর আলম কলকাতা থেকে যে পয়গাম নিয়ে এসেছেন, তা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। আমার আফসোস হচ্ছে যে, এ যাবত তোমার সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়নি, নইলে এ অবস্থায় তোমায় এখানে আসার তকলিফ স্বীকার করতে হত না। তোমার আশংকা ছিলো যে, মহীশূরের সাথে বোঝাপড়া করার ফলে মারাঠারা আমাদের সাথে চুক্তি ভংগ করলে আমাদের সামনে আসবে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। কিন্তু এখন তুমি খুশী হতে পারো যে, মীর আলম কর্ণওয়ালিসের সাথে এরূপ শর্ত স্থির

করতে সমর্থ হয়েছেন, যার পর মারাঠা কোনো দুশমনীর প্রমাণ দিলে কোম্পানী আমাদের সাহায্য করবে না এমন-কোনো আশংকা থাকতে পারে না।'

কয়েক মুহূর্ত শামসুল উমারার মুখ থেকে কোনো কথা সরলো না। অবশেষে তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেনঃ 'আলীজাহ্! আমার যিন্দেগীর শ্রেষ্ঠ সময় আমি ত আপনার খান্দানের খেদমতে কাটিয়েছি। আমি আপনাদের নিমক খেয়েছি এবং আপনার সামনে অন্তরের কথা খুলে বলবার অধিকার আমার অবশ্যি আছে। হয়তো আমার কথাগুলো এখন আপনাদের কাছে খুবই অবাঞ্ছিত মনে হবে। কিন্তু সময় প্রমাণ করে দেবে যে, আমার আশংকা অমূলক ছিলো না। হুযুরের সামনে আমি মীর আলম ও মুশীরুল মুল্‌ককে প্রশ্ন করতে চাইঃ টিপুর সাথে ইংরেজ ও মারাঠার দুশমনীর কারণ কি? তার কারণ কি এই নয় যে, তারা তাঁর আত্মসম্ভ্রমবোধ, তাঁর হিম্মত, তাঁর শৌর্য ও তাঁর স্বাধীনতার উন্মাদনাকে তাদের পথের সব চাইতে বড়ো অন্তরায় মনে করে থাকে এবং তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেছে কর্ণওয়ালিস ও ফার্ণাবিসের আস্তিনে লুকানো খঞ্জর? তাঁকে ধোকা দেওয়া যায় না, খরিদ করা যায় না।

'আলীজাহ্! টিপুর সাথে ইংরেজ ও মারাঠার দুশমনীর কারণ সহজেই বোঝা যায়। তিনি এমন এক শাসক, যিনি মহীশূরে ইসলামের সমৃদ্ধি সাধন করেছেন। দিল্লীর বিশাল সালতানাতের পতনের পর এই দেশের কোটি কোটি মুসলমানের শেষ আশাস্থল তিনি, তিনিই গোটা হিন্দুস্তানের আযাদীর রূহ্ এবং যখন সে রূহ্ বেরিয়ে-যাবে, তখন এ দেশ হবে এক লাশ, যাকে ইংরেজ চঞ্চুর আঘাতে টুকরো টুকরো করবে ক্ষুধিত শুকনের মতো। এই শকুনের ক্ষুধা ক্রমাগত বেড়ে চলবে। আজ মহীশূরের পালা, এরপর আসবে আমাদের অথবা মারাঠার পালা। সময় এলে আমরা অনুভব করবো যে, এই দেশের ইয্‌যত ও আযাদীর যে দুশমনদের আমরা কাঁধে তুলে কলকাতা ও মাদ্রাজ থেকে এনেছিলাম সেরিংগাপটমে, তারাই তাকাচ্ছে দিল্লীর দিকে এবং পুণা ও হায়দরাবাদ হচ্ছে তাদের পথের মনযিল।

'ইংরেজের রাজ্যলালসার দৈত্য মুর্শিদাবাদ থেকে পৌঁছে গিয়েছিলো অযোধ্যায় এবং দক্ষিণ হিন্দুস্তানে কেবল মহীশূর সালতানাতই এক সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো গত ত্রিশ বছর ধরে রোধ করে এসেছে এই সয়লাবের পথ। আমি আপনাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, সুলতান টিপুর পতাকা যেদিন ধুলায় অবনমিত হবে, সেদিন হিন্দুস্তানের অবশিষ্ট শাসকদের কর্ণাটকের মুহাম্মদ আলী ওয়ালজাহর মতো ইংরেজের জন্য অসহায় দোআদাতা হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। সেদিন তাঁরই মতো তাঁদেরকে ইংরেজের সংগীণের ছায়ায় দরবার বসাতে হবে এবং অসহায় প্রজাদের রক্ত শোষণ করে ভরতে হবে তাদের পেট।'

মীর আলম ও মুশীরুল মুল্‌ক রুদ্ধ আক্রোশে মীর নিযাম আলীর মুখের দিকে তাকালেন এবং নিযাম আলী রাগে ফুলতে ফুলতে বললেনঃ 'তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে কি বলছো, তা' তুমি জানো না। তোমার পরামর্শের প্রয়োজন নেই আমার।'

মীর আলম বললেনঃ 'আলীজাহ্‌, টিপুর সব চাইতে বড়ো কামিয়ামী, তাঁর রাজনীতির বিষাক্ত প্রভাব হুযুরের দরবার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।'

মুশীরুল মুলক বললেনঃ 'তাঁর প্রতিনিধি আমাদের বাজারের ভিতর দিয়ে চললে লোক উঠে দাঁড়ায়। আমাদের মসজিদে তাঁর জন্য দোআ করা হয়। আওয়াম এতটা নির্ভীক হয়ে গেছে যে, হুযুরের সমালোচনা করতেও তারা দ্বিধা করে না, আর আমাদেরকে ইংরেজের পদলেহী বলে নিন্দা করে।'

মীর আলম বললেনঃ 'আলীজাহ্‌, এখানে পৌঁছামাত্রই স্যার জন কেনিয়াদে ও পুণায় দূত আমার কাছে অভিযোগ করেছেন যে, টিপুর প্রতিনিধিরা হায়দরাবাদে ছড়িয়ে রেখেছে চক্রান্তের জাল এবং তাঁদের ইশারায় আওয়াম প্রকাশ্যে গাল দিচ্ছে লর্ড কর্ণওয়ালিস ও নানা ফার্ণাবিসকে।'

শামসুল উমারা চীৎকার করে বললেনঃ 'মীর আলম! এখনো তুমি কিছু দেখনি, কিছু শোন নি। টিপুর প্রতি বিদ্বেষ তোমার চোখ-কানের উপর পর্দা ফেলেছে। কিন্তু নিযামুল মুলক যদি তোমার পিছনে চলবার ভুল করেন, তা'হলে এমন একদিন আসবে, যখন তোমারই পুত্র-কন্যা টিপুর জন্য অশ্রুপাত করবে। হায়দরাবাদের ভাবী বংশধররা সেদিন চীৎকার করে বলবেঃ আমাদের পূর্বপুরুষ একদিন যে তলোয়ার দিয়ে আঘাত হেনেছেন, আজ তা আমাদেরই শাহরগ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আমি জানি, যে কওমের বড়ো বড়ো লোক আত্মহত্যার পথ ধরে, কেউ সে কওমকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচাতে পারে না।

শামসুল উমারা এই পর্যন্ত বলেই আচানক নির্বাক হয়ে গেলেন। যে হিম্মত কঠিন জ্বর সত্ত্বেও তাঁকে নিযামের মহলে টেনে এনেছিলো, তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। বিস্ফোরিত চোখে কয়েক মুহূর্ত নিযামুল মুলকের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি ডুবে-যাওয়া আওয়াযে বললেনঃ 'আলীজাহ্‌! আমি কি বলছি, জানি না। আমার হিম্মত নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমায় এজাযত দিন।'

তিনি কুর্নিশ করার জন্য অবনমিত হলেন। কিন্তু দরযার তিন চার কদম যেতেই তিনি উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। মীর নিযাম কুরসি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং মীর আলম ও মুশীরুল মুলক ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে উঠবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি তখন বেহুঁশ। তার দেহ তখন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর কয়েকজন সিপাহী তাঁকে পালংকে তুলে মহলের বাইরে নিয়ে গেলো।

দু'দিন পর স্যার জন কেনিয়াদে লর্ড কর্ণওয়ালিসের কাছে চিঠি লিখলেনঃ 'আজ নিযামুল মুলকের রক্ষীবাহিনীর সালারে আলা ও হায়দরাবাদের বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী জায়গীরদারের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ছিলেন আমাদের নিকৃষ্টতম দুশমন এবং দাক্ষিণাত্য ও মহীশূরের ঐক্যের সব চাইতে বড়ো সমর্থক।'

শামসুল উমারার জানাযায় হায়দরাবাদের আওয়ামের এক বিপুল জনতার সমাবেশ হল এবং শহরের আওয়ামের মতো মহীশূরের প্রতিনিধিদল পালা করে জানাযা কাঁধে

করে বহন করলেন। লাশ কবরে নামাবার পর মুরাদ আলী ইমতিয়াযুদদৌলার দিকে তাকালেন এবং অলক্ষ্যে তাঁর চোখে অশ্রুধারা উথলে উঠলো।

ইমতিয়াযুদদৌলা তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেনঃ 'দোস্ত! আমার বাহু ভেঙ্গে গেলো। তকদীরের বিরুদ্ধে লড়তে আমরা পারি না। আমার কাছে শামসুল উমারার মৃত্যু দাক্ষিণাত্য ও মহীশূরের ঐক্য সম্পর্কে আমাদের অন্তরে পোষিত আশা-আকাংখার মৃত্যু।'

ঃ 'কিন্তু আমি হতাশ হইনি।' মুরাদ আলী হিম্মত সহকারে জওয়াব দিলেন।

ঃ 'আপনার হতাশ হওয়া চলে না। সুলতান টিপুর সিপাহী আপনি। হতাশ তারাই হয়, যাদের কোনো পথের দিশারী নেই।'

শামসুল উমারার মৃত্যুর পরেও মহীশূরের প্রতিনিধি দলের সাথে নিযামের মোলাকাতের ধারা অব্যাহত থাকলো, কিন্তু তখন তাঁর মোলাকাতের লক্ষ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও মারাঠার সাথে তাঁর সন্ধির শর্ত যথাসম্ভব সুবিধাজনক করে তোলা। প্রায় দুমাস পর মিত্রদের কাছ থেকে পূর্ণ আশ্বাস লাভের পর মীর নিযাম আলী সুলতান টিপুর দূতদের বিদায় করে দিলেন।

হায়দরাবাদ ছেড়ে যাবার কিছুকাল আগে মুরাদ আলী হাশিম বেগের গৃহে গেলেন। হাশিম ও তাঁর বিবি শান্তি-আলোচনার ব্যর্থতায় খুবই পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। মুরাদ আলী কয়েক মিনিট তাঁদের সাথে কথা ব'লে বিদায় নিলেন। হাশিম কিছুদূর তাঁর সাথে যেতে চাইলেন। কিন্তু মুরাদ আলী দেউড়িতে থেমে মোসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে বললেনঃ 'আপনি এখানেই থাকুন।'

হাশিম বেগ তাঁর সাথে মোসাফাহা করে বললেনঃ 'মুরাদ, আপনি হতাশ হবেন না। এখনো আমার বিশ্বাস, দাক্ষিণাত্য ও মহীশূরের কল্যাণের কোনো পথ খুলে যাবে। আগুন আর খুনের দরিয়া ব্যবধান সৃষ্টি করবে না আমাদের মাঝে। আমরা পরস্পরের উপর গুলী চালানোর জন্য পয়দা হইনি।'

মুরাদ আলী বেদনাতুর হাসি হেসে তাঁর সাথে মোসাফাহা করে লম্বা লম্বা কদম ফেলে সেখানে থেকে চলে গেলেন।

খানিকক্ষণ পর তিনি এসে পৌছলেন শাহী মেহ্মানখানায়। তখন তাঁর সাথীরা সফরের জন্য তৈরী।

সুলতান টিপুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য হিন্দুস্তানের তিনটি বৃহৎ শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। দক্ষিণ হিন্দুস্তানের সর্বশেষ প্রাচীরটিকে মিসমার করে দেবার জন্য নিযাম ও মারাঠাদের রাযী করাই ছিলো ইংরেজদের রাজনীতির সব চাইতে বড়ো সাফল্য। বহু বছর ধরে এই প্রাচীরই রোধ করেছে বিদেশী আধিপত্যের সয়লাব। যুদ্ধ তখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। শেরে মহীশূরকে আর একবার দাঁড়াতে হল অগুনতি শৃগাল, শকুন ও নেকড়ের মাঝখানে।

বাইরে থেকে কোনো সাহায্যেরও আশা নেই। পশ্চিমী হামলার বিরুদ্ধে আলমে ইসলামকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি কস্তানতুনিয়ায় যে দূত পাঠিয়েছিলেন, সে

ফিরে এসেছে হতাশ হয়ে। ওসমানিয়া সাম্রাজ্য তার ইতিহাসের সব চাইতে নাযুক পরিস্থিতি অতিক্রম করে চলেছে তখন। রুশ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিন ও অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঘোষণা করেছেন যে, সালতানাতের পশ্চিমাংশের রাজ্যগুলো দখল করে কস্তানতুনিয়ার তখতে বসানো হবে ক্যাথারিনের পৌত্র কন্‌স্টান্টাইনকে।

ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য কায়েম রাখার জন্য বৃটিশ উযিরে আযম বিভিন্ন শক্তির মধ্যে শান্তি স্থাপনে সচেষ্ট। এ হেন পরিস্থিতিতে ওসমানিয়া হুকুমত ইংরেজের মর্জীর বিরুদ্ধে সুলতান টিপুর সাথে কোনো চুক্তি করতে রাযী হলেন না। তুর্কী সুলতানের সাথে টিপুর দূতদের মোলাকাতের আগেই কস্তানতুনিয়ার বৃটিশ দূত স্যার রবার্ট এন্সলীকে নির্দেশ দেওয়া হল, যেনো তুর্কী ও মহীশূর হুকুমতের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের আলোচনা ব্যর্থ করার সর্ববিধ সম্ভাব্য চেষ্টা করা হয়। সুতরাং বৃটিশ দূতের চেষ্টার ফল হল এই যে, তুর্কী খলীফা টিপুকে সুলতান উপাধি, কিছু তোহ্‌ফা ও নেক দোআ ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারলেন না।

ফ্রান্সে সুলতানের প্রেরিত প্রতিনিধির প্রচেষ্টার ফলও ছিলো হতাশাব্যঞ্জক। তুলুনের বন্দরগাহে ফরাসী হুকুমত ও আওয়াম সুলতানের প্রতিনিধিদের বিপুল সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করলেন। তারপর প্যারী পর্যন্ত পথের প্রত্যেকটি শহরে ফ্রান্সের আওয়াম ও হুকুমতের প্রতিনিধিরা তাঁদেরকে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁদের সফরের জন্য ছয় ঘোড়ার গাড়ি ও সওয়ারদের একটি রক্ষী বাহিনী নিযুক্ত করা হল। পথের প্রত্যেকটি শহরে তাঁদের সম্মানে আতশবাযীর ব্যবস্থা করা হলো। বহু মাইল পথ অতিক্রম করে লোকেরা তাঁদেরকে দেখতে এলো। প্যারীতে রাজা লুই তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে। কিন্তু উভয় সালতানাতের মধ্যে চুক্তির আলোচনা যখন হল, তখন তিনি জওয়াব দিলেনঃ 'আমরা ভার্সাই চুক্তি ভংগ করে ইংরেজের সাথে যুদ্ধের বিপদ সম্ভাবনা বরণ করে নিতে পারি না।'

প্যারীতে সুলতানের প্রতিনিধিদলের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিলো এই যে, ফ্রান্স নিজেই তখন অত্যধিক বিপজ্জনক অবস্থার মোকাবিলা করছিলো। হুকুমাতের যুলুম-নির্যাতন ও শোষণের দরুন সেখানকার গণজীবন হয়ে উঠেছিলো দুঃসহ এবং বিপ্লবী শক্তিসমূহ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলো। হুকুমাতের কোনো কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি ইংরেজের বিরুদ্ধে সুলতান টিপুর সাথে চুক্তি সম্পাদনের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু অর্থনৈতিক অসুবিধা হেতু বেশীর ভাগ ছিলেন ইংরেজের সাথে যুদ্ধের বিপদ বরণ করে নেবার বিরোধী। তাঁরা ফ্রান্সের রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে, হিন্দুস্তান থেকে ফরাসী সৈন্য অপসারণ করে মরিশাস ও বুরবুনের কেন্দ্র আরো মযবুত করা উচিত। ফ্রান্সের রাজা সুলতানের প্রতিনিধিদের একটি মাত্র দাবী খুশীর সাথে মন্‌জুর করে নিলেন এবং তদনুযায়ী তিনি একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, একজন অস্ত্রচিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ব্যতীত চিত্রকর, সুতোরমিস্ত্রী, তাঁতী, ঘড়ি নির্মাতা প্রভৃতি শিল্পীদের একটি দলকে তাঁদের সাথে যাবার অনুমতি দিলেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাথে টিপুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ও সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরও নিযাম বা মারাঠা যুদ্ধের ময়দানে আগে থাকতে রাযী ছিলেন না। অতীত অভিজ্ঞতা তাঁদেরকে যথেষ্ট সতর্ক করে দিয়েছিলো। এবারকার যুদ্ধের সূচনা ইংরেজের তরফ থেকেই হোক, এই ছিলো তাঁদেরক কাম্য। ইংরেজ সেনাবাহিনী সামরিক সরঞ্জামে সজ্জিত ছিলো। কুর্গের রাজা ও মালাবারের নায়ার সামন্তেরা তাদের সাথে গোপন চুক্তি করেছিলো। কারনুল ও কুড়পার নওয়াব ছিলেন মহীশূরের করদ এবং তাঁরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে আগে থেকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধ শুরু হলেই তাঁরা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন। এখন মাংগালোর চুক্তি ভংগ করার জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রয়োজন ছিলো কেবলমাত্র একটা বাহানার এবং সে বাহানা আগে থেকেই তৈরী ছিলো। ত্রিবাংকুরের রাজা রাম বর্মা দীর্ঘকাল সুলতান টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজের প্ররোচনায় বিদ্রোহমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁর সৈন্যদল কয়েকবার মহীশূর সীমান্তে হামলা করেছিলা। রাজা ছিলেন কোম্পানীর মিত্র এবং ইংরেজ তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য তাদের ফউজের দু'টি দল তাঁর হাতে ন্যস্ত করেছিলো।

সুলতান টিপুর জানা ছিলো যে, ত্রিবাংকুর রাজের জওয়াবী ব্যবস্থা অবলম্বন করলে তা' ইংরেজের সাথে সংঘর্ষে রূপান্তরিত হবে। তাই তিনি শান্তি স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হলেন, কিন্তু রাম বর্মা সুলতানের শান্তি প্রচেষ্টার জওয়াবে তাঁর সামরিক প্রস্তুতি আরো বলিষ্ঠ করে তুললেন। সুলতান ইংরেজের কাছে আবেদন জানালেন, যেনো তারা তাদের মিত্রকে বিরোধমূলক কার্যকলাপ থেকে নিরস্ত করে। কিন্তু সে আবেদন ফলপ্রসূ হল না।

মীর নিযাম আলী ও নানা ফার্ণাবিসের সাথে স্বস্তিকর চুক্তি হতেই ইংরেজ রাম বর্মার পিঠ চাপড়ে খুশী করলো এবং তিনি ত্রিবাংকুরের প্রতিরক্ষা লাইনের সামনে ঘন জংগল সাফ করার বাহানায় এক হাজার সিপাহী মহীশূরের সীমানার ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। কিন্তু সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দিলো। এক মাস পরে ত্রিবাংকুরের রাজা দ্বিতীয়বার হামলা করলেন, কিন্তু তারও পরিণাম হল একই। সুলতান টিপু পরিস্থিতি সম্পর্কে মাদ্রাজের গভর্নর জেনারেল মিডোজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং শান্তি স্থাপনের জন্য একটি মিশন প্রেরণ করতে তাঁকে আহবান জানালেন, কিন্তু জেনারেল মিডোজ ছিলেন সুলতান টিপুর পুরানো দুশমন এবং লর্ড কর্ণওয়ালিসের তরফ থেকে নির্দেশ পেয়েছিলেন যে, তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং যুদ্ধবিরতির কারণ হবার মতো কোনো চেষ্টা যেনো তাঁদের তরফ থেকে করা না হয়। সুতরাং মিডোজ সুলতানের শান্তি আবেদনের প্রতি কর্ণপাত না করে আরো তিনটি ব্যাটালিয়ন ত্রিবাংকুর সীমান্তে প্রেরণ করলেন।

ত্রিবাংকুররাজ ইংরেজের অথসাহায্য এবং চেরাকল, কালিকট, কোয়েম্বাটুর ও মালাবারের নায়ার সামন্তদের সহযোগিতায় মহীশূর সীমান্তে এক বিশাল সেনাবাহিনী সমাবেশ করেছিলেন। ইংরেজও তাদের ফউজের আট হাজার সিপাহীর জন্য উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিলো।

এহেন পরিস্থিতিতে আর একবার অস্ত্রধারণ ব্যতীত সুলতান টিপুর গত্যন্তর থাকলো না। মহীশূরের সিংহ আবার নেমে এলেন ময়দানে। ত্রিবাংকুর ফউজ মহীশূরের ঝটিকাবাহিনীর সামনে তৃণস্তূপ বলে প্রমাণিত হল। কয়েক ঘন্টার মধ্যে ত্রিবাংকুরের সীমান্ত চৌকি ও কেল্লাসমূহের উপর উড়তে লাগলো মহীশূরের পতাকা। রাজার সিপাহীরা ভেড়া-বকরীর মতো পালাতে লাগলো দিগ্বিদিকে। কর্ণেল হার্ডলের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ সিপাহীদের পাঁচটি দল তাদের বারুদ ও অস্ত্রসম্ভার ফেলে করংগুরে আশ্রয় গ্রহণ করলো। এক ইংরেজ পরচানবীশ যুদ্ধের ময়দান থেকে বোম্বে ও মাদ্রাজে জেনারেল মিডোজকে লিখে জানালোঃ 'আমি কখনো এমন লজ্জাজনক পশ্চাদপসরণ দেখিনি।'

ত্রিবাংকুরের প্রতিরক্ষা লাইন দখল করার পর সুলতান টিপু করংগুরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কর্ণেল হার্ডলে সেখান থেকেও পিছু হটে গেলেন এবং কেল্লা সুলতানের দখলে চলে গেলো। এরপর সুলতান কতিপয় বিখ্যাত কেল্লা দখল করে নিলেন। এবার গোটা ত্রিবাংকুর এলো সুলতানের পায়ের তলায়। রাম বর্মার তরফ থেকে কোনো বাধা পাওয়ার আশংকা ছিলো না। কিন্তু বেরাপুলী পৌছে সুলতানে কাছে খবর পৌছলো যে, লর্ড কর্ণওয়ালিস মহীশূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং তাদের মিত্ররা কয়েকটি ফ্রন্টে হামলা করার জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সুলতানকে তখন বাধ্য হয়ে পিছু হটতে হল।

বারো

মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট হাউসের এক কামরায় বড়ো বড়ো ফউজী অফিসারদের এক বৈঠক চলছিলো। মাদ্রাজের গভর্নর জেনারেল মিডোজকে নিযুক্ত করা হয়েছে কোম্পানীর ফউজের প্রধান সেনাপতি। বোম্বে ও কলকাতার ইংরেজ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের পরামর্শক্রমে যুদ্ধের কর্মসূচী নির্ধারিত হচ্ছে। কামরার মাঝখানে এক প্রশস্ত মেযের উপর দক্ষিণ হিন্দুস্তানের নকশা খোলা রয়েছে এবং তার আশেপাশে উপবিষ্ট রয়েছেন জেনারেল মিডোজ ও অন্যান্য ফউজী অফিসার।

জেনারেল মিডোজ বললেনঃ 'আমাদের প্রধান লক্ষ্য তাম্বাটুর ও পাইনঘাট এলাকার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। মহীশূরের গুরুত্বপূর্ণ শহর ও কেল্লাগুলোর দিকে অগ্রগতির জন্য এই উর্বর এলাকা থেকে রসদ সংগ্রহ করা খুবই সহজ হবে। বোম্বের ফউজের অগ্রগতি শুরু হবে মালাবার উপকূল থেকে এবং এই উপকূল এলাকা জয় করার পর তারা এসে মিলিত হবে মাদ্রাজের ফউজের সাথে। টিপু আমাদের অগ্রগতি রোধ করার জন্য কর্ণাটককে যুদ্ধের ময়দান বানাবার চেষ্টা করবেন, এমনি একটা বলিষ্ঠ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই জেনারেল কেলী করমন্ডল উপকূলের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাবেন বারমহলের দিকে, যেনো কর্ণাটকের বিপদ ঘটলে তার সাহায্য করা যেতে পারে। মাদ্রাজ থেকে অগ্রগতির পর আমাদের প্রথম কেন্দ্র হবে ত্রিচিনোপল্লীর আশপাশে।'

গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারী কামরায় প্রবেশ করলেন। সালাম করে তিনি এক পত্র পেশ করলেন। জেনারেল মিডোজ পত্রখানি খুলে পাঠ করলেন এবং কেমন উদাস হয়ে কুরসির উপর বসে রইলেন। ফউজী অফিসারগণ দ্বিধাগ্রস্ত ও পেরেশান হয়ে তাকালেন তাঁর দিকে।

জেনারেল মিডোজ কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে বললেনঃ 'জেন্টলমেন! এ হচ্ছে ত্রিবাংকুরের রাজার কার্যকলাপ সম্পর্কে এক নতুন রিপোর্ট। তাঁর ফউজ প্রত্যেক ময়দান ছেড়ে পালাচ্ছে। আমরা যে অস্ত্র ও বারুদ সরবরাহ করেছিলাম, তা' দুশমনের দখলে চলে গেছে। কর্ণেল হার্ডলে লিখেছেন, অবিলম্বে টিপুর মনোযোগ অন্যান্য ফ্রন্টের দিকে আকৃষ্ট করতে না পারলে তিনি অচিরেই গোটা ত্রিবাংকুর দখল করে নেবেন। চিঠি পড়ে জানা গেছে যে, পিছু হটার সময়ে আমাদের সিপাহীরা ত্রিবাংকুরের সিপাহীদের আগে যাবার চেষ্টা করছে। কাল ভোরেই আমাদের অগ্রগতির জন্য তৈরী হওয়া প্রয়োজন।'

সেক্রেটারী বললেনঃ 'ইওর এক্সেলেন্সী ! নওয়াব মুহাম্মদ আলীকে কি জওয়াব দেওয়া যাবে?'

জেনারেল মিডোজ ক্ষুব্ধ হয়ে বললেনঃ 'তিনি এখনো বসে রয়েছেন?

ঃ 'জি হ্যাঁ, আপনি বলেছিলেন, বৈঠক শেষে তাঁর সাথে মোলাকাত করবেন।'

ঃ কিন্তু কেন তিনি আমার সময় নষ্ট করতে চান? আমি কার্যভার নেবার পর তিনি তিনবার মোলাকাত করেছেন। যাও, তাঁকে বলো, আমি এখন অবসর পাবো না। আরো কয়েক ঘন্টা দেরী করতে না পারলে যেনো তিনি চলে যান।'

সেক্রেটারীর বললেনঃ 'ইওর এক্সেলেন্সী! তাঁকে হতাশ করা অতো সহজ নয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি আপনার ইন্তেযারে বসে থাকবেন। মাদ্রাজের গভর্নরের সাথে প্রতি তিন-চার দিনে একবার করে মোলাকাত করা তাঁর জীবনের সব চাইতে বড়ো আকর্ষণ। তিনি কোম্পানীর পুরানো অনুগত লোক এবং মাদ্রাজের সাবেক গভর্নরদের নির্দেশ, তাঁকে যেনো অকারণে নারায করা না হয়।'

জেনারেল মিডোজ কুরসি ছেড়ে উঠে বললেনঃ 'জেন্টলমেন, আমি এক্ষুণি আসছি।'

কর্ণাটকের কাষ্ঠপুত্তলি নওয়াব মুহাম্মদ আলী ওয়ালজাহ মোলাকাতের কামরায় উপবিষ্ট। তাঁর মুখে পেরেশানী ও উদ্বেগের ভাব। জেনারেল মিডোজ কামরায় প্রবেশ করলে তাঁর চোখ দু'টি আনন্দে চকচক করে উঠলো। তিনি জলদী করে উঠে এগিয়ে গেলেন এবং জেনারেল মিডোজ তাচ্ছিল্যসূচক হাসি হেসে সালাম জানিয়ে মোসাফাহার জন্য হাত বাড়ালেন।

মুহাম্মদ আলী দু'হাতে মোসাফাহা করে বললেনঃ 'হুযুরের সৌভাগ্য বুলন্দ হোক আর হুযুরের দুশমনরা অপমানিত ও ধ্বংস হোক!'

ঃ 'তশরীফ রাখুন, নওয়াব সাহেব! আপনাকে দীর্ঘ সময় ইন্তেযার করতে হয়েছে বলে আম দুঃখিত। আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম।'

মুহাম্মদ আলী কুরসির উপর বসতে বসতে বললেনঃ ঈদের চাঁদ দেখলে মানুষ মাহে রমযানের তকলীফ ভুলে যায়।'

ঃ 'ঈদ কবে?' জেনারেল মিডোজ হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'জনাব আমার মতলব বুঝতে পারেন নি। আমার মতলব হচ্ছে, আপনি আমার কাছে ঈদের চাঁদ। আপনাকে দেখে আমার মন বহুত খুশী হয়ে ওঠে।'

ঃ 'ওহ্, আমি মনে করেছিলোম, বুঝি ঈদের দিন এসে গেলো।'

ঃ 'জনাব, সত্যিকার ঈদ আসবে সেদিন, যেদিন আপনার সেনাবাহিনী সেরিংগাপটমে পৌঁছবে।'

ঃ 'নওয়াব সাহেব, এখনো তো যুদ্ধ শুরু হল না, আপনি বলছেন বিজয়ের কথা।'

ঃ হ্যাঁ, জনাব, আপনার ধারণা, আমি কিছুই জানি না। এখনই তো ত্রিবাংকুরের লশ্‌কর মালাবারে প্রবেশ করেছে।'

জেনারেল মিডোজ উষ্ণ হয়ে বললেনঃ 'ত্রিবাংকুরের লশকর ভেড়া-বকরীর মতো পালিয়ে যাচ্ছে।'

কয়েক মুহূর্ত মুহাম্মদ আলীর মুখ থেকে কোনো কথা সরলো না। তারপর তিনি আচানক পকেট থেকে একটি সোনার তাবিয বের ক'রে জেনারেল মিডোজের গলায় দিয়ে দিলেন।

'এটা কি?' ঃ জেনারেল মিডোজ ক্রোধ সংযত করার চেষ্টা ক'রে বললেন।

ঃ 'জনাব, এটা তাবিয। আপনি এটা গলা থেকে খুলবেন না। আমার বিশ্বাস, এর বরকতে প্রত্যেক ময়দানে আপনার জয় হবে। এটা আমায় দিয়েছিলেন এমন এক বুযর্গ, যাঁর প্রতিটি কথা ছিলো পাথরের রেখার মতো। এখন আপনি খোদার নাম নিয়ে হামলা করুন। দুনিয়ার কোনো শক্তিই সেরিংগাপটম পর্যন্ত আপনার পথরোধ করতে পারবে না। আমি শুনেছি, ফরাসীরা পন্ডিচেরী ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে। এ আপনাদের প্রথম বিজয়।'

জেনারেল মিডোজ অন্তহীন ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ আলীর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'নওয়াব সাহেব, আমার ভয় হয়, এই ফ্রন্টে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে আপনার আর্কট খালি করার মতো পরিস্থিতি না হয়।'

মুহাম্মদ আলী কয়েক মুহূর্তের জন্য মোহাচ্ছন্নের মতো জেনারেল মিডোজের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। অবশেষে তিনি বললেনঃ 'গভর্নর সাহেব! ত্রিবাংকুর থেকে কোনো দুঃসংবাদ এসে থাকলেও আপনার এতটা পেরেশান হওয়া ঠিক হবে না। সুলতান টিপু এখন একা আমাদের মোকাবিলা করতে পারবেন না।'

ঃ 'আমি মোটেই পেরেশান হইনি। আমি শুধু চাই, আপনার মূল্যবান সময় কথায় অপরচয় না ক'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন।'

ঃ 'জেনারেল সাহেব, আমার ফউজকে কবে অগ্রগতির হুকুম দেওয়া হয়, আমি শুধু তাই জানতে এসেছি।'

ঃ 'আপনার ফউজের অগ্রগতির প্রয়োজন নেই। কেবল কর্ণাটক হেফাজতের ব্যবস্থা করলেই আমাদের যথেষ্ট সাহায্য হবে। এবার এজাযত দিন। আমি বড়োই ব্যস্ত।'

জেনারেল মিডোজ উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। নওয়াব মুহাম্মদ আলী অনেক কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু কর্ণাটকের হেফাজতের সমস্যা তাঁর ধারণার রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলো। তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠলেন এবং জেনারেল মিডোজ তাঁর সাথে মোসাফাহা ক'রে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কামরার বাইরে এসে সেক্রেটারীর দিকে তাকিয়ে জেনারেল মিডোজ মুহম্মদ আলীর দেওয়া তাবিযটি তার হাতে দিয়ে বললেনঃ 'এটা নিজের কাছে রেখে দাও। এই বেঅকুফকে বলে দিও, যেনো যুদ্ধ শেষ হবার আগে আমায় পেরেশান করবার চেষ্টা না করে। এ গাধা আমায় বিজয়ের খবর শুনাতে এসেছিলো।'

ইসায়ী ১৭৯০ সালের মে মাসের শেষ দিন মাদ্রাজ থেকে এগিয়ে গিয়ে জেনারেল মিডোজ ত্রিচিনোপল্লীর নিকটে ডেরা ফেললেন। জেনারেল মিডোজের নেতৃত্বে পনেরো হাজার সিপাহী ছিলো উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। হিন্দুস্তানের ইতিহাসে এর আগে কোনো ফ্রন্টে এত বড়ো ইংরেজ ফউজ কখনো দেখা যায়নি। সুলতান টিপুর সামনে এখন শুধু কোনো বিশেষ এলাকার শহর বা কেল্লা হেফাজতের প্রশ্ন নয়, গোটা সালতানাতের হেফাজতের প্রশ্ন তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। গোটা সীমান্তে দুশমনের সেনাসমাবেশের ফলে তিনি বাধ্য হয়েছেন তাঁর লশ্‌করকে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করতে।

জেনারেল মিডোজ ১৫ই জুন করোরের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বিশেষ কোনো বাধা ছাড়াই করোর ও ধারাপুরম ব্যতীত আরো কয়েকটি কেল্লা দখল করে নিলেন।

সুলতান টিপু দুশমনের সংকল্প সম্পর্কে হুঁশিয়ার হয়ে ত্রিবাংকুরের অবরোধ তুলে নিয়ে কোয়েম্বাটুর পৌঁছে গেলেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য ফ্রন্টেও ইংরেজরা সৈন্য সমাবেশ শুরু করে দিয়েছে। সুলতান প্রায় একমাত্র কোয়েম্বাটুরে অবস্থান করে ব্যাপক যুদ্ধপ্রস্তুতির প্রয়োজনে সেরিংগাপটম অভিমুখে রওয়ানা হোলেন। কোয়েম্বাটুর থেকে রওয়ানা হবার সময়ে সুলতান চার হাজার সওয়াব মীর মুঈনুদ্দীন ওরফে সৈয়দ সাহেবের নেতৃত্বে ছেড়ে দিয়ে নির্দেশ দিলেন, যেনো বিক্ষিপ্ত হামলা করে দুশমনকে ব্যস্ত করে রাখা হয়, যাতে তিনি যুদ্ধপ্রস্তুতির অবকাশ পেতে পারেন।

মীর মুঈনুদ্দীনের এই ছোটখাটো ফউজ কোনো ময়দানে শক্ত হয়ে ইংরেজের মোকাবিলা করতে পারে না, কিন্তু বর্ষার মওসুম শুরু হয়ে গেছে। যদি তারা

সুলতানের নির্দেশ পালন করে যায়, তা'হলে এই চার হাজার নিপুণ গরিলা যোদ্ধা দুশমন বাহিনীর শৃংখলা বিপর্যস্ত করে দিয়ে বহু বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু মীর মুইনুদ্দীনের মতো বিচক্ষণ সিপাহী যে অযোগ্যতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিলেন, তা' সুলতানের ফউজের কোনো সাধারণ অফিসারের পক্ষেও ছিলো অপ্রত্যাশিত। তিনি কর্ণেল ফ্লয়েডের সৈন্যদের সাথে কয়েকটি সংঘর্ষের পর ভবানীর উত্তরদিকে পিছিয়ে গেলেন এবং দক্ষিণের সকল এলাকা দুশমনের জন্য খোলা পড়ে রইলো।

মীর মুঈনুদ্দীনের কার্যকলাপ সামরিক দৃষ্টিভংগীতে মহীশূরের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসকর পরিণাম সৃষ্টি করতে পারতো। কিন্তু সৌভাগ্যবশত জুলাই মাসে বর্ষার তীব্রতা বেড়ে গেলো। জেনারেল মিডোজ ময়দান খালি দেখে কোয়েম্বাটুর দখল করলেন এবং কর্ণেল স্টুয়ার্টকে পালঘাটের দিকে অগ্রগতির হুকুম দিলেন। কিন্তু তিনি বর্ষার তীব্রতার দরুন বেশী দূর যেতে পারলেন না।

আগস্ট মাসের দ্বিতীয় হফতায় কর্ণেল স্টুয়ার্ট পুনরায় এগিয়ে চললেন এবং ডণ্ডিগলের কেল্লা অবরোধ করলেন। কেল্লাটি ছিলো এক উঁচু পাহাড়ের উপর এবং প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে ছিলো মহীশূর সালতানাতের সব চাইতে মযবুত কেল্লাসমূহের অন্যতম। কেল্লার রক্ষী সিপাহীদের সংখ্যা ছিলো আটশত' এবং তার পরিচালনা ভার সুলতানের নির্ভীক সিপাহী হায়দর আব্বাসের উপর। ইংরেজরে তোপখানা চারদিন ধরে কেল্লার উপর অগ্নিবর্ষণ করতে লাগলো। পঞ্চম দিনে কর্ণেল স্টুয়ার্ট সাধারণ হামলার হুকুম দিলেন, কিন্তু কঠিন ক্ষতি স্বীকার করে তাঁদেরকে পিছু হটতে হল। হায়দর আব্বাস শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করার ফয়সালা করেছিলেন। কিন্তু তার বেশীর ভাগ সিপাহী ও অফিসার সেনা সাহায্য না আসায় হিম্মত হারিয়ে বসেছিলো। তাই ২২শে আগস্ট তিনি এই শর্তে কেল্লার দরযা খুলে দিলেন যে, কেল্লা খালি করার সময়ে তাঁর সিপাহীদের পথরোধ করা হবে না।'

এই সময়ের মধ্যে জেনারেল মিডোজের অন্যান্য সেনাদল গজলহাটি উপত্যকা পথের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আত্মরক্ষা চৌকি দখল করে নিয়েছে। এই উপত্যকা পথের গুরুত্বপূর্ণ চৌকিগুলো দখল করে নেবার পর ইংরেজদের হাত গিয়ে পৌছলো মহীশূরের শাহরগ পর্যন্ত। কোয়েম্বাটুরের উর্বর এলাকা থেকে মিলতো সুলতানের সেনাবাহিনীর রসদের প্রাচুর্য। এখন সে এলাকা পুরোপুরি ইংরেজের দখলে চলে গেছে এবং তারা কারোর থেকে গজলহাটির উপত্যকা পথ পর্যন্ত তাদের চৌকি কায়েম করে বসেছে। অপর ফ্রন্টে কর্ণেল কীলের নেতৃত্বে কলকাতার যে দশ হাজার ফউজকে বারমহল জয় করার উদ্দেশ্যে অভিযান চালনার ভার অর্পণ করা হয়েছিলো, তারা আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে কুঞ্জিবরম পৌছে গেলো। জেনারেল স্টুয়ার্ট তিন দিক থেকে সেরিংগাপটমের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য এখন শুধু মালাবার ফ্রন্টে বোম্বের সেনাবাহিনীর প্রতীক্ষা করছিলেন। মহীশূরের উত্তর সীমান্তে জমা হচ্ছিলো নিযাম ও মারাঠা সেনাবাহিনী, কিন্তু যুদ্ধের গোড়ার দিকে তারা শুধু অভিনয় করে যাচ্ছিলো নীরব দর্শকের ভূমিকা।

লর্ড কর্ণওয়ালিস ও জেনারেল মিডোজের উপর্যুপরি হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ায় নানা ফার্ণাবিস ও মীর নিযাম আলীর দ্বিধার সব চাইতে বড়ো কারণ তাঁদের মধ্যে কেউ সুলতান টিপুর সঠিক সংকল্প সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। নানা ফার্ণাবিস ও মীর নিযাম আলী যদি নিশ্চিত জানতে পারতেন যে, তারা কোনো বিপদের মোকাবিলা না করেই এগিয়ে যেতে পারবেন, তাহলে তাঁদের ফয়সালা করতে কোনো অসুবিধা হত না। কিন্তু সুলতান টিপু সেরিংগাপটম পৌঁছে যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য দু'মাস সময় পেয়েছিলেন। তার ফলে নিযাম ও মারাঠাদের জন্য এক উদ্বেগজনক সমস্যার উদ্ভব হয়েছিলো। তাঁদের বিশ্বাস ছিলো যে, সুলতান সেরিংগাপটম থেকে বেরিয়ে দক্ষিণদিকে ইংরেজের মোকাবিলা না করে উত্তরদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে তাদের অবস্থা দুঃখজনক হবে।'

মহাবৎ জঙের নেতৃত্বে হায়দরাবাদের লশকর রায়চুরে শিবির সন্নিবেশ করেছিলো এবং তাদেরকে জরুরী নির্দেশ দেবার জন্য মীর নিযাম আলীও সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। একদিন মীর নিযাম আলী খিমার মধ্যে মহাবৎ জঙের সাথে দাবা খেলছেন, অমনি এক অফিসার খিমায় প্রবেশ করে কুর্ণিশ করে বললেনঃ 'আলীজাহ্! স্যার জন কেনিয়াদে এখানে এসেছেন এবং পৌঁছেই হুযুরের খেদমতে হাযির হবার এজাযত তলব করেছেন।'

মীর নিযাম আলী সন্দিগ্ধচিত্তে অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ বহুত আচ্ছা। তাঁকে নিয়ে এসো। তারপর তিনি মহাবৎ জঙকে লক্ষ্য করে বললেনঃ এবার তোমার হার নিশ্চিত। কিন্তু কেনিয়াদে আমাদেরকে দাবা খেলতে দেখবে, এটা ঠিক নয়।'

মহাবৎ জঙ তালি বাজালে এক নওকর এসে মীর নিযাম আলীর ইশারায় দাবার সামান তুলে নিয়ে গেলো।

নিযাম ঝুঁকে পড়ে কাছের গালিচার উপর রক্ষিত কাগজ থেকে একটি নকশা তুলে নিয়ে তেপায়ীর উপর ছড়িয়ে বললেনঃ 'এবার কমবখ্ত আমাদেরকে খুবই পেরেশান করবে।'

মহাবৎ জঙ হেসে জওয়াব দিলেনঃ 'আমার বিশ্বাস আপনিই তাঁকে বেশী পেরেশান করতে পারবেন।'

নিযাম বললেনঃ 'অগ্রগতিতে বিলম্বের কোনো উপযুক্ত কারণ ভেবে রাখতে হবে তোমায়।'

মহাবৎ জঙ জওয়াব দিলেনঃ 'জনাব, গত তিন হফতায় কেনিয়াদের পাঁচজন দূত আমার কাছে এসে গেছে এবং আমার বুদ্ধি যতোটা বাহানা খুঁজতে পারে, তা তাদের কাছে পেশ করা হয়েছে। এখন আমি ভাবছি, এ মোলাকাত থেকে বাঁচবার জন্য অসুস্থতার বাহানা করে নিজের খিমায় গিয়ে শুয়ে পড়াই আমার উচিত।

মীর যিনাম আলী হাসলেন।

কেনিয়াদে খিমায় প্রবেশ করলেন। মহাবৎ জঙ উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু মীর নিযাম আলী কুরসিতে বসে থেকেকেই মোসাফাহার জন্য হাত বাড়ালেন।

মহাবৎ জঙ একটি কুরসি এগিয়ে দিলে মীর নিযাম আলী বললেনঃ এই মওসুমে আপনাকে সফরের তফলীক স্বীকার করতে হয়েছে, তার জন্য আমার আফসোস হচ্ছে। তাশরীফ রাখুন।'

কেনিয়াদের কুরসির উপর বসে বললেনঃ 'বর্তমান পরিস্থিতিতে হায়দরাবাদে থাকাই পীড়াদায়ক ছিলো। আমার কোনো চিঠিরই সন্তোষজনক জওয়াব পাইনি। জেনারেল মিডোজ ও লর্ড কর্ণওয়ালিস আপনাদের বিলম্বের জন্য খুবই পেরেশান। আপনি কি ফয়সালা করেছেন, বলুন।'

মীর নিযাম আলী জওয়াব দিলেনঃ 'হরিপন্থ আজ এগিয়ে চলার ফয়সালা করলে আমাদের তরফ থেকে এক মুহূর্তও বিলম্ব হবে না। এখানে বসে থেকে আমরা বিরক্ত হয়ে গেছি।'

ঃ 'ইওর হাইনেস স্যার চার্লস মিলট আমায় জানিয়েছেন যে, হরিপন্থ ও নানা ফার্ণাবিস বিলম্বের দায়িত্ব আপনার উপর চাপাচ্ছেন। আপনি অতি মূল্যবান সময়ের অপচয় করছেন। আপনি জানেন, কোয়েম্বাটুরের গোটা সুবা আমাদের দখলে এসে গেছে। পূর্বদিকে আমাদের সেনাবাহিনী বারমহল দখল করতে যাচ্ছে। কয়েকদিনের মধ্যে বোম্বের ফউজ মালাবারে প্রবেশ করবে। আপনারা যদি অবিলম্বে হামলা করেন, তা'হলে সেরিংগাপটমের বাইরে সুলতান টিপুর কোনো ফ্রন্টে জওয়াবী হামলার সাহস হবে না।'

নিযাম বললেনঃ 'আপনার ধারণা, টিপু এখন সেরিংগাপটমেই বসে থাকবেন?'

ঃ 'হাঁ, লড়াই করার হিম্মৎই যদি তাঁর থাকতো, তা'হলে কোয়েম্বাটুরের মতো শস্যশ্যামল সুবা আমাদের জন্য খোলা রেখে তিনি সেরিংগাপটমে আশ্রয় নিতেন না।'

ঃ 'আপনার ধারণা ভুল। টিপু সেরিংগাপটমে আপনাদের ইন্তেযার করবেন না। প্রস্তুতির জন্য তাঁর সময়ের প্রয়োজন ছিলো না। তিনি এক ভয়াবহ ঝড়ের মতো বেরিয়ে আসবেন মহীশূর থেকে। তখন আমাদের রণকৌশলে রদবদলের প্রয়োজন আমরা অনুভব করবো।'

ঃ 'ইওর হাইনেস, টিপুর শক্তি সম্পর্কে এতটা ভীতি পোষণ করা আপনার উচিত হবে না। আমার বিশ্বাস, আপনারা অবিলম্বে হামলা করলেন সেরিংগাপটম থেকে বেরিয়ে আসার সাহসই তাঁর হবে না, আর সাহস হলেও তাঁর গতি উত্তরে না হয়ে দক্ষিণেই হবে এবং বিনাবাধায় আপনারা পৌঁছে যাবেন সেরিংগাপটমে।'

ঃ 'কিন্তু এ কথার কি জামানত রয়েছে যে, আপনাদের আগেই তিনি আমাদের সাথে বোঝাপড়া করা ভালো মনে করবেন না?'

ঃ 'আপনার ধারণা, তিনি আমাদের দিক থেকে চোখ বন্ধ করে আপনাদের

উপর হামলা করবেন?'

ঃ হ্যাঁ আর যদি আপনি আজকাল স্যার চার্লস্ মিলটের সাথে মোলাকাত করতেন, তা'হলে হয়তো তিনি বলতেন যে, হরিপন্থেরও এই একই ধারণা।'

ঃ 'ইওর হাইনেস, আমায় মাফ করুন। টিপু অতোটা নির্বোধ নন। আমাদের শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি তাঁর রয়েছে। তাই সেরিংগাপটম থেকে বেরিয়ে আমাদের মোকাবিলা করার সাহস তাঁর হবে না। এ বাস্তব পরিস্থিতি তাঁর কাছে গোপন নেই যে, তিনি উত্তরদিকে এগিয়ে এলে তুংগাভদ্রা পৌঁছতে পৌঁছতে আমরা সেরিংগাপটম পৌঁছে যাবো।'

ঃ 'আমি জানি, আপনারা সেরিংগাপটম পৌঁছে যাবেন। কিন্তু এও জানি যে, তখন পর্যন্ত আমাদের সামনে নিজস্ব সিপাহীদের লাশ গণনা ছাড়া আর কোনো কাজ থাকবে না।'

কেনিয়াদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বললেনঃ 'জনাব, যুদ্ধের ব্যাপারে আপনারা আমাদের মিত্র। যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত আমাদের সবাইর উপর একই ধরনের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। আপনার ও মারাঠাদের দ্বিধার ফল এ ছাড়া আর কিছুই হবে না যে, এই যুদ্ধ দীর্ঘ বিলম্বিত হবে এবং আপনাদের দিক থেকে হতাশ হয়ে আমরা টিপুর সাথেই সন্ধি করবো এবং আমাদের মিত্রদের চিরকালের জন্য ছেড়ে দেবো টিপুর করুণার উপর। তারপর তিনি কয়েক বছরের প্রস্তুতির পর আমাদের এক-এক শক্তিকে খতম করে দেবেন, এই হবে এ অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল।'

মীর নিযাম আলী খানিকটা নরম হয়ে বললেনঃ 'আমাদের সম্পর্কে আপনার এতটা হতাশ হওয়া উচিত নয়।'

ঃ 'ইওর হাইনেস, হতাশ আমি হইনি, কিন্তু আপনাদের দ্বিধার কারণ আমি বুঝে উঠতে পারি নি।'

ঃ 'আমাদের দ্বিধা থাকবে শুধু ততোক্ষণ, যতোক্ষণ না টিপু সেরিংগাপটম থেকে বেরিয়ে আসেন। আমরা যেতোক্ষণ তাঁর সঠিক সংকল্প সম্পর্কে অবহিত না হচ্ছি, ততোক্ষণ যুদ্ধের কোনো নকশা তৈরী করতে পারছি না।'

ঃ 'ইুওর হাইনেস, আপাতত এমন কোনো সম্ভাবনা নেই যে, তিনি বারমহল ও মালাবারের চিন্তা ত্যাগ করে আপনাদের দিকে মনোযোগ দেবেন, কিন্তু ধরে নিন, যদি তেমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তা'হলে তার অর্থ এ নয় যে, আপনারা গোড়া থেকে যুদ্ধে হিস্সা নেবেন না।'

মীর নিযাম আলী জওয়াব দিলেনঃ 'সে ক্ষেত্রে আমাদের যুদ্ধ হবে পুরোপুরি আত্মরক্ষামূলক। আমাদের সেরিংগাপটমের কথা চিন্তা না করে পূণা ও হায়দরাবাদের ভাবনা ভাবতে হবে। লড়াই আমরা করবো- পূর্ণ শক্তি দিয়ে আমরা লড়াই করবো। কিন্তু আমাদের চেষ্টা হবে, যেনো আমরা মহীশূরের সীমানার মধ্যে দুশমনের নাগালের মধ্যে না গিয়ে এমন কোনো জায়গায় তাদের মোকাবিলা করতে পারি, যেখান থেকে

আমাদের রসদ ও সেনা সাহায্য লাভের পথ নিরাপদ। আপনাদের সৌভাগ্য যে, টিপু কোয়েম্বাটুরে আপনাদের সাথে মোকাবিলার জন্য তৈরী ছিলেন না এবং আপনারা বিনা অসুবিধায় এক বিশাল এলাকা দখল করে নিয়েছেন। কিন্তু যদি আমরা মহীশূর সীমান্তে আমাদের ফউজ জমা না করতাম, তা'হলে টিপু প্রচন্ডভাবে আপনাদের মোকাবিলা করতেন প্রতি পদক্ষেপে।'

কেনিয়াদে বললেনঃ 'তা'হলে আপনাদের ফয়সালা, যতোক্ষণ টিপুর ফউজ সেরিংগাপটম থেকে গতিবিধি শুরু না করছে, ততোক্ষণ আপনারা এখানেই পড়ে থাকবেন?'

ঃ 'আমি শুধু বলতে চাচ্ছি, দুশমনের ইরাদা সম্পর্কে অবহিত হবার আগে তাদের বিরুদ্ধে আমরা কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারছি না।'

ঃ 'ধরে নিন, যদি টিপু সেরিংগাপটমেই তাঁর লড়াই সীমাবদ্ধ রাখার ফয়সালা করেন, তা'হলে আপনারা কি ব্যবস্থা করবেন?'

নিযাম হেসে বললেনঃ "হায়দর আলীর পুত্রকে আপনি জানেন না। আমার বিশ্বাস, খুব শীগ্‌গিরই তিনি সেরিংগাপটম থেকে বেরিয়ে পড়বেন এবং আমাদের মধ্যে যাঁর উপরই হোক, তাঁর প্রথম আঘাত হবে খুবই তীব্র। মারাঠাদের দায়িত্ব আমি নিতে পারি না, কিন্তু আমার তরফ থেকে লর্ড কর্ণওয়ালিসকে আপনি আশ্বাস দিতে পারেন যে, আমার সেনাবাহিনী কয়েক দিনের মধ্যেই ময়দানে নেমে আসবে। যদি উত্তরদিকে তাঁর প্রত্যাশিত হামলা বিবেচনায় আমাদেরকে পিছু হটতে হয়, তা'হলে আপনাদের এগিয়ে যাবার মওকা মিলবে আর যদি তিনি দক্ষিণদিকে এগিয়ে যান, তা'হলে আমরা উত্তরের সব এলাকা বিপর্যস্ত করে দেবো। জেনারেল মিডোজকে জানাবেন, তিনি যেনো তাঁর অগ্রগতি কায়েম রাখেন, যাতে আরো প্রস্তুতির মওকা না পান।'

কিছুক্ষণ পর কেনিয়াদে মীর নিযাম আলীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মারাঠা শিবিরের দিকে চললেন। মীর নিযাম আলী মহাবৎ জঙকে বললেনঃ 'আমার বিশ্বাস, এখন কয়েক দিন এরা আমাদেরকে আর পেরেশান করবে না, কিন্তু তোমায় তৈরী থাকতে হবে। টিপু বেশীদিন সেরিংগাপটমে বসে থাকবেন না। যদি তিনি দক্ষিণদিকে এগিয়ে যান, তা'হলে আমাদেরকে প্রমাণ দিতে হবে যে, আমরা মারাঠাদের পিছনে থাকিনি।'

তেরো

ঃ জিন! জিন! নীচে এসো। বাড়ির আঙিনা থেকে লা গ্রাঁদ আওয়ায দিলেন। আওয়ায শুনে জিন গ্যালারীতে এসে দাঁড়ালেন। নীচে আঙিনায় লা গ্রাঁদের সাথে এক প্রৌঢ় ব্যক্তিকে দেখে তিনি কয়েক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর কাপ্তান ফ্রাঁসককে চিনতে পেরে নীচে নেমে গেলেন।

কাপ্তান ফ্রাঁসক এগিয়ে এসে তাঁর সাথে মোসাফাহা করলে জিন তাঁর কাছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে শুরু করলেনঃ 'আপনি কবে এলেন এখানে ? এতদিন

কোথায় ছিলেন ? আমরা ভাবছিলাম, বুঝি আমাদেরকে ভুলে গেছেন। ফ্রান্সে আজকাল কি হচ্ছে? কিছুকাল ধরে এখানে বহু বিচিত্র খবর আসছে।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'আসুন, আমরা বসে নিশ্চিন্তে আলাপ করি।'

তাঁরা নীচু তলার এক প্রশস্ত কামরায় প্রবেশ করে কুরসির উপর বসে পড়লেন। কাপ্তান ফ্রাঁসক বললেনঃ 'আমি আজই সেরিংগাপটমে পৌঁছেছি। এসেই আমি মসিয়েঁ লালীর কাছে তোমাদের সন্ধান করলাম। সৌভাগ্যক্রমে লা গ্রাঁদও ক্যাম্পেই ছিলেন। আমি তোমাদের জন্য খুব ভালো খবর নিয়ে এসেছি। কিন্তু তার আগে আমি তোমাদেরকে শাদীর মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমি তোমাদেরকে ইচ্ছা করেই চিঠি লিখিনি। ইন্সপেক্টর বার্ণার্ডের মনে সন্দেহ হয়েছিলো যে, আমি তোমাদের সাহায্য করেছি এবং সে পন্ডিচেরী থেকে ফিরে গিয়েই বিপ্লবী দলের সহযোগিতার অভিযোগে আমায় কয়েদ করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলো।

'ব্যাস্টিলের কয়েদখানায় প্রায়ই সে এসে আমার সাথে দেখা করতো এবং প্রত্যেকবারই বলতোঃ "যদি তুমি সব ঘটনা প্রকাশ করে দাও এবং অপরাধীদের ধরার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করো, তা'হলে তোমায় মুক্তি দেওয়া যাবে।" আমার অস্বীকৃতির ফলে সে আমায় সর্বপ্রকার সম্ভাব্য কষ্ট দেবার চেষ্টা করেছে। ব্যাস্টিলের এক ভূ-গর্ভস্থ সংকীর্ণ অন্ধকার কুঠরীতে আমার কয়েদের শেষ কয়েক মাস অন্তহীন যন্ত্রণাদায়ক হয়েছিলো। বাইরে থেকে কোনো বন্ধু-স্বজনের আমার সাথে সাক্ষাত ও চিঠিপত্র আদান প্রদান নিষিদ্ধ ছিলো। যে পাহারাদার আমায় দু'বেলা খোরাক দিয়ে যেতো, তাদেরও আমার সাথে কথা বলবার অনুমতি ছিলো না। তারপর একদিন সরকার বিরোধী বিদ্রোহীরা ব্যাষ্টিলের দরযা ভেঙ্গে দিলো এবং আমি জানতে পারলাম যে, ফ্রান্সে বিপ্লব এসে গেছে।'

জিন বিষন্ন কণ্ঠে বললেনঃ 'আপনি আমাদেরই জন্য এতটা কষ্ট সহ্য করেছেন আর সেরিংগাপটমে আমরা নিরাপদ রয়েছি, তার জন্য আমি দুঃখিত। যদি পুলিশকে আপনি বলে দিতেন যে, আমরা এখানে পৌঁছে গেছি, তা'হলে হয়তো আপনাকে এতটা কষ্ট দেওয়া হত না।'

ফ্রাঁসক বললেনঃ 'আমি যদি একটি কথা প্রকাশ করতাম, তা'হলে আমার কাছ থেকে সব কথাই বের করে নেওয়া হত। মারসেলয্ থেকে পন্ডিচেরী পর্যন্ত সফরের যাবতীয় ব্যবস্থা জানিয়ে দিয়ে সকল বন্ধুর সাথে বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হোতাম। অথচ তাঁরাই আমাদের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন। এমন কি, মরিশাসে লা গ্রাঁদের ভগ্নিপতিকেও উদ্বেগজনক অবস্থায় পড়তে হত। তারপর যদি আমি এ যিল্লত মেনেও নিতাম, তা'হলে প্যারীর পুলিশের কাছ থেকে কোনো সদাচরণের প্রত্যাশা ছিলো না।

কিন্তু এর সব কিছুই অতীতের ব্যাপারে। বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে কিছু বলতে এসেছি। কয়েদখানা থেকে মুক্তি লাভের পর যে সব বিপ্লবী

নেতার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে, তাঁরা তোমার ভাইকে জানতেন। আমি যখন তাঁদেরকে বললাম যে, তোমরা নিরাপদে যিন্দা রয়েছো এবং তোমাদের সাহায্য করার অপরাধে আমি কয়েদখানায় কাটিয়ে এসেছি, তখন তাঁরা আমায় তাঁদের বিশ্বস্ত সাথী বলে মনে করতে লাগলেন। লা গ্রাঁদকেও তাঁরা বন্ধু মনে করেন এবং চান যে, তোমরা অবিলম্বে ফ্রান্সে ফিরে যাও। সরকার তোমাদের যে সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়েছিলো, তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে তোমাদেরকে। মসিয়েঁ লালীর কাছে তাঁরা পয়গাম পাঠিয়েছেন, যেনো অবিলম্বে তিনি তোমাদেরকে এখান থেকে রওয়ানা করে দেন। তোমাদের নির্বাসনের দিন কেটে গেছে। এবার তোমরা প্যারী পৌঁছলে হাজারো মানুষ তোমাদের জন্য সমবেদনার অশ্রুপাত করবে। এখানে আমি মসিয়েঁ লালীর সাথে আলাপ করেছি। লা গ্রাঁদ ফিরে গেলে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। যে জাহাজে আমি পণ্ডিচেরী এসেছি, সেটি ফিরতি পথে মাংগালোরে এসে আমাদের ইন্তেযার করবে। আমার ইচ্ছা, আমরা কয়েক দিনের মধ্যেই এখান থেকে মাংগালোরে চলে যাবো, কিন্তু লা গ্রাঁদের দ্বিধা কুণ্ঠার কারণ আমি বুঝে উঠতে পারিনি। তিনি এখনো আমায় কোনো জওয়াব দিচ্ছেন না।'

জিন সেরিংগাপটমের আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর দেশের হাওয়ার ঝাপটা অনুভব করছেন। তিনি যেনো ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্যারীর প্রশস্ত বাজারে। তাঁর চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে তাঁর পরিত্যক্ত বাসভবন। তাঁর ভৃত্যেরা সামনে দাড়িয়ে হুকুমের প্রতীক্ষা করছে। সখীরা এসে তাঁর বুকে বুক মিলাচ্ছে। তারপর তাঁর মনে ভেসে উঠছে সেরিংগাপটমের একটি গৃহের দৃশ্য। প্যারীর মুগ্ধকর দৃশ্যপট সরে যাচ্ছে তার কল্পনার পরদা থেকে। তিনি যেনো কল্পনায় বিদায় নিচ্ছেন আনওয়ার, মুরাদ ও তাঁদের মাতার কাছ থেকে। তাঁর মুখের হাসিটুকু ফুরিয়ে গেছে এবং চোখ হয়ে উঠেছে অশ্রুভারাক্রান্ত।

কাপ্তান ফ্রাঁসক বললেনঃ 'জিন, কি ভাবছো তুমি? আনন্দের অট্টহাস্যের পরিবর্তে তোমার চোখে অশ্রু দেখছি কেন?'

জিন এক নযর কাপ্তান ফ্রাঁসকের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন লা গ্রাঁদের মুখের উপর।

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'মসিয়েঁ ফ্রাসক, আপনারা উপকারের ভারে আমার গর্দান হামেশা অবনত হয়ে থাকবে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ফ্রান্সে ফিরে যাবার ফয়সালা আমি করতে পাচ্ছি না।'

ফ্রাঁসক নিজের কানকেই যেনো বিশ্বাস করতে পারেন না। কিছু বুঝে উঠতে না পেরে তিনি বললেনঃ 'কিন্তু কেন?'

লা গ্রাঁদ জওয়াব দিলেন। 'যুদ্ধ শেষ হবার আগে আমি ফ্রান্সে যেতে পারবো না। একটি গৃহহারা মানুষকে যাঁরা তাঁদের দোস্ত, ভাই ও পুত্রের মতো স্নেহের আশ্রয় দিয়েছেন, তাদেরকে পিঠ দেখিয়ে আমি চলে যেতে পারি না। আমার যিন্দেগীর অন্ধকারতম সময়ে সেরিংগাপটম ছিলো আমার কাছে আলোর মিনার।

আর আজ? আজ আমার মতো নিরাপত্তা ও প্রশান্তি, ইজ্জত ও আযাদীর আকাংখা করে ফিরছে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ, তাদেরই শেষ আশাস্থল সেরিংগাপটম। টিপু আজ আমার কাছে দূরদেশী শাসক নন; বরং এ দেশের প্রত্যেকটি বাসিন্দার বুকে যে আনুগত্য ও মুহাব্বতের মনোভাব সঞ্চিত রয়েছে তাঁর জন্য, আমার বুকেও আমি অনুভব করছি একই মনোভাব। আমার দৃষ্টিতে তাঁর বিজয় ইনসানিয়াতের (মানবতার) বিজয় এবং তাঁর পরাজয় ইনসানিয়াতেরই পরাজয়।'

কাপ্তান ফ্রাঁসক লা-জওয়াবের মতো হয়ে বললেনঃ 'যদি তোমাদের সংকল্প এই হয়, তা'হলে আমি কোনো বিতর্কের প্রয়োজন বোধ করি না। আমার বিশ্বাস তোমার জায়গায় আমি থাকলে আমার ফয়সালাও একই হত। মসিয়ে' লালী আমায় বলেছিলেন যে, তুমি এক ভালো সিপাহী হতে পারবে এবং মহীশূরে ভালো সিপাহীর জন্য তরক্কীর পথ খোলা রয়েছে।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'আমার মতলব এই নয় যে, আমি স্থায়ীভাবে এখানে থাকার ফয়সালা করেছি। যুদ্ধ শেষ হলে আমরা স্বদেশে চলে যাবো।'

ফ্রাঁসক বললেনঃ 'আমি তোমাদের অনুপস্থিতিতে তোমাদের সম্পত্তি হেফাযত করবার চেষ্টা করবো। তার জন্য হয়তো তোমাদের তরফ থেকে কোনো লিপির প্রয়োজন হবে আমার।'

লা গ্রাঁদ জওয়াব দিলেনঃ 'আমরা দুজনই আপনাকে মোখতারনামা লিখে দেবো।'

ঃ 'কিন্তু তোমাদের ভালো করে চিন্তা করা উচিত। আমি কাল পর্যন্ত এখানে থাকবো এবং এর মধ্যে যদি তোমাদের রায় বদলে যায়, তা'হলে খুশী হয়েই তোমাদেরকে সাথে নিয়ে যাবো। জিন এখনো এ ব্যাপারে কিছু বলে নি।'

জিন বললেনঃ 'লা গ্রাঁদের ফয়সালাই আমার ফয়সালা। আমার শুধু দুঃখ, মহীশূর ফউজে নারীর কোনো স্থান নেই।'

ফ্রাঁসক বললেন। 'আনওয়ার আলী এখনো আসেন নি। আমার ইচ্ছা ছিলো, আজ সন্ধ্যার আগেই এখানে আরো কয়েকজন বন্ধুর সাথে দেখা করবো।'

জিন প্রশ্ন করলেনঃ 'আনওয়ার আলী আপনার আগমন সংবাদ পেয়েছেন কি?'

ঃ 'হ্যাঁ, ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে আমি তাঁকে খবর দিয়েছি।

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'আমার বিশ্বাস, তিনি এখনই আসছেন।'

জিন বললেনঃ 'মসিয়ে' ফ্রাঁসক, আপনার মাধ্যমে আমি প্যারীতে আমার সখীদের কাছে কয়েকটা চিঠি পাঠাতে চাচ্ছি।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা। তুমি চিঠি লিখে রেখো। আমি নিয়ে যাবো। লা গ্রাঁদ আমি হয়তো মরিশাসের পথেই যাবো। তাই তুমি তোমার বোনের কাছেও চিঠি লিখে রাখতে পারো।'

ঃ 'খুব ভালো কথা। এখানে এসে আমি বোনকে কোনো খবরই দেইনি।' ভৃত্য ভিতরে উঁকি মেরে বললোঃ 'আনওয়ার আলী সাহেব তশরীফ এনেছেন।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।'



এক মিনিট পর আনওয়ার আলী কামরায় প্রবেশ করলেন। ফ্রাঁসক ও লা গ্রাঁদ উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং একে একে তাঁর সাথে মোসাফাহা করার পর এক কুরসির উপর বসে আনওয়ার আলী বললেনঃ 'মসিয়ে' ফ্রাঁসক, আমি মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য এসেছি। আজ পাঁচটায় সিপাহ্‌সালার বুরহানুদ্দীন ফউজের অফিসারদের কেন্দ্রে হাযির থাকার হুকুম দিয়েছেন। আমার অনেক কথা আপনার সাথে। তাই আমার ইচ্ছা, আপনি রাতের খানা আমার ওখানেই খাবেন। আর যদি ওখানেই থাকেন, তা'হলে আমি খুবই খুশী হবো।'

ফ্রাঁসক বললেনঃ 'কিন্তু আজ তো আমি মসিয়েঁ লালীর দাওয়াত কবুল করে ফেলেছি।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'আর কাল দু'বেলার জন্যই উনি আমার মেহমান। পরশু উনি চলে না গেলে আপনার পালা।

আনওয়ার আলী ফ্রাঁসককে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'পরশু আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

ঃ 'পরশু আমি ফ্রান্সে ফিরে যাবো।'

ঃ 'কিন্তু এত শীগ্‌গির কেন?'

ঃ 'সেরিংগাপটমে আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। খুব শীগ্‌গিরই আমি ফিরে যেতে চাই।'

ঃ গোপন না 'হলে আপনার কাজের কথাটা আমি শুনতে ইচ্ছা করি।'

ঃ 'আমি জিন ও লা গ্রাঁদকে খোশখবর শুনাতে এসেছিলাম যে, তাদের নির্বাসনের দিন অতীত হয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে তারা দেশে ফিরে যেতে পারে। ফ্রান্সের বিপ্লব তাদের পথের সকল বাধা দূর করে দিয়েছে।'

আনওয়ার আলী বিষন্ন হাসিমুখে জিন ও লা গ্রাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আমি আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।'

জিন বললেনঃ 'আপনাকে শোকরিয়া। কিন্তু আমরা এখানেই থাকবো। মহীশূরের সবদিকে যুদ্ধের ভয়াবহ ঝড় দেখে আমরা পালাবার চেষ্টা করবো না।'

কিছুক্ষণ আনওয়ার আলীর মুখে কোনো কথা সরলো না। তারপর তিনি ফ্রাঁসকের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আমি এখানে থাকবো, এমন কোন বিশ্বাস

থাকলে আজই আমার দাওয়াত কবুল করবার জন্য পীড়াপীড়ি করতাম না। কিন্তু আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তে অভিযানের জন্য তৈরী থাকার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আমার ভাই মুরাদ আলী আজ ভোরেই রওয়ানা হয়ে গেছে। সম্ভবত বুরহানুদ্দীন আমায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফয়সালা শুনাবার জন্যই ডেকেছেন এবং আজ সূর্যাস্তের আগেই এখান থেকে রওয়ানা হবার হুকুম দেওয়া হবে। এ হেন পরিস্থিতিতে আমি হয়তো আপনার সাথে আবার সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাবো না। তা' না হলে আজ আমার ওখানে আপনাদের সবার দাওয়াত থাকবে। আমি মসিয়ে' লালীকে আপনার তরফ থেকে অসামর্থ্য জানাবো আর তাঁকেও ওখানে দাওয়াত করবো।' তারপর তিনি জিনকে সম্বোধন করে বলে উঠলেনঃ 'আপনি অবশ্যি আসবেন। আম্মাজান আপনাকে খুবই মনে করছেন।'

ফ্রাঁসক বললেনঃ 'মসিয়ে' লালী রাগ না করলে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

ঃ 'আপনি নিশ্চিত থাকবেন, মসিয়েঁ লালী রাগ করবেন না। তিনি জানেন, আপনার মেযবান হবার হক তাঁর তুলনায় আমারই বেশী। যদি আমায় এক্ষুণি চলে যেতে হয়, তা'হলে অল্পসময়ের মধ্যে খবর পৌঁছবে আপনাদের কাছে। এবার আমায় এজাযত দিন।'

আনওয়ার আলী উঠে 'খোদা হাফিয' বলে বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে। ফ্রাঁসক বললেনঃ 'মসিয়ে লালীও বলছিলেন যে, তাঁকে অগ্রগতির জন্য তৈরী থাকার হুকুম দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, শীগ্গিরই একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে, কিন্তু আমি ভাবতে পারছি না, সুলতান এতটা সময় কেন নষ্ট করলেন। কোয়েম্বাটুর এলাকা ইংরেজের হাতে চলে যাওয়ায় মহীশূরের বিপদ অনেকখানি বেড়ে গেছে।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'সুলতানের কোনো পদক্ষেপই অকারণ নয়। তিনি এখানে বসে এক লম্হাও অপচয় করেন না। এ যাবত তাঁর জঙ্গী চাল সফল হয়ে এসেছে। নিঃসন্দেহে নিযাম ও মারাঠাদের সাথে তাঁর শান্তি প্রচেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু এখানে হাযির থাকায় তাঁর এখনো উত্তর সীমান্তে হামলা করার সাহস করেনি, আর যে ইংরেজ তাদের সহযোগিতার আশায় পরম উৎসাহে এগিয়ে এসেছিলো, তারা এখন নিঃসংগ অবস্থায় এগিয়ে আসতে বিপদের আশংকা করছে। ইতিমধ্যে সুলতান সেরিংগাপটমের আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা এমন মযবুত করে নিয়েছেন যে, প্রত্যেক ফ্রন্ট থেকে আমাদেরকে পিছু হটতে হলেও আমরা দীর্ঘকাল ইংরেজের সাথে লড়তে পারবো। আমার বিশ্বাস, সুলতান পূর্ণ প্রস্তুতির পর আচানক কোনো ফ্রন্টে শক্তি প্রদর্শন করে দুশমনকে ভয় পাইয়ে দেবার চেষ্টা করবেন এবং সুলতানের হামলা হবে যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি তীব্র। যদি তিনি ইংরেজদের শোচনীয়রূপে পরাজিত করতে পারেন, তা'হলে নিযাম ও মারাঠা যুদ্ধের ক্ষতির অংশ নিতে রাযী হবে না এবং তারা শান্তি স্থাপন করতে রাযী হয়ে যাবে।'

ফ্রাঁসক বললেনঃ 'কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় ইংরেজ চুপ করে থাকবে না। তারা পূর্ণ শক্তিতে সেরিংগাপটমের উপর হামলা করবে।'

লা গ্রাঁদ হেসে বললেনঃ 'সুলতান সে বিপদ সম্পর্কে উদাসীন নন। আমি আপনাকে নিশ্চিত বলছি, সে বিপদ থেকে বাঁচবার জন্য যে সতর্কতা সম্ভব, তা অবলম্বন করা হয়ে গেছে। গজলহাটির উপত্যকা পথের আগে তাদেরকে প্রতি পদে তীব্র বাধার মোকাবিলা করতে হবে এবং সুলতান নিযাম ও মারাঠাদের দিক থেকে নিশ্চিত হয়ে ইংরেজদের সোজা পথে আনবার অবকাশ অবশ্যি পাবেন।'

ঃ 'কিন্তু তুমি আস্থা পোষণ করছো যে, সুলতান এক অনির্দিষ্টকালের জনা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও হিন্দুস্তানের দুটি প্রবল শক্তির মোকাবিলা করতে পারবেন?

লা গ্রাঁদ জওয়াব দিলেনঃ 'প্যারীর ফউজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সময়ে আমার ধারণা ছিলো শুধু এই যে, বিজয়ের জন্যই যুদ্ধ করা হয়। কিন্তু এখানে এসে আমি একটা নতুন শিক্ষা পেয়েছি যে, যিন্দেগীর এমন কতকগুলো লক্ষ্যও রয়েছে, যার জন্য মানুষ জয়-পরাজয় থেকে নিরপেক্ষ হয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হয়।'

ঃ 'তুমি সে সব লক্ষ্যে বিশ্বাসী?'

ঃ 'হ্যাঁ, যদি আমি সে সব লক্ষ্যে বিশ্বাসী না হোতাম, তা'হলে আপনার কথা শুনেই আমি বলতাম যে, আজই এখান থেকে আমরা চলে যাবো। আমি সুলতানের বিজয় সম্পর্কেও হতাশ হইনি। এটা কি একটা অলৌকিক ব্যাপার নয় যে, মহীশূর সালতানাত তার সীমাবদ্ধ সামর্থ্য সত্ত্বেও গত যুদ্ধে নিযাম ও মারাঠাদের সম্মিলিত শক্তিকে পরাজিত করেছিলো, আর যে ইংরেজ কলকাতা থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত তাদের অধিকার কায়েম করেছিলো এবং যাদের ফউজী শক্তি আমাদেরকে প্রাচ্য থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছিলো, তারা হায়দর আলীর যামানা থেকে আজ পর্যন্ত উপর্যুপরি হামলা সত্ত্বেও মহীশূরের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি? যিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের শ্রেষ্ঠ সহযোগী হতে পারতেন, সে যুদ্ধে আমরা তাঁর সহযোগিতা করিনি বলে আমার আফসোস হচ্ছে। সুলতান টিপুর পরিণাম যাই হোক না কেন, এ কথা নিশ্চিত যে, বর্তমানে প্রাচ্যে ফ্রান্সের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে গেছে। পন্ডিচেরী থেকে আমরা এমন এক সময়ে সেনাবাহিনী সরিয়ে নিচ্ছি, যখন এখানে তাদের সবচাইতে বড়ো প্রয়োজন। আমরা নিরপেক্ষ থাকলেও সেখানে ফ্রান্সের আট দশ হাজার সিপাহীর উপস্থিতি ইংরেজদের যুদ্ধে বিরত রাখতে পারতো। আমার মনে হয়, আমরা সুলতানের সাথে চুক্তিভংগ করেছি এবং খোদা আমাদের অপরাধ মাফ করবেন না।'

ঃ 'এ ব্যাপারে ফ্রান্সের প্রত্যেকটি দুরদর্শী লোক তোমার সাথে একমত। আমার ভয় হয়, যেদিন ইংরেজ পন্ডিচেরী দখল করে নেবার প্রয়োজন বোধ করবে, সেদিন তাদের দৃষ্টিতে মাংগালোর চুক্তির চাইতে ভার্সাই চুক্তির গুরুত্ব বেশী হবে না।'



রাতের বেলায় আনওয়ার আলীর গৃহে ফ্রাঁসকের দাওয়াত। মসিয়েঁ লালী, লা গ্রাঁদ এবং ফউজের কিছু সংখ্যক দেশী ও ফরাসী অফিসার দস্তরখানে হাযির। জিন যানানাখানায় আনওয়ার আলীর মাতা ও কতিপয় অফিসারের বিবির সাথে খানা খাচ্ছেন।

আনওয়ার আলীর এক বন্ধুপত্নী ফরহাতকে বললেনঃ 'চাচীজান, ভাই আনওয়ার আলীর শাদী কবে হচ্ছে?'

ফরহাত জওয়াব দিলেনঃ 'তোমার ভাইয়ের শাদীর আগে আমায় একটি পাত্রীর সন্ধান তো করতে হবে।'

অপর এক মহিলা বললেনঃ 'চাচীজান, সেরিংগাপটমে এমন কোন্ খান্দান রয়েছে, যে আপনাদের সাথে সম্পর্ক পাতাতে গৌরব বোধ না করে?'

ফরহাত বললেনঃ 'প্রস্তাব অনেক রয়েছে, কিন্তু আমার পুত্রের শাদী সম্পর্কে চিন্তা করা মওকাই নেই। এবার অনেক পীড়াপীড়ির পর সে ওয়াদা করেছে যে, যুদ্ধের পর আর কোনো ওযর পেশ করবে না।'

একটি রসিক মেয়ে জিনের কানের কাছে বললোঃ 'আমি পুরুষ হলে তোমায় দেখার পর আর কোনো মেয়ে আমার পসন্দই হত না।'

জিন রাগের ভাব করে বললেনঃ 'আমি তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না।'

ঃ 'আমার কথা হচ্ছে তুমি অত্যন্ত সুন্দরী এবং আনওয়ার আলী যদি তোমার মাপকাঠিতে এখানকার মেয়েদের যাচাই করেন, তা'হলে চাচীজানের পক্ষে পাত্রীর সন্ধান করা মুশকিল হবে।'

জিন বললেনঃ 'কিন্তু আমার দেখার আগে আনওয়ারের মাপকাঠি নীচে ছিলো, এ কথা তোমায় কে বললে?'

ঃ 'জিন, কি কথা, বেটি?' ফরহাত দস্তরখানের অপর প্রান্ত থেকে প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'জি, কিছু নয়।'

কতক মহিলা খানা শেষ করেই নিজ নিজ গৃহে চলে গেলেন। কিন্তু অবশিষ্ট মহিলারা সেখানেই থাকলেন। প্রায় ন'টার সময়ে ফরহাতের মুখের উপর একটা বিষন্ন ভাব দেখা গেলো। জিন মেহমান মহিলাদের সাথে আলাপে মগ্ন না থেকে বারবার তাকাতে লাগলেন তাঁর দিকে। তারপর এক সময়ে তিনি নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে গিয়ে বসলেন ফরহাতের কাছে।

ঃ 'মুরাদ আলীর সম্পর্কে চিন্তা করবেন না।' তিনি বললেন।

ফরহাত সস্নেহে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'বেটি, এ বয়সে এক বিধবার জন্য এ পরীক্ষা বড়োই কঠিন। আমার ধারণা ছিলো, আনওয়ার আলী আরো কিছুদিন

আমার কাছে থাকবে, কিন্তু সেও আজই চলে যাচ্ছে।'

ঃ 'কখন?' জিন চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'আর কিছু সময়ের মধ্যে এখান থেকে সে রওয়ানা হবে।'

ঃ 'কিন্তু তিনি আমাদেরকে তো বলেন নি।'

ঃ 'বেটি, ওর ধারণা ছিলো, কোনো কোনো মেহ্‌মানের এ দাওয়াতে মন বসবে না। তা'ছাড়া সে এমন এক অভিযানে যাচ্ছে, যা প্রকাশ করা ঠিক নয়।'

পরিচারিকা কামরায় ঢুকে ফরহাতের বাহু হাত দিয়ে আকর্ষণ করলো। ফরহাত নিঃশব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জিন বুকের মধ্যে এক অবাঞ্ছিত কম্পন অনুভব করলেন। কয়েক মিনিট দ্বিধার পর তিনি উঠে বাইরের বারান্দায় চলে গেলেন। তাঁর অনুমান নির্ভুল। আঙিনায় আনওয়ার আলী মায়ের সামনে দাঁড়ানো। তিনি কম্পিত পদে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং খানিকটা দূরে সামনা-সামনি এক স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়ালেন।

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'আম্মাজান, চিন্তিত হবেন না। আমার বিশ্বাস, এ যুদ্ধ শীগ্‌গিরই শেষ হবে আর আমরা বিজয়ী হয়ে ফিরে আসবো। আমার ধারণা, আমাদের ইউরোপীয় সিপাহীরাও খুব শীগ্‌গিরই এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। আমার ইচ্ছা লা গ্রাঁদের অনুপস্থিতির সময়ে আপনি জিনকে ডেকে নেবেন আপনার কাছে। এবার আমায় এজাযত দিন।'

মা বললেনঃ 'কিন্তু জিনের কাছ থেকে তুমি বিদায় নেবে না?'

ঃ 'আম্মাজান, এখন সময় নেই। আমার তরফ থেকে আপনি তাঁকে বলবেন।'

জিন এগিয়ে গিয়ে কিছু বলতে চান, কিন্তু তাঁর ফয়সালা করার শক্তি নিশেষ হয়ে গেছে।

আনওয়ার আলী মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন আঙিনার বাইরে।

ফরহা দীর্ঘসময় দরযার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জিন কিছুক্ষণ ইতস্তত করে এগিয়ে গেলেন ফরহাতের কাছে। তারপর বিষন্ন আওয়াযে বললেনঃ 'আম্মাজান, চলুন।'

ফরহাত ফিরে ডান হাতখানি রাখলেন তাঁর কাঁধে।



বাইরে মেহ্‌মানখানায় আনওয়ার আলীর বন্ধুরা খানা খাওয়ার পর খোশগল্পে মশগুল। এক নওজোয়ান প্রশ্ন করলেনঃ 'ভাই, আনওয়ার আলীকে তো অনেকক্ষণ দেখছি না। কোথায় গেলেন?'

লা গ্রাঁদ জওয়াব দিলেনঃ 'কোনো জরুরী কাজে ভিতরে গেছেন। এক্ষুণি এসে পড়বেন।'

কয়েক মিনিট পর আনওয়ার আলী কামরায় এসে প্রবেশ করলেন। ফ্রাঁসক বললেন ঃ 'মসিয়েঁ, অনেক দেরী করলেন আপনি।'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'মাফ করবেন। আমি আম্মাজানের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়েছিলাম।'

ঃ 'আপনি যাচ্ছেন কোথাও?'

ঃ 'জি হ্যাঁ।'

ঃ 'কোথায়?'

ঃ 'তা' আমার জানা নেই। শুধু এতটুকুই জানি যে, আমায় রাত দশটায় ফউজী কেন্দ্রে হাযির থাকতে হবে। তারপর রাতের যে কোনো সময়ে রওয়ানা হয়ে যেতে হবে এখান থেকে।'

ঃ 'কিন্তু আপনি তো আমায় আগে কিছু বলেন নি। নইলে আমি আপনাকে এ তকলীফ করতে দিতাম না।'

ঃ 'আমি কোনো তকলীফ করিনি। তবে আপনাদের খেদমত করবার বেশী অবকাশ পেলাম না, তার জন্য দুঃখিত।'

মেহমানরা উঠে দাঁড়ালেন। লালী বললেনঃ 'আমার মনে হয়, এখন আমাদেরও বিদায় নেওয়া উচিত।'

কিছুক্ষণ পর মেহ্মানরা কামরা থেকে বেরিয়ে দেউড়ির সামনে দাঁড়ালেন এবং আনওয়ার আলী একে একে তাঁদের সাথে মোসাফাহা করলেন। লা গ্রাঁদের পালা এলে আনওয়ার আলী তাঁকে বললেনঃ 'আমার বিশ্বাস, আপনাদের দলটিকেও খুব শীগ্গির এখানে থেকে রওয়ানা হয়ে যেতে হবে। এরপর আমাদের সাক্ষাত হবে কোনো যুদ্ধের ময়দান।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'যদি আমাদেরকে অপর কোনো ফ্রন্টে পাঠানো না হয়, তা' হলে খুব শীগ্গিরই আমাদের মোলাকাত হবে। মসিয়ে' লালী বললেনঃ 'আমাদেরকে দু'দিনের মধ্যেই এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যেতে হবে।'

ঃ বহুত আচ্ছা। এবার মেহ্মানদের বিদায় সম্ভাষণ জানাবার দায়িত্ব আপনার উপর রইলো।'

আনওয়ার আলীর নওকর ঘোড়ার বাগ ধরে কাছেই দাঁড়িয়েছিলো। তিনি এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। বিদ্যুৎগতি ঘোড়া দেখতে দেখতে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ পর লা গ্রাঁদ ফ্রাঁসক ও জিনকে সাথে নিয়ে নিজ গৃহের দিকে চললেন। পথে ফ্রাঁসক প্রশ্ন করলেন। 'লা গ্রাঁদ, আনওয়ার আলী খানা খেয়েই উঠে বাইরে গেলেন, তখন তুমি কি জানতে যে, তিনি তাঁর মায়ের কাছে বিদায় নিতে গেছেন?'

ঃ 'জি হ্যাঁ, তিনি আমায় বলেছিলেন যে, মেহ্মানদের খানা খাওয়াবার পরেই তিনি কোনো এক অভিযানে রওয়ানা হয়ে যাচ্ছেন।'

ঃ 'কিন্তু তুমি আমায় কেন বললে না?'

ঃ 'আনওয়ার আলী আমায় মানা করে দিয়েছিলেন। খানার সময়ে এঁরা মেহ্মানদের পেরেশান করতে চান না।'

চৌদ্দ

'দুশমন আমাদের গুপ্তচরদের খবরের আগেই আমাদের মাথার উপর চড়াও হয়েছে। কর্নেল ফ্লয়েডের সৈন্যদল তাদের গতি রোধ করতে পারিনি। কোয়েম্বাটুরের দিকে পিছু হটে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো চারা নেই।'

এর আগেও জেনারেল মিডোজ এ ধরনের অবিশ্বাস্য খবরের সমর্থন পেয়েছেন। সুলতান টিপুর সেনাবাহিনী অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার সালে হামলা করে সত্যমংগলম কেল্লা দখল করে নিয়েছে এবং কর্ণেল ফ্লয়েড তাঁর তোপখানা ও রসদ-সামগ্রী বোঝাই অসংখ্য গাড়ি দুশমনের দখলে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছেন। সত্যমংগলম থেকে উনিশ মাইল দূরে পরাজিত ইংরেজ সৈন্যরা সম্পূর্ণরূপে দুশমনের নাগালের মধ্যে এসে গেছে। কিন্তু মহীশূরের ঝটিকা বাহিনী যখন চূড়ান্ত হামলা করেছে এবং ইংরেজদের পরিপূর্ণ ধ্বংস নিশ্চিত হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময়ে মহীশূরের যোগ্যতম জেনারেল, সুলতানের সম্পর্কিত ভ্রাতা বুরহানুদ্দীন শহীদ হলেন। যে সব সিপাহী ও অফিসার সুলতান টিপুর পরেই তাঁকে মনে করতেন মহীশূর অস্ত্রাগারের শ্রেষ্ঠ তলোয়ার, তাঁরা দুশমনের অবশিষ্ট সৈন্যদলের পিছু ধাওয়া না ক'রে তাঁর লাশের পাশে এসে জমা হতে লাগলেন।

সেরিংগাপটম থেকে সুলতানের রওয়ানা হওয়ার ও ইংরেজ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের মাঝখানে ছিলো মাত্র বারো দিনের ব্যবধান এবং এই বারো দিনেরও কম-সে-কম আট দিন ইংরেজ ফউজ ছিলো সুলতানের অগ্রগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। বাকী চারদিনে ইংরেজদের এত ক্ষতি স্বীকার করতে হল যে, তাদের আক্রমণাত্মক যুদ্ধ রূপান্তরিত হোল আত্মরক্ষার লড়াইয়ে। তথাপি সুলতানের কাছে কোনো বড়ো সাফল্যই বুরহানুদ্দীনের প্রাণহানির ক্ষতিপূরণ করার মতো ছিলো না।

মুহাররমের দশম দিনে ভবানী নদীর কিনারে শিবির সন্নিবেশ করে সুলতান অগ্রগতি শুরু করলেন এবং এরোড দখল ক'রে নিলেন। ইতিমধ্যে কর্ণেল ফ্লয়েড অবশিষ্ট সৈন্যদলসহ কোয়েম্বাটুরে জেনারেল মিডোজের সাথে মিলিত হলেন। সুলতানের আকস্মিক অগ্রগতির দরুন ইংরেজ ফউজের আর একটি ডিভিশনকে

পালঘাট থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিলো। তারাও এর মধ্যে কোয়েম্বাটুরে পৌছলো। সুলতান এরোড থেকে দক্ষিণদিকে এগিয়ে গেলেন। ইংরেজ ফউজের একটি দল প্রচুর রসদ ও সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে কোয়েম্বাটুরের দিকে যাচ্ছিলো, সুলতান তাদের গতিরোধ করলেন। জেনারেল মিডোজ খবর পেয়েই কোয়েম্বাটুর থেকে এগিয়ে চললেন, কিন্তু কয়েক মনযিল দূরে পৌছে খবর পেলেন যে, সুলতান টিপু রসদ ও সেনা সাহায্যের কাফেলার উপর হামলা না ক'রে রাতের মধ্যেই কোয়েম্বাটুরে পৌছে গেছেন। জেনারেল মিডোজ ভীত হয়ে সদর দফতর বাঁচাবার জন্য ফিরে চললেন., কিন্তু পথেই খবর পাওয়া গেলো যে, মহীশূরের লশকর কোয়েম্বাটুরের পরিবর্তে ধারাপুরমের দরযায় আঘাত হানছে।

দু'দিন পর তাঁর কাছে খবর পৌছলো যে, ধারাপুরমের কেল্লার উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিবর্তে সুলতানের পতাকা উড্ডীন হয়েছে। সুলতান টিপুর পরবর্তী পদক্ষেপ কোথায়, জেনারেল মিডোজ তা' জানতে পারলেন না। কোয়েম্বাটুরে থাকা অথবা সেখান থেকে বেরিয়ে অপর কোনো ময়দানে সুলতানের মোকাবিলা করা তিনি নিজের জন্য সমভাবে বিপজ্জনক মনে করছিলেন। কোয়েম্বাটুরের যুদ্ধে নকশা তখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যুদ্ধের সূচনা তখন পুরোপুরি সুলতানেরই হাতে। জেনারেল মিডোজের কাছে একটি মাত্র উৎসাহব্যঞ্জক খবর এসেছিলো যে, বাংলার যে ফউজ বারমহলের দিকে এগিয়ে এসেছিলো, তারা মহীশূরের কয়েকটি সীমান্ত চৌকি দখল করে কৃষ্ণগরী পর্যন্ত পৌছে গেছে।

সুলতান টিপু কমরুদ্দীন খানের নেতৃত্বাধীন ফউজের কয়েকটি দলকে রেখে আচানক ধারাপুরম থেকে বেরিয়ে গেলেন। কয়েকদিন পর জেনারেল মিডোজ অশান্তি ও উদ্বেগের মধ্যে খবর পেলেন যে, ইংরেজদের যে দলটি কৃষ্ণগরীর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলো, তারা সুলতানের ঝটিকা বাহিনীর হাতে প্রচন্ড মার খেয়েছে এবং বাঙলা থেকে প্রেরিত দশ হাজার সিপাহীর পুরোপুরি ধ্বংসের বিপদ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জেনারেল মিডোজ অবিলম্বে বারমহলের দিকে এগিয়ে চললেন। সুলতান টিপু ইংরেজের দুটি ফউজের মাঝখানে বেষ্টিত হবার সম্ভাবনা দেখে পশ্চিম দিকে চললেন। তাঁদের গতি ছিলো এত দ্রুত যে, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাঁর ফউজ তোপখানা ও ভারী সামরিক সরঞ্জামসহ পাহাড় ও বনের পথ ধরে পঁয়তাল্লিশ মাইল অতিক্রম ক'রে পালাকাচ উপত্যকার কাছে পৌছে গেলো।

জেনারেল মিডোজের সেনাবাহিনী কাবেরী পটনম নামক স্থানে বাঙলার সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হলে তাদের মিলিত সেনাবাহিনী সুলতানের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধের সংকল্প নিয়ে থুপুর দিকে অগ্রগতি শুরু করলো। জেনারেল মিডোজ পূর্ণ বিক্রমে হামলা করলেন, কিন্তু সুলতানের পথ রোধ করতে পারলেন না। এই ব্যর্থতার পর যখন জেনারেল মিডোজ পুনরায় হামলার জন্য তৈরী হচ্ছেন, তখন সুলতান আচানক উপত্যকাপথ·পাড়ি দিয়ে ঝড়ের মতো এগিয়ে গেলেন কর্নাটকের দিকে। জেনারেল মিডোজের দৃষ্টি পড়েছিলো মহীশূরের মধ্যবর্তী জেলাগুলোর দিকে,

কিন্তু এবার তাঁকে এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হল। কয়েক দিনের মধ্যেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেল্লা দখল করে নিয়ে সুলতানের লশকর ত্রিচিনোপল্লীর কাছে পৌঁছে গেলো।

জেনারেল মিডোজ মহীশূরের মধ্যবর্তী জেলাগুলোর উপর হামলার ধারণা ত্যাগ করে ত্রিচিনোপল্লীর হেফাযত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। যুদ্ধের গোড়ার দিকে জেনারেল মিডোজ যে সাফল্য লাভ করেছিলেন, তা এতদিনে রূপান্তরিত হয়েছে শোচনীয় পরাজয়ে। ইংরেজের সামনে সমূহ বিপদ, অবিলম্বে কোথাও গৌরবময় বিজয় লাভ করতে না পারলে নিযাম ও মারাঠা হতাশ ও ভীত হয়ে তাদের সাহচর্য ত্যাগ করে যাবে। সুতরাং ত্রিচিনোপল্লী থেকে কিছুটা দূরে থেকে জেনারেল মিডোজ খবর পেলেন যে, লর্ড কর্ণওয়ালিস ফউজের নেতৃত্বের ভার নিজ হাতে নেবার জন্য কলকাতা থেকে পৌঁছে গেছেন মাদ্রাজে।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায় শেষ হয়ে গেছে। জেনারেল মিডোজের বিশাল ফউজের কয়েকটি ফ্রন্টেই পরাজয় ঘটেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ জেনারেলও সুলতান টিপুর সামরিক চালের সাথে পেরে ওঠেন নি। শেরে মহীশূর ত্রিচিনোপল্লী অবরোধে সময়ে অপচয় না করে ফরাসীদের সাহায্য লাভের আশায় পন্ডিচেরীর নিকটে পৌঁছে শিবির সন্নিবেশ করলেন। কর্ণওয়ালিস আর্কট থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত পশ্চিম উপকূলের সকল কেল্লার জন্য বিপদ সম্ভাবনা অনুভব বলতে লাগলেন। ইংরেজরা গত কয়েক মাসে যদি কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে থাকে, তা ছিলো পূর্ব ও পশ্চিমের কয়েকটি ফ্রন্টে সুলতানের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে বোম্বের ফউজের কানানূর ও মালাবারের আরো কয়েকটি কেল্লা উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ ছাড়াই দখল করে নেওয়া।

উত্তরদিকের ফ্রন্টে নিযাম ও মারাঠাদের সেনাবাহিনী সেরিংগাপটম থেকে টিপুর অগ্রগতির খবর পেয়েই হামলা করেছিলো। কিন্তু তখনো তাদের কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ হয়নি। মারাঠা কয়েকটি গুরুত্বহীন সীমান্ত চৌকি দখল করে তাদের পূর্ণ শক্তি ধাড়ওয়ারের কেল্লা দখলের জন্য ব্যয় করেছিলো এবং এখানে বদরুযযামান খানের নেতৃত্বে সুলতানের দশ হাজার জানবায সিপাহী তাদেরকে ক্রমাগত শোচনীয়রূপে পরাজিত করছিলো। নিযাম তাঁর পূর্ণশক্তি ব্যয় করেও কোপালের কেল্লা জয় করতে পারলেন না।



এক রাত্রে পন্ডিচেরী থেকে কিছু দূরে সুলতানের শিবিরে কয়েকজন দ্রুতগামী সওয়ার এসে প্রবেশ করলো। সুলতানের খিমার কাছে এসে তারা ঘোড়া থেকে নামলো। তাদের ভিতর থেকে একজন দ্রুত পদক্ষেপে এগিযে গেলেন। ইনি আনওয়ার আলী।

দরযার পাহারাদাররা তাঁকে সালাম করলো। এক অফিসার হাত দিয়ে ইশারা করে তাঁর গতিরোধ করবার চেষ্টা করে বললেনঃ 'জনাব, একটুখানি দেরী করুন।

সুলতান মোয়াযযম এখন খুব ব্যস্ত।'

কিন্তু আনওয়ার আলী বিরক্ত হয়ে বললেনঃ 'তুমি আমার সময় নষ্ট করছো।' তিনি বিনাদ্বিধায় খিমার ভিতরে ঢুকে গেলেন।'

সুলতান একটি প্রশস্ত মেযের সামনে উপবিষ্ট। তাঁর ডানে-বাঁয়ে ও সামনে ফউজের আটজন বিশিষ্ট অফিসার দন্ডায়মান। আনওয়ার আলী এগিয়ে গিয়ে সালাম করলেন এবং সুলতানের সামনে দাঁড়ানো অফিসারটি একধারে সরে গেলেন।

সুলতান বললেনঃ 'আনওয়ার আলী, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি কোনো ভালো খবর নিয়ে আসো নি।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'আলীজাহ্! কর্ণওয়ালিস চিত্তুর থেকে মাত্র বারো মাইল দূরে রয়েছেন। আমরা কাল সন্ধ্যায় আর্কট ও চিত্তুরের মাঝখানে তাঁদের রসদবাহী ফউজের উপর হামলা করে একশ ত্রিশটি গাড়ি ছিনিয়ে নিয়েছি। আমাদের আটজন এবং দুশমনের দেড়শ লোক মারা গেছে। সিপাহসালারের ধারণা, কর্ণওয়ালিস বাংগালোরের পথ সাফ করার জন্য কোলার দখল করবার চেষ্টা করবে এবং কোলারের ফউজ কয়েক ঘন্টার বেশী তাদের পথরোধ করতে পারবে না।'

ঃ 'তোমার আসার আগে আমি সৈয়দ আহমদকে হুকুম পাঠিয়েছি, যেনো আপাতত তিনি দুশমনের মোকাবিলা না করে কেবল তাদের পিছন থেকে হামলা করেই নিরস্ত থাকেন।'

ঃ 'কিন্তু আলীজাহ্, বাংগালোরের বিপদ আসন্ন।'

ঃ 'তা' আমি জানি। কিন্তু আমাদের সামনে একটি বিপদই নয়। তুমি এমন সময় এসেছো, যখন কোলারের চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্টে তোমার খেদমতের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমি তোমায় ধাড়ওয়ারে পাঠাতে চাই। বদরুযযামান খবর পাঠিয়েছেন যে, ধাড়ওয়ারে বারুদের ভান্ডার শেষ হয়ে এসেছে। দুশমনের অবরোধ বেশীর ভাগ সিপাহীর মনে ভীতির সঞ্চার করেছে। আজই শেষ প্রহরে তুমি পাঁচশ সিপাহী নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাবে। পথে চাতল দুর্গ থেকে তোমায় বারুদ ও রসদের গাড়ির সংস্থান করে দেওয়া হবে। ধাড়ওয়ারের কয়েকজন যোগ্য তোপচীর প্রয়োজন এবং লালী তাঁর তোপখানার কয়েকজন লোককে তোমার সাথে রওয়ানা করে দেবেন। এখন দুটি কাজ তোমার দায়িত্বে থাকলো। প্রথমত তুমি যথাসম্ভব শীগ্‌গির চাতল দুর্গ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদ নিয়ে ধাড়ওয়ারে পৌঁছে যাবে। দুশমনের নযর এড়িয়ে কেল্লায় প্রবেশ করা খুব কঠিন কর্তব্য, কিন্তু তোমার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠার উপর আমার বিশ্বাস রয়েছে। তোমার দ্বিতীয় কর্তব্য তুমি কেল্লার রক্ষীদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করবে এবং বদরুয্‌যামানকে আমার তরফ থেকে পয়গাম দেবে যে, আমি ধাড়ওয়ারকে সেরিংগাপটমের দরযা মনে করি। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে ধাড়ওয়ারকে বাঁচানোর সর্বপ্রকার সম্ভাব্য চেষ্টা করা। তিনি যেনো মনে না করেন যে, তিনি আমাদের এক দূরবর্তী কেল্লার হেফাযত করেছেন; বরং তাঁকে মনে করতে হবে যে,

তিনি মারাঠাদের ধাড়ওয়ারের প্রতিরোধ করে আমাদেরকে ইংরেজের সাথে বোঝাপড়া করবার মওকা দিচ্ছেন। তিনি যদি ধাড়ওয়ারের কেল্লা খালি করে দেন, তা'হলে উত্তরের জেলাসমূহে মারাঠারা ধ্বংসের তুফান বইয়ে দেবে।

'চাতল দূর্গ থেকে আগে দুশমনের নযর এড়িয়ে ধাড়ওয়ারে পৌঁছবার জন্য তোমার একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন । তাই তুমি ঢুন্ডিয়া দাগকে নিজের সাথে নিয়ে যাও। ভোরে রওয়ানা হবার আগে লিখিত হুকুম তুমি পাবে।'



রাতের শেষ প্রহরে কে যেনো আনওয়ার আলীর বাহু ধরে এক ঝাঁকুনি দিলে তিনি গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। খিমার এক কোণে একটি চেরাগ জ্বলছে। তাঁর আর্দালী ও ঢুন্ডিয়া দাগ তাঁর শয্যার পাশে দাঁড়ানো।

ঃ 'প্রায় চারটা বাজে।' ঢুন্ডিয়া দাগ বললো।

'তিনটায় কেন তুমি আমায় জাগালে না?' ঃ আর্দালীর দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ আনওয়ার আলী প্রশ্ন করলেন।

আর্দালীর পরিবর্তে ঢুন্ডিয়া দাগ জওয়াব দিলোঃ 'আমি জানতাম যে, আপনি খুব ক্লান্ত। তাই আমি ওকে বলেছিলাম, সিপাহীদের তৈরী হওয়া পর্যন্ত যেনো আপনাকে আরাম করতে দেয়। আপনি চারটা বাজলে রওয়ানা হতে চেয়েছিলেন। এখনো চারটা বাজতে কয়েক মিনিট দেরী।'

ঃ 'ভিতরে আসতে পারি ?'ঃ কে যেনো বাইরে থেকে ফরাসী ভাষায় বললেন।

ঃ 'কে? লা গ্রাঁদ ? আসুন।'

লা গ্রাঁদ খিমার ভিতরে প্রবেশ করলেন।

'কিন্তু আপনি এ সময়ে ?' আনওয়ার আলী তার দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

ঃ 'আমি আপনার সাথে যাচ্ছি। আপনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ, আপনি রাতের বেলায় মসিয়েঁ লালীর কাছে যে সাতজন লোক চেয়েছিলেন, তার মধ্যে আমার নাম ছিলো না।'

ঃ 'মসিয়েঁ লালী নিজের মরযী মোতাবিক লোক বাছাই করে নিয়েছেন। কিন্তু আমার পরামর্শ চাইলেও আমি বলতাম না যে, আপনাকে আমার প্রয়োজন।'

ঃ 'কেন?'

ঃ 'কারণ এখানে মসিয়েঁ লালীরই আপনাকে বেশী প্রয়োজন। আমার ধারণা ছিলো যে, তিনি আপনাকে আর কোথাও পাঠাবেন না।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'আপনার সাথে যাবার জন্য মসিয়েঁ লালীকে আমায় যথেষ্ট অনুরোধ করতে হয়েছে।'

ঃ 'এ অনুরোধ করা আপনার ঠিক হয়নি।' আনওয়ার আলী বিরক্তির স্বরে বললেনঃ তারপর তিনি ঢুন্ডিয়া দাগকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'তুমি কিছুক্ষণ খিমার বাইরে দেরী করো। আমার লেবাস বদল করতে দু'মিনিট লাগবে।'

ঢুন্ডিয়া দাগ, আনওয়ার আলীর আর্দালী ও লা গ্রাঁদ খিমার বাইরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর আনওয়ার আলীর নেতৃত্বে পাঁচশ' সওয়ার উত্তর-পশ্চিমের পথ ধরে রওয়ানা হল। সবার আগে চললো ঢুন্ডিয়া দাগের ঘোড়া এবং তার সাথের কোনো সিপাহীর জানার প্রয়োজন ছিলো না যে, তারা কোন পথে যাচ্ছে।

ঢুন্ডিয়া দাগ ছিলো এক মারাঠা খান্দান থেকে উদ্ভূত। যে সব আযাদী পিয়াসী লোক হায়দর আলীকে হিন্দুস্তানের আযাদীর দিশারী মনে করে তাঁর ঝান্ডাতলে সমবেত হয়েছিলো, এ লোকটিও ছিলো তাদেরই একজন। মহীশূরের পিন্ডারা ফউজের একটি দলের নেতৃত্ব হাসিল করে ইংরেজ ও মারাঠার বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে সে শরীক হয়েছিলো। সুলতান টিপুর প্রাণপণ যোদ্ধা হিসাবে সে লাভ করেছিলো অসাধারণ সাফল্য। সুদর্শন মধ্যমাকৃতির এই মানুষটির চোখ ছিলো চিতার চোখের মতো জ্বলন্ত এবং দোস্ত-দুশমন সকলেরই কাছে সে ছিলো এক রহস্য। যুদ্ধ ছিলো তার খেলা। মাইলের পর মাইল সে ছুটে চলতো পায়দল, আর ক্লান্তি, ভূখ-পিয়াসা ও ঘুম ছাড়াই ঘোড়ার পিঠে চেপে থাকতো ঘন্টার পর ঘন্টা। দিনের আলোর চাইতে রাতের অন্ধকারই ছিলো তার বেশী পসন্দ। মহীশূরের পাহাড় ও বনের সবগুলো পথ ছিলো তার মনের পটে আঁকা। গত যুদ্ধে মারাঠাদের সব চাইতে বেশী ক্ষতি করেছিলো বলে তারা তার মস্তকের মূল্য ঘোষরা করেছিলো। এবার আনওয়ার আলীর সাথে ধাড়ওয়ারের দিকে যেতে সে আনন্দ বোধ করলো এইজন্য যে, তাকে যে ফ্রন্টে পাঠানো হচ্ছে, সেখানে তার গুণের পরিচয় দেবার শ্রেষ্ঠ মওকা মিলবে।

একটি নদী পার হয়ে যাবার পর সে তার ঘোড়া আনওয়ার আলীর পাশে নিয়ে বললোঃ 'আমি এখানে ছিলাম বেকার। রাতের বেলায় পাহারাদারদের শামিল হয়ে দুশমন-শিবির ঘুরে আসা আমার যিন্দেগীর সব চাইতে চিত্তাকর্ষক কাজ। ইংরেজদের ভাষা জানি না বলে তাদেরকে ধোকা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মারাঠা শিবিরে দিনের বেলায়ও আমার মনে হয়, যেনো নিজের গাঁয়ে বেড়াচ্ছি।'

লর্ড কর্ণওয়ালিস বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরাজিত সেনাবাহিনীকে জমা করে অগ্রগতি শুরু করলেন এবং ভেল্লোর, চিত্তুর ও পামানীরের মাঝখানকার দীর্ঘ পথ ঘুরে প্রবেশ করলেন মহীশূরে। তারপর তাঁর গতি ছিলো বাংগালোরের দিকে। সুলতান টিপু ত্রিচিনোপল্লী থেকে পৌঁছলেন বাংগালোরে। পথিমধ্যেই তিনি খবর পেলেন যে, বাংগালোরের ফউজদার সৈয়দ পীর ও অপর এক ফউজী অফিসার রাজা রামচন্দ্র দুশমনের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত। সুলতান বাংগালোর পৌঁছেই তাদেরকে গেরেফতার করলেন। এর আগে বাহাদুর খান কৃষ্ণগরীর ফউজদার হিসাবে প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁকে বাংগালোরের মুহাফিয নিযুক্ত করা করা হল। এই সময়ের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধের মোকাবিলা

না করেই লর্ড কর্ণওয়ালিস কোলার ও হাউসকোর্ট দখল করলেন। সুলতান বাংগালোরের হেফাজতের জন্য দু'হাজার সিপাহী রেখে ইংরেজের মোকাবিলার জন্য বেরিয়ে গেলেন। বাংগালোর থেকে দশ মাইল দূরে তিনি ইংরেজ ফউজের পশ্চাদ্ভাগে হামলা করে রসদ ও বারুদের কয়েকটি গাড়ি ছিনিয়ে নিলেন।

পরের সন্ধ্যায় মহীশূরের এক হাজার সওয়ার কর্ণেল ফ্লয়েডের নেতৃত্বে বাংগালোরে আগত কোম্পানীর ফউজের সামনে এসে আচানক দেখা দিলো। কর্ণেল ফ্লয়েড তাদের উপর হামলা করলেন এবং মহীশূর জেলার সওয়াররা কিছুক্ষণ প্রচন্ড বিক্রমে মোকাবিলা করার পর দক্ষিণ-পশ্চিমে হটে গেলো। ফ্লয়েড তাদের পিছু ধাওয়া করে চললেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি বুঝলেন যে, তাঁরা সুলতানের পুরো ফউজের নাগালের মধ্যে এসে গেছেন। সুলতান এমন তীব্র হামলা চালালেন যে, দেখতে দেখতে ইংরেজ সওয়ার দল চারশ' লাশ ফেলে ময়দান ছেড়ে পালালো। ফ্লয়েড নিজে আহত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন মাটিতে। কিন্তু সাথীরা তাঁকে তুলে নিয়ে গেলো সাথে করে। ইংরেজের ভাগ্যক্রমে রাত হয়ে গেলো এবং মহীশূরের সওয়াররা রাতের অন্ধকারে দুশমনের পিছু ধাওয়া করা ভালো মনে করলো না। সুলতানের সিপাহীদের হাতে বন্দী একশ' যখমী ইংরেজ পরদিন ভোরে লর্ড কর্ণওয়ালিসের শিবিরে হাযির হয়ে জানালো যে, সুলতান তাদের ঔষধ-পট্টির ব্যবস্থা করে তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং বখ্শিশ হিসাবে একটি করে টাকা দিয়েছেন।

কর্ণওয়ালিসের ময়দানে অবতরণের পর যুদ্ধের নতুন পর্যায় শুরু হয়ে গেলো। নিযাম ও মারাঠা ইংরেজদের কাছে লোক দেখানো কৃতিত্বের পরিচয় না দিয়ে পূর্ণ শক্তি এনে ময়দানে কেন্দ্রীভূত করলো। সুলতান টিপু তাঁর ফউজের একটি অংশ গুরত্বপূর্ণ কেল্লাগুলোর হেফাজতের জন্য পাঠালেন উত্তরদিকে। এবার দুশমনের সাথে কোনো বিশেষ ফ্রন্টে নিয়মিত লড়াই না করে তিনি চেষ্টা করলেন গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্টসমূহে তাদের রসদ ও সেনা সাহায্যের পথ রুদ্ধ করতে এবং তার পরে উপর্যূপরি হামলা করে তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করতে। সুতরাং বাংগালোরের সামনে ডেরা ফেলে লর্ড কর্ণওয়ালিস উপলব্ধি করতে লাগলেন যে, তিনি এক বিপদ সংকুল পরিবেশের মধ্যে পা দিয়েছেন। আর্কট থেকে তাঁর ঘোড়ার জন্য যে চারা ও সিপাহীদের জন্য খাদ্য সরবরাহ আসছিলো, তার বেশীর ভাগ চলে গেছে মহীশূরের নৈশ্য হামলাকারীদের দখলে।

ফ্লয়েডের সৈন্যদলকে পরাজিত করার পর সুলতান বাংগালোর থেকে কয়েক মাইল দূরে সরে গিয়ে কাংগরীতে অস্থায়ী কেন্দ্র করে নিলেন। নিযাম ও মারাঠাদের সেনাবাহিনী বাংগালোর বিজয়ে শরীক হবার জন্য এগিয়ে আসবে, এই প্রত্যাশা নিয়ে কর্ণওয়ালিস বাংগালোরের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তারা উলটো তাদের সাহায্যের জন্য তাঁকেই দাওয়াত দিচ্ছিলো উত্তর এলাকায়। পরিস্থিতি ক্রমেই লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রতিকূলে যাচ্ছিলো; গোড়ার দিকে সাফল্য তাঁর কাছে অবাস্তব মনে হচ্ছিলো। রসদ ও চারার ঘাটতি পূরণের জন্য তিনি অবিলম্বে বাংগালোর দখল

করে নেবার প্রয়োজন বোধ করলেন। সামরিক দৃষ্টিভংগীতে দক্ষিণ-পূর্বের প্রত্যেক শহরের মোকাবিলায় বাংগালোরের গুরুত্ব ছিলো অনেক বেশী। বাংগালোরের প্রশস্ত রাজপথ, আলীশান বাসভবন ও ব্যবসায়কেন্দ্র ছিলো সারা হিন্দুস্থানে মশহুর। শিল্পকলার দিক দিয়েও এ শহর সেরিংগাপটম ব্যতীত সকল শহরের আগে ছিলো। সুলতানের ফউজের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদের চাহিদার বেশীর ভাগ পূরণ হত এখানকার কারখানা থেকে। শহরের পাঁচিলের পাশে বিশ ফুট গভীর খন্দক ছিলো বাঁশ ও কাঁটাঝাড় দিয়ে ঘেরা। শহরের চার দরযা ছিলো অত্যন্ত মযবুত। শহরের দক্ষিণে কেল্লার আয়তন প্রায় এক বর্গ মাইল এবং তার উঁচু ও প্রশস্ত পাঁচিলের উপর ছাব্বিশটি বুরুজ আর প্রতি বুরুজে তিনটি করে তোপ বসানো। শহরের মতো কেল্লার খন্দকও ছিলো যথেষ্ট গভীর।



৭ই মার্চ ইংরেজ শহরের উপর হামলা করলো। ইংরেজের ভারী তোপের আওয়াযে বাংগালোরের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। তুমুল যুদ্ধ ও ভয়াবহ ক্ষতি স্বীকারের পর ইংরেজ শহর দখল করলো এবং রক্ষী ফউজ কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হল। শহরের বেশীরভাগ বাসিন্দা ইংরেজ হামলার আগেই সেখান থেকে হিজরত করেছিলো। তথাপি তখনো হাজারো নারী-পুরুষ ইংরেজের বন্য বর্বরতা প্রত্যক্ষ করার জন্য সেখানে মওজুদ ছিলো। লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজ চোখে তাকিয়ে দেখছিলেন অসহায়া নারীদের উপর তাঁর সিপাহীদের যবরদস্তি, নিজ কানে শুনছিলেন তাদের মর্মবিদারক চীৎকার ধ্বনি। যে সব ঐতিহাসিক লর্ড কর্ণওয়ালিসকে হিন্দুস্তানের পরিত্রাতা এবং সুলতান টিপুকে স্বেচ্ছাচারী যালেম শাসক বলে প্রমাণ করার কর্তব্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরাও ছিলেন তাঁরই সাথে। কিন্তু ইংরেজ ফউজের লুটতরাজ, নৃশংসতা ও বর্বরতা সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন মূক। কর্ণওয়ালিসের ফউজ লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার যেওরাত জমা করলো;' খাদ্যশস্য, অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদের বড়ো বড়ো ভান্ডার হল তাদের হস্তগত, কিন্তু মহীশূরের সিপাহীরা বেশীর ভাগ চারার স্তূপে লাগালো আগুন।

বাংগালোর শহরটি এত শীগ্‌গির বিজিত হওয়া ছিলো সুলতান টিপুর প্রত্যাশার বাইরে। তিনি অবিলম্বে কাংগরী থেকে এগিয়ে গিয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছলেন বাংগালোরের সামনে। প্রথম হামলায় ছয় হাজার সিপাহী প্রবেশ করলো শহরে, কিন্তু বেশী সময় তারা শহর দখলে রাখতে পারলো না। তা' সত্ত্বেও শহরের উপর সুলতানের প্রথম হামলা পিছিয়ে দেওয়ায় লর্ড কর্ণওয়ালিসের খুশী খুবই অস্থায়ী প্রমাণিত হল। শহরের গলিতে ও বাজারে লড়াই করার ধারণা ত্যাগ করে বাইরে কেল্লার দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের উঁচু টিলা দখল করে বসলেন। সেখান থেকে সাফল্যের সাথে ইংরেজদের উপর গোলা বর্ষণ করার সুবিধা ছিলো। লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁর সকল শক্তি কেল্লার দিকে কেন্দ্রীভূত করলেন, কিন্তু পনেরো দিনের উপর্যুপরি চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো সাফল্য লাভ সম্ভব হল না। তাঁদের তোপ ক্রমাগত গোলাবর্ষণের

পর কেল্লার পাঁচিলের এক ধারে যে গর্ত করলো, তা বাইরে থেকে টিলার উপর সুলতানের তোপের নাগালের ভিতরে ছিলো। সুলতানের তোপ পাঁচিলের গর্তের দিকে হামলাকারী ফউজের উপর সাফল্যের সাথে গোলাবর্ষণ করতে পারতো।

কর্ণওয়ালিস অনিচ্ছাসত্বেও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। একদিকে তিনি কেল্লা অবরোধ করেছিলেন, অপরদিকে তিনি নিজে অবরুদ্ধ ছিলেন সুলতানের ফউজের হাতে। সুলতানের ফউজ প্রয়োজন মতো তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারতো। একদিকে কেল্লার মুহাফিয ইংরেজ ফউজের উপর গোলাবর্ষণ করেছিলো, অপর দিকে বাইরে থেকে সুলতানের তোপখানা অগ্নিবর্ষণ করেছিলো তাদের উপর। শহরে চারার ঘাটতির দরুন তাদের ঘোড়া ও বলদগুলো ক্ষুধায় মরে যাচ্ছিলো। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সামনে এমন বিপদ-সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠেছিলো যে, কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী সিপাহীরা বেকার হয়ে যাবে ঘোড়ার অভাবে এবং বাংগালোর থেকে অপর কোনো ফ্রন্টের দিকে যাবার সময়ে তাঁদের সাজ-সরঞ্জাম বোঝাই গাড়িগুলো সেখানেই ফেলে যেতে হবে। কিন্তু শৌর্য-সাহস যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে ধূর্ততা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। যেখানে কেল্লার মুষ্টিমেয় রক্ষী সিপাহী শেষ বিজয়ের আশায় পূর্ণ সাহস ও অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, সেখানে কতিপয় গাদ্দার খুলে দিলো দুশমনের সাফল্যের পথ। এই গাদ্দারদের দলপতি ছিলো কৃষ্ণরাও।

হামলার আগে ইংরেজরা কৃষ্ণরাওর কাছ থেকে নির্দেশ পেলোঃ 'তোমরা অমুক রাত্রে অমুক সময়ে কেল্লার পাঁচিলের অমুক অংশে হামলা করলে আমায় সেখানে তোমাদের অভ্যর্থনার জন্য হাযির পাবে। পাহারাদারদের সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে।' কর্ণওয়ালিস তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলেন। মধ্যরাত্রে ইংরেজ ফউজের কয়েকটি দল যখন কেল্লার মধ্যে ঢুকে গেছে, তখন কেল্লার মুহাফিযও গাদ্দারীর খবর জানতে পারলেন। বাহাদুর খান ও তাঁর সাথী এক হাজার জানাবায সিপাহী লড়াই করে শহীদ হলেন। তিনশ' মুজাহিদ বন্দী হল। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিলো যখমী। বাকী সিপাহীরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলো।* ইংরেজরা এ বিজয়ের যে দাম দিয়েছিলো, তা'-ও খুব কম ছিলা না। সুলতান টিপু এই গাদ্দারীর খবর শুনে অবিলম্বে দু'হাজার সিপাহী কেল্লারক্ষীদের সাহায্যের জন্য পাঠালেন। কিন্তু এরই মধ্যে কেল্লার উপর ইংরেজদের পূর্ণ দখল কায়েম হয়ে গেছে।

বাংগালোর ইংরেজের দখলে চলে যাওয়া ছিলো সুলতানের এক অপূরণীয় ক্ষতি, কিন্তু বাহাদুর খানের মৃত্যু ছিলো তার চাইতেও বড়ো ক্ষতি । বুরহানুদ্দীনের পর তিনি

---

* কৃষ্ণরাও এইসব লোকর সাথেই বেরিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সে সুলতানের কাছে না গিয়ে সেরিংগাপটম চ'লে যায়। ইতিমধ্যে বাংগালোর থেকে এক অফিসারের চিঠি ধরা পড়ে এবং জানা যায় যে, কৃষ্ণরাওকে সেরিংগাপটমেও সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জাল বিছানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। সুলতান মীর নুঈমুদ্দীন ওরফে সৈযদ সাহেবকে তার পিছনে রওয়ানা ক'রে দিলেন। ষড়যন্ত্রের প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে তিনি কৃষ্ণরাও ও পিতার তিন ভাইকে মৃত্যুদন্ড দান করলেন।

ছিলেন সুলতানের ফউজের সব চাইতে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত অফিসার। এই দীর্ঘকায় ও দরবেশ চরিত্র মানুষটি সত্তর বছর বয়সেও ছিলেন এমন স্বাস্থ্যবান ও সতেজ যে, তাঁকে দেখে জোয়ানরাও ঈর্ষা করতো। তিনি ছিলেন এমন মহিমাময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী যে, লর্ড কর্ণওয়ালিসের মতো মানবতার দুশমনও তাঁকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারেননি। তাই তিনি সুলতানের কাছে খবর পাঠালেন যে, সুলতান ইচ্ছা করলে তিনি বাহাদুর খানের লাশ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে প্রস্তুত। সুলতান জওয়াব দিলেনঃ 'আপনার এ আচরণ প্রশংসনীয়। যদি আপনি বাহাদূর খানের লাশ বাংগালোরের মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত করেন, তা'হলে তারা তাঁকে পূর্ণ ইয্যত ও শ্রদ্ধার সাথে দাফন করবে।'

বাংগালোর বিজয়ের জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিসকে যে দাম দিতে হয়েছিলো, তা ছিলো তাঁর প্রত্যাশার বাইরে। তারপর এই সাফল্য ইংরেজ ফউজের ভবিষ্যত সম্পর্কে এমন কতকগুলি বিপদ সৃষ্টি করে দিলো, বাংগালোরের দিকে অগ্রগতির সময়ে যা' তাদের ধারণায় আসেনি। বাংগালোরের বাইরে তাদের রসদ ও সেনা সাহায্যের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেলো এবং রসদ ও চারার ক্রমবর্ধমান ঘাটতির দরুন তাদের পক্ষে দীর্ঘ অবরোধের মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে পড়লো। কিন্তু উত্তরদিকে মারাঠাদের হামলার তীব্রতা ও মীর নিযাম আলীর পনেরো হাজার সওয়ারের অগ্রগতি সুলতান টিপুকে বাংগালোর অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য করলো।

পনেরো

বদ্‌রুয্‌যামান খান ধাড়ওয়ারে অবস্থান করছিলেন। মারাঠাদের আগমনের পূর্বেই শহরের বাসিন্দারা হিজরত করে চলে গেছে। মারাঠা লশ্‌করের কেন্দ্র ছিলো দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পাঁচ মাইল দূরে। প্রতিদিন তারা শিবির থেকে কয়েকটি তোপ টেনে নিয়ে যেতো শহরের আশপাশের টিলার উপর আর সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখান থেকে করতো গোলাবর্ষণ। রাতের বেলায় মহীশূরের সওয়ারদের দিক থেকে বিপদের আশংকা করে তারা তোপগুলোকে টেনে নিয়ে যেতো শিবিরে। কিন্তু কয়েক হফতা পর কোম্পানীর ফউজের কয়েকটি দল তাদের সাহায্যের জন্য এসে পৌঁছলো এবং যুদ্ধের তীব্রতাও কিছুটা বেড়ে গেলো। মারাঠা ও ইংরেজের তরফ থেকে গোলাবর্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধির জওয়াবে শহররক্ষীরাও শুরু করলো জওয়াবী হামলা। মহীশূরের সওয়ার সকাল-সন্ধ্যায় কখনো কখনো শহর থেকে আচানক বেরিয়ে এসে দেখতে দেখতে দুশমনের কঠিন ক্ষতিসাধন করে ফিরে চলে যায়।

অবশেষে একদিন মারাঠারা তুমুল যুদ্ধের পর শহর দখল করে নিলো এবং শহররক্ষীরা কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হল। কিন্তু পরদিনই বদরুয্‌যামান আচানক কেল্লা থেকে বেরিয়ে জওয়াবী হামলা করলেন এবং মারাঠারা ধাড়ওয়ারের গলীতে ও বাজারে লাশের স্তূপ ফেলে পালিয়ে গেলো। পাঁচদিন পর মারাঠারা পূর্ণ শক্তিতে আবার হামলা করলো এবং পুনরায় শহর দখল করে নিলো। কিন্তু কেল্লা

থেকে তীব্র গোলাবর্ষণের ফলে তাদের শহরের কাছে মযবুত হয়ে দাঁড়াবার মওকা মিললো না। সুতরাং তারা শহরের পাঁচিল বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে ও বাসগৃহসমূহে আগুন লাগিয়ে ফিরে গেলো শিবিরে।

এরপর কেল্লার পথ বন্ধ করার কাজ চললো। কিন্তু মারাঠারা যে ভীতি প্রকাশ করছিলো, তা' ছিলো ইংরেজদের কাছে উদ্বেগজনক।*

দক্ষিণদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সেনাবাহিনীকে বিপদ থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ থাকলো মারাঠা ও নিযামের ফউজের সেরিংগাপটমের দিকে অগ্রগতি, কিন্তু মারাঠারা ধাড়ওয়ারের কেল্লাকে মনে করতো তাদের শাহ্‌রগের উপর খঞ্জরের মতো। এই কেল্লা দখল না করে তারা অপর কোনো ফ্রন্টের দিকে মনোযোগ দিতে রাযী ছিলো না।

তারপর বোম্বের ইংরেজদের একটি সেনাদল ভারী তোপ ও প্রচুর পরিমাণে বারুদ নিয়ে মারাঠাদের সাহায্যের জন্য পৌঁছলো এবং তার পূর্ণ বিক্রমে কেল্লার উপর গোলাবর্ষণ শুরু করলো। এই সময়ের মধ্যে বদরুয্‌যামনের সিপাহীদের অবস্থা নাযুক হয়ে গেলো। রসদ ও বারুদের ভাণ্ডার প্রায় শেষ হয়ে গেলো। কেল্লায় তখন মাত্র কয়েকদিন চলার মতো পানি রয়েছে।



এক রাত্রে কেল্লার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বুরুজের কাছে একে একে দুটি ছোট ছোট পাথরের টুকরা এসে পড়লো। পাহারাদার বন্দুক হাতে বাইরের দিকে উঁকি মেরে দেখতে লাগলো।

ঃ অন্ধকারে একটি লোক আওয়ায দিলো 'আমি ঢুন্ডিয়া দাগ। জলদী করে সিঁড়ি নামিয়ে দাও।

ঃ 'কোত্থেকে এলে তুমি?'

ঃ 'বেকুফ, বাদশাহ্ আমার পাঠিয়েছেন। জলদী সিঁড়ি নামিয়ে দাও, নইলে ওপরে এসে আমি তোমাদের গলা টিপে দেবো।

'দাঁড়াও। জমাদারকে খবর দিচ্ছি।'

দশ মিনিটের মধ্যে জমাদার ও কতিপয় ফউজী অফিসার সেখানে পৌঁছলেন। ঢুন্ডিয়া দাগ দড়িয়া সিঁড়ি বেয়ে পাঁচিলের উপর উঠে এলো।

---

* লেফ্‌টন্যান্ট মুর নামে এক ইংরেজ সামরিক অফিসার মারাঠাদের এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দান প্রসংগে লিখেছেন যে, একটি তোপে বারুদ ভ'রে তোপখানার আমলারা আমঘন্টা আরামে ব'সে তামাক টানতো। তোপ চালানোর সময়ে তাদের লক্ষ্য দেখা যেতো না। বেশী ক'রে ধুলো উড়লে তারা আশ্বস্ত হত। আবার বারুদ ভ'রে তামাক সেবন ও গল্পগুজব চলতো। দুপুরে দু'ঘন্টা ছিলো খানা ও আরামের সময়। তখন যুদ্ধ বন্ধ থাকতো। তোপগুলো সব পুরোনো ও অকাজের এবং চালাতে গিয়ে তা' ফেটে যেতো। আর একটি হাস্যকর ব্যাপার, সন্ধ্যায় মারাঠা তোপগুলো ঠেলে নিয়ে যেতো শিবিরে। দুশমনরা রাতের বেলায় পাঁচিল মেরামতের মওকা পেতো। বারুদের ঘাটতি লেগেই আছে এবং পুণা থেকে তার সরবরাহ খুবই কম ও অনিয়মিত এবং তোপগুলো কখনো কখনো অচল হ'য়ে প'ড়ে থাকে।

ঃ 'বদরুয্যামান খান কোথায়?' পাঁচিলের উপর পৌঁছেই সে প্রশ্ন করলো।

ঃ 'তিনি আসছেন।' এক অফিসার জওয়াব দিলেন।

ঃ 'আমি তাঁর জন্য ইন্তেষার করতে পারছি না। আমায় তাঁর কাছে নিয়ে চলুন। এক্ষুণি আমায় ফিরে যেতে হবে।'

ঃ 'তোমায় ইন্তেযার করতে হবে না।' এক ব্যক্তি বুরুজের দিক থেকে বেরিয়ে এসে বললেন।

ঢুন্ডিয়া দাগ বললোঃ 'আপনিই বদরুয্যামান খান?'

ঃ 'কি পয়গাম নিয়ে এসেছো, বলো।'

ঃ 'জনাব, কাল রাতের শেষ প্রহরে আনওয়ার আলী পাঁচশ' সওয়ার ও রসদ-বারুদের দেড়শ গাড়ি সাথে নিয়ে এখানে পৌঁছবেন। আমি কেল্লার বাইরে দুশমনের তামাম ঘাঁটি যাচাই করে দেখে এসেছি। মারাঠা যথেষ্ট দূরে রয়েছে এবং তাদের দিক দিয়ে আমাদের কোনো বিপদ নেই। কিন্তু ইংরেজদের ঘাঁটি খুব কাছে এবং সেনা সাহায্য আসার পথ সাফ করার জন্য তাদেরকে পিছু হটানো জরুরী প্রয়োজন রয়েছে। আপনারা কাল সারাদিন দুশমনের উপর তীব্র গোলাবর্ষণ করতে থাকবেন, যাতে তাদের মনোযোগ অপর কোনো দিকে নিবন্ধ হতে না পারে। তারপর রাত ঠিক দুটোর সময়ে হামলা করবেন তাদের উপর। আমরা পূর্বদিকের দরযা দিয়ে প্রবেশ করবো। আমাদের সওয়াররা দুশমনকে আশপাশের ঘাঁটি থেকে পিছু হটানোর ব্যাপারে আপনাদেরকে সাহায্য করবে। এবার আমায় এজাযত দিন। সাথীদের পথ দেখিয়ে আনার জন্য আমায় এক্ষুণি ফিরে যেতে হবে।'

বদরুয্যামান বললেনঃ 'সুলতানে মোয়ায্যম ধাড়ওয়ারের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর নন। কিন্তু তিনি মাত্র পাঁচশ' সিপাহী পাঠাচ্ছেন শুনে আমি হয়রান হচ্ছি। এ কেল্লা বাঁচানোর জন্য আমার কম-সে-কম দশ হাজার সিপাহীর প্রয়োজন।'

ঢুন্ডিয়া দাগ জওয়াব দিলোঃ 'এ যুদ্ধে কোথায় কতো সিপাহীর প্রয়োজন, তা' সুলতানের চাইতে বেশী আর কেউ জানেন না। এ ফ্রন্টে বেশী ফউজ না পাঠাবার কারণ আনওয়ার আলী আপনাকে বলে দেবেন। আমি শুধু এতটা জানি যে, আপাতত আপনার বেশী সেনা সাহায্য লাভের প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না। সুলতানে মোয়ায্যম চান যে, আপনারা দুশমনকে এই ফ্রন্টে যথাসম্ভব বিব্রত করে রাখবেন। আমার বিশ্বাস, আবার দেখা হলে আমরা এ ব্যাপার নিয়ে নিশ্চিন্তে আলাপ করতে পারবো। এবার আমায় এজাযত দিন।'

বদরুয্যামান 'খোদা হাফয' বলে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ঢুন্ডিয়া দাগ মোসাফাহা করে দড়ির সিড়ি বেয়ে নেমে গেলো নীচে।



পরের রাত্রে এক পাহারাদার মারাঠা ফউজের সিপাহ্‌সালার পরশুরাম ভাওকে গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে বললোঃ 'সরকার, এক ইংরেজ অফিসার খিমার বাইরে

দাঁড়ানো। তিনি এই মুহূর্তে আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চান। তিনি দুশমনের হামলার খবর নিয়ে এসেছেন।'

ভাও চোখ মলতে মলতে খিমার বাইরে গেলো। এক ইংরেজ অফিসার ঘোড়ার বাগ ধরে দাঁড়ানো। দলে দলে মারাঠা সিপাহী এসে তার কাছে জমা হচ্ছে।

ইংরেজ অফিসার কোনো ভূমিকা না করেই বললোঃ 'দুশমন কেল্লার বাইরে এসে আমাদের শিবিরের উপর হামলা করেছে। আপনাদের ফউজের যে দলটি আমাদের সাথে ছিলো, তারা পালিয়ে গেছে। আমরা পিছ হটতে বাধ্য হয়েছি।

ঃ 'তোমাদের সতর্ক থাকা উচিত ছিলো। তোমাদের কর্ণেলকে আমি বলে দিয়েছিলাম যে, রাতের বেলায় কেল্লার কাছে থাকা বিপজ্জনক। কিন্তু তোমরা কার কথাই বা শোন?

ঃ 'সঠিক পরিস্থিতি জানলে আপনারা মানতে বাধ্য হবেন যে, আমাদের ফয়সালাই ছিলো নির্ভুল। আপনাদের ত্রুটির জন্যই আমরা দুশমনের পথ রোধ করতে সফল হইনি। তারই জন্য তারা রসদ ও বারুদ বোঝাই অসংখা গাড়ি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু কর্ণেল সাহেব বলছেন যে, আপনারা এখনো অবিলম্বে হামলা করলে আমরা অনেকগুলো গাড়িকে কেল্লায় প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারবো।'

মুহূর্তের জন্য ভাও মোহাচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

ইংরেজ অফিসার বললোঃ 'এখন আর ভাবনা চিন্তার সময় নেই। যে ফউজ আপনারা দুশমনের রসদ ও সেনা সাহায্যের পথে মোতায়েন করেছিলেন, তারা অন্তহীন অযোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু এখনো যদি আপনারা জলদী করেন, তা'হলে সে ত্রুটির অনেকটা প্রতিকার হতে পারে।'

ঃ 'যে ফউজ রসদের গাড়ি নিয়ে এসেছে, তাদের সংখ্যা কতো, তোমাদের জানা আছে?'

ঃ 'রাতের বেলায় কি করে তা' আন্দায করা যাবে? কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশী হতে পারে না। জলদী করুন।'

ঃ 'টিপুর মতো দুশমনের বেলায় আমি অতোটা তাড়াহুড়ার পক্ষপাতী নই তোমাদের সেনাদল এখানে নিয়ে এসো এবং কর্ণেল সাহেবকে বলো, ভোর হবার আগে কোনো ফয়সালা করা যাবে না।'

●

ভোর বেলা পরশুরাম ভাওয়ের খিমায় কিছুসংখ্যক ইংরেজ ও মারাঠা অফিসার এসে মিলিত হল। কর্ণেল ফ্রেডারিক অন্তহীন ক্রোধে পরশুরাম ভাওকে লক্ষ্য করে বললোঃ 'আপনাদের সিপাহীরা যুদ্ধকে মনে করে ছেলেখেলা। কোম্পানীর সিপাহীরা এ রকম দায়ত্বহীনতার পরিচয় দিলে আমরা তাদেরকে গুলী করে উড়িয়ে দিতাম। এ

কতো শরম ও আফসোসের ব্যাপার যে, দুশমনের রসদ ও বারুদের গাড়ি ধাড়ওয়ারের কাছে পৌঁছে গেলো আর পথে আপনাদের চৌকির রক্ষীরা থাকলো বেখবর।'

পরশুরাম বিরক্ত হয়ে বললোঃ 'দেখুন, কর্ণেল সাহেব, এখন কথা কাটাকাটিতে কোনো লাভ নেই। যা' হবার, হয়ে গেছে। কিন্তু আপনারা আমাদের চাইতে বেশী খবর রাখেন বলে যদি দাবি করেন, তা'হলে দুশমনের গাড়ি যে আপনাদের ঠিক সামনে দিয়ে কেল্লার ভিতরে চলে গেলো এবং তারপরও আপনারা তাদের সংখ্যা বলতে পারছেন না, তার কি জওয়াব আছে?'

ঃ 'আপনি জানেন, রাতের বেলায় দুশমনের আকস্মিক হামলা ছিলো এত তীব্র যে, আমাদেরকে বাধ্য হয়ে আশপাশের ঘাঁটি খালি করতে হয়েছিলো, কিন্তু আপনারা যদি আমাদেরকে সাহাযা করতে যেতেন, তা'হলে কেল্লার দিকে বেশীর ভাগ গাড়ির গতিরোধ করতে আমরা পারতাম।'

পরশুরাম খানিকটা নরম হয়ে বললো ঃ 'কর্ণেল সাহেব এখন পরস্পর ঝগড়া করে কোনো ফায়দা নেই। আমি আপনার সাথে ওয়াদা করছি, পথের চৌকির রক্ষীদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু এখন আমাদের সামনে রয়েছে কেল্লা জয়ের সমস্যা।'

কর্ণেল ফ্রেডারিক বললোঃ 'বর্তমান পরিস্থিতিতে কেল্লা জয়ের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমি আপনাকে পরামর্শ দিতে এসেছি যে, এখন আমাদের অবিলম্বে দক্ষিণদিকে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। দুশমনের কিছু সিপাহী এ কেল্লায় পুড়ে থাকলেও আমাদের তেমন কিছু এসে যাবে না। দক্ষিণদিকে আমরা দুশমনের শক্তি খর্ব করার পর বিনাবাধায় ফিরে এসে কেল্লা দখল করতে পারবো। কিন্তু আপনারা এখানে নিষ্ক্রিয় বসে থাকলে আমাদের যুদ্ধ পরিকল্পনা ধূলায় লুটাবে। আমাদের শক্তি বিভিন্ন ফ্রন্টে ভাগ হয়ে থাক এবং আমরা কোনো এক ময়দানে মিলিত হয়ে চূড়ান্ত হামলা করতে না পারি, দুশমনদের লক্ষ্য এ ছাড়া আর কিছুই নয়।

পরশুরাম ভাও বললোঃ 'আমাদের পক্ষে এ কেল্লা জয় না করে এগিয়ে যাবার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। ধাড়ওয়ারকে এই অবস্থায় রেখে এগিয়ে যাবার ফল এছাড়া আর কি হতে পারে যে, বদরুয্যামান পেছন থেকে আমাদের রসদ ও সেনা সাহায্যের পথ বিচ্ছিন্ন করার মওকা পাবে? জেনারেল মিডোজের সংকটের অনুভূতি আমার আছে, কিন্তু উপর পেশোয়া ও নানা ফার্ণাবিসের হুকুম, আমরা এগিয়ে যাবার আগে যেনো ভালো করে দেখে নেই, আমাদের পেছন দিক কতোটা নিরাপদ। আপনারা হিম্মৎ করলে আমরা কয়েক দিনের মধ্যেই কেল্লা জয় করতে পারি। তারপর আপনাদের নির্দেশ মেনে চলতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।

কর্ণেল ফ্রেডারিক বললোঃ 'এই যদি হয় আপনাদের ফয়সালা, তা'হলে আমি আপনাদের সাহায্য করতে তৈরী, কিন্তু এখন আপনাদের সিপাহীরা যে সতর্ক থাকবে এবং দুশমনের আর সেনা সাহায্য পাঠাবার মওকা মিলবে না, এ কথার

জামানত কোথায়?

ঃ 'এ সম্পর্কে আমি যিম্মা নিচ্ছি যে, দুশমনের একটি সিপাহীও এ এলাকায়' প্রবেশ করতে পারবে না।'

ঃ 'দুশমন কোন্ পথ ধরে এখানে এলো আর আপনাদের মুহাফিয চৌকির সিপাহীরাই বা কোথায় ছিলো, তা' আমার বুদ্ধির অগম্য। রসদের দু'চারটি গাড়ি হোলে আলাদা কথা ছিলো, কিন্তু যে গাড়িগুলো রাতের বেলায় কেল্লায় প্রবেশ করেছে, তার সংখ্যা শতাধিক এবং আমাদের তুলনায় কেল্লারক্ষীরা এতটা অবহিত ছিলো যে, রসদ ও সেনা সাহায্য পৌঁছবার নির্ভুল সময় পর্যন্ত তাঁদের জানা ছিলো।'

পশুরাম ভাও বললোঃ 'কর্ণেল সাহেব, এখন এ ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি নিষ্ফল। আমি কয়েকজন হুঁশিয়ার লোককে গাড়ির চিহ্ন দেখে আসার জন্য পাঠিয়েছি এবং তাদের অনুসন্ধানের পর যে চৌকির সিপাহীরা দোষী সাব্যস্ত হবে, তাদেরকে কঠিনতম শাস্তি দেওয়া হবে। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে বদরুযযামানের ফউজ বাইরে থেকে আনাজের একটি দানাও সংগ্রহ করতে পারবে না। এখন এ কেল্লা জয় করা আমাদের ইয্যতের প্রশ্ন। আমি ফয়সালা করেছি, আমরা আজই আমাদের শিবির কেল্লার কাছে নিয়ে যাবো, যাতে আপনারা বারবার না বলতে পারেন যে, আমরা যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহী নই।'



ধাড়ওয়ারে অবরোধের ছয় মাস অতীত হয়ে গেছে এবং কেল্লার মুহাফিয অসাধারণ দৃঢ়সংকল্প ও সহিষ্ণুতা সহকারে দুশমনের উপর্যপরি হামলার মোকাবিলা করে যাচ্ছেন। ইংরেজ ও মারাঠা বোম্বে ও পূণা থেকে অবাধে রসদ ও সেনা সাহায্য পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বদরুয্যামানের অদূর ভবিষ্যতে কোনো বাইরের সাহায্যের প্রত্যাশা নেই। কেল্লার ভিতরে রসদ ও বারুদের গুদাম ক্রমাগত খালি হয়ে যাচ্ছে। দুশমনের তীব্র অবরোধের ফলে বিপর্যস্ত শহরের কূপগুলো থেকে তাযা পানি সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং কেল্লার ভিতরকার জলাশয় ধীরে ধীরে খালি হয়ে আসছে। অবস্থা এমন হয়ে উঠেছে যে, কেল্লারক্ষীদের সারাদিনে এক মুটো সিদ্ধ চাউল বা একটি মাত্র শুকনো জোয়ারের রুটি আর এক পেয়ালা পানি দিয়েই দিন গুযরান করতে হচ্ছে এবং অত্যাধিক প্রয়োজন ছাড়া বারুদ ব্যবহারের এজাযত নেই তাদের। তথাপি তারা বেশ মযবুত হয়ে রয়েছে এবং কেল্লার বাইরে দুশমনের গোলাবর্ষণ ও ভিতরে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ব্যাধির শিকার হয়েও জানবায যোদ্ধারা তাদের উদ্যম হারায়নি। তারা যিন্দেগীর পাঠ নিয়েছে সুলতান ফতেহ আলী টিপুর কাছ থেকে। যাদের মুখে ছুটে বেড়াতো যিন্দেগীর শোণিতধারা তারা আজ কংকালসার। যে আনওয়ার আলীকে কয়েক হফতা আগে দেখেছে তারা এক বাহাদুর ও কর্তব্যনিষ্ঠ অফিসার হিসাবে, আজ তিনি হয়েছেন তাদের চোখের তারা। বদরুয্যান থেকে শুরু করে মামুলী সিপাহী পর্যন্ত সবাই ভালোবাসে তাঁকে। তিনি কখনো রোগীর

শুশ্রূষা করেন, কখনো আহতদের ঔষধপট্টি বেঁধে দেন আবার কখনো রাতের বেলায় কেল্লার বাইরে গিয়ে দুশমন শিবিরের উপর হামলাকারী জানবাযদের নেতৃত্ব করেন কখনো তিনি দাঁড়ান এ কেল্লার মসজিদের মিম্বরে আর তার জীবনসঞ্চার বক্তৃতা কেল্লার ভাঙা পাঁচিলের মধ্যে এনে দেয় উৎসাহ-উদ্দীপনার নতুন প্রাণ চাঞ্চল্য। ঢুন্ডিয়া দাগ সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী আনওয়ার আলী ও তাঁর সাথীদের কেল্লায় পৌঁছে দিয়ে অন্যান্য ফ্রন্টে দাক্ষিণাত্য ও পুণার সেনাবাহিনীর গতিবিধি জানবার জন্য ফিরে চলে গেছে।

ধাড়ওয়ারে পৌঁছে লা গ্রাঁদ কয়েক হফতা বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু ক্রমাগত ভুখ-পিয়াস ও অস্বাচ্ছন্দ্যের প্রভাব তাঁর স্বাস্থ্যের উপর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সারাদিনের পানির বরাদ্দ এক পেয়ালা থেকে আধা পেয়ালায় দাঁড়িয়েছে। এক দিন তিনি কয়েক লোকমা সিদ্ধ চাউল গিলবার পর বরাদ্দ পানিটুকু পান করলেন, কিন্তু তাতে তাঁর পিপাসা দূর হল না। শূন্য পেয়ালাটি নীচে রাখতে গিয়ে তাঁর মনে হল, বুঝি পানির কয়েকটি বিন্দু রয়েছে তখনো। তাই তিনি পেয়ালাটি তুলে আবার মুখে লাগালেন। আনওয়ার আলী কয়েক কদম দূরে বসেছিলেন। তিনি নিজের পেয়ালাটি তুলে নিয়ে এগিয়ে এসে হাসিমুখে লা গ্রাঁদের কাছে বসলেন। লা গ্রাঁদ যখন পানির শেষ বিন্দু গলায় ঢেলে পিয়ালাটি নীচে রাখছেন, অমনি তিনি নিজের পেয়ালা থেকে খানিকটা পানি তাতে ঢেলে দিলেন। লা গ্রাঁদ তাঁর দিকে তাকিয়ে পেরেশান হয়ে বললেনঃ 'দোস্ত, আমার ভাগের পানিটুকু আমি পান করেছি। আপনার ঠোঁট আমার চাইতেও শুকনো। আমায় লজ্জা দেবেন না।'

আনওয়ার আলী তাঁর নিজের পেয়ালাটি চোখের সামনে ধরে বললেনঃ 'আমার জন্য এই দুই ঢোকই যথেষ্ট, আর তোমারই এখন পানির প্রয়োজন বেশী।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'আজ আমার তবিয়ত ভালো নয়। হয়তো জ্বর আসছে।'

ঃ 'তুমি পানিটুকু পান করে শুয়ে পড়ো। আমি এক্ষুণি চিকিৎসক ডাকাচ্ছি।'

লা গ্রাঁদ কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আনওয়ার আলীর দিকে তাকিয়ে পেয়ালাটি মুখে তুলে নিলেন।



অন্যান্য ফ্রন্টে মিলিত সেনাবাহিনীর অন্তহীন সামরিক প্রস্তুতি সত্ত্বেও কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ হল না। দক্ষিণে মীর নিযাম আলীর লশকরের অগ্রগতির ফলে সুলতান টিপুকে বাংগালোরের অবরোধ তুলে নিতে হল। তিনি সেরিংগাপটমে দুশমনের হামলার আশংকা বিবেচনা করে পথের চৌকি ও কেল্লাসমূহ মযবুত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস মহীশূরের সরযমিনে প্রতি পদক্ষেপে বাধার আশংকা করছিলেন এবং মারাঠা লশকর সাথে না নিয়ে এগিয়ে যাওয়া তিনি বিপজ্জনক মনে করেছিলেন, কিন্তু পরশুরাম ভাওয়ের লশকর ধাড়ওয়ারে আটক হয়ে পড়েছিলো। মারাঠাদের অপর যে লশকর হরিপন্থের নেতৃত্বে কারনুলীর দিকে

এগিয়ে গিয়েছিলো, তাদেরকে পদে পদে তীব্র বাধার মোকাবিলা করতে হল। তাদের সম্পর্কে একদিন খবর আসে যে, তারা অমুক চৌকি, অমুক শহর বা অমুক কেল্লা দখল করে নিয়েছে; পরদিনই খবর শোনা যায় যে, মহীশূরের ফউজ অমুক জায়গায় তাদেরকে পরাজিত করে কয়েক ক্রোশ পিছু হটিয়ে নিয়ে গেছে।

এহেন পরিস্থিতি লর্ড কর্ণওয়ালিসের কাছে ছিলো অপ্রত্যাশিত। তথাপি তিনি ততোটা পেরেশোন হলেন না। মীর নিযাম আলী ও মারাঠা শক্তি তাঁকে ময়দানে নিঃসংগ ফেলে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াবে, তাঁর মন থেকে সে আশংকা দূর হয়ে গিয়েছিলো। দাক্ষিণাত্যের লশকর তাঁর সাথে শামিল হয়েছিলো এবং মারাঠা সম্পর্কেও তাঁর বিশ্বাস ছিলো যে, ধাড়ওয়ার থেকে অবকাশ পেলেই পরশুরাম ভাওয়ের লশকর এসে হরিপন্থের লশকরের সাথে মিলিত হবে। তারপর তাদের পংগপালের মতো অগুণতি লশকর সেরিংগাপটমের উপর হামলা করবে।

চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য সুলতান টিপুর প্রস্তুতি সম্পর্কে লর্ড কর্ণওয়ালিস অবহিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর এ অনুভূতও ছিলো যে, তখনকার অবস্থায় যুদ্ধ বিলম্বিত করায় তাঁর যেমন ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, সুলতান টিপুর জন্যও তা' ততোধিক অনিষ্টকর হতে পারে। মহীশূরের তুলনায় তিনি সংগতভাবেই তাঁর ও তাঁর মিত্রদের সামরিক শক্তি নিয়ে গর্ব করতে পারতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নৌবহর তখন বোম্বে ও কলকাতা থেক পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের বন্দরসমূহে তাযাদম সেনাবাহিনী ও সামরিক সরঞ্জাম পৌঁছে দিতে ব্যস্ত এবং তাদের মিত্রশক্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য পুণা ও হায়দরাবাদ থেকে তোপের খোরাক সংগ্রহ করে দিতে পারবে।

এসব সত্ত্বেও আসন্ন যুদ্ধের দিনের কথা যখন তিনি চিন্তা করেন, তখন বারংবার এই ধরনের চিন্তা তাঁকে বিব্রত করে তোলেঃ 'টিপু এখন কি ভাবছেন? কোথায় তিনি হামলা করবেন? আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর না জানার মতো নির্বোধ তিনি নন। তা'হলে কি আশায় তিনি লড়াই করছেন? কেন এখনো তাঁর উদ্যম ভেঙে পড়ছে না?'

তারপর যখন সহসা কোনো দিন তাঁর কাছে খবর আসে যে, মহীশূরের ঝটিকা বাহিনী কোথাও হামলা করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, নিযাম বা মারাঠার এত সিপাহীকে হত্যা করেছে এবং রসদ ও বারুদের এতগুলো গাড়ি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তখন তিনি অনুভব করতে থাকেন যে, প্রবল হাওয়ার এ বিক্ষিপ্ত প্রবাহ কোনো ভয়াবহ ঝড়ের পূর্বাভাস।



লা গ্রাঁদ কয়েক দিন ধ'রে রোগী ও যখমীদের সাথে কেল্লার এক প্রশস্ত কামরায় প'ড়ে রয়েছেন। একদিন দুপুর বেলা আনওয়ার আলী কামরায় প্রবেশ ক'রে ত'ার নাড়ির উপর হাত রেখে বললেনঃ 'আজ তোমার অবস্থা অনেকটা ভালো মনে হচ্ছে।'

ঃ হ্যাঁ, আমার জ্বর কমছে মনে হয়, কিন্তু ব্যাপার কি, আজ কয়েক ঘন্টা ধ'রে দুশমনের তোপের আওয়ায শোনা যাচ্ছে না। তবে কি কালকের হামলায় প্রচুর

ক্ষতি স্বীকার করে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? আমি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু কেউ সন্তোষজনক জওয়াব দিতে পারেনি।'

আনওয়ার আলী নিজের কপালে হাত বুলিয়ে ক্লান্ত কণ্ঠে বললেনঃ 'না, ব্যাপার তা' নয়। দুশমন আমাদের অবস্থা ভালো করেই জানে এবং তাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, বেশী ক্ষতি স্বীকার না করেই তারা আমাদেরকে হাতিয়ার সমর্পণ করতে বাধ্য করতে পারবে। আজ ভোরে তারা আমাদের সিপাহ্সালারের কাছে দূত পাঠিয়েছিলো এবং বদ্রুয্যামান খান কতকগুলো শর্তে কেল্লা খালি ক'রে দিতে রাযী হয়েছেন। আরো আলোচনার জন্য তিনি চারজন অফিসারকে পরশুরাম ভাওয়ের দূতদের সাথে রওয়ানা করে দিয়েছেন। এই কারণেই ভোর থেকে দুশমনের তোপ স্তব্ধ হ'য়ে আছে।'

লা গ্রাঁদ বিষন্ন কণ্ঠে বললেনঃ 'আমার ধারণা ছিলো যে, কেল্লার সিপাহ্সালার আপনার পরামর্শ মতো কাজ করবেন।'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'আমার কোনো অভিযোগ নেই তাঁর বিরুদ্ধে। এর আগে দুশমন দু'বার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করেছে এবং বদরুয্যামান খান শুধু আমারই বিরোধিতার জন্য কেল্লা খালি করা সম্পর্কে তাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন, কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমন যে, আমি এখন তাঁর ফয়সালার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারছি না।'

এক সিপাহী কামরায় প্রবেশ ক'রে আনওয়ার আলীকে বললোঃ 'কেল্লাদার সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

ঃ' আমাদের প্রতিনিধিরা ফি'রে এসেছেন, মনে হচ্ছে।' বলে আনওয়ার আলী উঠে দ্রুত বাইরে চলে গেলেন। দু'মিনিট পর তিনি প্রবেশ করলেন বদ্রুয্যামানের কামরায়। কামরায় কয়েকজন অফিসার কুরসির উপর উপবিষ্ট। বদ্রুয্যামানের সামনে ছোট মেযের উপর একটা কাগজ পড়ে রয়েছে। তাঁর ইশারায় আনওয়ার আলী সামনের এক কুরসিতে বসলেন।

বদ্রুয্যামান মেয থেকে কাগজ তু'লে তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেনঃ 'নিন, এটা প'ড়ে দেখুন। আপনার আশংকা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পরশুরাম ভাও আমার সকল শর্তই মেনে নিয়েছে। কেল্লা ছেড়ে যাবার সময়ে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সকল সরকারী অর্থ নিয়ে যাবার এজাযত থাকবে। আমাদের যখমী ও রোগীদের জন্য বলদের গাড়ির সংস্থান ক'রে দেওয়া হবে। যতোক্ষণ আমরা নদীর ওপারে না পৌছবো, পরশুরাম ভাওয়ের বিশেষ সেনাদল ততোক্ষণ আমাদের হেফাজত করবে। দুশমনদের দাবি, সাতটি তোপের বেশী আমরা কেল্লার বাইরে নিতে পারবো না, কিন্তু আমাদের জন্য এ সওদা খুব অবাঞ্ছিত নয়। আমাদের বেশীর ভাগ তোপই বেকার হ'য়ে গেছে।

আনওয়ার আলী চুক্তির প্রস্তাব প'ড়ে বললেনঃ 'বর্তমান অবস্থায় আপনি এর চাইতে ভালো কোনো শর্ত মানাতে পারতেন না। কিন্তু এর কি জামানত আছে যে,

ইংরেজ ও মারাঠা এসব শর্ত পূর্ণ করবে এবং যে সেনাদল আমাদের হেফাযতের জন্য মোতায়েন করা হবে, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে না যে, তারা কেল্লার বাইরে মওকা পেয়েই আমাদের উপর হামলা করবে।'

বদ্‌রুয্‌যামান বললেনঃ 'তাঁর কোনো জামানত নেই, কিন্তু বর্তমান অবস্থায়-দুশমনের শরাফত ও নেক নিয়তের উপর বিশ্বাস করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। আপনি জানেন, নিজের জান বাঁচানোর জন্য আমি এ চুক্তি করিনি। আমার সামনে রয়েছে এইসব মানুষের সমস্যা, এই কেল্লার মধ্যে যাদের চোখের সামনে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই আসছে না। আমাদের রসদ শেষ হয়ে গেছে। যে জলাশয়ে গত বর্ষার সময়ে আমরা কিছু পানি জমা করেছিলাম, তা' শুকিয়ে আসছে। আমার দশ হাজার সৈন্য এখন তিন হাজারে এসে ঠেকেছে এবং যে রসদ ও পানি এখন আমাদের কাছে রয়েছে, তা'এ লোকগুলোকে পাঁচ-ছয়দিনের বেশী সময় যিন্দা রাখতে পারবে না। কেল্লার বাইরে বেরিয়ে এলে যদি দুশমন চুক্তি ভংগ করে, তা'হলে কিছু লোকের বাঁচার সম্ভাবনা থাকবে, কিন্তু কয়েকদিন পর কেল্লার ভিতরে লাশ ছাড়া কিছু থাকবে না। আমার বিশ্বাস, সুলতানে মোযায্‌যম আমায় এ কথা বলবেন না যে, আমি তাঁর হুকুম অমান্য করেছি এবং আপনারা বলবেন না যে, আমি তাঁর হুকুম অমান্য করেছি এবং আপনারা আমায় আত্মসম্ভ্রমবোধহীন কাপুরুষ ব'লে নিন্দা করবেন না। দুশমনকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমরা পাঁচ দিনের মধ্যে কেল্লা খালি করে দেবো। এই চুক্তি অনুসারে আমরা বাইরে থেকে প্রয়োজনমতো পানি সংগ্রহ করতে পারবো এবং আমাদের দুশমন শিবির থেকে আনাজ খরিদ করবার এজাযতও থাকবে। আপনি আরো কিছু বলতে চান?'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'না, আমার আর কিছু বলার হিম্মত নেই। আমি ধু আবেদন করবো যে, কেল্লার বাইরে যাবার পর আপনি মারাঠাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন।'

বদ্‌রুয্‌যামান জওয়াব দিলেনঃ 'কেল্লার বাইরে বেরুবার পর যদি কোনো বিপদ ঘটে, তা'হলে কোনো সিপাহী বা অফিসারের এ আশা পোষণ করা ঠিক হবে না যে, আমি তাদের কোনো সাহায্য করতে পারবো। আমাদের কর্তব্য হবে নিজ নিজ জান বাঁচানোর চেষ্টা করা। আমি দুশমনের কাছ থেকে পাঁচ দিনের সময় চেয়েছি, এই জন্য যে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আমার সাথীরা ক্লান্ত ও অশক্ত হ'য়ে পড়েছে এবং আমার ইচ্ছা, কেল্লা খালি করার আগে যেনো তারা চলাফেরা করতে সমর্থ হয়।'

আনওয়ার আলী পুনরায় কাগজের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেনঃ কিন্তু এ চুক্তি অনুসারে আপনাকে কালই কেল্লার বাইরে চ'লে যেতে হবে।'

ঃ 'হ্যাঁ, ভাও দাবি করেছে, যেনো আমি নেক নিয়তের প্রমাণ দেবার জন্য কালই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করি। আমি মাত্র কয়েকজন লোক সাথে নিয়ে যাবো। আমার অনুপস্থিতিতে ফউজের নেতৃত্ব ভার থাকবে আপনার উপর। দুশমন আমার সাথে চুক্তিভংগ না করলে আপনি খবর পাবেন। আমার তরফ থেকে কোনো

খবর না আসার অর্থ হবে, আমি দুশমনের হাতে বন্দী অথবা কতল হ'য়ে গেছি। তারপর আপনারা কোন পথ ধরবেন, সে চিন্তা আপনাকেই করতে হবে।'

পরদিন মারাঠা ফউজের কয়েকজন অফিসার কেল্লার বাইরে দাঁড়িয়ে। বদ্‌রুয্‌যামান পঞ্চাশজন লোকসহ কেল্লার বাইরে এলেন। এক অফিসার এগিয়ে এসে তাঁকে সালাম করে বললোঃ 'মহারাজ ভাও সাহেব আপনার জন্যে পাল্‌কী পাঠিয়েছেন।'

বদ্‌রুয্‌যামান পায়দল যেতে চাইলেন, কিন্তু মারাঠা অফিসারের অনুরোধে তিনি পাল্‌কীতে চাপলেন। কাহাররা পাল্‌কী তুললো এবং কাফেলা মারাঠা শিবিরের দিকে রওয়ানা হয়ে চললো। মারাঠা শিবিরে প্রবেশ করা মাত্রই অসংখ্য লোক পরম উৎসাহে চীৎকার করে গাল দিতে দিতে তাদের পাশে এসে জমা হল। মাটির ঢেলা তুলে তারা নিক্ষেপ করতে লাগলো বদ্‌রুয্‌যামানের পালকীর উপর। এই দুঃসহ পরিবেশে মহীশূরের সিপাহীদের ধৈর্য ও প্রশান্তি ছিলো দেখার জিনিস। কতক মারাঠা নেচে কুদে এগিয়ে এসে তাদের সামনে তলোয়ার ঘুরালো। কেউ খঞ্জর রাখলো তাদের গর্দানের উপর। কেউ কেউ বন্দুকের নল আনলো তাদের বুকের কাছে। আচানক একদিক থেকে কয়েকটি বন্দুকের আওয়ায এলো এবং লোকের ভিড় এদিকে ওদিক সরে গেলো। পরশুরাম ভাও ফউজের কতিপয় সরকার ও রক্ষীবাহিনী সাথে নিয়ে এসে হাযির হলেন। কাহাররা বদ্‌রুয্‌যামানের পালকী নীচে রেখে দিলো। পরশুরাম এগিয়ে এসে বললোঃ 'আমি বড়োই দুঃখিত। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, যারা আপনাদের সাথে অসদাচরণ করেছে, তাদেরকে কঠিনতম শাস্তি দেওয়া হবে।'

বদ্‌রুয্‌যামান খান তাঁর পোশাকের ধূলো ঝেড়ে পালকী থেকে নেমে বললেনঃ 'এদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমার প্রতি এদের বিদ্বেষ প্রমাণ দিচ্ছে যে, আমি সুলতানের এক বিশ্বস্ত সিপাহী।'

ঃ ' কিন্তু এক বাহাদুর ও শরীফ দুশমনের সাথে এ ধরনের আচরণ নীচতার প্রমাণ। আপনার খিমা আমি আমার কাছেই পাতিয়ে দিয়েছি। এখন আপনার হেফাযত আমারই যিম্মায় থাকবে।'

ঃ 'শোকরিয়া। কিন্তু আমায় আপনার কাছে রাখলে আপনার সিপাহীদের উপর নানারকম বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হবে। তাই আমার ইচ্ছা আমায় আপনার শিবির থেকে কিছুটা দূরে অবস্থানের এজাযত দিন। আমার সাথীরা চুক্তির শর্তের খেলাফ কিছু করবে না, তার যামানতের জন্যই আমি আপনার কাছে এসেছি। তথাপি যদি আমার উপর আপনার বিশ্বাস না থাকে, তা'হলে আমার সাথে কয়েকজন সিপাহী পাঠিয়ে দেবেন।

ঃ'এ প্রস্তাবে আমি রাযী।'

বদ্‌রুয্‌যামান বললেনঃ 'কেল্লার ভিতরে আমার সাথীরা ভুখ-পিয়াসে মারা যাচ্ছে। আপনি ওয়াদা করেছেন যে, আমি এখানে পৌছলেই তাদের জন্য রসদ ও পানির ব্যবস্থা করে দেবেন।

পরশুরাম ভাও জওয়াব দিলোঃ 'আমার ওয়াদা আমি পালন করবো।

কিছুক্ষণ পর বদ্‌রুয্‌যামান ও তাঁর সাথীরা মারাঠা শিবির থেকে দু'মাইল দূরে শামুগার দিকে সড়কের কিনারে ডেরা ফেললেন।

ষোল

পঞ্চম দিন বিকাল বেলা আনওয়ার আলী ও তাঁর অবশিষ্ট সাথীরা ধাড়ওয়ারের কেল্লা খালি ক'রে চ'লে যাচ্ছেন। সাতটি তোপ ও অর্থ তহবিল দু'দিন আগেই ববদ্‌রুয্‌যামানের তাঁবুতে পাঠানো হয়েছে। রোগী ও যখমীদের খাটের উপর তুলে কেল্লার বাইরে আনা হয়েছে। লা গ্রাঁদ অসুস্থতাহেতু খুব কমজোর হ'য়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তিনি খাটের উপর না শুয়ে হেঁটে যেতে চাইলেন।

কাফেলা যখন কেল্লা থেকে বেরিয়ে তাদের তাঁবুর দিকে রওয়ানা হচ্ছে, তখন ইংরেজ ও মারাঠা সিপাহীদের কয়েকটি দল কেল্লার দরযায় দাঁড়িয়ে । সওয়ারদের একটি দল কাফেলার সাথে সাথে চললো এবং অবশিষ্ট দলগুলো আনন্দে হর্ষধ্বনি করে কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করলো। কিছুদূর চলার পর আনওয়ার আলী পিছনে তাকিয়ে দেখলেন, কেল্লায় যেখানে খানিকক্ষণ আগে উড়ছিলো মহীশূরের ঝান্ডা, সেখানে ইংরেজ ও মারাঠার ঝান্ডা তোলা হচ্ছে। তাঁর দৃষ্টির সামনে নেমে এলো অশ্রুর পরদা এবং তিনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর তিনি সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ 'বন্ধুরা, গর্দান উঁচু করে চলো। খোদার মরযী হলে আমরা আবার ফিরে আসবো খুব শীগ্‌গির।'

রাতের বেলায় কয়েকজন ফউজী অফিসার বদ্‌রুয্‌যামান খানের খিমায় বসে তাঁকে বললেনঃ 'যুদ্ধের দিনে মারাঠারা এবারই প্রথম মনুষ্যত্বের পরিচয় দিলো।'

একজন অফিসার তাঁদের কথায় সম্মতি জানিয়ে বললেনঃ 'পরশুরাম ভাও এক শরীফ দুশমন এবং তার তরফ থেকে আমি কোনো অসদাচরণের ভয় করিনি' একে একে সব অফিসারই পরশুরামের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁদের নিজ নিজ মত প্রকাশ করলেন। আনওয়ার আলী কিছুক্ষণ খামোশ ব'সে থাকলেন। অবশেষে তিনি বললেনঃ 'ভাওয়ের আচরণ সত্যিই অপ্রত্যাশিত। কিন্তু যতোক্ষণ না আমরা কোনো নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যাচ্ছি, ততোক্ষণ তার মনুষ্যত্ব বা শরাফতের উপর আমার বিশ্বাস নেই। আমাদের সম্পর্ক মারাঠাদের ধারণা বদল করতে দেরী লাগবে না। তাই আমি আর একবার আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, অবিলম্বে আমাদের এখান থেকে চ'লে যাওয়া প্রয়োজন।'

বদ্‌রুয্‌যামান খান বললেনঃ 'ভাও আমায় আশ্বাস দিয়েছে যে, জরুরী বন্দোবস্ত হ'য়ে যাবার পরই তিন-চার দিনের মধ্যে আমাদেরকে এখান থেকে রওয়ানা হবার এজাযত দেওয়া হবে।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'গোস্‌তাখী না হলে আমি প্রশ্ন করতে চাই, সে বন্দোবস্ত কি?'

ঃ 'গাড়ি টানার জন্য বলদ যোগাড় না হলে আমরা আমাদের জিনিসপত্র এবং আমাদের যখ্‌মী ও রোগীদের নিয়ে যেতে পারছি না। ভাও ওয়াদা করেছে যে, এখান থেকে আমাদেরকে বলদ ছাড়া ঘোড়া খরিদ করারও এজাযত দেওয়া হবে। যাতে কালই এসব বন্দোবস্ত হ'য়ে যায় এবং অবিলম্বে আমরা এখান থেকে রওয়ানা হতে পারি, তার চেষ্টা আমি করবো। কিন্তু ভাও যদি দু'একদিন আমাদেরকে এখানে রাখবার চেষ্টা করে, তা'তে কি এমন হবে? ভাওয়ের মনে ভয় ছিলো যে, পথে মারাঠা চৌকির সিপাহীরা আমাদেরকে পেরেশান করতে পারে। তাই ধাড়ওয়ার এলাকা অতিক্রম ক'রে আসার সময়ে তার সিপাহীদের আমাদের সাথে পাঠাবার ফয়সালা করেছে।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'আমায় ভয় হয়, ভাওয়ের সিপাহীরাই মারাঠা চৌকির সিপাহীদের চাইতে আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হবে।'

বদ্‌রুয্‌যামান খান জওয়াব দিলেন ঃ ' আপনার ভয় অমূলক, এমন কথা আমি বলবো না। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে কি-ই বা করতে পারি আমরা?'

এক অফিসার ব'লে উঠলেন ঃ 'হায় ! এ অবস্থা সম্পর্কে যদি আমরা নদীর আশপাশে আমাদের চৌকিগুলোকে অবহিত করতে পারতাম! আজ ঢুন্ডিয়া দাগের প্রয়োজন ছিলো সব চাইতে বেশী।'

বদ্‌রুয্‌যামান বললেনঃ 'বর্তমান পরিস্থিতিতে মারাঠার এজাযত ছাড়া আমাদের কোনো লোককে বাইরে পাঠানো সম্ভব নয়। সব পথই তারা পুরোপুরি বন্ধ করে রেখেছে এবং আমাদের দূত এখান থেকে বেরিয়ে গেরেফ্‌তার হয়ে যাবে, এরূপ বিপদের মধ্যে আমরা যেতে পারি না। এরূপ পরিস্থিতিতে মারাঠারা আমাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবার একটা মওকা পেয়ে যাবে।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'নদী পর্যন্ত পৌঁছে গেলে আগে আমাদের কোনো বিপদ নেই। আমাদের চৌকিগুলো এ অবস্থা সম্পর্কে বেখবর নয়। আমি তাদেরকে খবর দিয়েছি।'

ঃ 'কবে?'ঃ বদ্‌রুয্‌যামান হয়রান হ'য়ে প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'আপনার কেল্লা খালি করার আগের রাতে আমি এক দূত পাঠিয়েছিলাম।'

ঃ 'খোদার শোকর যে, তোমার দূত ধরা পড়েনি।'

ঃ 'সে ঢুন্ডিয়া দাগের অত্যধিক নির্ভরযোগ্য সাথীদের একজন। ধরা পড়লেও মারাঠারা সন্দেহ করবে যে, সে আমাদেরই মরযীমতো পালিয়ে গেছে, তার পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা আমি আগেই করে দিয়েছি। তাকে টাকা-পয়সার একটা ভরা থলে বের ক'রে দিয়েছি যাতে সে নিজেকে এক পাকা চোর ব'লে প্রমাণিত করতে পারে।'

ঃ 'আর-আপনি বিশ্বাস করেন যে, সে ধরা পড়েনি?'

ঃ 'হ্যাঁ, সে ধরা পড়লেও কোনো বিপদের কারণ হত না আমাদের। আমার বিশ্বাস, মারাঠা পাহারাদার তাকে ধ'রে নিয়ে এসে পরশুরামের কাছ থেকে সাবাস পাওয়ার চাইতে চুরির মালের ভাগী হওয়াটাই বেশী লাভজনক মনে করতো।'

এক অফিসার বললেনঃ 'কিন্তু তাতে কি ফায়দা হবে? যতোক্ষণ না আমরা এ এলাকা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, ততোক্ষণে আমাদের চৌকিগুলো কি সাহায্য করতে পারে আমাদের?'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'এ কথা আমি বলিনি যে, আমাদের চৌকির সিপাহীরা এ এলাকায় এসে আমাদের সাহায্য করতে পারবে। আমি শুধু চিন্তা করেছি যে, রাস্তায় যদি মারাঠাদের নিয়ত খারাপ হয়, তা'হলে হয়তো লড়াই করতে করতে কিছু লোক দরিয়ার দিকে বেরিয়ে যাবে এবং সেখানে যথাসময়ে আমাদের সিপাহীদের হস্তক্ষেপের ফলে তাদের জান বেঁচে যেতে পারে। ভাওয়ের সিপাহীরা যদি আমাদেরকে কোনো বিশেষ রাস্তায় নিয়ে যাবার চেষ্টা না করে, তা'হলে আমাদের জন্য বন ও পাহাড়ের পথ ধরাই হবে ভালো।'

পরশুরাম তিনদিন টালবাহানা করার পর বদ্‌রুয্‌যামানকে এজাযত দিলো রওয়ানা হ'য়ে যেতে এবং কাফেলাটি রওয়ানা হল মারাঠা সিপাহীদের হেফাযতে। কাফেলার সাথে ত্রিশটি বলদের গাড়ি। তার মধ্যে কয়েকটিতে তোপ ও অন্যান্য জিনিসপত্র বোঝাই, অবশিষ্টগুলোতে যখমী ও রোগী। বদ্‌রুয্‌যামান ছাড়া আরো পাঁচজন বড়ো অফিসার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলেছেন। লা গ্রাঁদের অবস্থা কিছুটা ভালো, কিন্তু দু'তিন মাইল চলার পর তাঁর পা কাঁপছে। আনওয়ার আলী তাঁর কাছে গিয়ে ঘোড়া থামালেন এবং নামতে নামতে বলেনঃ 'যদি তুমি রোগী ও যখমীদের সাথে বলদের গাড়িতে যেতে না চাও, তা'হলে আমার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাও।'

লা গ্রাঁদ খানিকটা ইতস্তত করে আনওয়ার আলীর অনুরোধে ঘোড়ার উপর সওয়ার হলেন। কিছুদূর চলার পর বদ্‌রুয্‌যামান আনওয়ার আলীর অনুকরনে নিজের ঘোড়াটি এক দুর্বল সাথীর জন্য ছেড়ে দিলেন। তাঁদের দেখাদেখি অপর অফিসাররাও ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াগুলো অশক্ত সাথীদের জন্য ছেড়ে দিয়ে কাফেলার সাথে পায়দল চলতে লাগলেন।

দুপুরের কাছাকাছি সময়ে প্রায় পঞ্চাশজন দ্রুতগামী সওয়ার মারাঠা শিবিরের দিক থেকে এসে হাযির হল। রক্ষী বাহিনীর অফিসার কাফেলাকে দাঁড়াবার হুকুম দিয়ে তাদের সাথে কথা বলতে লাগলো।

এই পঞ্চাশজন সওয়ারের মধ্যে একজন ছিলো মারাঠা ফউজের প্রভাবশালী সরদার। সে কাফেলার কাছে এসে সাথীদের দাঁড়াবার হুকুম দিলো। তারপর এগিয়ে

এসে রক্ষীদলের অফিসারের সাথে কিছুটা আলাপ করে অবশেষে বদ্‌রুয্‌যামানকে বললোঃ 'আপনাদেরকে কিছুক্ষণ দেরী করতে হবে এখানে।'

বদ্‌রুয্‌যামান প্রশ্ন করলেনঃ 'এটা আপনার ইচ্ছা, না ভাও সাহেবের হুকুম?'

ঃ 'কিছুটা আন্দায ক'রে নিন।'

ঃ 'আপনি কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া আমাদেরকে বাধা দিতে পারেন না। এতে চুক্তি ভংগ করা হবে।'

ঃ 'চুক্তিভংগ আপনাদের তরফ থেকেই হয়েছে। জানা গেছে, আপনারা কেল্লা খালি করার সময়ে প্রচুর বারুদ নষ্ট করে দিয়েছেন।'

ঃ 'এ কথা ভুল। আমাদের কাছে বারুদ থাকলে আমরা কেল্লা খালি করতাম না।'

ঃ 'আপনারা শুধু বারুদই নষ্ট করেন নি, ফাল্‌তু বন্দুকগুলোও গোপন করেছেন কোথাও।'

আনওয়ার আলী সামনে এসে জওয়াব দিলেনঃ 'এ কথা বিল্‌কুল মিথ্যা। সকল ফালতু বন্দুক গুণে আমি আপনাদের অফিসারদের কাছে দিয়েছি। দেখাই যাচ্ছে, আমাদের কোনো সিপাহীর কাছে একটির বেশী বন্দুক বা তলোয়ার নেই।'

সরদার বললোঃ 'ভাও সাহেবের হুকুম, আপনাদের বন্দুক-তলোয়ার আমাদের হাতে দেবেন এবং এখানে থেকে ভাও সাহেরে হুকুমের ইন্তেযার করবেন। তিনি যখন আশ্বস্ত হবেন যে, আপনারা চুক্তি ভংগ করেন নি, তখন আপনাদেরকে চলে যাবার এজাযত দেওয়া হবে।'

বদ্‌রুয্‌যামান বললেনঃ 'আমরা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বেঅকুফ হ'য়ে গেছি, ভাও সাহেবের এ ধারণা ভুল। যদি তোমাদের নিয়ত বদলে গিয়ে থাকে, তা'হলে আমি তোমাদেরকে নিশ্চিত বলে দিচ্ছি যে, তোমরা লাশের স্তূপের ভিতর দিয়ে বন্দুক খুঁজে নিতে পারবে। আমার সাথীরা তোমাদের লোকদের ঘেরের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু মরবার আগে তারা শেষবারের মতো তাদের তলোয়ার ও বন্দুক ব্যবহারের মওকা হারাতে চাইবে না।'

মারাঠা সরদার খানিকটা নরম হয়ে বললোঃ 'ভাও সাহেব আপনাদের সাথে লড়াই করার এজাযত দেন নি আমাদেরকে।'

বদ্‌রুয্‌যামান জওয়াব দিলেনঃ 'আমি ভাও সাহেবকে অকারণে নারায করতে চাচ্ছি না। কিন্তু আমাদের সফল অব্যাহত রাখতেই হবে।'

ঃ 'ভাও সাহেবের নিয়ত সম্পর্কে সন্দেহ করা উচিত হবে না আপনাদের। তিনি শুধু নিশ্চিত জানতে চান যে, আপনারা কেল্লা খালি করার ব্যাপারে চুক্তির শর্ত ভংগ করেন নি।'

ঃ 'জওয়াব আমি দিয়েছি। আমরা কোনো শর্ত ভংগ করিনি। কিন্তু এ জওয়াব যদি আপনাদের কাছে সন্তোষজনক মনে না হয়, তা'হলে আমি আপনাদের সাথে ভাও সাহেবের কাছে যেতে তৈরী।'

ঃ 'আপনি নেক নিয়তের এর চাইতে বড়ো কোনো প্রমাণ দিতে পারেন না। আমার বিশ্বাস, আপনার সাথে আলাপ ক'রে ভাও সাহেব আশ্বস্ত হবেন।'

আনওয়ার আলী উদ্বিগ্ন হয়ে বললেনঃ 'আপনার এ ফয়সালা ঠিক হয়নি।'

কিন্তু বদ্‌রুয্‌যামান তাঁর দিকে মনোযোগ না দিয়ে মারাঠা সরদারকে বললেনঃ 'আমি আপনার সাথে যেতে তৈরী। কিন্তু আপনি আপনাদের সিপাহীদের সাথে কথা ঠিক ক'রে নিন যে, তারা আমার ফি'রে আসা পর্যন্ত কাফেলার গতিরোধ করার চেষ্টা করবে না। ভাও সাহেবের সাথে মোলাকাতের পর আমি অবিলম্বে ফিরে আসতে চাচ্ছি। আমার বিশজন সিপাহী সাথে যাবে এবং আমাদের সবাইর জন্য আপনাদেরকে ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

মারাঠা সরদার বললোঃ 'ছয়টি ঘোড়া আপনাদের সাথে রয়েছে। আরো পাঁচ-ছয়টি ঘোড়ার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। তার চাইতে বেশী লোক আপনার সাথে যাবার প্রয়োজন নেই।'

বদ্‌রুয্‌যামান বললেনঃ 'বেশী লোক সাথে নেবার ইচ্ছা নেই আমার, কিন্তু আমার রক্ষীদল কোনো অবস্থায়ই আমার সংগ ছাড়তে রাযী নয়। যাই হোক, আপনাদের আপত্তি থাকলে আমি তাদের সংখ্যা কম করতেও তৈরী।'

ঃ 'আমার কোনো আপত্তি নেই।'

ঃ 'তা'হলে আপনি ঘোড়ার ব্যবস্থা করুন। আমি ততোক্ষণে আমার সাথীদের যরুরী নির্দেশ দিচ্ছি। কিন্তু খেয়াল রাখবেন, যারা পায়ে হেঁটে চলতে অক্ষম, আমাদের ঘোড়াগুলো তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা। আপনারা তৈরী হন, আমি ঘোড়ার ইন্তেযাম করছি।' সরদার ঘোড়ার বাগ ঘুরিয়ে মারাঠা অফিসার ও সিপাহীদের কাছে গিয়ে আলাপে ব্যস্ত হল।

আনওয়ার আলী বদ্‌রুয্‌যামানের বাহু ধরে ফিস্ ফিস্ করে বললেনঃ 'আপনি ভুল করবেন না।'

বদ্‌রুয্‌যামান জওয়াব দিলেনঃ 'এ ঘটনার পর তোমার উপদেশের প্রয়োজন নেই আমার। আমি জানি, ভাও আমার সাথে ভালো ব্যবহার করবে না। কিন্তু আমি তোমাদেরকে মওকা দিতে চাচ্ছি। আমি দেখছি, ওরা হামলা করার জন্য তৈরী। আমি ভাওয়ের কাছে এই কারণে যাচ্ছি যে, তোমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত সফরের সুযোগ পাবে এবং রাতের অন্ধকারের ফায়দা নিতে পারবে। আমার যাওয়ার পর মারাঠা সিপাহীরা এতটুকু আশ্বস্ত হবে যে, তোমরা সন্ধ্যাবেলায় কোথাও থেমে

আমার ইন্তেযার করবে। কিন্তু সফর অব্যাহত রাখার চেষ্টা করো, কেননা তোমরা মারাঠা শিবির থেকে যতো দূরে যাবে, ততোই নিরাপদ হতে পারবে।'

কাছেই মারাঠা সরদার রক্ষীদলের অফিসারদের লক্ষ্য করে বলতে লাগলোঃ 'যদি তোমাদের তরফ থেকে কোনো ভুল ক্রুটি হয়, তা'হলে ভাও সাহেব কঠিন শাস্তি দেবেন। পথে এদের যেনো কোনো তকলীফ না হয়। এদেরকে আমরা বন্ধুর মতো বিদায় করবো।'

মারাঠা অফিসার বললোঃ 'আমরা এখানে তাঁবু ফেলে খান সাহেবের ফিরে আসার ইন্তেযার করলেই কি ভালো হয় না?'

বদ্‌রুয্‌যামান এগিয়ে এসে বললেনঃ 'না, না, আমাদের সাথে এমন সব যখমী রয়েছে, যাদের অবস্থা খুব নাযুক! আমরা শীগগিরই তাদেরকে এমন কোনো জায়গায় পৌঁছাতে চাই, যেখানে তাদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেতে পারবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদেরকে সফর করতে দিন। আমি খুব জলদী ফিরে এসে তাদের সাথে মিলিত হবো।'

কিছুক্ষণ পর বদ্‌রুয্‌যামান খান ও তাঁর সাথীরা পঞ্চাশজন মারাঠা সিপাহীর পাহারায় পরশুরাম ভাওয়ের শিবিরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং আনওয়ার আলী বাকী কাফেলাকে এগিয়ে চলার হুকুম দিলেন। পাঁচটার কাছাকাছি সময়ে মারাঠা সিপাহীরা এক জায়গায় তাঁবু ফেলার ইরাদা জানালো, কিন্তু আনওয়ার আলী সূর্যাস্ত পর্যন্ত সফরের জন্য দৃঢ় সংকল্প। খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটির পর তাঁর কথাই মেনে নিতে হল মারাঠা অফিসারকে।

মারাঠাদের মনোভাবের পরিচয় পেয়ে তাদের সংকল্প সম্পর্কে কয়েদীদের মনে কোনো ভালো ধারণা ছিলো না। কাফেলার চারদিকে তাদের গতিবিধি দেখে মনে হল, হামলা করার জন্য তারা রাতের অন্ধকারের প্রতীক্ষাও করবে না।

সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময়ে তারা পৌঁছলো এক নদীর কিনারে। মারাঠা রক্ষীদলের অফিসার আনওয়ার আলীর কাছে পৌঁছে বললোঃ 'এখন সন্ধ্যা আসন্ন হয়ে এসেছে। এই নদী থেকে খানিকটা দূরেই জংগল শুরু হয়ে যাবে। তাই রাতের বেলায় তাঁবু ফেলার জন্য এর চাইতে ভালো কোনো জায়গা পাওয়া যাবে না।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'রাতের অন্ধকারের আগেই আমরা জংগলের কাছে পৌঁছে যাবো এবং সেখানে কোনো জায়গায় থেমে পড়বো।

ঃ 'না জনাব, আমার সাথীরা ক্লান্ত। আপনি যিদ করলে আমরা নদীর অপর কিন্যারে তাঁবু ফেলছি।

মারাঠা অফিসার এই কথা বলে ঘোড়া হাঁকিয়ে গিয়ে সাথীদের সাথে মিলিত হল। তারপর দেখতে দেখতে কয়েকটি দল নদীর কিনারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো

এবং বাকী সিপাহীরা কাফেলার ডানে, বাঁয়ে ও পশ্চাতে সারি বেঁধে দাঁড়ালো।

আনওয়ার আলী বুলন্দ আওয়ায়ে 'হুঁশিয়ার' বলে উঠলেন এবং তাঁর সাথীরা চোখের পলকে যমিনের উপর শুয়ে পড়ে নিজ নিজ বন্দুক সোজা করে ধরলো। সাথে সাথেই মারাঠারা চারদিক থেকে গুলীবৃষ্টি শুরু করলো। যমিনের উপর শুয়ে-পড়া সিপাহীদের চাইতে বলদের গাড়িতে শায়িত রোগী ও যখমীদের উপর মারাঠা সিপাহীদের গুলী বেশী করে লাগলো। তারপর মহীশূরের সিপাহীরা জওয়াবী গুলীবর্ষণ করলো এবং মারাঠা সিপাহীরা পিছু হটতে বাধ্য হল। কিন্তু তাদের কাছে বারুদের পরিমাণ ছিলো এত কম যে, তোপগুলোকে কাজে লাগানো সম্ভব হল না। মারাঠারা তা' জানতো।

কিছুক্ষণ পর নেযাহ্বাযদের একটি দল এগিয়ে এসে ত্রিশ-চল্লিশজনকে হতাহত করে অপরদিকে বেরিয়ে গেলো। তারপর অপরদিক থেকে আর একদল নেযাহ্বায হামলা করলো। কিন্তু এর মধ্যে মহীশূরের সিপাহীরা আবার বন্দুক বোঝাই করে নিয়েছে। তাদের গুলী হামলাদারদের পিছু হটতে বাধ্য করলো।

কয়েক মিনিটের লড়াইয়ে মারাঠাদের ক্ষতি হল অপ্রত্যাশিত। তারা ঘোড়াগুলোকে পিছু হটিয়ে নিলো এবং গাছ ও ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বন্দুকের লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলো। লড়াইয়ের শুরুতে আনওয়ার আলীর সত্তরজন সাথী শহীদ হল। তাদের মধ্যে অনেকে আগেই যখমী বা পীড়িত ছিলো। কিন্তু বন্দুকের যুদ্ধে, কোনো পক্ষেরই পাল্লা ভারী হল না। অন্ধকার যতো বেড়ে চললো, মহীশূরের লোকদের বেঁচে যাবার সম্ভাবনাও ততোই বাড়তে লাগলো।

আনওযার আলী একদিক থেকে অপরদিক পর্যন্ত তাঁর সাথীদের পয়গাম পৌঁছালেনঃ 'মারাঠা এখন রাতের অন্ধকারে আমাদের উপর হামলা না করে ভোর পর্যন্ত আমাদেরকে তাদের ঘেরের মধ্যে রাখার চেষ্টা করবে। তারপর তাদের আরো ফউজ না এলেও আমাদের কারুর বাঁচবার কোনো উপায় থাকবে না। তাই এই হচ্ছে তোমাদের সময়। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে এজাযত দিচ্ছি, যেনো সে নিজের জান বাঁচাবার চেষ্টা করে।'

মহীশূরের সিপাহীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মাটির উপর হামাগুড়ি দিয়ে নদীর কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে নদী পার হয়ে অপর কিনারে পৌঁছে গেলো। তারা জংগলের দিকে তাদের পথরোধকারী মারাঠা সৈন্যদের উপর হামলা করলো। রাতের অন্ধকার বেড়ে চলেছে এবং হাতাহাতি লড়াইয়ে দোস্ত-দুশমনের কোনো প্রভেদ নেই। মারাঠারা দেখতে দেখতে বিশৃংখল অবস্থায় ডানেবাঁয়ে সরে যেতে লাগলো এবং মহীশূরের সিপাহীরা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে জংগলের পথ ধরতে লাগলো। আনওয়ার আলী সাথীদের পালানোর সুযোগ দেবার জন্য ত্রিশ-চল্লিশ জন সাহসী যোদ্ধা সাথে নিয়ে দীর্ঘ সময় নদীর অপর কিনারে প্রতীক্ষায় থাকলেন এবং জওয়াবী গুলী চালাতে থাকলেন, যাতে দুশমন বুঝতে না পারে যে, ময়দান প্রায় খালি হয়ে

এসেছে। তারপর যখন দক্ষিণদিকে দুশমনের চীৎকারধ্বনি শোনা গেলো, তখন আনওয়ার আলী তাঁর সাথীদের বললেনঃ 'এখন আর তোমাদের এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। তোমরা নিজ নিজ জান বাঁচাবার চেষ্টা করো। কিন্তু যাবার আগে কয়েকটা বন্দুক বোঝাই করে আমার কাছে রেখে যাও এবং নিজেদের জন্য আশপাশে পড়ে থাকা সাথীদের বন্দুক কুড়িয়ে নাও।'

এক সাথী বললোঃ 'আপনি আমাদের সাথে যাবেন না?'

ঃ 'না, আমার ভাগের কাজ এখনো শেষ হয়নি।'

ঃ তা' হলে আমরা আপনার সাথে আছি।'

আনওয়ার আলী গর্জন করে বললেনঃ 'তোমরা সময় নষ্ট করছো। আমি তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছি, অবিলম্বে এখান থেকে বেরিয়ে যাও।'

অপর এক সাথী বললোঃ 'কিন্তু যখমীদের সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করেছেন?'

ঃ 'তোমরা তাদের কোনো সাহায্য করতে পারছো না। তোমাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য অবশ্যি তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে আনওয়ার আলীর কাছে বন্দুকের স্তূপ হয়ে গেলো। তাঁর সাথীরা রাতের অন্ধকারে গায়েব হয়ে গেলো। তিনি একটির পর একটি ভরা বন্দুক তুলে নিয়ে বিভিন্ন দিকে গুলী ছুঁড়তে লাগলেন। একাধিক লোক গুলী ছুঁড়ছেন, দুশমনের মনে এই ধারণা জন্মাবার জন্য হাঁটু ও কনুইয়ে ভর করে চলে এখান ওখান থেকে গুলী চালাতে লাগলেন। আচানক পনেরো-বিশ কদম দূরে শোনা গেলো বন্দুকের আওয়ায এবং তিনি নির্বাক হয়ে সেদিকে দেখতে থাকলেন। তারপর তিনি মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে। কিছুক্ষণ পর আবার আওয়ায শোনা গেলো এবং বন্দুক থেকে বেরিয়ে-আসা শিখাও দেখা গেলো সাথে সাথে। অন্ধকারে নিশানাবাযকে চিনতে পারা ছিলো মুশকিল। কিন্তু তিনি ঠিকই বুঝলেন, তাঁর বন্দুকের গতি দুশমনের দিকে।

ঃ 'কে তুমি ?' তিনি ধীরে বললেন।

ঃ 'মসিয়েঁ আনওয়ার আলী! আমি লা গ্রাঁদ।' বলতে বলতে লা গ্রাঁদ হামাগুড়ি দিয়ে এলেন তাঁর কাছে।

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'লা গ্রাঁদ, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা কেন করলে না? আমার ধারণা ছিলো, তুমি এতক্ষণে জংগলের ভিতরে পৌঁছে গেছো।'

ঃ 'আমি জংগলের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম, কিন্তু যখন জানলাম যে, আপনার সাথে কিছু লোক এখনো রয়েছে, তখন আমার পালাবার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হল।'

ঃ তুমি খুবই নির্বুদ্ধিতা করেছো। আমার সাথীরা সবাই চলে গেছে।'

ঃ 'আমি জানি। পথে তাদের সাথে আমার দেখা হয়েছে।'

ঃ 'আর তা' সত্ত্বেও তুমি এখানে এসেছো। তোমার ঘোড়া কোথায় ?'

ঃ 'আমার ঘোড়া যখমী হয়ে গেছে।'

মারাঠারা বিক্ষিপ্তভাবে গুলীবর্ষণ করতে লাগলো। আনওয়ার আলী উত্তরদিকে গুলী ছুড়ে বললেনঃ 'তুমি তোমার বন্দুক ভরেছো। পশ্চিমদিকে গুলী কর, তারপর আমার সাথে এসো।'

লা গ্রাঁদ তাঁর হুকুম তামিল করলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তারা স্তুপীকৃত বন্দুকগুলোর কাছে গেলেন। আনওয়ার আলী খালি বন্দুক একদিকে রেখে ভরা বন্দুক তুলে নিয়ে বললেনঃ 'লা গ্রাঁদ, তুমি ভালো করোনি। নিজের জান বাঁচাবার শ্রেষ্ঠ মওকা তুমি হারিয়ে ফেললে, কিন্তু এখনো হিম্মৎ করলে তোমার বেঁচে যাবার কিছুটা সম্ভাবনা রয়েছে।'

ঃ 'আমি আপনার সাথেই থাকবো।' লা গ্রাঁদ চূড়ান্ত সংকল্পের স্বরে বললেন।

ঃ 'লা গ্রাঁদ, খোদার দিকে চেয়ে আমার কথা মেনে নাও। এ আত্মহত্যারই নামান্তর। তুমি এখানে থাকলে আমার কোনো ফায়দা হবে না।

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, এখানে আমি নিজের বাহাদুরী বা ত্যাগের প্রমাণ দিতে আসিনি। আমি পালিয়ে যেতে পারলে আপনি পিছনে রয়েছেন বলে হয়তো পরোয়া করতাম না। জংগলের মধ্যে বাধবেষ্টিত শিকারের মতো আমি মারাঠাদের হাতে মরতে চাইনি। তাই আমি এই মনে করে ফিরে এসেছি যে, হয়তো আমার জন্য এক বন্ধুর জান বেঁচে যাবে। এখন আপনি চলে যান। দুশমনকে আমি নিজের দিকে আকৃষ্ট করে রাখবো।

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'তুমি আমার জন্য এসে থাকলে চলো। অকারণে মরতে আমি চাই না। তুমি না এলেও আমার এক ঘন্টার বেশী এখানে থাকার ইরাদা ছিলো না। আমরা দু'জনই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি। মারাঠা রাতের অন্ধকারে নিজের ছায়া দেখেও ভয় পায়। ভোর হবার আগে তারা পরিস্থিতি যাচাই করবার সাহস করবে না।'

এ কথা বলে আনওয়ার আলী পর পর আরো কয়েকটি গুলী ছুঁড়লেন। তারপর তিনি লা গ্রাঁদকে বললেনঃ 'চলো।'

লা গ্রাঁদ বেদনাব্যঞ্জক স্বরে বললেনঃ 'আনওয়ার আলী, আমি আপনার সাথে তাল রেখে চলতে পারবো না। আমি যখমী বলেই ফিরে এসেছি।'

কয়েক মুহূর্ত আনওয়ার আলীর মুখ থেকে কোনো কথা সরলো না। তারপর তিনি জলদী এগিয়ে গিয়ে লা গ্রাঁদের দেহ হাতড়ে দেখে বললেনঃ 'যখম কোথায়?'

লা গ্রাঁদ তাঁর হাত ধরে নিজের ডান কাঁধের একটুখানি নীচে রেখে বললেনঃ

আনওয়ার আলীর হাত তাজা উষ্ণ রক্তে ভিজে উঠলো। মুহূর্তের জন্য তাঁর দেহ ও মনের শক্তি উবে গেলো। তারপর এক ঝটকায় তিনি লা গ্রাঁদের জামা ছিঁড়ে ফেলে নিজের কোমরবন্দ খুলে বললেনঃ 'এখনো তোমার রক্ত ঝড়ছে। তুমি যখমী; সে কথা আমায় আগে বলোনি কেন?' আনওয়ার আলী ছেঁড়া জামার একটা টুকরা ভাঁজ করে লা গ্রাঁদের হাতে দিয়ে বললেন। 'এটা যখমের উপর চেপে রাখো। আমি পট্টি বেঁধে দিচ্ছি।'

লা গ্রাঁদ তাঁর হুকুম তামিল করলেন। আনওয়ার আলী পরিবেশ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে পট্টি বাঁধতে ব্যস্ত হলেন। লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'দোস্ত, আপনি অকারণে তকলীফ করছেন। আমি জানি, আমার মনযিল কাছে এসে গেছে। যখমী হবার পর আমার ধারণা ছিলো, মরবার আগে আমার যিন্দেগীর শেষ ক'টি মুহূর্ত এক দোস্তকে বাঁচাবার কাজে লাগাতে পারবো। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, আমারই জন্য আপনি এক মুসীবতে পড়ে গেছেন। আমার মৃত্যুর মুহূর্তটি যদি আপনি আরো কষ্টদায়ক না বানাতে চান, তা'হলে এখান থেকে চলে যান।

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'তুমি যখমী হয়ে আমার কাছে এসেছো, আমার সন্ধানে এসেছো। তারপর তুমি প্রত্যাশা করছো যে, আমি তোমায় এই অবস্থায় রেখে চলে যাবো? তুমি যদি আমার জান বাঁচাতে চাও, তা'হলে তোমায় হিম্মত করতে হবে। বলোঃ তুমি কিছুদূর চলতে পারবে কিনা?

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'আপনার জান বাঁচানোর জন্য আমি কয়েক মাইল চলতে পারবো।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা। কয়েক মিনিট তুমি এখানে আমার ইন্তেযার করো। আমি এক্ষুণি ফিরে আসছি।'

ঃ 'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

ঃ 'এসে বলবো।' আনওয়ার আলী উঠে পূর্ণগতিতে একদিকে ছুটলেন।

লা গ্রাঁদ প্রায় আধ ঘন্টা নিশ্চল হয়ে আনওয়ার আলীর ইন্তেযার করলেন। তারপর তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বসলেন। মারাঠারা এবার বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্তভাবে গুলীবর্ষণ না করে মাঝে মাঝে গুলী ছুঁড়ছে। আচানক একদিকে তিনি দেখতে পেলেন একটি ছোটখাটো রকমের অগ্নিশিখা। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে আগুনের শিক্ষা ক্রমাগত উপরে উঠতে লাগলো। কাছেই তিনি কারুর ছুটে আসার আওয়ায পেলেন।

ঃ 'আনওয়ার আলী, আমি এখানে' তিনি বললেন।

আনওয়ার আলী হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে এসে বললেনঃ 'এবার ওঠো।'

লা গ্রাঁদ উঠে তাঁর সাথে চললেন। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ কদম চলবার পর চারদিক থেকে দুশমনের চীৎকা[illegible]নে আসতে লাগলো। আনওয়ার আ[illegible] ও লা গ্রাঁদ

পুনরায় শুয়ে পড়লেন। আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ে একটা মস্ত বড়ো আলোকপিন্ড হয়ে উঠলো। ময়দানে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো আলোর শিখা। অগ্নিশিখার দিকে ইশারা করে লা গ্রাঁদ আনওয়ার আলীকে বললেনঃ 'মসিয়েঁ, আপনি জিনিসপত্র বোঝাই গাড়িতে আগুন লাগিয়ে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

ঃ 'কিন্তু কেন? এতে কি ফায়দা হবে।?'

ঃ 'তুমি নিশ্চল হয়ে পড়ে থাক। আমি দুশমনকে দেখাতে চাই যে, লাশ ও আহত ছাড়া এখানে আর কিছু নেই'

ঃ আপনার দেরী দেখে আমিও হয়রান হয়েছিলাম।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'দশ-বারোটা গাড়ির বলদ খুলে দেওয়া, কোনো কোনো গাড়ি থেকে লাশ নামানো এবং সবকটা গাড়ি এক জায়গায় এনে আগুন লাগানো মামুলী কাজ নয়।'

ঃ 'কিন্তু এতে ফায়দা কি হবে?'

ঃ 'মারাঠারা জানে, এসব গাড়িতে আমাদের অর্থভান্ডার রয়েছে। তারা যে কোনো উপায়ে আগুন নিভানোর চেষ্টা করবে। সকল টাকা বের করে আমি আলোর চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি। কিছু সময়ের মধ্যে তুমি এক অদ্ভূত তামাশা দেখবে। দেখো, ওরা আসছে। এবার শ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাক। কতক লোক এদিক দিয়ে যাবে এবং তোমায় দেখাতে হবে যে, তুমি এক লাশ।'

লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'আমি জানি না, এতে আমাদের কি ফায়দা হবে, কিন্তু আপনার এ খেলা খুবই চিত্তাকর্ষক।'

কয়েক মিনিট পর ময়দানের অনেক দূরে দূরে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। মারাঠা পদাতিক ও সওয়ার ডাক-চীৎকার করে আলোর দিকে এগিয়ে আসছে। মারাঠাদের কয়েকটি দল আনওয়ার আলী ও লা গ্রাঁদের কাছ দিয়ে চলে গেলো। তারপর সওয়ারের একটি দল এসে দেখা দিলো এবং আনওয়ার আলী লা গ্রাঁদের বাহু ধরে বললেনঃ 'এবার ওঠো।'

কয়েকজন সওয়ারের ঘোড়া তাঁদের খুব কাছে এসে গেলো এবং আনওয়ার আলী বহু কষ্টে লা গ্রাঁদকে টেনে পিছনে সরালেন। তারা চলে গেলে লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'আপনি চলে যান এখান থেকে। আগুনের আলোয় ওরা চিনে ফেলবে আমাদেরকে।'

ঃ 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এখন কেউ মনোযোগ দেবে না আমাদের দিকে। কিছুক্ষণ আগে আমার সামনে সমস্যা ছিলো, ঘোড়া ছাড়া তোমায় এখান থেকে কি করে নিয়ে যাবো? কিন্তু এখন তুমি চাইলে আমি বিশটি ঘোড়া এনে দিতে পারি।'

ঃ 'তাঁ কি করে?'

ঃ 'এখনই তুমি জানতে পাবে।'

আনওয়ার আলীর কৌশল তাঁর প্রত্যাশার চাইতেও বেশী সফল হল। যারা জ্বলন্ত গাড়ির কাছে গেছে, তারা আগুন নিভানোর চাইতে বেশী করে মনোযোগ দিলো সোনা-চাঁদির চমকদার মুদ্রাগুলোর দিকে। তাদের সালার ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে চীৎকার করে বলছেঃ 'বেঅকুফ! তোমরা এখানে কি করছো? অসংখ্য দুশমন আমাদের হাত থেকে বেঁচে গেলো, তোমরা তাদের পিছু ধাওয়া করলে না? গাড়িগুলোর পরোয়া করো না। তোমরা কি করছো? '

তারা কি করছে, যখন সে জানলো, অমনি সেও লাফিয়ে পড়লো ঘোড়া থেকে। কিন্তু অধিকতর বলিষ্ঠ সাথীদের ধাক্কা খেয়ে একদিকে সরে গিয়ে সে পূর্ণ শক্তিতে চীৎকার করে উঠলোঃ 'বদমাশ, এ টাকা সরকারী। তোমরা পিছু না হটলে আমি সরওয়ারদের হামলা করার হুকুম দেবো।'

ঘটনাস্থলে পৌঁছে সওয়াররাও পদাতিকদের উপর অগ্রাধিকার নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। তাদের খালি ঘোড়াগুলো ছুটতে লাগলো এদিক ওদিক। এক অফিসার তার এক সিপাহীর জামার পিছন দিক টেনে ধরে বললো চীৎকার করেঃ 'বদমাশ, আমার ঘোড়া কেন ছেড়ে দিলে?' সিপাহী বললোঃ 'মহারাজ, গরীবের উপর যুলুম করবেন না। ভগবানের দোহাই, আমায় ছেড়ে দিন। আমার পাঁচটা বাচ্চা। আপনার ঘোড়া পালাবে না। কোথাও। দেখুন, সবাইর ঘোড়া এখানেই ঘুরছে।' তারপরই সে দেখলো মাটিতে পড়ে থাকা একটা মুদ্রা। অমনি জামার একটা টুকরা অফিসারের হাতে রেখেই সে ছুটলো।

আনওয়ার আলী ও লা গ্রাঁদ এগিয়ে গিয়ে দু'টো ছেড়ে-দেওয়া ঘোড়ার বাগ ধরলেন। কিছুদূর গিয়ে তাঁরা ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। আলোর পাশে ভিড়ের মধ্যে এমন বিশৃংখলা সৃষ্টি হল যে, কোনো কোনো লোক সাথীদের পায়ের তলায় পড়তে লাগলো। ভিড়ের চাপে এক সিপাহীর পা পিছলে গেলো এবং সে একটা জ্বলন্ত গাড়ির উপর পড়ে গেলো। দেখতে দেখতে তার কাপড়ে আগুন ধরে গেলো এবং চীৎকার করে সে এদিক ওদিক ছুটতে লাগলো। কিন্তু কেউ তার দিকে মনোযোগ দেবারও প্রয়োজন বোধ করলো না।

সতেরো

আনওয়ার আলী ও লা গ্রাঁদ নদী পার হয়ে জংগলে প্রবেশ করলেন এবং কিছুক্ষণ পরে আনওয়ার আলী বললেনঃ 'এখন আমাদের দুশমনের তরফ থেকে কোনো বিপদ নেই, কিন্তু বাকী রাত আমাদের চলতে থাকা দরকার।'

লা গ্রাঁদ জওয়াব দিলেনঃ 'আমি আপনার সাথে সাথে চলবার চেষ্টা করবো।'

আনওয়ার আলী ঘোড়া ছুটালেন এবং লা গ্রাঁদ তাঁর অনুসরণ করলেন। প্রায় এক ঘন্টা জংগলের সংকীর্ণ পায়ে-চলা পথে চলার পর আনওয়ার আলী ঘোড়া থামালেন এবং লা গ্রাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'লা গ্রাঁদ এখন তোমায় খুব সতর্ক থাকতে হবে। আমি এখন এ পথ ছেড়ে জংগল পার হতে চাই।'

লা গ্রাঁদ ক্ষীণ কণ্ঠে জওয়াব দিলেনঃ 'দোস্ত, আমার শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। আমি খুব কষ্টে ঘোড়ার যিনের উপর বসার চেষ্টা করছি।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'এখন তোমায় হিম্মত দেখাতে হবে। এ এলাকাটি আমাদের জন্য মোটেই নিরাপদ নয়।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা, চলুন। কিন্তু আমার সাথে ওয়াদা করুন, যদি আমি কোথাও ঘোড়া থেকে পড়ে যাই, তা'হলে আপনার সফর অব্যাহত থাকবে।'

ঃ 'আমি তোমার সাথে ওয়াদা করতে পারি যে, তোমায় সাথে নিয়ে যেতে না পারলে আমার মনযিল সেরিংগাপটম হবে না। জিনকে আমি খবর দিতে পারবো না যে, আমি তার আহত স্বামীকে বনের মধ্যে ফেলে পালিয়ে এসেছি।'

প্রায় দু'ঘন্টা পর বনের মধ্যে আর একটি নদী পার হবার সময়ে লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'একটু থামুন, আমার বড়োই পিপাসা লেগেছে।' তিনি অবিলম্বে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন।' আনওয়ার আলী ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে তাঁকে ধরে বসালেন নদীর কিনারে। লা গ্রাঁদ কয়েক ঢোক পানি পান করে বললেনঃ 'আপনার এজাযত পেলে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করি।'

আনওয়ার আলী সস্নেহে জওয়াব দিলেনঃ 'আমার মনে হয়, এ জায়গাটি নিরাপদ। তুমি কয়েক মিনিট বিশ্রাম করতে পারো।'

লা গ্রাঁদ কিনার থেকে একটুখানি সরে গিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। আনওয়ার আলী ঘোড়া দু'টো এক গাছের সাথে বাঁধলেন এবং লা গ্রাঁদের কাছে এসে তাঁর মাথা জানুর উপর তুলে নিলেন।

ঃ 'মনে হচ্ছে, তোমার খুবই কষ্ট হচ্ছে।' তিনি বললেন।

ঃ 'এখন কষ্ট বেশী নয়, তবে ঘোড়ার উপরে আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিলো।'

আনওয়ার আলী লা গ্রাঁদের নাড়ি দেখে কপালে হাত রাখলেন। তারপর উদ্বিগ্ন হয়ে যখমের আশপাশ ও সিনা হাতড়ে দেখলেন। আচানক আঙুলে ভেজা ভেজা লাগলে তিনি বললেনঃ 'মনে হয়, এখনো তোমার রক্তপাত বন্ধ হয়নি। পট্টিটা আরো এঁটে বাঁধা দরকার।

ঃ 'বহুত আচ্ছা, জলদী করুন। এ বনের মধ্যে মরতে চাই না আমি।'

আনওয়ার আলী পট্টি খুলে বেঁধে দিলেন নতুন করে। তারপর নদীর পানিতে হাত ধুয়ে লা গ্রাঁদের কাছে বসলেন।

লা গ্রাঁদ কাতরাতে কাতরাতে বললেনঃ 'রাস্তায় কোনো সাথীর দেখা হল না। কে জানে, তারা এখন কোথায়?'

ঃ 'কোনো পথই যে তাদের জন্য নিরাপদ নয়, তা' তারা জানে। তারা এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে জংগল পার হয়ে যাচ্ছে। আমরা পায়ে হেঁটে চললে এতক্ষণে কিছু লোক হয়তো আমাদের সাথে শামিল হত। কিন্তু অন্ধকারে আমাদের ঘোড়ার পদশব্দ তাদেরকে দূরে রাখার জন্য যথেষ্ট ছিলো।'

ঃ 'আপনার কি ধারণা, ওরা বেঁচে যেতে পারবে?'

ঃ 'আমার ভয় হয়, দুশমন সওয়ার যদি ভোরে তাদের অনুসরণ করে, তা'হলে কতক লোককে তারা গেরেফতার করে নিতে পারবে। তথাপি আমাদের সাথীরা রাতের বেলায় ভুল পথ ধরে থাকলে বহু লোকের বেঁচে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি যখমী লোকদের সম্পর্কে খুবই পেরেশান। ওরা হয়তো বেশী দূরে যেতে পারেনি।'

লা গ্রাঁদ ও আনওয়ার আলী কিছুক্ষণ নির্বাক বসে থাকলেন। আচানক আশপাশের ঝোপঝাড় ও গাছের শাখায় নড়াচড়ার হালকা আওয়ায পাওয়া গেলো। ঘোড়া দুটো ভয়ে লাফাতে থাকলো। লা গ্রাঁদ উঠে ধরা গলায় বললেনঃ 'খোদার কসম, আপনি পালিয়ে যান। আমরা দুশমনের ঘেরের মধ্যে পড়ে গেছি।'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'ওরা আমাদেরই সাথী; দুশমন হতে পারে না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে থাকো।

তারপর উচ্চ কণ্ঠে তিনি বললেনঃ 'যদি তোমরা মারাঠা সিপাহী না হও, তা'হলে এখানে তোমাদের কোনো বিপদ নেই। আমি আনওয়ার আলী।'

একটি লোক গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললোঃ 'আমি আপনার আওয়ায চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু আপনি অপর কোনো ভাষায় কথা বলছিলেন আর এ বেঅকুফরা আপনাকে ইংরেজ মনে করেছিলো। আপনাদের ঘোড়ার পদশব্দ শুনে আমাদের ধোকা লেগেছিলো।'

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'খোদার শোকর, তোমরা আমাদেরকে গুলীর নিশানা বানাবার চেষ্টা করোনি।'

অল্প সময়ের মধ্যে পঁচিশ-ত্রিশজন লোক এসে জমা হল তাঁদের পাশে। আনওয়ার আলী বললেনঃ 'তোমাদের এখানে দেরী করে কথা বলবার সময় নেই। তোমরা চলতে থাকো।'

ঃ 'কিন্তু আপনারা?' একজন প্রশ্ন করলো।

ঃ 'লা গ্রাঁদ যখমী। ওঁর কিছুক্ষণ বিশ্রাম দরকার।'

এক সিপাহী বললোঃ তা'হোলে আমরা আপনাদের সাথেই চলবো।'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'তোমরা আমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে না। আমাদের সাথে ঘোড়া রয়েছে এবং কিছু সময়ের মধ্যে সওয়ার হয়ে আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব। কিন্তু আমরা যদি অপর কোনো দিকে চলে যাই, তা'হোলে তোমরা আমাদের ইন্তেযার করো না।'

লা গ্রাঁদ আনওয়ার আলীর হাত ধরে ফরাসী ভাষায় বললেনঃ 'আমার সাথীদের কথা ওদের কাছে জিজ্ঞেস করুন।'

আনওয়ার আলী সিপাহীদের কাজে প্রশ্ন করলেনঃ 'আমাদের ইউরোপীয় সাথীদের খবর তোমরা জানো কিছু?'

এক সিপাহী জওয়াব দিলোঃ 'জনাব, আমি ছিলাম তাদের সাথে। ময়দান থেকে বেরুবার সময়ে তাদের এক সাথী যখমী হল এবং জংগলের কাছে পৌছতে পৌছতে তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে গেলো। তখন তারা দুশমনের কাছে আত্মসমর্পণ করার ফয়সালা করলো। লা গ্রাঁদের সন্ধানও তারা করতে চেয়েছিলো।'

আনওযার আলী বললেনঃ 'আচ্ছা, তোমরা রওয়ানা হয়ে যাও। তোমাদের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিমদিক বেশী নিরাপদ। খুব শীগগিরই আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো।'

এক সিপাহী প্রশ্ন করলোঃ 'জনাব, খান সাহেবের কোনো খবর পেয়েছেন?'

ঃ 'না, কিন্তু তোমরা সময় নষ্ট করো না।'

সিপাহীরা আবার গায়েব হয়ে গেলো জংগলের মধ্যে। আনওয়ার আলী লা গ্রাঁদের কাছে বসে থাকলেন আরো আধ ঘন্টা। অবশেষে লা গ্রাঁদ বললেনঃ 'মনে হয়, এখন কিছুক্ষণ আমি ঘোড়ার সওয়ার হয়ে চলতে পারবো।'

আনওয়ার আলী তাঁকে ধরে বসালেন। তারপর তাঁর ঘোড়ার বাগ খুলে এনে হাতে দিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা গিয়ে সাথীদের সাথে মিলিত হলেন। লা গ্রাঁদের অবস্থা আবার খারাপ হতে লাগলো। তিনি বহু কষ্টে ঘোড়ার যিনের উপর বসে থাকতে চেষ্টা করলেন। আনওয়ার আলী তাঁর ঘোড়ার যিনের উপর বসে থাকতে চেষ্টা করলেন। আনওয়ার আলী তাঁর ঘোড়া এক যখমী সিপাহীকে দিয়ে নিজে লা গ্রাঁদের ঘোড়ার বাগ ধরে আগে আগে চললেন। ভোর পর্যন্ত প্রায় দেড়শ' লোক তাঁদের সাথে মিলিত হল। লা গ্রাঁদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়লো। তাঁর গর্দান ঝুঁকে রয়েছে। তিনি দু'হাতে যিন আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করছেন।

সূর্যোদয়ের একটুখানি পরেই ছোট একটি ঝিলের কাছে পৌছে তাঁর সাথীদের থামবার হুকুম দিলেন। লা গ্রাঁদকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে মাটির উপর শুইয়ে দেওয়া হল। কোনো কোনো সিপাহী থলে থেকে বাসি রুটি বের করে সাথীদের মধ্যে ভাগ

করে দিয়ে ঝিলের কিনারে বসে গেলো। আনওয়ার আলীর এক সাথীর কিছুটা অস্ত্রচিকিৎসার অভিজ্ঞতা ছিলো। তিনি পট্টি খুলে যখন পরীক্ষা করে বললেনঃ 'গুলী খুব নীচে যায়নি। এজাযত হলে গুলী বের করে আমি যখমে দাগ দিয়ে দিতে পারি। নইলে কিছু কিছু রক্ত ঝরতেই থাকবে।'

ঃ 'যদি তুমি মনে করো, এমনি করে ওঁর জান বেঁচে যাবে, তা'হলে আমি তোমায় এজাযত দিচ্ছি।'

লা গ্রাঁদের নাড়িতে হাত রেখে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে বললেনঃ 'ওঁর জ্বর এতটা প্রবল না হলে আমার কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হত। কিন্তু এখন আস্থার সাথে আমি কিছু বলতে পারছি না। পথে ওঁর অনেকখানি রক্তপাত হয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, এ অবস্থায় যখম দাগানোর কষ্ট ওঁর পক্ষে অসহনীয় হবে।

লা গ্রাঁদ বিরক্তির দৃষ্টিতে আনওয়ার আলীর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আনওয়ার আলী, গোড়ার দিকে আমি বারংবার অনুরোধ করেছি যে, আপনি আমায় ফেলে গিয়ে নিজের জান বাঁচাবার চেষ্টা করুন। কিন্তু এখন আমার শেষ আকাংখা, মৃত্যুর পূর্বে জিনকে একবার দেখতে চাই। কোনো উপায় থাকলে আমায় সেরিংগাপটমে পৌছে দেবার চেষ্টা করুন। আমি জানি, এ জংগলের ভিতরে আপনি আমার জন্য কিছু করতে পারবেন না।'

আনেওয়ার আলী বেদনাতুর হ'য়ে গর্দান নীচু করলেন এবং তাঁর এক সাথী বললেনঃ 'জনাব, ওঁর অবস্থা আমার ভালো মনে হচ্ছে না। ওঁকে কোনো নিরাপদ জায়গায় পৌছাবার চেষ্টা করাই আমাদের উচিত। ওঁর জন্য ভালো অস্ত্রচিকিৎসকের প্রয়োজন। আমরা চাতলদুর্গে পৌছতে পারলে ওঁর জন্য এলাজ হতে পারতো।'

আনওয়ার আলী অপর ব্যক্তিকে বললেনঃ 'তুমি সতর্ক হয়ে পট্টি বেঁধে দাও। এর আগে ওঁর ঘোড়ায় চড়ে সফর করাও ঠিক হবে না। ওঁকে তুলে নেবার জন্য আমি একটা খাটিয়া তৈরী করাচ্ছি।'

আনওয়ার আলীর সাথীরা জলদী ক'রে কিছুটা কাঠ কেটে আনলো এবং তা' দিয়ে একটা খাটিয়া তৈরী করে ফেললো। তারপর আনওয়ার আলী সাথীদের বললেনঃ 'বন্ধুগণ! আমি জানে, তোমরা খুব ক্লান্ত এবং তোমাদের কয়েক ঘন্টা বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু লা গ্রাঁদের জান বাঁচাবার জন্য এমন কয়েকজন রেযাকার আমার প্রয়োজন, যারা এই মুহূর্তে আমার সাথে রওয়ানা হতে প্রস্তুত।'

তাঁর কথা শুনে কয়েকজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে গেলো এবং তারা সবাই বললোঃ 'জনাব, আমরা সবাই আপনার সাথে যাবার জন্য প্রস্তুত।'

ঃ ' আমার মাত্র আটজন বলিষ্ঠ লোকের প্রয়োজন।

এক সিপাহী বললোঃ 'আমাদের মধ্যে কেউ পিছনে পড়ে থাকতে চাইবে না। তাই আপনি নিজের মরযী মতো আটজনকে বাছাই করে নিন।'

আনওয়ার আলী একে একে আটজনকে ইশারা করলেন এবং তারা অবশিষ্ট সাথীদের থেকে আলাদা হয়ে একদিকে দাঁড়ালো। আচানক একদিক থেকে ঘোড়ার পদধ্বনি শোনা গেল। এক সিপাহী চমকে উঠে বললো : 'কে যেনো এদিকে আসছে।'

আনওয়ার আলীর বললেন : 'মনে হয়, লোকটি একা। তবু তোমরা চুপচাপ আলাদা হ'য়ে লুকিয়ে থাকো।'

আনওয়ার আলী সাথীরা জলদী করে লা গ্রাঁদকে খাটিয়ার উপর তুলে কাছে ঘন গাছপালার আড়ালে নিয়ে গেলো। অবশিষ্ট লোক এদিকে ওদিকে লুকালো।

কিছু সময়ের মধ্যে এক সওয়ার এসে পৌঁছালো ঝিলের কিনারে এবং আনওয়ার আলী গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বললেন : 'ভাই, কোনো ভয় নেই। এ আমাদেরই সাথী।

সওয়ার আনওয়ার আলীকে দেখেই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লো এবং ছুটে তাঁর কাছে এলো। যে সিপাহীর বদরুয্যামানের সাথে মারাঠা শিবিরে গিয়েছিলো, এ লোকটি তাদেরই একজন। লোকটি বললো : 'জনাব, খোদার শোকর, আপনি যিন্দাহ্ রয়েছেন।'

: বদুরুয্যামান খানকে তুমি কোথায় রেখে এসেছো?' আনওয়ার আলী প্রশ্ন করলেন।

: জনাব, তিনি পরশুরামের কয়েদখানায় বন্দী। মারাঠারা হামলা ক'রে আমাদের তিনজন সাথীকে কতল ও বদরুয্যামান সহ চার-পাঁচজনকে যখমী করলো রাস্তায়। তারপর তারা আমাদেরকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেলো পরশুরামের কাছে। তিনি প্রকাশ্যে তাদের কার্যকলাপে লজ্জা প্রকাশ করলেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এর সব কিছুই তার ইশারায় হয়েছে। তিনি বদরুয্যামানকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, এরপর তাঁর সাথে কোনো বাড়াবাড়ি করতে দেবেন না। তাঁর চিকিৎসার জন্য এক ইংরেজ ডাক্তারকেও ডেকে আনা হল। তথাপি তিনি যখন প্রশ্ন করলেন যে, আমাদেরকে ফিরে যাবার আদেশ কবে দেওয়া হবে? তখন ভাও বললেন : "যুদ্ধ চলতে থাকা পর্যন্ত আপনারা আমার মেহমান এবং আমি ফয়সালা করেছি যে, আপনাদেরকে নারগন্ড পাঠানো হবে।" মধ্যরাত্রে আমি পালাবার মওকা পেয়ে গেলাম।'

: 'তুমি রাস্তায় কোনো মারাঠা ফউজ দেখেছো?'

: 'জি না। পশ্চিম দিক থেকে আমি লম্বা পথ ঘুরে এদিকে এসেছি।'

আরো কয়েকটি প্রশ্নের পর আনওয়ার আলী তাঁর সাথীদের লক্ষ্য ক'রে বললেনঃ 'এখনো তোমরা বিপদ সীমা অতিক্রম করে যেতে পারো নি। তাই এখানে তোমাদের বেশী দেরী করা উচিত হবেনা। দুশমন পিছু ধাওয়া করে লড়াই না করে তোমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে জংগলের মধ্যে পালাবার চেষ্টা করাই ভালো হবে। রাতের বেলায় জংগল তোমাদের জন্য বেশী নিরাপদ হবে এবং তোমরা কোনো বিপদের মোকাবিলা

না করে সফর চালিয়ে যেতে পারবে। আমি অপর ঘোড়াটিও তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। এখন তার উপর সওয়ার হবার হক কার সব চাইতে বেশী, সে ফয়সালা তোমাদের উপর থাকলো।'

আনওয়ার আলী যখন এসব কথাবার্তা বলছেন, তখন সেখান থেকে পাঁচ মাইল পূর্বে ভোর হতেই পলাতকদের সন্ধানে আগত মারাঠা ফউজের কয়েকটি দল মহীশূরের পঞ্চাশ-ষাটজন সিপাহীকে কতল করে এবং প্রায় দেড়শ' লোককে গেরেফতার করে ফিরে যাচ্ছিলো।

দুপুর বেলায় জংগল খতম হয়ে গেলো এবং সামনে এক মাইল দূরে একটি পল্লী নযরে পড়লো। আনওয়ার আলী তাঁর সাথীদের থামাবার জন্য ইশারা করে বললেনঃ 'তোমরা কিছুক্ষণ এখানে দেরী করো। আমি এক্ষুণি এই বস্তি থেকে ফিরে আসবো। এ এলাকা নিরাপদ হলে আমাদের সফর চলতে থাকবে, নইলে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে হবে এখানে।'

আনওয়ার আলীর সাথীরা লা গ্রাঁদকে ঝোঁপের আড়ালে নামিয়ে দিলো এবং আনওয়ার আলী রওয়ানা হয়ে গেলেন বস্তির দিকে। কিছুদূরে এক পাল গরু-মহিষকে চরতে দেখা গেলো। তিনজন রাখাল এক গাছের ছায়ায় পড়ে ঘুমুচ্ছে। আনওয়ার আলী এক রাখালের কাছে গিয়ে তাকে জাগিয়ে বললেন ঃ 'এটা তোমাদের পল্লী?'

রাখাল বিড়বিড় ক'রে জওয়াব দিলো ঃ 'জি হ্যাঁ।'

আনওয়ার আলী তাঁর পকেট থেকে একটি রূপোর মুদ্রা বের করে তার হাতে দিয়ে প্রশ্ন করলেনঃ 'এখানে আশপাশে মারাঠা সিপাহীদের কোনো চৌকি আছে?'

রাখাল ভালো ক'রে আনওয়ার আলীর দিকে তাকিয়ে দেখে বললো ঃ 'জনাব, আপনি মহীশূরের সিপাহী হলে এ কথা জিজ্ঞেস করার জন্য এ পাগোডা (রৌপ্য মুদ্রা) নেবার প্রয়োজন ছিলো না। আমরা সুলতান টিপুর প্রজা। এটা ফিরিয়ে নিন।'

আনওয়ার আলী বললেন ঃ 'দোস্ত, তোমাকে আমি ছোট করতে চাইনি। এটা কাছে রেখে আমার প্রশ্নের জওয়াব দাও।'

রাখাল বললো ঃ 'জনাব মারাঠা চৌকি আমাদের গাঁয়েই ছিলো, কিন্তু এখন তাদের কোনো লোক সেখানে নেই।'

ঃ 'তারা সেখান থেকে চলে গেছে?'

ঃ 'জনাব, তারা যায়নি, বরং মহীশূরের সিপাহীদের হাতে বন্দী হয়েছে। তারা আমাদেরকে বড়োই জ্বালাতন করতো। বাড়িঘর লু'টে নিতো আর আমাদের সরদারকেও অপমান করেছে। কাল রাত্রে আমাদের ফরিয়াদ শুনেছেন। ওরা শরাবের নেশায় মাতাল হ'য়ে পড়েছিলো। মধ্যরাত্রে আমরা ওদের চীৎকার শুনতে পেলাম।

তারপর জানলাম, যে, মহীশূরের সিপাহীরা এসে গেছে, আর তারা চৌকি দখল ক'রে নিয়েছে।'

ঃ 'চৌকিতে মারাঠাদের কতো লোক ছিলো?'

ঃ 'আগে তাদের সংখ্যা ছিলো শ'খানেকের কাছাকাছি, কিন্তু কয়েকদিন ধ'রে মাত্র বিশজন সেখানে ছিলো। জনাব, আপনি এলেন কোথেকে?'

ঃ 'আমি বহুদূর থেকে আসছি।' এ কথা বলেই আনওয়ার আলী ছুটে চললেন বস্তির দিকে। কিছুক্ষণ পর তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন গাঁয়ের সরদারের হাবেলীর দরযার সামনে এবং ঢুন্ডিয়া দাগ ছাড়া আরো পঞ্চাশ-ষাটজন সিপাহী এসে জমা হল তাঁর পাশে।

আনওয়ার আলী ঢুন্ডিয়া দাগকে এক নিশ্বাসে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন ঃ 'তোমরা এসেছো কোথেকে? তোমার সাথে কতো লোক রয়েছে? বাকী ফউজ কোথায়?'

ঢুন্ডিয়া দাগ জওয়াব দিলেন ঃ 'আমি চাতলদুর্গ থেকে গাযী খানের ফউজের সাথে এসেছি। শাহনূরের কাছে পৌঁছে আমরা জেনেছি যে, আপনারা ধাড়ওয়ারের কেল্লা খালি করে দিচ্ছেন। গাযী খান পাঁচ হাজার সওয়ার সাথে নিয়ে দরিয়ার পারে থেমে গেছেন। আপনাদের সম্পর্কে আরো খবর জানবার জন্য তিনি পাঠিয়েছেন আমায়। এখানে পৌঁছে আমি ভাবলাম, মারাঠা চৌকি দখল করে হয়তো আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারবো। বদরুদয্যামান ও বাকী লোকেরা কোথায়?'

ঃ 'বদরুদয্যামান খান মারাঠাদের হাতে বন্দী। যারা কোনোমতে বেঁচে এসেছে, তাদের বেশীর ভাগ আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত জংগল পার হয়ে আসবে। এখন তাদেরকে আশপাশের এলাকায় সন্ধান করা তোমাদের কর্তব্য। লা গ্রাঁদ যখমী হয়েছেন এবং আমি তাঁকে এখান থেকে এক মাইল দূরে রেখে এসেছি। তাঁকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছানো খুবই জরুরী। আমরা চাতলদুর্গে পৌঁছলে হয়তো তার জান বেঁচে যাবে। তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে এবং একটা কাঠের খাটিয়ায় তুলে আমরা তাঁকে এখানে এনেছি। কিন্তু এখন আমি তাঁর জন্য একটা আরামপ্রদ পালকীর ব্যবস্থা করতে চাচ্ছি।

বস্তির সরদার কাছে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথা শুনছিলো। সে বললো ঃ 'আমার নিজের পালকী আমি আপনাকে দেবো।'

আনওয়ার আলী বললেন ঃ 'আমার সাথীরা খুবই ক্লান্ত। যখমীকে তু'লে নেবার জন্য কয়েকজন বলিষ্ঠ লোক প্রয়োজন।'

ঃ 'লোকের ব্যবস্থাও হ'য়ে যাবে, কিন্তু আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, দীর্ঘ সময় আপনার কিছু খাওয়া হয়নি। আমি আপনাদের খানার ইনতেযাম করছি।'

আনওয়ার আলী বললেন ঃ 'আমার সাথীরা আমার চাইতেও বেশী ভুখা। আপনি আটজনের খানার বন্দোবস্ত করুন। আমি তাদেরকে নিয়ে আসছি। যখমীর

জন্য দুধের ব্যবস্থা করতে হবে। আপনার কাছে কাগজ-কলম থাকলে চেয়ে নিন। যাবার আগে একটা জরুরী চিঠি লিখতে চাই আমি।'

ঃ 'আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি।' বলে সরদার ভিতরে চলে গেলেন। আনওয়ার আলী ঢুন্ডিয়া দাগের প্রতি লক্ষ্য ক'রে বললেন ঃ 'আপনি তিন-চারজন নির্ভরযোগ্য লোককে ঘোড়া তৈরী করবার হুকুম দিন। জরুরী পয়গাম দিয়ে আমি তাদেরকে সেরিংগাপটম পাঠাবো।

বস্তির সরদার তিন-চার মিনিট পর কাগজ-কলম শুদ্ধ একটি ছোট কাঠের বাক্স নিয়ে এলো। আনওয়ার আলী দেউড়ির ভিতরে একটা খাটের উপর বসে চিঠি লিখতে লাগলেন। পরপর তিন টুকরা কাগজে কয়েক পংক্তি করে লিখে তিনি দেউড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন। ঢুন্ডিয়া দাগকে তিনি বললেন ঃ 'আপনার লোক তৈরী?'

ঃ 'জি হ্যাঁ, তারা বাইরে দাঁড়িয়ে আপনার হুকুমের ইনতেযার করছে।' আনওয়ার আলী ঢুন্ডিয়া দাগের সাথে হাবেলীর চারদেয়ালের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। সামনে চারজন সিপাহী ঘোড়ার বাগ ধরে দাঁড়িয়ে। একে একে তিনটি চিঠি এক সিপাহীর হাতে দিয়ে তিনি বললেন ঃ 'সেরিংগাটমে গিয়ে তুমি প্রথম চিঠিটা আমার গৃহে লা গ্রাঁদের বিবিকে দেবে। দ্বিতীয় চিঠিটা লিখেছি সেরিংগাপটমের ফউজদারের নামে। লা গ্রাঁদের বিবিকে বলবে যে, তাঁর স্বামী যখমী হয়েছেন এবং আমি তাঁকে চাতলদুর্গে নিয়ে যাচ্ছি। তিনি যদি চাতলদুর্গে আসতে রাযী থাকেন, তা'হলে সেরিংগাপটমের ফউজদার তাঁর সফরের জরুরী ইনতেযাম করে দেবেন। তৃতীয় চিঠিটা আলাদা ক'রে রেখো। এটি পথের সকল চৌকির অফিসারদের নামে। কোথাও তাযাদম ঘোড়া হাসিল করতে অসুবিধা হলে চিঠিটা তোমার কাজে আসবে। তোমরা অবিলম্বে রওয়ানা হ'য়ে যাও।'

সিপাহীরা সালাম করে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চললো।

কয়েকদিন পর। লা গ্রাঁদ চাতলদুর্গ কেল্লার এক কামরায় পড়ে রয়েছেন। তুংগভদ্রা নদী পার হওয়ার পর তিনি বেশীর ভাগ পথ অতিক্রম করেছেন অচেতন বা অর্ধ-চেতন অবস্থায়। চাতলদুর্গ সেরিংগাপটমের পরেই খোদাদাদ সালাতানাতের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা ঘাঁটি এবং এখানে লা গ্রাঁদের দেখাশোনার কাজে রয়েছেন ফউজের শ্রেষ্ঠ হাকীম ও ক্ষতচিকিৎসক। তাঁর যখম থেকে গুলী বের ক'রে ফেলা হয়েছে। কিন্তু চাতলদুর্গের শ্রেষ্ঠ-চিকিৎসকের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও দিনের পর দিন তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটছে। বিষাক্ত ক্ষত ও ক্রমাগত জ্বরের দরুন তাঁর দেহ কংখালসার হয়ে গেছে। আনওয়ার আলী সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর শুশ্রূষার জন্য হাযির থাকেন। এক রাত্রে তাঁর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়লো এবং আনওয়ার আলী তাঁর শয্যার কাছে এক কুরসীতে বসে থাকলেন। লা গ্রাঁদ বললেন ঃ 'মসিয়েঁ, আপনি ঘুমোন গে। আপনাকে এত তকলীফ দেবার হক নেই আমার।'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'লা গ্রাঁদ, আমার জন্য তুমি ভেবো না। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আমিও ঘুমাবো।'

লা গ্রাঁদ বললেন ঃ 'ঘুমের কথা ভাবতেও ভয় হয় আমার, আমার মনে হয়, ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো আর চোখ খুলবে না আমার। আপনার সান্ত্বনা সত্ত্বেও আমার সময় আসন্ন। আমার চিকিৎসক মুখে কিছু বলেন না, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিই বলে দেয় যে, আমি মৃত্যুর দরযায় পৌছে গেছ। জিনের প্রতীক্ষায় আমি লড়াই করছি মৃত্যুর সাথে। পথে আমার বারবার মনে হয়েছে, সে হয়তো এখানে এসে আমার ইনতেযার করছে। এখন বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। আপনার দূতের তরফ থেকে কোনো ত্রুটি না হলে এতক্ষণে তার পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিলো। আমার ভয় হয়, আমি বেশী সময় তার ইনতেযার করতে পারবো না। আপনি আমায় এখানে না এনে সেরিংগাপটম নিয়ে গেলেই ভালো করতেন।'

আনওয়ার আলী বললেন ঃ 'লা গ্রাদঁ, সেরিংগাপটম বহুত দূর। তথাপি আমার বিশ্বাস, জিন দু'এক দিনের মধ্যেই এসে যাবেন।'

লা গ্রাঁদ আশান্বিত হ'য়ে বললেন ঃ 'আপনি পাহারাদারদের বলে দিয়েছেন যেনো রাতের বেলায় পৌঁছলে তাঁকে দরযা খুলে দেয়? আমার ভয় হয়, রাত্রে এলে হয়তো ওরা ওকে কেল্লায় ঢুকতেই দেবে না।'

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তিনি এলে পাহারাদার এখানেই তাঁকে পৌঁছে দেবে।'

ঃ না' সে আসবে না।' বেদনার্ত লা গ্রাঁদ চোখ বন্ধ ক'রে বললেন।

আনওয়ার আলী সস্নেহে তাঁর পেশনীতে হাত রেখে বললেন ঃ 'দোস্ত, তোমার হতাশ হওয়া ঠিক হবে না।'

আনওয়ার আলী সারারাত লা গ্রাঁদের পাশে বসে রইলেন। কখনো তিনি বেদনায় কাতরাতে কাতরাতে চোখ খোলেন এবং তাঁর সাথে কথা বলতে থাকেন, আবার কখনো দীর্ঘ সময় বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকেন। আনওয়ার আলী নামাযের জন্য উঠলেন এবং কিছুক্ষণ পরে আবার এসে বসলেন তাঁর পাশে। লা গ্রাঁদ তখনো ঘুমে অচেতন। আনওয়ার আলী ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ হাই তু'লে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর কামরায় কারুর পদশব্দ শোনা গেলো। তিনি চোখ খুললেন। তাঁরা সামনে দাঁড়িয়ে জিন।

মুহূর্তের জন্য আনওয়ার আলী তাঁর চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। কুরসি ছেড়ে উঠে তিনি একদিকে স'রে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'লা গ্রাঁদকে জাগানো এখন ঠিক হবে না। অনেক দেরী ক'রে ঘুম এসেছে। আপনি তশরিফ রাখুন।'

জিনের দৃষ্টি লা গ্রাঁদের মুখের উপর নিবদ্ধ এবং তাঁর চোখে চকচক করছে অশ্রুবিন্দু।

ঃ 'এখন ওঁর অবস্থা কেমন?' জিন কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন।

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'আমার বিশ্বাস, আপনাকে দেখে ওঁর অবস্থা আরো ভালো হবে। তশ্‌রীফ রাখুন।'

জিন এগিয়ে গিয়ে কুরসির উপর বসলেন। আনওয়ার আলী আর একখানা কুরসি টেনে তাঁর সামনে বসলেন। জিন তাঁর কম্পিত হস্তে লা গ্রাঁদের পেশানীতে হাত রেখে আনওয়ার আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ ওঁর জ্বর খুব বেশী।'

আনওয়ার আলী লা গ্রাঁদের নাড়ি দেখে বললেন ঃ 'রাতের বেলায় ওঁর জ্বর আরো বেশী ছিলো। আমি এক্ষুণি, চিকিৎসককে ডেকে আনছি। আম্মাজান কেমন ছিলেন?'

ঃ 'তিনি বেশ ভালোই ছিলেন। মাফ করবেন, তাঁর কথা বলতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এখনো আমার মন স্থির হয়নি। সব ঘটনাই আমার কাছে মনে হয় এক ভয়ানক স্বপ্ন।' কথা বলতে বলতে জিনের চোখে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তিনি দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগলেন।

আনওয়ার আলী বললেন ঃ 'জিন, লা গ্রাঁদের মনে সাহস সঞ্চার করার জন্য আপনাকে হিম্মতের পরিচয় দিতে হবে। আমি এক্ষুণি আসছি।'

আনওয়ার আলী কামরার বাইরে চলে গেলেন। লা গ্রাঁদ কিছুক্ষণ কাতরাতে কাতরাতে চোখ খুললেন এবং কয়েক মুহূর্ত জিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মোহাচ্ছনের মতো। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে 'জিন', 'জিন', বলে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং জিন তাঁর মাথাটি রাখলেন তাঁর সিনার উপর।

লা গ্রাঁদ তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন ঃ 'জিন, তুমি এখানে রয়েছো আর আমি তোমার সন্ধান করে ফিরেছি হাজারো মাইল দূরে প্যারীর অলিগলিতে। তোমার প্রতীক্ষায় আমি লড়াই করেছি মৃত্যুর সাথে। এখন আমার হিম্মত নিঃশেষ হয়ে গেছে। জিন, আমি তোমার শোকরগুযারী করছি। তুমি কবে এসেছো? এখানে এসেই আমায় জাগানো উচিত ছিলো তোমার।'

ঃ 'আমি এখনই এসেছি।' জিন বললেন ঃ 'আনওয়ার আলী বললেন যে, খুব দেরীতে ঘুমিয়েছো তুমি।'

ঃ 'তিনি কোথায় গেলেন?'

ঃ 'তিনি চিকিৎসক ডেকে আনতে গেছেন।'

ঃ 'এখন আর চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই আমার । জিন, তোমার অশ্রু দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে। তোমার মুখে চিরন্তন হাসি দেখাই আমার যিন্দেগীর সব চাইতে বড়ো আকাংখা। কিন্তু অশ্রু ছাড়া আর কিছুই তোমায় দিতে পারিনি আমি।'

জিন কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ 'এখন তোমার তবিয়ত কেমন? যখমে বেশী কষ্ট হচ্ছে না তো?'

লা গ্রাঁদ তাঁর ঠোঁটের উপর বিষন্ন হাসি টেনে এনে জওয়াব দিলেনঃ 'তুমি আমার সামনে, এ ছাড়া আর কোনো অনুভূতি নেই আমার। মৃত্যুর মুখও আমার কাছে ততো ভয়ানক মনে হয় না এখন।'

লা গ্রাঁদ কিছুক্ষণ কাশবার পর পানি চাইলেন। জিন জলদি উঠে কাছের সোরাহী থেকে পেয়ালা ভরে আনলেন। লা গ্রাঁদ বেদনায় কাতরাতে কাতরাতে উঠে বসলেন। তারপর জিনের হাত থেকে পানির পেয়ালা নিয়ে মুখে তুললেন। পানি পান করে বিছানায় শুয়ে নিশ্চল হয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তার দু'চোখে ফুঠে উঠলো অসহনীয় বেদনার অভিব্যক্তি।

আনওয়ার আলী, চিকিৎসক ও এক সিপাহী কামরায় প্রবেশ করলেন। সিপাহীর হাতে ঔষধের বাক্স। চিকিৎসর লা গ্রাঁদের নাড়ি পরীক্ষা করে আনওয়ার আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'আমি ওঁর যখম সাফ ক'রে পট্টি বদল করে দিতে চাচ্ছি। মাদাম কয়েক মিনিটের জন্য পাশের কামরায় বসালে ভালো হয়।'

জিন বললেন ঃ 'না, আমি এখানেই থাকবো।'

চিকিৎসক যখন পট্টি খুলছেন, আনওয়ার আলী বললেন ঃ 'মাদাম,আপনি বসুন।'

জিন কুরসির উপর বসলেন। কয়েক মিনিট পর লা গ্রাঁদের ঔষধ পট্টি শেষ করে চিকিৎসক আনওয়ার আলীকে বললেন ঃ 'আজ ওঁর অবস্থা কিছুটা ভালো মনে হচ্ছে। কিন্তু ওঁর বিশ্রাম খুব বেশী প্রয়োজন। বেশী কথা বলাও ঠিক হবে না ওঁর। আমি ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিন ঘন্টা পর একটি করে পুরিয়া খাওয়াতে থাকুন। ঘুমিয়ে পড়লে জাগাবার চেষ্টা করবেন না।'

চিকিৎসক ও তার সাথী কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। আনওয়ার আলী জিনের কাছে আর এক কুরসির উপর বসলেন। এক নওকর প্লেটের উপর দুধের বাটি নিয়ে কামরায় ঢুকলো। আনওয়ার আলী এগিয়ে লা গ্রাঁদকে ধরে তুলতে গিয়ে বললেন ঃ 'গ্রাদ, তোমার নাশতা এসে গেছে।'

লা গ্রাঁদ বললেন ঃ 'আমার আগে জিনের দিকে খেয়াল করা আপনার উচিত ছিলো।'

ঃ 'তুমি ভেবো না। জিনের খানা আসছে।'

নওকর প্লেট এগিয়ে ধরলে আনওয়ার আলী দুধের পেয়ালা লা গ্রাঁদের মুখে তুলে ধরলেন।

কয়েক ঢোক দুধ গিলে লা গ্রাঁদ বললেন ঃ 'বাস্, এর বেশী আমার চলবে না।'

লা গ্রাঁদ পেয়ালাটি প্লেটে রাখলে আনওয়ার আলী নওকরকে বললেন ঃ এবার তুমি মেম সাহেবের খানা নিয়ে এসো, তারপর ওঁর জন্য একটা খাট পেতে দেবে এখানে।'

জিন বললেন ঃ 'এখন ভুখ নেই আমার।'

ঃ ' না, আপনি-কম-বেশী কিছু খেয়ে নিন।'

নওকর বললো ঃ 'আপনার খানাও নিয়ে আসি?'

আনওয়ার আলীর পরিবর্তে লা গ্রাঁদ জওয়াব দিলেন ঃ 'হ্যাঁ নিয়ে এসো। তোমার ধারণা, উনি আজ খানা খাবেন না? মনে হয়, আজ উনি নাশ্‌তাও করেন নি।'

এক ঘন্টা পর আনওয়ার আলী লা গ্রাঁদ ও জিনের এজাযত নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেলেন। কয়েকদিন বিনিদ্র রাত্রি কাটানো ও ক্লান্তির ফলে তাঁর শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে চলছে। তিনি চুপচাপ একটা খাটের উপর শুয়ে পড়লেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি গভীর ঘুমে অচেতন। প্রায় দুটোর সময়ে নওকর এসে ঘুম ভাঙিয়ে তাঁকে বললো ঃ 'মেম সাহেব আপনাকে ডাকছেন। তিনি বললেন, লা গ্রাঁদের অবস্থা ভালো নয়।'

আনওয়ার আলী উঠে ছুটে গেলেন তাঁদের কামরায়। লা গ্রাঁদ ভীষণ কষ্টে কাতরাচ্ছেন এবং জিন বসে রয়েছেন তাঁর শিয়রে।

ঃ 'কি হল?, আনওয়ার আলী কাছে গিয়ে চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন। জিন জওয়াব দিলেন ঃ 'ওঁর অবস্থা ভালো নয়। এক্ষুণি উনি আপনার নাম ধরে ডাকছিলেন।'

আনওয়ার আলী ফিরে দরযার দিকে তাকিয়ে নওকরকে বললেন ঃ তুমি হাকীম সাহেবকে ডেকে নিয়ে এস এক্ষুণি।' নওকর চলে গেলো।

ডুবন্ত আওয়াযে লা গ্রাঁদ বললেন ঃ 'দোস্ত আমার, হাকীমকে ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি এসে বসুন আমার কাছে।'

আনওয়ার আলী কুরসী টেনে তাঁর কাছে বসলেন।

লা গ্রাঁদ কষ্টের আতিশয্যে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকলেন। তারপর আনওয়ার আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'এ কথা বলে দেবার প্রয়োজন নেই যে, আমার পর তুমিই জিনের শেষ অবলম্বন। জীবনে তুমিই আমার সবার বড়ো উপকারী বন্ধু এবং মৃত্যুর মুহূর্তেও আমি রুহের শান্তির জন্য এতটুকু আশ্বাস চাই যে, জিনের মনেও তুমি অসহায়তার অনুভূতি আসতে দেবে না।'

ঃ 'লা গ্রাঁদ!- অশ্রুসজল চোখে আনওয়ার আলী কিছু বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরুলো না।

লা গ্রাঁদ বললেন ঃ 'আনওয়ার আলী, জিনকে আমি অশ্রু ব্যতীত আর কিছু দিতে পারিনি, কিন্তু তুমি ইচ্ছা করলে তাঁকে সকল হাসি-আনন্দই দিতে পারবে।

আনওয়ার আলী একবার জিনের মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করলেন আর তাঁর চোখ দিয়ে বয়ে যেতে লাগলো অঝোর অশ্রুধারা। তিনি কাতর অনুনয়ের স্বরে জিনকে বললেন ঃ 'তোমার স্বামীকে সান্ত্বনা দাও। বলো যে, তাঁকে তোমার প্রয়োজন। খোদার রহমত থেকে তাঁকে হতাশ হতে দিও না। আমার বিশ্বাস, উনি ভালো হয়ে যাবেন।'

জিন একখানা হাত লা গ্রাঁদের মাথায় রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। লা গ্রাঁদ বললেন ঃ আনওয়ার আলী, এখন আমায় সান্তনা দিয়ে কোনো ফায়দা নেই। আমি জানি, আমার সময় আসন্ন। কুদরতের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই আমার। আমি শুধু এতটুকু আশ্বাস চাই যে, জিন আমার পর অসহায় হবে না।' তিনি জিনের হাতখানি বুকে চেপে ধরলেন। অপর হাতখানা আনওয়ার আলীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঃ 'আনওয়ার আলী, আমার কাছে এসে একখানা হাত আমার হাতে দাও।'

আনওয়ার আলী কুরসী কাছে টেনে নিয়ে লা গ্রাঁদের হাতে দিলেন। লা গ্রাঁদ মুখে বিষন্ন হাসি এনে আনওয়ার আলীর হাতখানা টেনে জিনের হাতের উপর রেখে গভীর শ্বাস টেনে চোখ বন্ধ করলেন।

আনওয়ার আলী তাঁর দেহে কম্পন অনুভব করে উৎকণ্ঠার স্বরে ডাকলেন ঃ 'লা গ্রাঁদ! লা গ্রাঁদ!!

লা গ্রাঁদ চোখ খুললেন। তাঁর শ্বাস বেরিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর ঠোঁটের উপর খেলা করছে এক মুগ্ধকর হাসির রেখা। ধীরে ধীরে আনওয়ার আলী ও জিনের হাতের উপর তাঁর হাতের চাপ ঢিলা হয়ে এলো।

চিকিৎসক হাসিমুখে কামরায় প্রবেশ করলেন।

ঃ 'আপনি বহুত দেরী করে এসেছেন।' আনওয়ার আলী বললেন।

ঃ 'আমি নামায পড়তে মসজিদে গিয়েছিলাম।' হাকীম বললেন।

লা গ্রাঁদের দেহটা একটুখানি নড়ে উঠলো এবং আনওয়ার আলী তাঁর হাত টেনে নিলেন। হাকীম জলদী করে নাড়ি দেখে মাথা নত করলেন।

জিন কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে থাকলেন। তারপর বে-এখতিয়ার লা গ্রাঁদের সিনার উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

হাকীম আনওয়ার আলীর কাঁধে হাত রেখে বললেন ঃ 'এমনি বাহাদুরীর সাথে আমি খুব কম লোককে মওতের মোকাবিলা করতে দেখেছি।'

কয়েক মিনিট পর হাকীম কামরার বাইরে চলে গেলেন। আনওয়ার আলী কিছুক্ষণ নিশ্চল হ'য়ে থাকলেন। অবশেষে তিনি উঠে জিনের দু'বাহু ধরে তুলে বললেন ঃ 'জিন, তোমার ভেঙে পড়লে চলবে না। এখন সবর করা ছাড়া কোনো

চারা নেই।' সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্বে লা গ্রাঁদকে পুরো ফউজী সম্মানের সাথে চাতলদুর্গে একটি ছোট ইসায়ী কবরস্থানে দাফন করা হলো।

এক হফতা পর জিন তাঁর কামরার জানালার কাছে দাড়িঁয়ে আছেন। আসমান মেঘে ঢাকা। হালকা হালকা বৃষ্টিপাত হচ্ছে। দরযায় কারুর করাঘাত শোনা গেল।

ঃ 'কে?' জিন ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

আনওয়ার আলীর আওয়ায শোনা গেল ঃ 'ভিতরে আসতে পারি?'

ঃ 'আসুন।'

আনওয়ার আলী ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁরা সামনাসমানি কুরসিতে বসলেন।

আনওয়ার আলী কিছুক্ষণ মাথা নত ক'রে বসে থাকার পর বললেন ঃ 'জিন, আমার ভয় হয়, মারাঠারা খুব শীগ্‌গিরই চাতলদুর্গের উপর হামলা করবে। এ অবস্থায় আপনার এখানে থাকা ঠিক নয়। আমার ইচ্ছা, আপনি অবিলম্বে সেরিংগাপটমে চলে যান। ফউজদারের মতও তাই এবং তিনি ওয়াদা করেছেন যে, কাল ভোরেই তিনি আপনার সফরের বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন।'

জিন বিষন্ন কণ্ঠে জওয়াব দিলেন ঃ 'আপনার হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করবো না।'

ঃ 'এটা হুকুম নয়, নিরুপায় হ'য়ে আমি আপনাকে এ কথা বলেছি। আমার সম্পর্কে এখনো সেরিংগাপটম থেকে কোনো নির্দেশ আসেনি। ফউজদার আমায় এখানে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এও সম্ভব, হয়তো কয়েকদিনের মধ্যে আমি সেরিংগাপটম অথবা অপর কোনো ফ্রন্টে চলে যাবো।'

জিন বললেন ঃ 'আমি কাল চলে যেতে তৈরী, কিন্তু আপনার কাছ থেকে একটা ওয়াদা নিতে চাচ্ছি।'

ঃ 'বলুন।'

ঃ 'আপনার কাছে কিছু দাবি করবার হক আমার নেই, কিন্তু আমার জন্য না হলেও আপনার মায়ের সান্ত্বনার জন্য অবশ্যি চিঠি লিখবেন। ধাড়ওয়ার থেকে কয়েক হফ্‌তা আপনার কোনো খবর না পেয়ে তিনি বড়ই পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন।

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'ধাড়ওয়্যারের অবস্থাই ছিলো এমন যে আমার পক্ষে চিঠি পাঠানো ছিলো অসম্ভব। কিন্তু এখন আমি প্রতি হফ্‌তায় কম-সে কম একটা করে চিঠি লিখবো। তা'ছাড়া লা গ্রাঁদের মৃত্যুর পর আমার উপর আপনার হক কম নয়, এখন তা' আরো বেশী হয়ে গেছে। আপনি এখন আরাম করুন গে। মওসুম ভালো থাকলে কাল ভোরে আপনাকে রওয়ানা করে দেওয়া যাবে।'

আনওয়ার আলী উঠে দাঁড়ালেন এবং কয়েক মুহূর্ত দেরী করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। জিন বহুক্ষণ নির্বাক নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। লা গ্রাঁদের মৃত্যুর পর এমন মওকা খুব কম এসেছে, যখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে আনওয়ার আলীর সাথে কথা বলতে পেরেছেন। তিনি সকাল-সন্ধ্যায় সে কামরায় আসেন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকটি সান্ত্বনা ও আশ্বাসসূচক কথা বলে ফিরে যান। খাওয়ার সময়েও জিন অনুভব করেন যে, তিনি নেহায়েত নিরুপায় অবস্থায় তাঁর সাথে শরীক হন, নইলে তাঁর চিন্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে অপর কোথাও। কখনো কখনো তাঁর দৃষ্টি অবচেতনভাবে এসে নিবদ্ধ হয়ে জিনের মুখের উপর, কিন্তু যখন জিন তাঁর দিকে তাকাবার চেষ্টা করেন, তখন তিনি কেমন পেরেশন হয়ে দৃষ্টি অবনত করেন। জিন কোনো প্রশ্ন করলে তিনি সংক্ষিপ্ত জওয়াব দিয়ে খামোশ হয়ে যান।

গোড়ার দিকে জিনের মনে হত, যুদ্ধের ক্লেশ ও লা গ্রাঁদের মৃত্যুর আঘাত আনওয়ার আলীকে ক্লিষ্ট করে তুলেছে; কয়েক দিন, কয়েক হফ্‌তা অথবা কয়েক মাস পর তাঁর স্মৃতি থেকে বিগত দুর্ঘটনার ছাপ মুছে যাবে। কিন্তু এখন তিনি অনুভব করছেন যে, সময়ের সাথে সাথে তাঁদের মাঝখানে অপরিচয়ের পর্দা আরো পুরু হচ্ছে। যে আনওয়ার আলীর সাথে তাঁর দেখা হয়েছিলো পন্ডিচেরীর বন্দরগাহে এবং যাঁর সাথে তিনি সেরিংগাপটম পর্যন্ত সফর করেছিলেন, তিনি যেনো এক রহস্য জিনের কাছে।

পরদিন ভোরে তিনি সফরের জন্য তৈরী হয়ে আনওয়ার আলীর ইনতেযার করছেন। এক সিপাহী কামরায় প্রবেশ করে বললো ঃ 'আপনার সাথীরা সফরের জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে?'

জিন ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন ঃ 'আনওয়ার আলী কোথায়?

সিপাহী জওয়াব দিলো ঃ 'তিনি কেল্লার দরযায় দাঁড়িয়ে আছেন। আসুন। জিন সিপাহীল সাথে চললেন। সেরিংগাপটম থেকে তাঁর সাথে আগত সিপাহীরা ঘোড়ার বাগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেল্লার দরযার বাইরে এবং আনওয়ার আলী তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ 'মেম সাহেবের তবিয়ত ভালো নয়। পথে তোমাদেরকে তাঁর দিকে খুব খেয়াল রাখতে হবে। পথে তাঁর কোনো তকলীফ হবার অভিযোগ আমার কাছে এলে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। কয়েকদিন পথে তোমাদের কোনো বিপদের আশংকা নেই তাই আমার ইচ্ছা, তোমরা নিশ্চিন্ত আরামে সফর করবে।'

জিন আনওয়ার আলীর পিছনে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিলেন। তাঁর নিরুত্তাপ মনোভাব সম্পর্কে তাঁর ধারণায় যেনো একটা পরিবর্তন আসছে। আনওয়ার আলী ফিরে তাঁর দিকে তাকিয়ে একটি ঘোড়ার বাগ ধরে কাছে এনে ফারসী ভাষায় বললেন ঃ 'আপনি সওয়ার হয়ে যান এবং দুপুরের আগেই এক মনযিল অতিক্রম করুন।'

জিন অশ্রুসজল চোখে ঘোড়ার বাগ হাতে নিলেন। আনওয়ার আলী তাঁকে ধরে বসিয়ে দিলেন যিনের উপর। জিন দ্বিধাগ্রস্তের মতো কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন

তাঁর দিকে। আনওয়ার আলী বললেন ঃ 'জিন, খোদা যিন্দেগী দিলে আবার দেখা হবে আমাদের। খোদা হাফিয।'

জিনের সাথীরা ঘোড়ায় সওয়ার হল। 'খোদা হাফিয' বলে তিনি ঘোড়ার বাগ ঘুরিয়ে দিলেন। কাফেলা চললো গন্তব্য পথে।

মহীশূরে জিনের যিন্দেগীর এক অধ্যায় কেটে গেছে। আনওয়ার আলীর মুহূর্তের কথাটি তাঁর কাছে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। আনওয়ার আলী যেনো তাঁর কাছে এক রহস্য নন এখন।

আঠারো

ধাড়ওয়ার বিজয়ের পর দক্ষিণদিকে মারাঠাদের পথ সাফ হয়ে গেলো। পরশুরাম ভাও এপ্রিল মাসের শেষভাগে তুংগভদ্রা পার হলেন এবং রামগির দখল করে বসলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের আশা ছিল, ধাড়ওয়ারী বিজয়ের পর ভাওয়ের লশকর কোম্পানীর সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হবে। কিন্তু পরশুরাম ভাও পশ্চাদ্দিক হেফাযত না করে এগিয়ে চলা বিপজ্জনক মনে করলেন। তিনি রামগির থেকে এগিয়ে গেলেন চাতলদুর্গের দিকে। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে তীব্র বাধার মোকাবিলা করতে হল।

মারাঠাদের আর এক লশকর গণপত রাও মীহনডেলের নেতৃত্বে বিডনোরের দিকে এগিয়ে গিয়ে কয়েকটি এলাকা দখল করে নিলো। কিন্তু শামুগার ফউজ জাওয়াবী হামলা করে তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করলো।

এহেন পরিস্থিতিতে পরশুরাম ভাও চাতলদুর্গের উপর হামলা মুলতবী রেখে ফউজের এক অংশ বিডনোর ফ্রন্টে পাঠিয়ে দিলেন। মারাঠারা বিডনোরের কয়েকটি এলাকা পুনরায় জয় করে নিলো। এরপর মারাঠাদের অগ্রগতি খুব মন্থর হয়ে গেলো। লর্ড কর্ণওয়ালিস ইতিমধ্যে মীর নিযাম আলীর সাথে বাংগালোর থেকে সেরিংগাপটমের দিকে অগ্রগতি শুরু করেছিলেন। তাঁকে আবার নতুন করে একবার ভাবতে হল যে, তাঁদের মারাঠা মিত্র ধাড়ওয়ার থেকে বেরিয়ে এসে আর এক সংকটে পতিত হয়েছে।

এই সময় পর্যন্ত মারাঠা ফউজের সিপাহসালার হরিপন্থের তৎপরতা সারা এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিলো এবং দক্ষিণে অগ্রসর হবার জন্য তিনি অনুকূল পরিস্থিতির প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনি যখন সেরিংগাপটমের দিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস ও মীর নিযাম আলীর সেনাবাহিনীর অগ্রগতির খবর পেলেন, তক্ষুণি তিনি উত্তর ও পশ্চিমের প্রত্যেক ফ্রন্টের মারাঠা ফউজকে সেরিংগাপটমের দিকে এগিয়ে চলার হুকুম দিলেন। বর্ষার মওসুম শুরু হবার আগেই লর্ড কর্ণওয়ালিস সেরিংগাপটম জয় করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মারাঠাদের মন্থর গতির দরুন তাঁর যাবতীয় পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। বাংগালোর থেকে বেরিয়ে আসার পর রামগির ও মহীশূরের আরো কয়েকটি কেল্লার ভয়ে তিনি এক দীর্ঘ ও দুর্গম পথ ধরলেন। কিন্তু এখানেও তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে কঠিন সংকটের মোকাবেলা

করতে হল। পথের সকল বস্তি তখন জনশূন্য হয়ে গেছে এবং ইংরেজ ফউজের নযরে পড়ছে চারা ও খাদ্যশস্যের জায়গায় শুধু ভস্মস্তূপ। বর্ষা তখন শুরু হয়ে গেছে এবং ছোট ছোট নদীনালাকে দেখা যাচ্ছে দিগন্ত প্রসারী বড়ো নদীর মতো। নৈশ আক্রমণকারী সৈন্যদলের উপর্যুপরি হামলার দরুন রসদ ও সেনা সাহায্য ব্যবস্থা পূর্ণ বিশৃংখল হয়ে গেছে। চারার ঘাটতির দরুন প্রতিদিন অসংখ্য জানোয়ার মারা পড়ছে। সিপাহীদের অর্ধহারে দিন গুযরান করতে হচ্ছে। প্রায় দশদিন মারামারির পর কর্ণওয়ালিশ ফউজ অগুণ্তি মুসীবতের মোকাবিলা করার পর সেরিংগাপটমের নয় মাইল পূর্বে কাবেরী নদীর কিনারে এসে পৌঁছলো। এই সময়ের মধ্যে সুলতানের নিয়মিত ফউজের মোকাবিলা না করেই তাদেরকে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হল, তা' কোনো বড়ো যুদ্ধের ক্ষতির চাইতে কম নয়। সেরিংগাপটমের কাছে পৌঁছলে কাবেরী নদীর বিক্ষুব্ধ তরংগ তাঁদের পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো।

একদিন মুষলধারে বর্ষণ হচেছ। মুনাওয়ার খান ছুটতে ছুটতে বাড়ির বারান্দায় প্রবেশ করে বুলন্দ আওয়াযে চীৎকার করে বললো ঃ 'বিবিজী মুরাদ আলী সাহেব এসে গেছেন।'

ফরহাত ও জিন নীচু তলার এক কামরা থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলেন। মুরাদ আলী আঙিনায় প্রবেশ করলেন। তাঁর লেবাস কাঁদা-পানিতে একাকার। ফরহাত তাঁকে দেখেই বারান্দার বাইরে গিয়ে বেএখ্‌তিয়ার তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। মুরাদ আলী বললেন ঃ 'আম্মাজান, বৃষ্টি পড়ছে আর আমার কাপড় কাদায় ভরা।'

কিন্তু মুরাদ আলীর উপস্থিতি ছাড়া আর কোন কিছুরই অনুভূতি নেই ফরহাতের। তিনি মুরাদ আলীর চোখে ও কপালে চুমু খেয়ে বললেন ঃ 'আমার লাল, তোমায় দেখার পর আমি সারা জীবন দাঁড়িয়ে থাকতে পারি বৃষ্টির মধ্যে।'

মুরাদ আলী মায়ের বাহু ধরে বারান্দার দিকে নিয়ে চললেন। সেখানে জিনকে দেখে কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখে কোনো কথা সরলো না। ফরহাত আনন্দাশ্রু মুছে ফেলে অভিযোগের স্বরে বললেন ঃ 'মুরাদ, তুমি আমায় বড়োই পেরেশান করেছো। কয়েক মাস আমি তোমার কোনো খবর পাইনি। তুমি ছিলে কোথায়?'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'আম্মাজান, আমাদের ফউজ প্রথম মালাবারের উপকূল চৌকির পাহারায় নিযুক্ত ছিলো। এরপর আমায় পাঠানো হল বিডনোরের উত্তরে মারাঠা লশকরের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। তারপর দরিয়ার কিনারে একটি ছোট কেল্লার হেফাজতের ভার পড়লো আমার উপর। এ অবস্থায় চিঠি লেখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।'

ফরহাত বললেন ঃ 'বেটা, আমি তোমার সাথে অনেক কথা বলবো। কিন্তু তার আগে তুমি গোসল করে কাপড় বদল করে এসো।'

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'আম্মাজান, সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি এমনি বৃষ্টিপাত চলতে থাকে, তা'হলে আমার লেবাস পরিবর্তন করে কোনো ফায়দা হবে না। সূর্যাস্তের পরেই আমায় ফিরে যেতে হবে।'

'কোথায়?' ঃ মা উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন।

মুরাদ আলী হেসে বললেন ঃ 'আম্মাজান, পেরেশান হবার কোনো কারণ নেই। এবার আমি বেশী দূর যাবো না। এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে দরিয়ার অপর পারে এক পাহাড়ী চৌকির হেফাজতে নিযুক্ত করা হয়েছে আমায়। সেরিংগাপটম কেন্দ্রে পৌঁছা মাত্রই এই হুকুম পেয়েছি।

ফরহাত মুনাওয়ার খানকে বললেন ঃ 'মুনাওয়ার, তুমি মুরাদের কাপড়ের একটা জোড়া গোসলখানায় রেখে দাও।

মুরাদ আলী সাহস করে জিনকে সম্বোধন করে বিষন্ন কণ্ঠে বললেন ঃ 'বোন, লা গ্রাঁদের মৃত্যুতে আমি বড়োই দুঃখিত। আমি চাতলদুর্গ হয়ে এসেছি।

ফরহাত চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন ঃ 'আনওয়ারের সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

ঃ 'জি হ্যাঁ, আম্মাজান!'

ঃ 'আনওয়ার ভালো আছে তো?'

ঃ 'হ্যাঁ, আম্মাজান, বিলকুল ভালো আছেন।'

জিন বহুকষ্টে অশ্রু সংযত করার চেষ্টা করলেন।

ফরহাত বললেন ঃ 'বেটা, চাতলদুর্গ কেল্লার কোনো বিপদের আশংকা নেই তো?'

ঃ 'না আম্মাজান। চাতলদুর্গ কেল্লা খুবই নিরাপদ। তা'ছাড়া মারাঠাদের লক্ষ্য চাতলদুর্গ নয়, সেরিংগাপটম।'

মুনাওয়ার খানকে কামরা থেকে বেরিয়ে বললো ঃ 'জনাব, কোন্ লেবাস আপনার পসন্দ, তা'আমার জানা নেই। তাই সাদা কাপড়ের এক জোড়া ছাড়া একটা নতুন উর্দিও এনে রেখেছি গোসলখানায়।'

মুরাদ আলী হেসে বললেন ঃ 'ভাই, তুমি তো ভারী হুশিঁয়ার হয়ে গেছো। আমার শুধু উর্দিই প্রয়োজন।'

কিছুক্ষণ পর মুরাদ আলী নতুন উর্দি পরিধান করে তাঁর মাতা ও জিনের সাথে উপর তলার এক কামরায় বসে আছেন। জিন লা গ্রাঁদের মৃত্যুর মর্মান্তিক কাহিনী বর্ণনা করে বললেন ঃ 'গত হফ্‌তায় মসিয়েঁ লালী এখানে এসেছিলেন এবং তিনি ইংরেজের অগ্রগতি সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তারপর আমরা গত কয়েকদিনে কোনো সন্তোষজনক খবর পাইনি। কাল আমরা এক খোশখবর শুনলাম যে, দরিয়া পারের এক লড়াইয়ে ইংরেজের অসংখ্য সিপাহী মারা গেছে। '

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'এ খবর ঠিক যে, ইংরেজেদের খুব বড়ো অনিষ্ট হয়ে গেছে এবং ইনশাআল্লাহ, দু'চারদিনের মধ্যেই এর চাইতে বড়ো খোশখবর শুনতে পাবেন। গত কয়েকদিন অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। ইংরেজদের রসদ ও সেনা সাহায্যের সকল পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বাইরে থেকে এখন তারা আনাজের একটি দানাও পাবে না। আমাদের সওয়াররা সকল পথ পাহারা দিচ্ছে। এখন সেরিংগাপটমের চাইতেও বেশী অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে লর্ড কর্ণওয়ালিশের লশকর। কুদরত আমাদের সাহায্য করেছেন। এবার খোদার কাছে দোআ করুন, যেনো কয়েকদিন এ বৃষ্টি শেষ না হয়। আমার বিশ্বাস, কাবেরীর প্লাবনই ইংরেজের উদ্যম-উৎসাহ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এই মওসুমে সেরিংগাপটমের উপর লর্ড কর্ণওয়ালিসের দ্রুত হামলা ঠিক সুলতানের আকাংখার অনুরূপই হয়েছে। ইংরেজ শিবিরের পথ আমরা এমন কঠোরভাবে রুদ্ধ করেছি যে, এযাবত তাঁর যেসব দূত মারাঠাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, তাদের সবাইকে গেরেফতার করা হয়েছে।'

জিন বললেন ঃ 'আপনার ধারণা, মারাঠা ইংরেজদের সাহায্যের জন্য আসবে না?'

ঃ 'তারা অবশ্যই আসবে। তাদের গতিবিধি সম্পর্কে আমি পূর্ণ অবহিত। তাদের অগ্রগতির খবর সুলতানকে জানাবার জন্যই আমি এসেছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাদের আগমনের পূর্বেই আমরা লর্ড কর্ণওয়ালিসের যুদ্ধসাধ মিটিয়ে দিতে পারবো।'

জিন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন ঃ 'মহীশূরের ভবিষ্যত সম্পর্কে আমি হতাশ হইনি। কিন্তু এ যুদ্ধে সুলতানকে হিন্দুস্থানের তিন বিশাল শক্তির সাথে বোঝাপড়া করতে হবে। মহীশূরের সমর-সজ্জাও অবশ্যি তাদের তুলনায় সীমাবদ্ধ।

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'মহীশূরের সিপাহী তার সমর-সজ্জার চাইতে বেশী ঈমান পোষণ করে তার লক্ষ্যের শ্রেষ্ঠত্বের উপর। আমাদের জন্য আযাদীর যিন্দেগী বা ইয্যতের মৃত্যু ব্যতীত যেনো বিকল্প পন্থা নেই। দুশমন আমাদের লাশ পদদলিত করতে পারে, তাদের গোলামীর তকমা পরিধান করতে বাধ্য করতে পারে না আমাদেরকে। কিন্তু আপনার হতাশ হওয়া উচিত হবে না। আমার বিশ্বাস, মহীশূরের ইয্যত ও আযাদীর দুশমন এবার তাদের নিজস্ব ধ্বংসের দরযায় করাঘাত করছে।'

লর্ড কর্ণওয়ালিষের সংকট ক্রমাগত বেড়ে চললো। তিনি যে রসদ সাথে এনেছিলেন, তা' খতম হয়ে এসেছে। চারার অভাবে প্রতিদিন তাঁর শিবিরে অসংখ্য ঘোড়া-গরুর মৃত্যু ঘটছে। ভূখা সিপাহীরা মোরদা জানোয়ারের গোশ্‌ত খাচ্ছে নিরুপায় হয়ে। ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের ফলে শিবিরে ক্রমবর্ধিত আবর্জনা সঞ্চিত হয়ে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হচ্ছে এবং লর্ড কর্ণওয়ালিসের কাছে তাঁর শিবিরটিকে মনে হচ্ছে যেনো এক বিরাট হাসপাতাল। মহীশূরের নৈশ হামলাকারী সিপাহীরা কখনো দিনে, আবার কখনো রাতে আশপাশের টিলা ও পাহাড়ের উপর

দেখা দিয়ে কয়েক মিনিট গুলীবর্ষণ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। কোম্পানীর সিপাহীদের মধ্যে এমন ভীতির সঞ্চার হয়েছে যে, তাদের শিবিরে কেউ রাত্রে ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে উঠলেও গোটা শিবিরে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে। মীর নিযাম আলীর সিপাহীদের অবস্থা ইংরেজ সিপাহীদের চাইতেও শোচনীয়।

এহেন পরিস্থিতিতে লর্ড কর্ণওয়ালিশ অবিলম্বে সেরিংগাপটমের উপর হামলা করার ফয়সালা করলেন। কেল্লার কাছে নদীর যে অংশটি পার হয়ে যাবার মতো, তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে এক পাহাড় এবং তার চূড়ার উপর পাতা রয়েছে মহীশূরের তোপ। কর্ণওয়ালিস পূর্ণ বিক্রমে হামলা করলেন সেই পাহাড়ের উপর এবং তুমুল যুদ্ধের পর পাহাড়টি দখল করলেন। মহীশূর ফউজের কয়েকটি দল পিছু হটে গেলো এবং ইংরেজ ফউজ তাদের পিছু ধাওয়া করে পৌঁছলো নদীর কিনারে। কিন্তু সেরিংগাপটমের তোপের তীব্র গোলাবর্ষণে তাদেরকে কঠিন ক্ষতি স্বীকার করে পিছু ফিরতে হল।

এই ব্যর্থতার পর লর্ড কর্ণওয়ালিস কয়েক মাইল দূরে সরে গিয়ে দরিয়া পার হওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হল না।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ মারাঠাদের গতিবিধি সম্পর্কে ছিলেন বেখবর এবং তাঁর শেষ আশা ছিল এই যে, মালাবারের পথে জেনারেল এবারক্রুসীর নেতৃত্বে কোম্পানীর সেনাবাহিনী তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে এবং তারা রসদ, অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদ নিয়ে আসছে প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু হঠ্যাৎ একদিন তিনি খবর পেলেন যে পথে মহীশূরের সৈন্যরা হামলা করে বেশীর ভাগ জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিয়েছে।

এই খবরে লর্ড কর্ণওয়ালিসের হতাশা চরমে পৌঁছলো। তাই তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছু হটে যাওয়ার ফয়সালা করলেন। এক রাত্রে হামলাকারী ফউজের শিবিরে জ্বলে উঠলো ভয়াবহ অগ্নিশিখা। মহীশূরের চর এসে সুলতান টিপুকে জানালো যে, লর্ড কর্ণওয়ালিসের অসংখ্য বলদের গাড়ি, খিমা ও অবশিষ্ট বারুদ এক জায়গায় জমা করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন এবং বেশীর ভাগ তোপও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

পরদিন ভোরে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংগালোরের দিকে ফিরে চললেন। ক্ষুধা ও ব্যাধির তাড়নায় তাঁর সিপাহীরা পথের মধ্যে পড়ে মরতে লাগলো। বলদের গাড়ির অভাবে তাদের সাথে আনা সামান্য জিনিসপত্র তারা পথেই ফেলে যাচ্ছিলো। পশ্চাত ও দু'পাশ থেকে মহীশূরের সওয়ারদের হামলার ভয়ে এমন বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়লো যে, কেউ তার পড়ে-যাওয়া সাথীকে ধরে তুলতেও রাযী ছিলো না। ঝড়বৃষ্টির ভিতর দিয়ে প্রায় ছয় মাইল অতিক্রম করার পর ইংরেজদের সামনে সওয়ারদের কয়েকটি দল দেখা দিলো এবং তাদের অবশিষ্ট সাহসটুকুও এবার নিঃশেষ হয়ে গেলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন তাঁর সৈন্যদের সারিবদ্ধ করলেন তখন দ্রুতগামী সওয়ারের একটি দল তাঁর কাছে এলো। এবার তাঁরা বুঝলেন যে, এরা মহীশূরের সিপাহী নয়; বরং এরা হচ্ছে মারাঠা লশকরের অগ্রগামী দল। পশুরাম ভাও, হরিপন্থ ও অন্যান্য মারাঠা সরদার বাকী ফউজ নিয়ে

মাত্র কয়েক মাইল দূরে রয়েছেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস তার লশকরকে এক পাহাড়ের পাদদেশে শিবির সন্নিবেশ করার হুকুম দিলেন। কয়েক ঘন্টা পর মারাঠাদের অবশিষ্ট ফউজ সেখানে পৌঁছে গেলো। হরিপন্থ ঘোড়া থেকে নেমেই লর্ড কর্ণওয়ালিসের সাথে মেসোফাহা করে বললেন ঃ 'এখন আপনাকে পিছু হটার খেয়াল ত্যাগ করা উচিত। সেলিংগাপটম জয় না করে ফিরে যাবো না।'

লর্ড কর্ণওয়ালিসের মুখ রাগে রক্তিম হয়ে উঠলো। তবু তিনি মনোভাব সংযত করে জওয়াব দিলেন ঃ 'যদি আরো দু'তিন দিন আপনারা এখানে না আসতেন, তা'হলে আমার কোনো সিপাহী আপনাদের ভর্ৎসনা শোনার জন্য যিন্দা থাকতো না। আমি শোকরগুযারী করছি এই জন্য যে, আমাদের মিত্রদের যথাসময়ে সাহায্য প্রাপ্তির ফলে আমাদের বাংগালোরে ফিরে যাবার সম্ভাবনা সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হরিপন্থ জওয়াব দিলেন ঃ 'সেরিংগাপটমের উপর হামলা করবার পূর্বে যদি আপনি আমাদের প্রতীক্ষা করতেন, তা'হলে আপনাকে এহেন অবস্থার মোকাবিলা করতে হত না। আমরা ক'দিন ধরে এতটুকু জানতে পারিনি যে, আপনি সেরিংগাপটমের কাছে পৌঁছে গেছেন।'

লর্ড কর্ণওয়ালিস বললেন ঃ 'আমরা বর্ষা শুরু হবার আগেই সেরিংগাপটম জয়ের ফয়সলা করেছিলাম এবং আপনারা আমাদের সাথে একমত হয়েছিলেন। আমি কয়েকদিন বা কয়েক হফ্‌তা নয়; বরং কয়েক মাস প্রতীক্ষা করার পর বাংগালোর থেকে অগ্রগতির ফয়সালা করলাম। তারপর আমি বহুবার দূত পাঠিয়েছি আপনাদের কাছে।'

ঃ 'জনাব, এ আমাদের ত্রুটি নয়; বরং আমাদের দুশমনের কৃতিত্ব যে, আপনার কোনো দূত আমাদের কাছে পৌঁছতে পারেনি। আমরা যে দূত আপনার কাছে পাঠিয়েছি, তারাও নিখোঁজ। কিন্তু এখন আমাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করে কোনো ফায়দা হবে না। যদি আপনার রসদ ও বারুদের প্রয়োজন থাকে, তা'হলে আমরা তাঁর সংস্থান করতে পারবো। এখন পিছু হটবার চিন্তা ছেড়ে দিন।'

লর্ড কর্ণওয়ালিস চূড়ান্ত জওয়াব দিলেন ঃ 'না, দুশমনের আরো কৃতিত্ব দেখাবার মতো হিম্মত আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। এখন যদি আমার উপর কোনো মেহেরবানী করতে চান, তা'হলে আপনারা আমাদের অবশিষ্ট ফউজকে বাংগালোরে পৌঁছে দিন। আমার কথার অর্থ এ নয় যে, সেরিংগাপটম জয়ের ইরাদা আমি ত্যাগ করেছি। কিন্তু আমার ফউজের অবস্থা যাচাই করে দেখলে আপনাদেরকে স্বীকার করতেই হবে যে, এ অবস্থায় যুদ্ধ অব্যাহত রাখা হবে আমার পক্ষে আত্মহত্যারই নামান্তর। আপনারা আমাদেরকে যে রসদ ও বারুদ দেবেন, তা' কয়েক দিনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। তারপর আপনাদের লশকরের অবস্থাও আমাদের থেকে আলাদা হবে না। বর্ষার মওসুমের শেষ পর্যন্ত আমি পুনরায় আমার ফউজ সংহত করতে পারবো। তারপর যদি আপনারা আমার সহযোগিতা করেন, তা'হলে আমার এ পরাজয় ও ব্যর্থতার পুরো বদলা নিতে পারবো। এই মুহূর্তে আমার সামনে

একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে যথাসম্ভব শীগ্‌গির বাংগালোর পৌঁছে যাওয়া। আমার বিশ্বাস, দুশমনরা নৈশ হামলাকারী দল এখনো আমাদের পিছনে রয়েছে আর সুলতান টিপু যদি সেরিংগাপটম থেকে বেরিয়ে আমাদের অনুসরন করেন, তা'হলে আমাদের শোচনীয় ধ্বংসের মোকাবিলা করতে হবে।

হরিপন্থ বললেন ঃ 'বহুত আচ্ছা। যদি এই হয় আপনার মরযী, তা'হলে আমরা আপনার সাথে আছি।'

একদিন ভোরবেলা মুরাদ আলী বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন। খাদেমা আঙিনায় ঝাড়ু দিচ্ছিলো। মুরাদ আলী এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন ঃ 'আম্মাজান কোথায়?'

খাদেমা জওয়াব দিলো ঃ 'তিনি উপরে নামায পড়ছেন।'

ঃ 'আর জিন কোথায়?'

খাদেমা হেসে বললো ঃ 'তিনিও নামায পড়ছেন!'

মুরাদ আলী হয়রান হয়ে বললেন ঃ 'জিন নামায পড়ছেন!'

ঃ 'জি হ্যাঁ, আর এখন তাঁর নাম জিন নয়, মুনীরা খানম। আমি সত্যি বলছি। তিনি মুসলমান হয়ে গেছেন।'

মুরাদ আলী তাঁর অন্তরে এক খুশীর কম্পন অনুভব করে দ্রুতপদে উপতলার সিঁড়ির উপর চড়তে লাগলেন। শেষ সিঁড়ির কাছে পৌঁছে তিনি এক মুহূর্ত থেমে তারপরে নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন। উপরতলার এক কামরা থেকে ফরহাত ও জিনের আওয়ায শোনা গেল। তিনি দরযার সামনে থেমে ভিতরে উঁকি মারলেন। ফরহাত ও জিন নামায শেষ করে খোদার দরবারে হাত তুলে বসে আছেন। ফরহাত স্পষ্ট করে দোআ করছেন আর জিন ধীরে ধীরে কথাগুলো আবৃত্তি করে যাচ্ছেন। মুরাদ আলী দরযার একদিকে সরে গিয়ে দোআ শুনতে লাগলেন ঃ 'মাওলায়ে করীম, আমাদের সিনা ঈমানের রোশনীতে প্রদীপ্ত করে দাও। আমাদেরকে সকল দুঃখ মুসীবতের মোকাবেলা করবার হিম্মৎ দান করো। তোমার রহমত ব্যতীত আর কোনো অবলম্বন নেই আমাদের। আমাদের সুলতানকে বিজয় দান করো। তাঁকে দ্বীনের সমৃদ্ধি বিধান ও ইসলামের দুশমনদের পরাজিত করার শক্তি দান করো। আনওয়ার ও মুরাদকে তাদের বাপের অনুসৃত পথে চলবার শক্তি দান করো। আমার মাওলা! এনে দাও সেই দিন, যেদিন তার বিজয়পতাকা উর্ধ্বে তুলে ফিরে আসবে। আয় আল্লাহ্! আমাদের সুলতানের দুশমনদের ধ্বংস করো। 'আমীন!'

দোআ শেষ করে তাঁরা দু'জন আলাপ করতে লাগলেন। জিন বললেন ঃ 'আজ আপনি বৃষ্টির জন্য দোআ করতে ভুলে গেছেন, আম্মাজান!'

ফরহাত জওয়াব দিলেন ঃ 'বেটী, দুশমন ফউজ পিছু হটে গেছে। এখন আমাদের আর বৃষ্টির প্রয়োজন নেই।'

ঃ 'আম্মাজান, সেরিংগাপটমের পর অন্যান ফ্রন্টেও আমাদের এমনি বৃষ্টির প্রয়োজন। আপনি দোআ করুন, যেনো মহীশূরের সরযমিনে আমাদের দুশমন কোথাও এক লমহার জন্যও স্থির হয়ে না দাঁড়াতে পারে। তারা যেখানেই থাক, সেখানে দুনিয়ার তামাম মেঘ যেনো তাদের অভ্যর্থনার জন্য মওজুদ থাকে।'

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'মুনীরা বোন, আমি ভিতরে আসতে পারি?'

ফরহাত ও জিন ফিরে তাকালেন দরযার দিকে এবং মুরাদ আলী হাসতে হাসতে ভিতরে প্রবেশ করলেন। মা এগিয়ে এসে সস্নেহে দু'হাত তাঁর মাথার উপর রাখলেন। জিন নামাযের মসল্লা গুছিয়ে একদিকে রেখে দিলেন এবং ফরহাতের কাছ থেকে দু'তিন কদম দূরে দাঁড়িয়ে গেলেন।

মুরাদ আলী জিনকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'খাদেমা যদি আমার সাথে কৌতুক না করে থাকে আর আপনি সত্যি সত্যি মুসলমান হয়ে থাকেন, তা'হেল আমি আপনাকে এবং আপনার চাইতেও বেশী করে আম্মাজানকে মোবারকবাদ পেশ করছি। মুনীরা নামটি খুবই ভালো। আপনি বিশ্বাস করবেন না যে, চাতলদুর্গে ভাইজান আমায় বলেছিলেন, তিনি আপনাকে স্বপ্নে নামায পড়তে দেখেছেন। মুনীরা! হা! আপনি যদি আমার খুশীর পরিমাণ করতে পারতেন!' তারপর তিনি ভালো করে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'আম্মাজান, কি ব্যাপার, আপনাকে এতটা দুর্বল মনে হচেছ কেন?

ঃ 'বেটা, তুমি চলে যাবার পরেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু সে অসুস্থতায় এই ফায়দা হয়েছে যে, তোমার বোন ইসলাম কবুল করে নিয়েছে। মুনীরা দীর্ঘকাল ধরে ইসলাম কবুল করেছে, কিন্তু ওকে কলেমা পড়াবার জন্য এক বাহানা হয়েছিলো আমার জ্বর। এবার তুমি ঠান্ডা হয়ে বসে যুদ্ধের অবস্থা শোনাও।'

তাঁরা গালিচার উপর বসলে মুরাদ আলী বললেন ঃ আম্মাজান, যুদ্ধের অবস্থা এখন আমাদের অনুকূলে। যদি দুশমনের উপর বৃষ্টিধারা নেমে আসার মধ্যে মুনীরা বোনের দোআ কাজে লেগে থাকে, তা'হলে তাঁর কাছে শোকরগুযার হওয়া মহীশূরের প্রত্যেকটি সিপাহীর কর্তব্য।

মুনীরা হেসে বললেন ঃ 'ভাইজান, যদি আমার দোআ কাযে লাগতো, তা'হলে আজ কঠিনতম বৃষ্টিপাত হত। কাল যখন আসমান সাফ হতে লাগলো, আমি তখন খুব দরদের সাথে আরো বৃষ্টিপাতের জন্য দোআ শুরু করে দিলাম। আজো আমি আম্মাজানের সাথে তাহাজ্জুদের জন্য উঠেছিলাম এবং সেই সময় থেকেই আমি দোআ করছি। কিন্তু তার ফল হয়েছে এই যে, আসমানে এক টুকরো মেঘও দেখা যাচ্ছে না।'

মুরাদ আলী হেসে উঠলে ফরহাত বললেন ঃ 'বেটা, যুদ্ধের কথা তুমি শেষ করোনি।'

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'আম্মাজান, খোদা আমাদের উপর বড়োই মেহেরবানী করেছেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসকে এখন দীর্ঘদিন তাঁর যখম চাটতে হবে। তিনি তাঁর বেশীর ভাগ সামরিক সরঞ্জাম নষ্ট করে দিয়ে পালিয়ে গেছেন। মালাবার থেকে যে ইংরেজ ফউজ এসেছিলো, তারা পুরো তোপখানা পথে ফেলে পিছিয়ে গেছে।

একটামাত্র ব্যাপারে আমরা দুঃখ যে, পংগপালের মতো অগুণ্তি মারাঠা লশকর যথাসময়ে পৌঁছে যাওয়ায় আমরা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও মীর নিযাম আলীর সেনাবাহিনীর অনুসরণ অব্যাহত রাখতে পারিনি। মারাঠা যদি আরো দু'চার দিন দেরী করতো, তা'হলে আমি আপনাদেরকে খোশখবর শুনাতে পারতাম যে, আমরা মহীশূরের যমিনের উপর কোনো ইংরেজকে যিন্দা ছেড়ে দিইনি।'

মুনীরা প্রশ্ন করলেন ঃ 'ইংরেজ ফউজ এখন কোথায়?'

ঃ 'এতক্ষণে তাঁরা বাংগালোরে পৌঁছে গেছে।'

ঃ 'তা'হলে এর অর্থ হচ্ছে, প্রস্তুতির পর তারা আবার সেরিংগাপটমের উপর হামলা করবে?'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'কর্ণওয়ালিস বর্ষা কেটে যাবার আগে' সেরিংগাপটমের দিকে মুখ ফিরাবার সাহস করবে না। কিন্তু মারাঠাদের আগমনের দরুন অন্যান্য ফ্রন্টে দুশমনের চাপ বেড়ে যাবে। বিশ্রামের জন্য আমি তিনদিনের ছুটি পেয়েছি। কিন্তু সুলতানের হুকুম ফউজের সকল অফিসার ও সিপাহীকে চব্বিশ ঘন্টা প্রস্তুত থাকতে হবে।'

ফরহাত বললেন ঃ 'বেটা, আনওয়ার আলীর কোনো খবর আসেনি?

ঃ 'আম্মাজান, যুদ্ধের দিনে চিঠি পাঠানো খুব সোজা নয়। ভাইজানের সম্পর্কে আপনার চিন্তার কারণ নেই। চাতলদুর্গ খুবই নিরাপদ। আমি আজই তাঁর কাছে চিঠি পাঠাবার চেষ্টা করবো। মুনীরা মুসলমান হয়েছেন, শুনলে তিনি খুবই খুশী হবেন!'

ঃ 'না ভাইজান, তাঁকে আমার কথা লিখবেন না।

ঃ 'কেন আপাজান, এটা তো লুকিয়ে রাখার মতো কথা নয়। আমি তো সারা শহরে ঘোষণা করে দিতে চাই যে, আমার বোন মুসলমান হয়েছেন।'

মুনীরা বিব্রত হয়ে ফরহাতের মুখের দিকে তাকালেন এবং ফরহাত বললেন ঃ 'বেটা, মুনীরার ইচ্ছা, তোমার ভাই ঘরে ফিরে এ খোশখবর শুনবে। আমি ওয়াদা করেছি যে, আনওয়ারকে আমি খবর জানাবো না। তুমি ইচ্ছা করলে লিখতে পারো যে, মুনীরা বেশ খুশী রয়েছে এবং সকাল-সন্ধ্যায় তার নিরাপত্তার জন্য দোআ করছে।'

মুনীরা বিব্রত হয়ে বললেন ঃ 'না, না, তাঁকে শুধু এতটুকু লিখলেই যথেষ্ট হবে যে, আমি যিন্দা রয়েছি এবং তাঁর জন্য আমার নাম মুনীরা নয়, জিন। ভাইজান, আপনি ওয়াদা করুন যে, আমার মসুলমান হওয়ার কথা ওঁকে লিখবেন না।'

মুরাদ আলী পেরেশান হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং তাঁর অবস্থা হোল সেই শিশুর মতো, যার হাতে একটি সুন্দর খেলনা দিয়ে হুকুম দেওয়া হয়েছে, 'তুমি এ নিয়ে সাধ মিটিয়ে খেলা করো, কিন্তু সাথীদের দেখিয়ো না যেনো।' তিনি বললেনঃ 'বোন, আমি আপনার আপত্তি করার কারণ বুঝতে পারি নি। তবু ওয়াদা করছি, আপনার সম্পর্কে ভাইজানকে আমি কিছু লিখবো না।'

উনিশ

সেরিংগাপটম থেকে পিছু হটে আসার পর বাংগালোরে মিলিত সেনাবাহিনীর সমাবেশ লর্ড কর্নওয়ালিসের জন্য এক উদ্বেগজনক সমস্যা হয়ে উঠলো। মারাঠা ফউজ তাদের সাথে যে অতিরিক্ত রসদসামগ্রী এনেছিলো, এই বিরাট সেনাবাহিনীর জন্য তা' কয়েকদিনের চাহিদা মিটানোর বেশী কিছু ছিলো না। মীর নিযাম আলীর ও মারাঠাদের সেনাবাহিনী যে পথে রসদ ও সেনা সাহায্য আনার ব্যবস্থা করেছিলো, সুলতানের ঝটিকা বাহিনীর উপর্যুপরি হামলার দরুন সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। বর্ষার প্লাবনে কর্ণাটক থেকে রসদ ও সামরিক দ্রব্য সংগ্রহের জন্য পালাকড় উপত্যকা পথ ছিলো সব চাইতে সহজগম্য ও সংক্ষিপ্ত পথ। কিন্তু সুলতানের কয়েকটি মযবুত কেল্লা ছিলো সে পথের প্রতিবন্ধক। লর্ড কর্ণওয়ালিস অবিলম্বে কেল্লাগুলো দখল করে নেওয়া তাঁর জীবন-মরণ সমস্যা বলে ধরে নিয়েছিলেন, কিন্তু পরশুরাম ভাও, হরিপন্থ ও নিযামের ফউজের অফিসাররা পশ্চাদ্ভাগ অরক্ষিত মনে করে দাবি করেছিলো যে, ইংরেজ ফউজ তাদের সাথে সারার দিকে এগিয়ে যাবে। কর্ণওয়ালিসের মতো দূরদর্শী সৈনিকের পক্ষে এ কথা বোঝা মুশকিল ছিলো না যে, সারার দিকে অগ্রগতির ফলে নিযাম ও মারাঠা সেনাবাহিনী যতোটা নিরাপদ হবে, কোম্পানীর সেনাবাহিনীর সংকট ততোটা বাড়তে থাকবে। মারাঠা সরদার ও নিযামের ফউজের অফিসাররা কয়েকদিন এই প্রশ্ন নিয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সাথে আলোচনা চালালো এবং শেষ পর্যন্ত ফয়সালা হল যে, মারাঠা তাদের বেশীর ভাগ ফউজ সারার দিকে রওয়ানা করে দেবে, নিযামের লশকর উত্তর-পূর্বদিকে এগিয়ে যাবে এবং ইংরেজ কর্ণাটকের সাথে যোগাযোগ কায়েম করার জন্য পালাকড় উপত্যকা পথের চৌকিগুলোর উপর হামলা করবে। সুতরাং হরিপন্থ তাঁর ফউজের কয়েক ডিভিশনকে কর্ণওয়ালিসের সাহায্যের জন্য রেখে দিলেন। বাকী মারাঠা ফউজ পরশুরামের নেতৃত্বে সারার দিকে রওয়ানা হল। দাক্ষিণাত্যের সিপাহ্সালার ও তার পদাতিক ও সওয়ার ফউজের কয়েকটি ডিভিশন লর্ড কর্ণওয়ালিসের কাছে ন্যস্ত করে অবশিষ্ট লশকর সহ গুরমকুন্ডার দিকে রওয়ানা হল।

জুলাইয়ের মধ্যভাগে লর্ড কর্ণওয়ালিস কয়েকবার তীব্র সংঘর্ষের পর হোসর ও রায়াকুটি কেল্লা এবং পালাকড় উপত্যকা-পথের কয়েকটি চৌকি দখল করে নিলেন। কোম্পানীর ফউজের জন্য কর্ণাটক থেকে রসদ ও সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহের পথ সাফ হয়ে গেলো।* এরপর সেরিংগাপটমের আশপাশের কয়েক মাইল এলাকা ব্যতীত সারা মহীশূরে চললো আগুন ও রক্তের তান্ডবলীলা। মারাঠাদের পংগপালের মতো অগুণতি সেনাবাহিনী সারা ও তার দক্ষিণ-পূর্বের অন্যান্য উর্বর

---

* কর্ণাটক থেকে প্রথম যে কাফেলা কর্ণওয়ালিসের কাছে এলো, তারা রসদ ও সামরিক সরঞ্জামের গাড়ি টানার জন্য ছয় হাজার বলদ, একশ' হাতী ও হাজার হাজার মযদূর নিয়ে এসেছিলো। এ থেকে রসদ ও যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিসের উদ্বেগের পরিমাপ করা যায়। জেমস্ মিল লিখেছেন যে, এর আগে হিন্দুস্তানের বৃটিশ ফউজের পুরো ইতিহাস এত বড়ো কাফেলার নযীর দেখা যায় না।

এলাকার লুটতরাজ চালাতে লাগলো। দাক্ষিণাত্যের ফউজ গুরমকুন্ডার আশপাশের এক বিশাল এলাকায় চালাতে লাগলো ধ্বংসতান্ডব। ইংরেজ বাহিনী ও পূর্ব উপকূলের মধ্যবর্তী বিশাল দক্ষিণ এলাকা বিজয়ে ব্যস্ত।

এর আগে যে সব কেল্লা ও চৌকির সেনাবাহিনী ইংরেজ বাহিনীর পথ রোধ করে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ করেছিলো, মিলিত সেনাবাহিনী সেরিংগাপটমের উপর পুনরায় হামলা করার পূর্বে সেগুলো দখল করে নেওয়া জরুরী মনে করলো। কিন্তু বিভিন্ন ফ্রন্টে কয়েক মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর তারা তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে লাগলো যে, সেরিংগাপটমের মতো এসব কেল্লা ও চৌকির প্রতিরোধ শক্তি সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল ভুল। মহীশূর এক প্রশস্ত জলা এবং দিনের পর দিন তারা তার ভিতরে আটকে যাচ্ছে।

মারাঠারা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ও কেল্লার উপর ব্যর্থ হামলা করার পর যে সব উর্বর এলাকা থেকে সুলতানের সেনাবাহিনীর রসদ সংগৃহীত হত, তার দিকে পূর্ণ মনোযোগ নিবন্ধ করলো। উত্তর-পশ্চিমের বিশাল এলাকায় মানুষের বসতির পরিবর্তে ভস্মস্তূপসমূহ তাদের পশুত্ব ও বর্বরতার সাক্ষ্য দিতে লাগলো। সারা সুবায় ধ্বংসতান্ডব চালিয়ে পরশুরাম ভাও চাতলদুর্গের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু চাতলদুর্গের প্রতিরোধ শক্তি উপলব্ধি করতে তাঁর দেরী লাগলো না। তিনি পথের কয়েকটি বস্তি ও ছোট ছোট শহরে লুটতরাজ করে ফিরে গেলেন চাঁদগরির দিকে। তারপর তিনি চললেন বিডনোরের দিকে এবং পথে কয়েকটি চৌকি দখল করে শামুগা।

জেলায় চালালেন ধ্বংসতান্ডব। এখানে ইংরেজ ফউজের এক হাজার সিপাহী তাদের তোপখানাসহ শামিল হল তাঁর সাথে। ১৭৯১ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে উপর্যুপরি হামলার পর তারা শামুগার কেল্লা দখল করলো।

শামুগার পর পরশুরাম ভাওয়ের অগ্রগতি চললো বিডনোরের রাজধানীর দিকে এবং পথে অনন্তপুর ও আরো কয়েকটি ছোট ছোট কেল্লা গেলো তাদের দখলে। কিন্তু এর মধ্যে খবর পাওয়া গেলো যে, মীর কমরুদ্দীন খানের নেতৃত্বে মহীশূরে সওয়ারদের এক লশকর বিডনোরের দিকে এগিয়ে আসছে। এই খরব তাঁকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পিছু হটতে বাধ্য করলো। জানুয়ারীর শেষে পরশুরামের সেনাবাহিনী হোত্রিদুর্গের অবস্থান স্থলে লর্ড কর্ণওয়ালিসের লশকরের সাথে মিলিত হল। বিডনোর থেকে পিছিয়ে যাওয়ার পর অগুণতি মারাঠা সৈন্য পথে অসংখ্য বস্তি বিরাণ করে চলে গেলো।

সেরিংগাপটম থেকে লর্ড কর্ণওয়ালিসের পশ্চাদপসরণের পর দশ মাস কেটে গেছে। এই দশ মাসের মধ্যে কম-সে-কম সাত মাস ছিলো এমন যে, খোদাদাদ সালতানাতের ইতিহাসের একটি দিনও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সুলতান টিপুর দৃঢ়সংকল্প সিপাহীদের আলোচনা ব্যতীত কাটে নি। এই সাত মাসের দিন রাতের বেশীর ভাগ

সময় শেরে মহীশূরের ঘোড়ার যিনের উপরই কাটিয়ে দিয়েছেন। এ যুদ্ধের নযীর গোটা হিন্দুস্তানের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। এতে মহীশূর জানবাযদের কতো রক্তধারা বয়ে গেছে দেশের আযাদীর জন্য, কতো শহর গেছে বিরাণ হয়ে, কতো বস্তি পরিণত হয়েছে ভস্মস্তূপে! মহীশূরের জনগণের কতো অশ্রুধারা মিশে গেছে দেশের মাটিতে, আর মহীশূরের মুজাহিদের সংকল্প ও দৃঢ়তা, শৌর্য-সাহস, ত্যাগ ও আন্তরিকতার কতো কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পায়নি-আজ দুই শতাব্দী পর আমরা এসব প্রশ্নের নির্ভুল জওয়াব দিতে পারি না। তথাপি যে ক'টি কাহিনী সে যুগের ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করার যোগ্য মনে করেছেন, তা' রোয কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষের অনাবিল প্রশংসার অর্ঘ্য লাভ করতে থাকবে।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের পিছনে ছিলো অসীম সামরিক শক্তির অধিকারী কওম। দক্ষিণ হিন্দুস্তানের উপকূলে ছিলো বিশাল সামরিক নৌবহরের আধিপত্য। রসদ ও সেনা সাহায্য লাভের পথ নিরাপদ করে নেবার পর লর্ড কর্ণওয়ালিস যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদ সংগ্রহ করেছিলেন, তা' ছিলো তাঁদের প্রয়োজনাতিরিক্ত। বৃটেন থেকে আগত তাযাদম সিপাহীরা ক্রমাগত তাঁর ফউজী কুওৎ বৃদ্ধি করে চলেছিলো দিনের পর দিন। হিন্দুস্তানে তাদের মিত্রশক্তি প্রত্যেক ময়দানে মহীশূরের এক এক সিপাহীর মোকাবিলায় এনে হাযির করতে পারতো পাঁচ সিপাহী। সুদীর্ঘ কাল ধরে ইংরেজ ছাড়া হিন্দুস্তানের আরো দুটি বড়ো শক্তির মোকাবিলা করা ছিলো সুলতান টিপুর সৈনিক জীবনের বৃহত্তম সাফল্য। সুলতানের যুদ্ধ শুধু দুশমনের এক ময়দানে কয়েক মাইল পিছু হটলে অপর ময়দানে দুশমনকে কয়েক মাইল পিছু হটতে বাধ্য করেছে। একদিন খবর আসতো, আজ অমুক কেল্লা, অমুক শহর বা অমুক চৌকি দুশমনদের দখলে চলে গেছে, পরদিন আবার খবর পাওয়া যেতো যে, অমুক কেল্লার উপর আজ ইংরেজ, মারাঠা অথবা নিযামের পরিবর্তে সুলতান টিপুর পতাকা উড্‌ডীন হয়েছে। একদিন লর্ড কর্ণওয়ালিসের লশকর ভেলোর বিজয়ের আনন্দোৎসব পালন করলো, কয়েকদিন পরেই আবার তার কাছেই দূত খবর নিয়ে আসতো যে, সুলতানের ফউজ কোয়েম্বাটুর পুনরায় দখল করে নিয়েছে। পরশুরাম ভাও যখন তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে শামুগা ও বিডনোর এলাকায় লুটতরাজ চালিয়ে যাচ্ছে, তখনই লর্ড কর্ণওয়ালিসের তাঁবুতে খবর পাওয়া গেলো যে, সুলতানের ঝটিকাবাহিনী সালেনের আশপাশের ইংরেজ চৌকি ধ্বংস করে দিয়ে কর্ণাটকে ফোর্ট সেন্ট জর্জের দরযায় পৌঁছে গেছে।

এসব যুদ্ধে সুলতানের কয়েকজন অভিজ্ঞ জেনারেল শহীদ হলেন। কিন্তু ইংরেজ ও তাদের মিত্ররা অনুভব করছিলো যে, সুলতানের তুণীর এখনো তীরশূন্য হয়নি। সুলতানের সুযোগ্য পুত্র ফতেহ হায়দর ছিলেন সেই নওজোয়ান অফিসারদের অন্যতম, যাঁরা তাঁদের তলোয়ারের মুখে খোদাদাদ সালাতানাতের ইতিহাস নতুন পৃষ্ঠা সংযোজন করছিলেন। আঠারো বছরের শাহ্‌যাদা ফত্‌হে হায়দরকে মীর নিযাম আলীর লশকরের মোকাবিলার জন্য পাঠানো হল গুরমকুণ্ডার দিকে। হাফিয ফরীদুদ্দীনের নেতৃত্বে হায়দরাবাদের ফউজ তাঁর পথরোধ করতে চেষ্টা করলো

গুরমকুন্ডার কয়েক মাইল দূরে। কিন্তু নওজোয়ান শাহ্যাদা তাঁকে শোচনীয়রূপে পরাজিত করলেন। হাফিয ফরীদুদ্দীন যুদ্ধে মারা গেলেন এবং ফতেহ্ হায়দর তীব্র হামলার পর গুরমকুন্ডার কেল্লা দখল করে নিলেন।

কিন্তু এসব ব্যাপার সত্ত্বেও সুলতান টিপুর সেনাবাহিনী সীমাবদ্ধ সামরিক সরঞ্জামের দরুন যুদ্ধের গতি ফিরাতে পারলো না। এ কথা সত্য যে, আগের কয়েক মাসে অসংখ্য সংঘর্ষে ইংরেজ, মারাঠা ও নিযামের লশকরের ক্ষতি মহীশূরের মোকাবিলায় অনেকখানি বেশী হয়েছিলো। কিন্তু তাদের সামরিক শক্তি ছিলো অন্তহীন এবং প্রতি মুহূর্তে তারা সে ক্ষতির প্রতিকার করতে পারতো। পথের নিরাপত্তা বিধানের পর অস্ত্র, বারুদ, রসদ ও তাযাদম সিপাহী হাসিল করতে তাদের কোনো অসুবিধা ছিলো না। হরিপন্থ ও পরশুরামের পিছনে ছিলো পুরো মারাঠা কওম। হায়দরাবাদের ফউজের সাহায্যের জন্যও ক্রমাগত তাযাদম সৈন্যদল আসতে লাগলো। ইংরেজ সিপাহীদের সংখ্যাও বেড়ে গেলো অনেকখানি। কিন্তু বাইরে থেকে সুলতানের কোনো সাহায্য লাভের আশা ছিলো না। মহীশূরের যে উর্বর এলাকা থেকে তাঁর রসদ মিলতো, সে এলাকাটি ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে। যে সব শহরের কারখানায় মহীশূরের জন্য অস্ত্র ও বারুদ তৈরী হত, সে শহরগুলো চলে গেছে মিলিত সেনাবাহিনীর দখলে। সুলতানের শেষ আশা ছিলো, হয়তো যুদ্ধ বিলম্বিত হওয়ায় মিলিত সেনাবাহিনী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু সে আশাও ব্যর্থ প্রমাণিত হল। মীর নিযাম আলী ও নানা ফার্ণাবিস ইংরেজের সাথে তখন স্বদেশের ইয্যত ও আযাদীর সওদা করে ফেলেছে।

ইসায়ী ১৭৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে ইংরেজ, মারাঠা ও নিযামের সেনাবাহিনী তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়ে সেরিংগাপটমের দিকে অগ্রগতি শুরু করলো।

একদিন দুপুর বেলায় ফরহাত ও মুনীরা নীচের তলার এক কামরায় বসেছিলেন। ফরহাত একখানা কিতাব পড়ছিলেন। মুনীরা কাপড় সেলাইয়ের ব্যস্ত। হঠাৎ দরযার দিকে মুরাদ আলীর আওয়ায শোনা গেলো ঃ 'আম্মাজান'! ফরহাতের হাত থেকে কিতাব পড়ে গেলো এবং তিনি রুদ্ধশ্বাসে দরযার দিকে তাকাতে লাগলেন। মুরাদ আলী কম্পিত পদে কামরায় প্রবেশ করলেন। মুনীরা কাপড়টা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে জলদী উঠে তাঁর বাহু ধরে বললেন ঃ 'কি ব্যাপার, ভাইজান?'

ঃ 'কিছু নয়, বোন! আমি ভালোই আছি।' বলে মুরাদ আলী এগিয়ে গিয়ে ফরহাতের কাছে বসলেন।

ফরহাত কয়েক মুহূর্ত মোহাচ্ছন্নের মতো তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তিনি হাত বাড়িয়ে মুরাদ আলীর মাথাটা টেনে নিলেন কোলের মধ্যে।

ঃ 'বাছা আমার! লাল আমার!' তিনি কাঁপা আওয়াযে বললেন। 'তুমি বহুত কমযোর হয়ে গেছো। এতদিন পর তোমার আওয়ায আমার কানে কেমন যেনো অপরিচিত লাগছে।'

মুরাদ আলী ক্লান্ত আওয়াযে বললেন ঃ 'আম্মাজান, কয়েকদিন আমি বিশ্রাম করতে পারিনি আর দু'দিন খানাও খাইনি।'

ঃ 'আমি এক্ষুণি খানা তৈরি করাচ্ছি।' বলে মুনীরা কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মুরাদ আলী সোজা হয়ে বসে বললেন ঃ 'আম্মাজান, ভাইজানের কোনো চিঠি পেয়েছেন?'

মা অশ্রুসজল চোখে বললেন ঃ 'দু'মাস থেকে আমরা তাঁর কোনো খবর পাচ্ছি না। শেষ চিঠিতে লিখেছিলো যে, সাতলদুর্গ থেকে সে শামুগার দিকে যাচ্ছে। তারপর আর কোনো খবর আসেনি।'

মুরাদ আলী কিছুক্ষণ মাথা নত করে চিন্তা করে বললেন ঃ 'আম্মাজান! "আপনার চিন্তার কারণ নেই। আমার বিশ্বাস, ভাইজান নিরাপদেই আছেন। বর্তমান অবস্থায় চিঠি পাঠানো তাঁর পক্ষে মুশকিল।'

মুনীরা কামরায় প্রবেশ করে মুরাদ আলীর কাছে এক কুরসির উপর বসে বললেন ঃ 'আপনার খানা কয়েক মিনিটের মধ্যেই তৈরী হচ্ছে। আপনার জন্য আম্মাজান বড়োই পেরেশান ছিলেন। এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন?'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'গত চার মাসে আমি গাযি খানের সাথে ছিলাম। আমাদেরকে কখনো পিছন থেকে ইংরেজদের রসদ ও সেনা সাহায্যের পথ বিচ্ছিন্ন করতে, কখনো নিজেদের কাফেলা হেফাজত করতে, আবার কখনো মারাঠাদের অগ্রগতি রোধ করতে পাঠানো হত। গুরমকুন্ডার যুদ্ধে আমি ছিলাম শাহ্যাদা ফত্হে হায়দরের সাথে। তারপর আমাকে পাঠানো হোল কোয়েম্বাটুর ফ্রন্টে। কোয়েম্বাটুর জয়ের পর আমাদের বাহিনী কর্ণাটকের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলো। যদি আমরা কয়েকদিন উত্তর-পূর্ব থেকে মারাঠাদের অগুণতি ফউজের অগ্রগতি রোধ করতে পারতাম, তা'হলে আজ লর্ড কর্ণওয়ালিসের সেরিংগাপটমের উপর হামলা করার পরিবর্তে পূর্ব উপকূলে বন্দরগাহ্ বাঁচাবার জন্য বিব্রত থাকতে হত।'

ঃ 'আর এখন কি হবে?' মুনীরা বিষণ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'এখন মহীশূরের আযাদী-সংগ্রাম চলবে সেরিংগাপটমের খন্দক, পাঁচিল, গলি ও বাজারের মধ্যে। দুশমন আমাদের লাশ দলিত না করে আমাদের আযাদীর পতাকায় হাত লাগাতে পারবে না। এখন আমাদের চেষ্টা হবে দুশমনকে বর্ষার মওসুম পর্যন্ত কাবেরীর তীরে ঠেকিয়ে রাখা আর বর্ষার মওসুমে আমরা দুশমনকে আর একবার বুঝিয়ে দিতে পারবো যে, এবারও তারা আমাদের শক্তি পরিমাপ করতে ভুল করেছে।'

ফরহাত প্রশ্ন করলেন ঃ 'বেটা, এখন তো তোমায় বাইরে কোথাও পাঠানো হবে না।'

ঃ 'আমি জানি না, আম্মাজান! কিন্তু আমার ধারণা, বর্ষার মওসুম শুরু হওয়া পর্যন্ত আমি এখানেই থাকবো। অবশ্যি এখানেও আমি এত ব্যস্ত থাকবো যে, হয়তো প্রতিদিন আমি আপনার খেদমতে হাযির হতে পারবো না।'

কাবেরী নদীর দুই শাখার মাঝখানে সাড়ে তিন মাইল লম্বা ও দেড় মাইল চওড়া সেরিংগাপটম দ্বীপ। উত্তর-পশ্চিম কোণে দ্বীপের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পুরানো শহরও কেল্লার খন্দক পাঁচিলের মধ্যে অবস্থিত। বাইরে পাঁচিল কোথাও বিশ ফুট আর কোথাও সাঁইত্রিশ ফুট উঁচু। উত্তরদিকে শাহী মহল। কেল্লার উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে পাঁচশ গত পূর্বে যে ঘাঁটি তৈরী হয়েছে, তা মাটির প্রশস্ত উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। দ্বীপের পূর্বাংশের ঠিক মাঝখানে একটি আড়ম্বরপূর্ণ শহর গঞ্জাম নামে অভিহিত। তার সন্নিকটে পূর্ব কোণে লালবাগ। দরিয়ার দুই শাখা ছাড়া বিভিন্ন স্থানে উঁচু পুশতার উপর পাতা সুলতানের তোপ দ্বীপের এ অংশের হেফাযত করছিলো। দ্বীপের ভিতর দিকেও স্থানে স্থানে পাঁচিল ও পুশতার উপর তোপ পাতা। তা'ছাড়া কিনারের সাথে সাথে ঘন বাঁশ ও কাঁটা ঝাড়। উত্তর-পূর্বদিকে দরিয়ার পারে এক পাহাড়ের উপর সুলতানের তোপখানা বাইরের প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য পাতা। পাঁচ হাজার সওয়ার ও চল্লিশ হাজার পদাতিক ফউজ ছড়িয়ে রয়েছে দ্বীপের বিভিন্ন অংশে।

৫ই ফেব্রুয়ারী মিলিত দুশমন সেনাবাহিনী সেরিংগাপটমের প্রায় চার মাইল উত্তরে শিবির সন্নিবেশ করলো। লর্ড কর্ণওয়ালিসের ফউজে বাইশ হাজার অভিজ্ঞ সিপাহী। হায়দরাবাদের আঠারো হাজার সওয়ার এবং কোম্পানীর দুই ব্যাটেলিয়ন সৈন্য শাহ্যাদা সিকান্দার জাহ্র নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিলো। হরিপন্থের নেতৃত্বে আরো বারো হাজার মারাঠা সওয়ার সেরিংগাপটমের সংঘর্ষে অংশ নেবার জন্য জমা হল।

ইংরেজ ও তাদের মিত্রশক্তির জন্য সেরিংগাপটম সম্মানের প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। শক্তির প্রাধান্যের অনুভূতি তাদের ছিলো, কিন্তু তা' সত্ত্বেও যুদ্ধ বিলম্বিত হওয়াকে তারা বিপজ্জনক মনে করতো। সেরিংগাপটমের উপর আগের হামলার সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস যে শিক্ষা পেয়েছেন, তারপর তিনি বর্ষার প্লাবনকে মনে করতেন সুলতান টিপুর সব চাইতে বড়ো সহযোগী। বর্ষার আগমনের মাত্র আড়াই-তিন মাস বাকী। মিলিত সেনাবাহিনী তীব্রভাবে অনুভব করছে যে, বর্ষা শুরুর আগে এ যুদ্ধ শেষ না হলে বাইরের কেল্লা ও চৌকিতে অবস্থিত সুলতানের ছোটোখাটো ফউজের আক্রমণে তাদের পশ্চাদ্ভাগ অত্যন্ত অরক্ষিত হয়ে পড়বে। পরশুরামের লশকর ও বোম্বে থেকে এবারক্রুসীর সাথে আগত গোর সিপাহীরা তখনো পথে। সিকান্দার জাহ্ ও হরিপন্থ হামলার আগে তাদের ইন্তেযার করতে চান, কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস মামুলী বিলম্বও বিপজ্জনক মনে করেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী সূর্যাস্তের দু'ঘন্টা পর ইংরেজ ফউজের পদাতিক দল তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে দ্বীপের দিকে চললো। দরিয়া থেকে কিছু দূরে তারা হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলো। শীতের মওসুমে দরিয়ার পানি কম। হামলাদারদের তিন ডিভিশন মধ্যরাত্রের দিকে উত্তর-পূর্ব কিনারের বিভিন্ন স্থানে এসে ঘন বাঁশ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে পথ সাফ করতে লাগলো।

সেরিংগাপটমের রক্ষীদের কাছে এ হামলা ছিলো অপ্রত্যাশিত এবং রাতের বেলায় বাইরের পুশতা থেকে তাদের গোলাবর্ষণ তেমন কার্যকরী ছিলো না। সুলতানের সওয়ার ফউযের ময়দানে আসার আগে হামলাদার বাহিনী কয়েকটি পুশতা দখল করে নিলো। জেনারেল মিডোজ এক ডিভিশন সিপাহী নিয়ে ঈদগাহ্ পুশতার কাছে পৌঁছালেন। সৈয়দ হামীদের সৈন্যদল সেখানে মোতায়েন ছিলেন। সৈয়দ হামীদ ও তাঁর চারশ' সাথী লড়াই করে শহীদ হলেন এবং জেনারেল মিডোজ পুশতা দখল করে নিলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ ফউজের আর এক ডিভিশন দৌলতবাগের কাছে তীব্র গোলাবর্ষণের মোকাবিলা করে পিছু হটে আসছিলো। তৃতীয় আর একটি ডিভিশন তুমুল সংঘর্ষের পর পূর্ব কিনারের কয়েকটি তোপ দখল করে নিয়েছে। রাতে শেষদিকে দ্বীপের বাইরের ঘাঁটি ও পুশতার রক্ষীরা বিশৃংখল অবস্থায় বিভিন্নস্থানে হামলাদারদের মোকাবেলা করতে লাগলো। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে কর্ণওয়ালিসের ফউজের আরো কয়েকটি দল নদী পার হয়ে দৌলতবাগ ও শহর গঞ্জামের পূর্বদিকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করে নিলো। সূর্যোদয়ের কাছাকাছি সময়ে সুলতানের পদাতিক ও সওয়ার সিপাহীরা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর কয়েকটি ঘাঁটি পুনরায় হস্তগত করলো। কিন্তু সেরিংগাপটমের প্রথম প্রতিরোধ লাইন ভেঙে গেছে এবং সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর হায়দরাবাদী ও মারাঠা সেনাবাহিনীও দ্বীপের বিভিন্ন অংশে মযবুত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

পূর্ব রাত্রে লড়াইয়ের প্রভূত ক্ষতি সত্ত্বেও বাহিনীর সাফল্য ছিলো তাদের আশাতীত। কিন্তু দুপুরের দিকে আর একবার তাদের নযরে সুলতানের পাল্লা ভারী মনে হল। মহীশূরের জানবাযরা উপর্যুপরি হামলা করে তাদের হটিয়ে নিয়ে গেলো দরিয়ার দিকে।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের বিশ্বাস ছিলো যে, মিলিত বাহিনী দ্বীপের উপর মযবুত হয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে কেল্লার দরযা ভেঙে ফেলবে, কিন্তু তাঁর প্রত্যাশা ভুল প্রমাণিত হল। মিলিত বাহিনী পুরো আঠারো দিন প্রচন্ড চেষ্টার পরেও সেই ঘাঁটি থেকে এগিয়ে যেতে পারলো না, যুদ্ধের শুরুতে কয়েক ঘন্টার মধ্যে যা' তারা দখল করেছিলো। কেল্লার আশে পাশে কয়েকটি ঘাঁটি ও পুশতায় তখনো সুলতানের জানবাযরা মযবুত হয়ে রয়েছে। কেল্লার পাঁচিল ও খন্দক লর্ড কর্ণওয়ালিসকে আর এক দীর্ঘ ধৈর্যসাপেক্ষ যুদ্ধের পয়গাম দিচ্ছিলো।

এক রাত্রে মুরাদ আলী নিজ গৃহের দেউড়ির দরজায় করাঘাত করলেন। করীম খান দরযা খুলে বললোঃ 'খোদার শোকর, আপনি এসে গেছেন দীলওয়ার খানের অবস্থা খুব খারাব।'

'কি হল তার?' ঃ মুরাদ আলী পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'জি, তার জ্বর। হাকীম সাহেব দেখে গেলেন। বিবিজী তার কাছে বসে আছেন।'

মুরাদ আলী দ্রুত কদম ফেলে দেউড়ি থেকে একটুখানি দূরে নওকরদের ঘরের এক কামরায় গিয়ে প্রবেশ করলেন। দীলাওয়ার খান চোখ বন্ধ করে বিছানায় পড়ে রয়েছে। ফরহাত ও মুনীরা তার কাছে একটা ছোট খাটে বসে রয়েছেন। মুনাওয়ার একদিকের পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো। মুরাদ আলী সালাম করে এগিয়ে গেলেন এবং দীলাওয়ার খানের কপালে হাত রাখলেন। দীলাওয়ার খান চোখ খুললো। কয়েক মুহূর্ত সে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকলো মুরাদ আলীর দিকে। অবশেষে ক্ষীণকণ্ঠে সে বললো ঃ 'অধীর হয়ে আমি আপনার ইন্তেযার করছিলাম। বিবিজী বলছিলেন, লড়াই বন্ধ হয়ে গেছে, সত্যি?'

ঃ হ্যাঁ চাচা, লড়াই বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু দুশমন যেসব শর্ত পেশ করেছে, তা'; হয়তো সুলতানের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।' তারপর ফরহাতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ 'আম্মাজান, ওঁর জ্বর কবে থেকে?'

ঃ 'বেটা, পরশু থেকে অমনি পড়ে রয়েছে ও।'

দীলাওয়ার খান বললো ঃ 'আমার অসুখের জন্য আপনি পেরেশান হবেন না। বলুন, দুশমন সন্ধির কি শর্ত পেশ করেছে?'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'দুশমন আমাদের অর্ধেক সালতানাত ছাড়া আরো দাবি করেছে তিন কোটি ষাট লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ। এর মধ্যে এক কোটি ষাট লাখ টাকা আমাদেরকে অবিলম্বে আদায় করতে হবে। বাকী আদায় করতে হবে এক বছরের মধ্যে চার কিস্তিতে। শান্তিচুক্তির বিস্তারিত শর্ত স্থির হয়ে গেলে দু'পক্ষের যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হবে।'

ফরহাত বিষণ্ন কণ্ঠে বললো ঃ 'বেটা, এতো খুবই কঠিন শর্ত।'

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'আম্মাজান, এহেন অবস্থায় আমরা দুশমনের কাছ থেকে এর চাইতে কোনো ভালো শর্ত আশা করতে পারি না। ওরা আমাদের যখম দেখে ফেলেছে। যুদ্ধ বিলম্বিত হওয়ার ভয় না থাকলে ওরা এসব শর্তেও সন্ধি করতে সম্মত হত না। আজ যামানার গর্দেশ নেকড়েকে সিংহে আর শকুনকে ঈগলে পরিণত করেছে। আমাদের জন্য এর চাইতে ভয়াবহ ব্যাপার আর কি হতে পারে যে, ইংরেজ মুসলমানদের ইয্যত ও সম্মানের সব চাইতে বড়ো রক্ষকের কাছে তাঁর দুই পুত্রকে যামানত হিসাবে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবার দাবি জানিয়েছে?'

মুনীরা অশ্রুসজল চোখে বললেন ঃ 'কিন্তু ভাইজান, এটা কি করে সম্ভব যে, সুলতান টিপু তাঁর দুই পুত্রকে ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেবেন।'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'এই মুহূর্তে সুলতান মোয়ায্যম তাঁর পুত্রদের চাইতে বেশী চিন্তা করছেন প্রজাদের জন্য। এই সন্ধিচুক্তির মধ্যে তিনি যদি মহিশূরের

কোনো কল্যাণ দেখতে পান, তা'হলে শাসকের কর্তব্যের উপর পিতৃস্নেহ জয়ী হতে পারবেনা।'

দীলাওয়ার খান মোহাচ্ছন্নের মতো কিছুক্ষণ মুরাদ আলীর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ উঠে বসে গযবের স্বরে চীৎকার করে বললো ঃ 'না, না, তা' হতে পারে না। মহীশূরের সিপাহী কখনো শাহ্‌যাদাদের দুশমনের হাতে ছেড়ে দিতে রাযী হবেন না। মহীশূরের প্রজাদের জন্য এ ধরনের সন্ধি মৃত্যুর চাইতেও অবাঞ্ছিত। এমন সময় এলে মহীশূরের শাহ্‌যাদাদের পথে তারা লাশের আস্তরণ বিছিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকবে।'

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'চাচা, আপনি শুয়ে আরাম করুন। সুলতানে মোয়ায্‌যমের মনে প্রজাদের বিশ্বস্ততা ও সিপাহীদের শৌর্যসাহস সম্পর্কে কোনো সন্দেহ সংশয় নেই।

দীলাওয়ার খান আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলো, কিন্তু সহসা প্রচন্ড কাশির বেগে তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না। দু'তিন মিনিট কাশবার পর সে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে থাকলো এবং মুরাদ আলী বাহু ধরে তাকে বিছানার উপর শুইয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ কামরার মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করলো। অবশেষে মুরাদ আলী মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'আম্মাজান, আপনারা গিয়ে আরাম করুন। আমি এখানে বসছি।'

দীলাওয়ার কাত্‌রে উঠে চোখ খুললো এবং ক্ষীণ কণ্ঠে মুরাদ আলীকে বললো ঃ 'আমার সম্পর্কে আপনি পেরেশান হবেন না। আপনি ঘরে গিয়ে খানা খেয়ে নিন। আমি বেশ ভালো আছি। এখনো হয়তো বিবিজী ও মুনীরার খাওয়া হয়নি।

মুরাদ আলী খানিকক্ষণ ইতস্তত করে উঠতে উঠতে বললেন ঃ 'বহুত আচ্ছা। আমি এখ্‌খুনি আসছি। মুনাওয়ার, তুমি চাচার কাছে থেকো আর করীম খানকেও এখানে ডেকে নিও।'

দীলাওয়ার খান বললো ঃ 'না, করীম খানের এখানে দরকার নেই। ও বড়োই বেঅকুফ।'

ঃ কেন চাচা, সে কি করেছে?

ঃ 'জি, ও বারবার আমার নাড়ি হাতড়ায়। ওরা শুশ্রুষা আমার তকলিফের কারণ হয়। সাহেবের অসুখের সময়ে ও বলেছিলো ঃ "আমার বাপ এই রোগেই মরেছেন।" এখন ও আমায় বলে ঃ "আমার মারও ঠিক এই রোগই ছিলো।" শহরের কোন এক বেঅকুফ সন্ন্যাসী ওর দোস্ত। সে ওকে কয়েকটা গাছ-গাছড়ার নাম বলে দিয়েছে। এখন সে প্রতিদিন কোনো না কোনো গাছের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আসে, আর পীড়াপীড়ি করে, যেনো হাকীম সাহেবের ওষুধ না খেয়ে আমি তার ব্যবস্থা মেনে নেই।'

মুনীরা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন ঃ 'ওর দেওয়া কোনো ওষুধ খান নি তো আপনি?'

ঃ 'না জি, অতোটা বেঅকুফ আমি নই।'

মুরাদ আলী মুনাওয়ারকে বললেন 'তুমি ওঁর খেয়াল রেখো আর করীম খানকে বলে দিও, যেনো ওঁকে বিরক্ত না করে। আমি এখ্‌খুনি আসছি। আসুন, আম্মাজান!'

ফরহাত ও মুনীরা উঠে মুরাদ আলীর পিছুপিছু কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী দুপুর বেলায় সুলতান টিপুর দুই বালকপুত্র শাহ্যাদা আবদুল খালেক ও শাহ্যাদা মোয়েয্যুদ্দীন কেল্লার ভিতর থেকে বেরিয়ে সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে সওয়ার হলেন। তাঁদের আগে কয়েকটি লোক নেযাহ্ ও ঝান্ডা উঁচু করে চলছে। পিছনে অপর দু'টি হাতীতে সুলতানের উকীল গোলাম আলী ও রেযা আলী সওয়ার হয়েছেন। হাতীর পিছনে প্রায় দু'শো সওয়ার ও পদাতিক। দরযার সামনে প্রশস্ত ময়দানে হাজারো মানুষ তাদের শাসকের পুত্রদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এসেছে। সুলতান টিপু পাঁচিলের এক বুরুজ থেকে দেখছেন এ মর্মন্তুদ দৃশ্য। শাহ্যাদা আবদুল খালেক আট বছরের আর মোয়ায্যুদ্দিনের বয়স পাঁচ বছর। কেল্লার তোপ সালামী ধ্বনি করলে কাফেলা রওয়ানা হল। পাঁচিলের উপর থেকে এ দৃশ্য দেখছে যে সব সিপাহী আর যে জনতা সমবেত হয়েছে ময়দানে, তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার চোখে অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়নি। কিন্তু সুলতানের মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি বিরাজমান। এক অফিসার সামনে এসে সালাম করে বললো ঃ 'আলীজাহ্, ঢুন্ডিয়া দাগ কদমবুসীর এজাযতপ্রার্থী।'

ঃ 'ঢুন্ডিয়া দাগ! কোথায় সে?'

ঃ 'আলীজাহ্, সে এখ্খুনি পৌঁছলো। আমি বলেছিলাম যে, এখন মোলাকাত হবে না, কিন্তু সে খুব পীড়াপীড়ি করলো।'

ঃ 'ডাকো তাকে।'

অফিসার সালাম করে নীচে নেমে গেলো এবং কিছুক্ষণ পরেই ঢুন্ডিয়া দাগ সিঁড়ি বেয়ে হাযির হল। সে এগিয়ে এসে সুলতানের পদস্পর্শ করবার চেষ্টা করলো সুলতান হাতের ইশারায় তাকে নিষেধ করে বললেন ঃ তোমাদের এ আদব আমার পসন্দ নয়। বলো, কি বক্তব্য তোমার?'

ঢুন্ডিয়া দাগ অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে বললো ঃ 'আলীজাহ্! আমি এই আবেদন নিয়ে এসেছি যে, শাহাযাদাদের আপনি দুশমনের হাতে দেবেন না।'

সুলতান জওয়াব দিলেন ঃ 'এ কথার সময় অতীত হয়ে গেছে।'

ঃ 'কিন্তু আলীজাহ্! সন্ধির ব্যাপারে দুশমনের নিয়ত ভালো নয়। কাল থেকে আমি দুশমন শিবিরে ঘুরেছি। আমি নিজের কানে কয়েকজন মারাঠা সরদারে কথা শুনেছি। শাহ্যাদাদের বন্দী করে রেখে আপনাকে নিকৃষ্টতম শর্ত মানতে বাধ্য করবে ওরা।'

সুলতান বললেন ঃ 'ঢুন্ডিয়া দাগ। এক সিপাহীর যিন্দেগীতে কখনো কখনো এমন মুহূর্তও আসে, যখন লড়াই করার পরিবর্তে তলোয়ার কোষবদ্ধ করার জন্য

বেশী হিম্মতের প্রয়োজন হয়। আমার দুশমন কেমন এবং কি সংকল্প নিয়ে তারা এসেছে, তা' তোমার বলবার প্রয়োজন নেই। আমি তাদেরকে খুব ভালো করেই জানি।'

ঃ 'আলীজাহ্! আপনি সব কিছু জেনে শুনে আপনার পুত্রদের তুলে দিচ্ছেন তাদের হাতে?'

ঃ 'আমার যুদ্ধ পুত্রদের জন্য নয়, মহীশূরের জন্য এবং এখন মহীশূরের অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী আমার তলোয়ার কোষবদ্ধ করছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি প্রজাদের কাছে আরো কোরবানীর দাবি জানাতে পারি না। কাবেরীর তীরে দুশমনদের হাতে যে সব বস্তি ধ্বংস হয়ে গেছে, তার অবস্থা তুমি দেখেছো। আমার অসহায় জনগণের প্রয়োজন শান্তিপূর্ণ নিরাপত্তা, সে কথা তোমায় বলে দেবার প্রয়োজন বোধ করি না। এ যুদ্ধ আমি শুরু করিনি। তুমি জানো, মহীশূরের জনগণকে যুদ্ধের আগুন থেকে বাঁচাবার সব রকম সম্ভাব্য চেষ্টাই আমি করেছি। এখন দুশমন যদি কোনো কারণে সন্ধি করতে রাযী হয়, তা'হলে আমি ভবিষ্যতের আশায় বর্তমানের তিক্ততা বরদাশ্ত করতে দ্বিধা করবো না।'

ঢুন্ডিয়া দাগ বললো ঃ 'আলীজাহ্। আমি নিজস্ব দীনতা স্বীকার করি। আমার বাদশার মস্তিষ্কে যে চিন্তা আসে, আমি তা' ভাবতে পারি না। আমি জানি, আপনার ফয়সালা অটল। আমি একথাও জানি যে, আপনার কোনো ফয়সালা ভুল হয় না। কিন্তু এসব কথা সত্ত্বেও যাদের জন্য আমাদেরকে এই দিন দেখতে হচ্ছে, শরাফত ও ইনসানিয়াতের সে দুশমনদের আমরা মাফ করবো না কখানো। আমার মনিবের পুত্রদের আমারই চোখের সামনে তারা বন্দী করেছে, এ কথা আমি ভুলবো না আমার মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত। ইংরেজকে আমি মাফ করতে পারি, কারণ মহীশূরের স্বাধীনতাকামী মানুষের সাথে তাদের দুশমনীর কারণ আমি বুঝতে পারি। কিন্তু যে নিযাম ও মারাঠা সেই চোর-ডাকাতদের ডেকে এনেছে আমাদের ঘর পর্যন্ত,তাদেরকে আমি মাফ করবো না কোনোদিন।'

ঃ 'ঢুন্ডিয়া দাগ! তোমায় এখন সবর করে কাজ করতে হবে। আমি তোমায় খবরদার করে দিচ্ছি, যতোক্ষণ না তাদের তরফ থেকে যুদ্ধ বিরতির শর্ত ভংগ করা হয়, মহীশূরের সীমানার মধ্যে ততোক্ষণ আমি তোমাদেরকে এমন কোনো পদক্ষেপের এযাযত দেবো না, যা আমাদের মধ্যে বিরোধিতার কারণ হতে পারে।'

ঢুন্ডিয়া দাগ বললো ঃ 'আলীজাহ্! খোদা আপনাকে দিয়েছেন বাদশার দীল এবং সবর করে চলতে আপনি পারেন। কিন্তু আমার মধ্যে তো তেমন হিম্মত নেই।'

সুলতান খানিকটা তিক্ত কণ্ঠে বললেন ঃ 'ঢুন্ডিয়া দাগ! কি করতে চাও তুমি?'

ঃ 'কিছু নয়, আলীজাহ্! আমি আপনার এক সামান্য গোলাম এবং মহীশূরের সীমানার মধ্যে কোনো বড়ো কথা বলবার সাহস থাকতে পারে না আমার। কিন্তু

মহীশূরের সীমানার বাইরে আপনি আমার কাজের যিম্মাদার নন। এবার আমায় এযাযত দিন।'

ঃ 'তুমি যেতে পারো।' ক্রুদ্ধস্বরে বলে সুলতান মুখ ফিরিয়ে নিলেন।'

মিলিত শক্তি সন্ধি শর্তের খুটিনাটি সব দিক স্থির করবার আগে সুলতানের কাছ থেকে যুদ্ধের প্রথম কিস্তি উসুল করে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করলো, কিন্তু সুদীর্ঘ যুদ্ধের ব্যয় বহন করার দরুণ সুলতানের মালখানায় তাদের দাবিকৃত এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা আদায় করার মতো টাকা ছিলো না। মিলিত শক্তি তাঁকে কয়েকদিন সময় দিতেও রাযী হল না। সুলতান শাহী মহল থেকে সোনাচাঁদির বরতন ও নিজস্ব দামী জওয়াহেরাত জমা করলেন। শাহী খান্দানের মহিলারা সকল যেওর এনে তাঁর পায়ের উপর জমা করে দিলেন। মহীশূরের ব্যবসায়ীরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে অংশ নিলেন ক্ষতিপূরণের অর্থ সংগ্রহে। তাঁরা স্বেচ্ছায় এসে সুলতানের পায়ে ঢেলে দিতে লাগলেন নিজ নিজ তওফীক অনুযায়ী অর্থ। সেরিংগাপটমের প্রতিপত্তিশালী মহিলারাও হিস্‌সা নিলেন এ অভিযানে। তাঁরা লোকের ঘরে ঘরে গিয়ে চাঁদার আবেদন জানালেন বোনদের কাছে। দাবিকৃত অর্থ আদায়ের ব্যাপারে শাসকের ওয়াদা পূরণ আমীর-গরীব প্রত্যেকের কওমী প্রশ্নে পরিণত হল। হিন্দুস্তানের ইতিহাসে শাসক ও শাসিতের এ সম্পর্ক ছিলো নতুন।

একদিন ভোরে চার কাহার একটি সুন্দর পালকী বহন করে শাহী মহলের সামনে এসে হাযির হল। পাহারাদার হাতের ইশারায় তাদেরকে দাঁড় করালো। এক ফউজী অফিসার দেউড়ি থেকে বেরিয়ে পালকীর কাছে পৌঁছে কাহারাদের কাছে প্রশ্ন করলেন ঃ 'এ পালকিতে কে?'

এক কাহার জওয়াব দিলো ঃ 'জনাব, এ পালকীতে, আনওয়ার আলীর মাতা এসেছেন।

ওঁকে ভিতরে নিয়ে চলো।'ঃ বলে অফিসার আগে আগে চললেন এবং কাহাররা তাঁর অনুসরণ করলো।

আর এক দেউড়ীর কাছে থেমে কাহারদের লক্ষ্য করে অফিসার বললেন ঃ 'তোমরা এখানে থাক। আমি দারোগাকে খবর দিচ্ছি।'

কাহাররা তাঁর হুকুম তামিল করলো এবং তিনি দ্রুত পদক্ষেপে ভিতরে চলে গেলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পর মহলের দারোগা দেউড়ি থেকে বেরিয়ে পালকীর কাছে এসে বললেন ঃ 'মোহ্‌তারেমা, আপনি মোয়ায্‌যম আলীর বিধবা?'

ঃ 'জি,হ্যাঁ।'

ঃ 'তশীরফ আনুন। সুলতানে মোয়ায্‌ম আপনার ইন্তেযার করছেন।

ফরহাত বোরকা পরে পালকি থেকে বেরিয়ে দারোগার পিছু পিছু চললেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা এক দীর্ঘ প্রশস্ত বারান্দা পার হয়ে এক কামরায় প্রবেশ করলেন। দারোগা বললেন ঃ 'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। সুলতানে মোয়াযযম এক্ষুণি তশরীফ আনছেন।'

দারোগা বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ফরহাত বোরকা থেকে হাত বের করে একটি চাঁদির ছোট বাক্স ও একটি মখমলের থলে একটি কুরসির উপর রাখলেন এবং নিজে অপর এক কুরসির উপর বসলেন। প্রশস্ত কামরাটি বহুমূল্য গালিচা ও আবলুস কাঠের কুরসি দ্বারা সজ্জিত। প্রায় দশ মিনিট পর ফরহাতের ডানদিকে একটি দরযা খুলে গেলো এবং সুলতান টিপু সামনের কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন। ফরহাত উঠে দাড়াঁলেন।

সুলতান এগিয়ে এসে বললেন ঃ 'আপনি মোয়ায্যম আলীর বিধবা?'

ঃ 'জি হ্যাঁ।'

ঃ 'তশরীফ রাখুন।'

ঃ 'ফরহাত বসলেন।'

সুলতান কিছুক্ষণ নির্বাক থাকার পর বললেন ঃ 'আপনাকে ইন্তেযার করতে হয়েছে, তার জন্য আমি দুঃখিত। আমি বড়োই ব্যস্ত ছিলাম। আপনার চিঠি আমি পেয়েছিলাম। আপনি যদি আনওয়ার আলীর সম্পর্কে কিছু বলতে চান, তা'হলে আপনার এতটা তকলীফ করার প্রয়োজন ছিল না। মুরাদ আলীকে পাঠিয়ে দিলেই পারতেন। মোয়ায্যম আলীর পুত্র আমার কাছে অপরিচিত নয়। আনওয়ার আলীর সম্পর্কে আমি আশ্বস্ত হয়েছে যে, তিনি শামুগার কাছে এক লড়াইয়ে যখমী হয়েছিলেন এবং মারাঠা তাঁকে বন্দী করে নারগন্ডে পাঠিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে কয়েদি বিনিময় হবে এবং ইনশা আল্লাহ, তিনি আপনার কাছে পৌঁছে যাবেন।'

ফরহাত অপর কুরসি থেকে চাঁদির বাক্সটি তুলে দাঁড়িয়ে বললেন 'আলীজাহ্! আনওয়ার আলীর কথা আমি জানতে আসিনি। চাতলদুর্গের কেল্লাদারের চিঠি তার সম্পর্কে আমায় আশ্বস্ত করেছে। আমি আর একটি কায নিয়ে এসেছি, এই নিন, এই বাক্সে আমার কিছু যেওর ছাড়া আরো রয়েছে সেই হীরা, যা আজ থেকে বিশ বছর আগে নওয়াব সিরাজুদ্দৌলা তাঁর এক বিশ্বস্ত সিপাহীর খেদমতের বিনিময়ে দান করেছিলেন। এই সিপাহী ছিলেন আমার স্বামীর বাপ। তিনি পলাশীর যুদ্ধে যখমী হয়ে মুমূর্ষ অবস্থায় মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন আপনার এক এক কড়ির প্রয়োজন, তখন আমি এই হীরক খন্ড এর চাইতে ভালোভাবে ব্যয় করার চিন্তাও করতে পারি না। আমার শুধু আফসোস, এ থেকে কয়েক খন্ড হীরা আমরা সেরিংগাপটমে আসার আগে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করেছিলাম।'

সুলতান কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে বললেন ঃ 'আমি আপনার শোকরগুযারী করছি। কিন্তু আমি আমার এক বিধবা বোনের তোহ্ফা কবুল করতে পারি না। আমি জানি,

মোয়ায্যম আলীর খান্দান মহীশূরের জন্য কোনো কোরবানী করতেই দ্বিধা করবে না। কিন্তু যে প্রয়োজনের জন্য আমি প্রজাদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য কবুল করেছি, তা' পুরো হয়ে গেছে। ইন্‌শাআল্লাহ, কাল পর্যন্ত দুশমনের ক্ষতিপূরণের অর্থ পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

ঃ 'আলীজাহ্! মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আমার অন্তরে দুঃখ থাকবে যে, আমি একটি কর্তব্য পালনে ত্রুটি করেছি।'

ঃ 'বোন, আপনার স্বামী আর আপনার দুই পুত্র আমার ঝান্ডাতলে শহীদ হয়েছেন। তাঁদের রক্ত আমার কাছে দুনিয়ার সকল সম্পদের চাইতে মুল্যবান।'

ফরহাত দুঃখের সাথে চাঁদির বাক্সটি পুনরায় কুরসির উপর রাখলেন এবং মখমলের থলেটি তুলে বললেন ঃ 'আলীজাহ্! পরশু আমার এক নওকর মারা গেছে। এই থলের মধ্যে তার সারা জীবনের কামাই রয়েছে। মৃত্যুকালে সে থলেটি আমার হাতে দিয়ে গেছে এবং আমি তার কাছে ওয়াদা করেছি যে, আমি নিজে আপনার খেদমতে হাযির হ'য়ে তার তরফ থেকে এ নয্‌রানা পেশ করবো।'

ঃ 'তার কোনো ওয়ারিস নেই?'

ঃ 'জি না, আলীজাহ্!'

সুলতান এগিয়ে এসে ফরহাতের হাত থেকে থলেটি ধরলেন এবং ঠোঁটের উপর এক বিষন্ন হাসি টেনে এনে বললেন ঃ 'কিছুক্ষণ আগে আমি ভেবেছি যে, আমার মালখানা খালি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ অবস্থায়ও আমার মনে হচ্ছে, আমি দুনিয়ার সব চাইতে সম্পদশালী ব্যক্তি। আপনার নওকরের নাম কি ছিলো?'

ঃ 'দীলাওয়ার খান।' ফরহাত জওয়াবে বললেন।

কিছুক্ষণ পর ফরহাত ফিরে চললেন তাঁর নিজ গৃহের অভিমুখে।



মিলিত সেনাবাহিনী যুদ্ধবিরতির প্রাথমিক শর্তে সুলতানের কাছ থেকে পেশোয়া ও নিযামের রাজ্যের এবং কোম্পানীর অধিকৃত এলাকার সন্নিহিত জেলাগুলো দাবি করেছিলো। কিন্তু সুলতানের শিশুপুত্রদের হাতে নেবার ও দাবিকৃত অর্থ উসুল করার পর তারা নিজ নিজ আকাংখা অনুযায়ী শর্তগুলোর ব্যাখা বিশ্লেষণ করতে লাগলো। সুলতান টিপু বারোমহল, ডান্ডিগল ও মালাবারের বেশীর ভাগ এলাকা ইংরেজের হাতে ছেড়ে দিতে রাযী ছিলেন, কিন্তু কর্ণওয়ালিস কুর্গ ছাড়া বেলাবী, গুটি ও সালেম এলাকাও তাঁদের অধিকারভূক্ত করার দাবী করলেন, যদিও এলাকাগুলি মিলিত শক্তির অধিকৃত এলাকার সীমান্তের নিকটবর্তী ছিলো না। মালে গণিমত হাসিল করা ছাড়াও ইংরেজদের লক্ষ্য ছিলো ভবিষ্যতের জন্য সুলতানের প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল করে দেওয়া। কুর্গ এলাকা মালাবার উপকূল ও সেরিংগাপটমের মাঝখানে একটা স্বাভাবিক সীমারেখার কাজ করছিলো এখানে ফউজী আড্ডা করে নিতে

পারলে ইংরেজ সেরেংগাপটমের জন্য একটা স্থায়ী বিপদ সম্ভাবনার কারণ হয়ে বসতে পারতো। কুর্গ কোম্পানীর অধিকৃত কোনো এলাকার সন্নিহিত ছিলো না এবং প্রারম্ভিক শর্ত সংক্রান্ত কোনো আলাপ আলোচনায় এ এলাকার প্রসংগ উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু এবার সুলতানের উকিলদের আপত্তির জওয়াবে লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রতিনিধি নেক্‌ডের চিরাচরিত যুক্তি পথ অবলম্বন করলো। এখন তাদের কাছে সন্নিহিত এলাকা বলতে কেবল এমন এলাকাই বুঝায় না, যার সীমানা মিলিত শক্তির অধিকৃত এলাকার সাথে মিলে গেছে; বরং এমন এলাকাও বুঝায়, যার সীমানা তাদের এলাকা থেকে খুব দূরে নয়। লর্ড কর্ণওয়ালিসের তরফ থেকে চুক্তির শর্ত নির্ধারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্যার জন কেনিয়াদে তাঁর অযৌক্তিক দাবির সংগতি প্রমাণের জন্য দলীল পেশ করলেন যে, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পনী কুর্গ সম্পর্কে প্রাক্তন রাজার সাথে এক আলাদা চুক্তি করেছে।

কয়েকদিনের নিস্ফল আলোচনার পর সুলতান ও মিলিত শক্তির মধ্যে শান্তি আলোচনা ভেঙে গেলো এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস সুলতানের উপর চাপ দেবার জন্য সেরিংগাপটম অবরোধ অব্যাহত রাখার হুকুম দিলেন। মিলিতি সেনাবাহিনীর গতিবিধির সাথে সাথে খবর শোনা গেল যে, শাহ্‌যাদা আবদুল খালেক ও মোয়েয্‌যুদ্দীনকে মাদ্রাজের দিকে রওয়ানা করে দেওয়া হচ্ছে। শাহ্‌যাদার সাথে যে দু'শো সিপাহী ও অফিসার পাঠানো হয়েছিলো, তাদেরকে নিরস্ত্র ক'রে জংগী কয়েদীদের তাঁবুতে পাঠানো হয়েছে।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের কার্যকলাপ ছিলো যুদ্ধবিরতি চুক্তির সুস্পষ্ট বিরোধী। তিনি সুলতান টিপুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, শান্তি-আলোচনা ভেঙে গেলে শাহযাদাদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং ক্ষতিপূরণের এক কোটি ষাট লক্ষ টাকাও ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু মিলিত শক্তির নিয়ত বদলে গেলো এবং তাদের বিশ্বাস ছিলো যে, তারা শাহ্‌যাদাদের বন্দী ক'রে রেখে সুলতানকে দিয়ে যে কোনো দাবী মানিয়ে নিতে পারবে। সুতরাং পুনরায় যুদ্ধ শুরু করার হুমকি অধিকতর কার্যকরী করার জন্য মিলিত শক্তি কাবেরী নদীর অপর পারে লুটতরাজ শুরু করে দিলো। এবারক্রুসীর নেতৃত্বে এক ইংরেজ ফউজ কাবেরীর দক্ষিণে কতকগুলো বস্তি ধ্বংস করে ফেললো। ইংরেজদের আর একটি ফউজ লালবাগের খুবসুরত বাগিচা বিরান করে দেওয়ার পর শহর গঞ্জামের গলিতে শুরু করলো লুটতরাজ। নিযামের এক লশ্‌কর গুরমকুন্ডার আশপাশে শুরু করলো হামলা এবং ভাওয়ের সেনাবাহিনী ধ্বংস তান্ডব চালাতে লাগলো কাবেরীর উত্তর দিকে।

এহেন পরিস্তিতিতে সুলতানের লড়াই ছাড়া কারো গত্যন্তর থাকলো না। মার্চ মাসের দ্বিতীয় হফ্‌তায় সুলতানের সিপাহীরা কেল্লার সংরক্ষণ ব্যবস্থা মযবুত করার কার্যে বিব্রত। কেল্লার বাইরে দ্বীপের বিভিন্নস্থানে ইংরেজ তাদের ভারী তোপ স্থাপন করতে লাগলো। এর সাথে সাথেই উভয় পক্ষের প্রায় একইভাবে যে কোনো উপায়ে যুদ্ধ সাময়িকভাবে মুলতবী রাখার জন্য সচেষ্ট হল। মিলিত শক্তির সৈন্যসংখ্যা

ও সামরিক সরঞ্জামের শ্রেষ্ঠত্ব থাকা সত্ত্বেও আশাংকা ছিল যে, সুলতান শক্ত হয়ে দাঁড়ালে কোনো অবস্থায়ই তারা বর্ষার আগে সেরিংগাপটমের কেল্লা জয় করতে পারবে না এবং বর্ষার মওসুমে সেরিংগাপটমের বাইরে সুলতানের অল্প সংখ্যক ফউজের পক্ষেও তাদের রসদ ও সেনা সাহায্যের পথ বিচিছন্ন করা খুব মুশকিল হবে না। বিজয়ের জন্য তাদেরকে অসংখ্য কোরবানী দিতে হবে এবং পরাজয় ঘটলে তাদেরকে শোচনীয় ধ্বংসের মোকাবিলা করতে হবে।

পক্ষান্তরে সুলতান টিপু অনুভব করছিলেন যে, তিনি নিংসগ অবস্থায় অনির্দিষ্টকালের জন্য মারাঠা, নিযাম ও ইংরেজের অগুণতি ফউজের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে পারেন না। তাই দুশমনের চুক্তি ভংগ ও অসদাচরণ সত্ত্বেও তাঁর আচরণ ছিলো অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ।

তারপর একদিন আচানক বিডনোর থেকে মীর কমরুদ্দীন খানের এক ডিভিশন ফউজ প্রচুর পরিমাণ রসদসহ সেরিংগাপটম পৌঁছে গেলো এবং প্রচন্ড বিক্রমে কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করলো। মীর কমরুদ্দীন খানের আগমনের কয়েক ঘন্টা পর মিলিত সেনাবাহিনীর পদপ্রদর্শক লর্ড কর্ণওয়ালিসের খিমায় সমবেত হয়ে পরস্পরকে পরামর্শ দিতে লাগলো যে, পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে এবং তাদেরকে স্থির মস্তিষ্কে এবার সুলতানের শান্তি প্রস্তাব নিয়ে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। সুতরাং ১৮ই মার্চ লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমন্ত্রণে সুলতানের প্রতিনিধি তাঁর শিবিরে পৌঁছলো এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁর সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর সন্ধিচুক্তির নতুন খসড়া তৈরী করে তার হাতে সোপর্দ করলেন।

সন্ধি চুক্তিতে যে সব রদবদল করা হল, তা' হরিপন্থ ও নিযামের সিপাহ্সালার সিকান্দার জাহ্র মনঃপুত হল না। মারাঠাদের অধিকারভুক্ত এলাকার সীমানা কৃষ্ণানদী পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হল। নিযামকে দেওয়া হল কুর্পা, গান্দিকোট, কম্বম এবং কৃষ্ণানদী ও নিম্ন তুংগভদ্রার মধ্যবর্তী কতিপয় জেলা। খোদাদাদ সালতানাতের বন্দরবাঁটের মধ্যে ইংরেজ সব চাইতে বড়ো ভাগ নিয়ে নিলো। তারা ডাভিগল ও বারোমহল ছাড়া মালাবারের বেশীর ভাগ উপকূল এলাকা এবং কালীকট, ও কানানূরের বন্দরগাহ্ সুলতানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলো। কুর্গের উপর দখল জমানো সম্পর্কেও তাদের দাবী সুলতানকে মেনে নিতে হল। কয়েকটি বিরোধীয় এলাকার উপর তারা সুলতানের অধিকার স্বীকার করে নিলো।

চুক্তির শর্ত নিজেদের জন্য লাভজনক করে নেবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সুলতানের সাথে যে প্রতারণা ও চুক্তিভংগের আশ্রয় নিয়েছিলো, তা' তাদের অতীত রাজনৈতিক কার্যকলাপের নীতিসম্মতই ছিলো কিন্তু সুলতানের মতো তাদের মিত্রদের সাথেও তারা কোনো সদাচরণ করেনি। নিযাম ও মারাঠা যদিও কতকগুলি এলাকার অধিকার পেয়েছিলো, তথাপি ইংরেজের বন্ধু বাৎসল্যের দরুন তা হয়নি; বরং তার কারণ ছিলো এই যে, তারা যে কোনো সময়ে সুলতানের সাথে সন্ধি করে ইংরেজের জন্য সংকট সৃষ্টি করতে পারতো। এই দু'টি বড়ো শক্তি নিরপেক্ষ থাকলেও ইংরেজের

ধ্বংসের পথই খোলাসা হত। তাই লর্ড কর্ণওয়ালিস তাদের দিকে গোশ্‌ত খেয়ে হাড়্ডি ছুঁড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

যে ত্রিবাংকুরের রাজার সাহায্য করবার বাহানায় ইংরেজও এ যুদ্ধ শুরু করেছিলো, তিনি দুর্বল ও অসহায় মিত্র বলেই লর্ড কর্ণওয়ালিসের জন্য কোনো উদ্বেগের কারণ হতে পারেননি। তাই লুণ্ঠিত দ্রব্য বন্টনের সময়ে তাঁকে স্পষ্টত উপেক্ষা করা হল। প্রথমে তিনি ইংরেজেরই প্ররোচনাই সুলতানের সাথে যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন এবং যথেষ্ট ক্ষতিও স্বীকার করেছিলেন। তারপর তিনি ইংরেজের সাহায্যের বিনিময়ে তাদেরকে পঁচিশ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হন। তারপর সুলতানের সাথে ইংরেজের নিয়মিত যুদ্ধ শুরু হলে রাজা তাঁর যাবতীয় সামরিক ও আর্থিক সংগতি ইংরেজের হাতে অর্পণ করেন, কিন্তু যুদ্ধ সমাপ্তির পর ইংরেজ তাদের এই বেঅকুফ, অসহায় ও দুর্বল বন্ধুটিকে লুণ্ঠিত দ্রব্যের শরীক না করে তাঁর অধিকৃত কোনো কোনো এলাকা ছিনিয়ে নিয়ে কোচিনের রাজাকে দান করলো।

যুদ্ধে যদিও ইংরেজ ও তাদের মিত্রশক্তি সুলতানকে পুরোপুরি পরাজিত করতে পারেনি, তথাপি মহীশূরের আর্থিক ও সামরিক শক্তির উপর তারা ভয়াবহ আঘাত হেনেছিলো। মালাবারের গরম মশলার ব্যবসায় ছিলো সুলতানের অর্থাগমের একটি বড়ো মাধ্যম। তার বড়ো অংশই চলে গেলো ইংরেজের দখলে। বারোমহল ও কুর্গ দখল করে নেবার পর পূর্ব ও পশ্চিম থেকে সুলতানের উপর হামলা চালানো ইংরেজের পক্ষে সহজসাধ্য হল। ডান্ডিগল এবং কৃষ্ণা ও তুংগভদ্রার মধ্যবর্তী উর্বর এলাকা থেকে সুলতান বঞ্চিত হলেন। পরিণামের দিক দিয়ে এ যুদ্ধ ইংরেজ ও তাদের হিন্দুস্থানীয় মিত্রদের জন্য আর একটি যুদ্ধের পথ খোলসা করে দিলো।

কুড়ি

মার্চ মাসের শেষের দিকে জংগী কয়েদি বিনিময় ও মিলিত সেনাবাহিনী অপসারণ শুরু হল। অবরোধ চলাকালে নিযাম, মারাঠা ও কোম্পানীর সেনাশিবিরে নানা রকম রোগের প্রাদুর্ভাব হল এবং তাদের পক্ষে যখমী ছাড়া আরো অসংখ্য রোগী অপসারণের প্রশ্ন উদ্বেগজনক হয়ে উঠলো। এই পর্যায়ে সুলতান আর একবার মানবতা প্রীতির প্রমাণ দিলেন এবং দুশমনের যখমী ও ব্যাধিগ্রস্থ লোকদের জন্য ডুলি ও কাহার পাঠালেন।

একদিন ভোরবেলা হরিপন্থ এক প্রশস্ত খিমায় উপবিষ্ট। এক পাহারাদার ভিতরে প্রবেশ ক'রে বললো ঃ 'মহারাজ, মহিশূর ফউজের একজন অফিসার আপনার কাছে হাযির হবার এজাযতপ্রার্থী।'

ঃ 'তাঁকে নিয়ে এসো।'

পাহারাদার বাইরে চ'লে গেলো। কিছুক্ষণ পর সৈয়দ গফ্‌ফার খিমায় প্রবেশ করলেন এবং যথারীতি আদব প্রদর্শন ক'রে বললেন ঃ 'জনাব, সুলতানের মায়ায্‌যম

আমায় পাঠিয়েছেন। তিনি আপনার সাথে মোলাকাত করতে চান। আপনার অপর কোনো ব্যস্থতা না থাকলে তিনি ঠিক দশটায় এখানে পৌঁছবেন।'

ঃ 'সুলতান টিপু আমার সাথে দেখা করতে আসছেন?' হরিপন্থ হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'জি হ্যাঁ, তাঁরা কাছে খবর পৌছে গেছে যে, কাল আপনি চলে যাচ্ছেন।' হরিপন্থ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন ঃ 'আমার তরফ থেকে এ মোলাকাতের আয়োজন করা হয়নি, তার জন্য আমি দুঃখিত। যা-ই হোক, আমি তাঁর শোকরগুযারী করছি। আপনি তাঁকে পয়গাম দেবেন যে, আমি তাঁর পথ চেয়ে থাকছি।

সৈয়দ গফ্‌ফার সালাম ক'রে বেরিয়ে গেলেন। খিমা থেকে খানিকটা দূরে তাঁর পাঁচজন সাথী ঘোড়ার বাগ ধ'রে দাঁড়িয়েছিলো। সৈয়দ গাফ্‌ফার এক ঘোড়ায় চ'ড়ে দ্রুত ঘোড়া ছুটালেন এবং তাঁর সাথীরা তার অনুসরণ করলো।

কিছুক্ষণ পর হরিপন্থের ফউজের বিশিষ্ট সরদার ও সিপাহীরা তাঁর খিমার বাইরে সারি সজ্জিত করতে লাগলো। দশটার সময়ে সুলতান টিপু একদল সওয়ার নিয়ে মারাঠা শিবিরে প্রবেশ করলেন। মারাঠা সিপাহীরা তাঁকে সালাম জানালো। তারপর হরিপন্থ এগিয়ে এসে খুবসুরত গালিচার উপর দিয়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন খিমার ভিতরে।

ঃ 'আলীজাহ্‌, তশরীফ রাখুন। হরিপন্থ একটি সুসজ্জিত কুরসির দিকে ইশারা ক'রে বললেণ ঃ 'আমার তোপখানা কাল এখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেছে। তাই আপনাকে সালামী দেওয়ার ব্যবস্থা করা গেলো না। তার জন্য আমি দুঃখিত।'

সুলতান বললেন ঃ 'আমি ব্যক্তিগত কারণে আপনার কাছে এসেছি। তাই এসব আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের প্রয়োজন নেই। আপনি তশ্‌রিফ রাখুন। আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই।'

হরিপন্থ অপর এক কুরসির উপর বসলেন এবং সুলতান খানিকক্ষণ নির্বাক থাকার পর বললেন ঃ 'এখন আমাদের যুদ্ধ খতম হ'য়ে গেছে এবং সে তিক্ততার আলোচনায় আমি কোনো ফায়দা দেখছি না; কিন্তু এ কথা আমি অবশ্যি বলবো যে, এখন আপনাদের লুব্ধ দৃষ্টিতে সেরিংগাপটমের দিকে না তাকিয়ে ইংরেজের সংকল্প সম্পর্কে খবরদার হওয়া উচিত। আমার খান্দান প্রায় ত্রিশ বছর আগে থেকে দক্ষিণ হিন্দুস্তানে ইংরেজ আক্রমণের সয়লাব প্রতিরোধ করেছে এবং এই সময়ের মধ্যে এ সয়লাব রোধ করার জন্য আমি যে পাঁচিল খাড়া করেছিলাম, তা' অনেকখানি ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে এই বাস্তব সত্য সম্পর্কে খবরদার ক'রে দিতে চাই যে, যেদিন সেরিংগাপটমের আযাদীর পতাকা ভূলুণ্ঠিত হবে, সেদিন আপনারা অথবা নিযামুল-মুলক পুণা ও হায়দরাবাদের পথে আর কোনো অপারাজেয় পাঁচিল খাড়া করতে পারবেন না। কর্ণওয়ালিসের সংকট সম্পর্কে আমার জানা আছে, যার জন্য তিনি যুদ্ধ বিলম্বিত করা সংগত মনে

করেন নি, কিন্তু তাঁর নিয়ত সম্পর্কে আমি কোনো অমূলক আশা পোষণ করি না। নতুন ক'রে তাঁর যুদ্ধের প্রস্তুতির প্রয়োজন এবং প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হ'য়ে গেলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করার জন্য বাহানা খুঁজতে তাঁর দেরী লাগবে না। তখন সেরিংগাপটম চুক্তিকে মাংগালোর চুক্তির চাইতে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হবে না। কিন্তু ইংরেজ যে দিল্লী পর্যন্ত তাদের জয়পতাকা উড্ডীন করতে চায় এবং সেরিংগাপটম, পুণা, হায়দরাবাদ, ইন্দোর, গোয়িলয়র প্রভৃতি স্থান যে তাদের পথের বিভিন্ন মন্যিল হবে, সে সম্পর্কে আপনাদের কোনো ভুল ধারণা থাকা উচিত হবে না। বাংলা থেকে ইংরেজ লাখ্নৌয়ে পৌছে গেছে। এখন মহীশূরের অবশিষ্ট প্রতিরোধ শক্তি ধ্বংস ক'রে দেবার পর তাদের পথে বাকী মন্যিল অতিক্রম করতে কতো দেরী লাগবে, তা' আপনাদের চিন্তার বিষয়। হায়! আমাদের সকলের আযাদী যে সারা হিন্দুস্তানের আযাদীর সাথে একই সূত্রে গ্রথিত, আমার এই পয়গম যদি আপনি মারাঠা কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পৌছাতে পারতেন!'

হরিপন্থ্ বিষাদক্লিষ্ট কণ্ঠে জওয়াব দিলেন ঃ 'আলীজাহ্! ইংরেজের নিয়ত সম্পর্কে এখন আমাদের কোনো ভুল ধারণা অবশিষ্ট নেই। এ যুদ্ধে আমরা লজ্জা ছাড়া আর কিছু পাইনি। অপরের কথা আমি বলতে পারি না, ব্যক্তিগতভাবে আপনার কাছে আমি ওয়াদা করছি, আপনি আমায় দুশমন হিসাবে দেখবেন না কখনো। হায়! আমরা যদি হোলকারের পরামর্শ মেনে চলতাম! এসব যুদ্ধ সম্পর্কে আমি হামেশা এক সিপাহীর মন নিয়ে চিন্তা করেছি, কিন্তু যেদিন আপনার বালক-পুত্রদের ইংরেজ শিবিরে নিয়ে আসা হল, তখন আমি সেখানে হাযির ছিলাম এবং আমি প্রথমবার অনুভব করলাম যে, হিন্দুস্তানের বাসিন্দা হিসাবে আমরাও তাঁদের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। তখন ইংরেজের অট্টহাসি আমার কাছে অন্তহীন পীড়াদায়ক মনে হয়েছিলো।'

সুলতান বললেন ঃ 'আমার পুত্রদের সম্পর্কে পেরেশান না হয়ে আপনার চিন্তা করা উচিত ছিলো মহীশূরের সেই হাজারো সন্তানের কথা, যারা স্বদেশের আযাদীর জন্য পেশ করেছে তাদের বুকের খুন। আপনার ভাবা উচিত ছিলো বাংলার নওয়াব সিরাজুদ্দৌদ্‌লা, বেনারসের চৈৎ সিংহ, রোহিলাখন্ডের হাফিয রহমত খান ও অযোধ্যার বেগমদের কথা, যাঁরা দেখেছেন ইংরেজের চুক্তিভংগের ও প্রতারণার অধিকতর মর্মবিদারী দৃশ্য।'

কিছুক্ষণ পরে হরিপন্থের সাথে সুলতানের মোলাকাত শেষ হল এবং হরিপন্থ্ খিমার বাইরে এসে সুলতানকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন। সুলতান চ'লে যাওয়া মাত্রই মারাঠা ফউজের বড়ো বড়ো সরদার হরিপন্থের কাছে এসে জমা হল এবং তারা নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলো। এক ব্রাহ্মণ বললো ঃ 'মহারাজ! দেখলেন, মহীশূরের বাদশাহ নিজে আপনার কাছে চ'লে এসেছেন! আর ক'টা দিন যুদ্ধ চালিয়ে গেলে তিনি পায়ে হেঁটে আসতেন আপনার কাছে।' হরিপন্থ্ রেগে বললেন ঃ 'তুমি এক বেঅকুফ। আমরা সুলতান টিপুকে পরাজিত করতে পারি, তাঁর সালতানাত দখল করতে পারি, কিন্তু তাঁর মহত্ব-গৌরব কেড়ে নিতে পারি না।'



যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পাঁচ মাস অতীত হয়ে গেছে। শান্তিচুক্তির অব্যবহিত পরেই সুলতান তামাম জংগী কয়েদীকে মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু পরশুরাম ভাও সেরিংগাপটম থেকে ফি'রে যাবার পথে কতকগুলো বস্তি ধ্বংস ও বিরাণ ক'রে গেছেন। সেরিংগাপটম অবরোধের আগে মহীশূরের যে সব কয়েদীকে নারগন্ডে পাঠানো হয়েছিলো, এখনো তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে তিনি দীর্ঘসূত্রিতার নীতি অনুসরণ ক'রে চলেছেন। হরিপন্থ পুণায় পৌছে অসংখ্যবার পরশুরামের এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু তাঁর পিছনে নানা ফার্ণাবিসের সমর্থন এবং পেশোয়ার দরবারে হরিপন্থের চীৎকার হল নিষ্ফল, কিন্তু আগষ্ট মাসের শেষদিকে পেশোয়ার পরে মারাঠা কওমের সব চাইতে প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী নেতা সিন্ধিয়া পুণায় পৌছলেন এবং তাঁর চেষ্টায় পুণার হুকুমতের কর্মপদ্ধতিতে এক বাঞ্ছিত পরিবর্তন দেখা গেলো।

যুদ্ধের পর ফরহাতের উপর পুত্র-বিচ্ছেদের ফল সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। ক্রমাগত অস্থিরতা ও অনিদ্রার দরুণ তাঁর স্বাস্থ্য দিনের পর দিন ভেঙে পড়তে লাগলো। তারপর কয়েক মাস কেটে গেলে যখন শহরে গুজব রটলো যে, পরশুরাম জংগী কয়েদীদের কতল ক'রে ফেলেছেন, তখন ফরহাতের অবশিষ্ট হিম্মতটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেলো। একদিন তিনি তীব্র জ্বরে কাতর হ'য়ে পড়ে রয়েছেন এবং মুনীরা ও মুরাদ আলী তাঁর কাছে বসে আছেন। মুনাওয়ার খান কামরায় প্রবেশ ক'রে মুনীরাকে বললো ঃ 'বিবিজী, একটি লোক আপনার সাথে দেখা করতে চান।'

'কে সে লোকটি?' ঃ মুনীরা বেগম পেরেশান হ'য়ে প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'লোকটিকে আপনার দেশের বলে মনে হয়, কিন্তু এর আগে কখনো দেখিনি তাঁকে। এক ফরাসী অফিসার তাঁর সাথে এসেছিলেন এবং তাঁকে দেওয়ানখানায় 'বসিয়ে রেখে ফিরে গেলেন। ওঁকে বেশ বড়ো লোক মনে হয়। ফরাসী অফিসার যাবার সময়ে খুব আদবের সাথে তাঁকে সালাম ক'রে গেলেন।'

ঃ 'কে হতে পারেন?' মুনীরা দ্বিধা ও পেরেশানীর অবস্থায় মুরাদ আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন।

ঃ 'আমি দেখে আসছি।' বলে মুরাদ আলী উঠে বাইরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে তিনি মুনীরাকে বললেন ঃ 'বোন, লোকটির নাম জুলিয়ান।'

ঃ 'জুলিয়ান!' মুনীরা তাঁর পেরেশানী সংযত করার চেষ্টা করে বললেন।

ঃ 'বেটী, তুমি ভয় পেলে কেন? জুলিয়ান কে?' ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ফরহাত।

ঃ 'আম্মাজান, উনি লা গ্রাঁদের ভগ্নিপতি।'

ফরহাত মুরাদ আলীকে বললেন ঃ 'বেটা, যাও, ওঁকে ভিতরে এনে নীচু তলার কামরায় বসতে দাও।

ঃ 'না, আম্মাজান, আমি ওখানেই যাচ্ছি। ভাইজান, আপনি আম্মাজানের কাছে বসুন।' বলে মুনীরা কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি দেওয়াখানার এক কামরায় জুলিয়ানের সামনে দাঁড়িয়ে। জুলিয়ান অভিযোগের স্বরে বললেন ঃ 'জিন, সেরিংগাপটম পৌঁছবার আগে লা গ্রাঁদের মৃত্যুর খবর আমি জানতাম না। হায়! তুমি যদি আমাদেরকে খবরটাও দিতে!'

মুনীরা খুব কষ্টে কান্না সংযত ক'রে নিচ্ছিলেন। জুলিয়ান তাঁর বাহু ধরে এক কুরসির উপর বসিয়ে দিয়ে বললেন ঃ 'এখন আর তোমার এখানে থাকা ঠিক নয়। তুমি খুব জল্‌দী করে সফরের জন্য জন্য তৈরী হও।'

ঃ 'না জুলিয়ান, আমি এখন সেরিংগাপটম ছেড়ে যাবো না'।

জুলিয়ান রুষ্ট হয়ে তাঁর সামনে অপর এক কুরসিতে বসে কিছুক্ষণ মাথা নত ক'রে থেকে চিন্তা ক'রে বললেন ঃ 'এখানে পৌঁছে আমি প্রথম যে ফরাসী অফিসারদের সাথে দেখা করেছি, তারা বলেছেন যে, এঁরা খুব রহমদীল মানুষ এবং তোমার সাথে এঁরা খুবই ভালো ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তা' বলে তুমি সারাজীবন দেশছাড়া হয়ে তাঁদের সাথে যিন্দেগী যাপন করে পারো না। আমি জানি, এখনো তোমার দীলের উপর প্যারীর ভয়াবহ দুর্ঘটনার স্মৃতি সজীব হয়ে রয়েছে। কিন্তু এখন ফ্রান্সের অবস্থা বদলে গেছে। যে ভয়ংকর রাতের অন্ধকার থেকে আশ্রয়ের সন্ধানে তুমি বেরিয়ে এসেছিলে, তা' দূর হয়ে গেছে। এখন তুমি দেশে ফিরে গিয়ে দেখবে এক নতুন আলো।'

মুনীরা বললেন ঃ 'বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে কোনো ফয়াসালা করা সম্ভব নয়। এ নিয়ে চিন্তা করতে আমার সময় লাগবে।'

জুলিয়ান বললেন ঃ 'এ কথা তো আমি বলিনি যে, আজই আমরা ফিরে যাচ্ছি। এখনো আমার তিন মাস ছুটি রয়েছে। কয়েক হফ্‌তা আমি এখানে কাটাতে পারি। চিন্তা করার প্রচুর সময় তুমি পাবে।'

মুনীরা বললেন ঃ 'এ গৃহের কর্ত্রী আমায় নিজের মেয়ে মনে করেন। তিনি এখন খুবই অসুস্থ এবং তাঁর পুত্র এখনো মারাঠাদের কয়েদখানায় বন্দী। এ অবস্থায় আমি ফ্রান্সে ফিরে যাবার ইরাদা করলেও আমার পক্ষে সেরিংগাপটম ছেড়ে যেতে মুশ্‌কিল হবে। সম্ভবতঃ কয়েকদিনের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। ওঁর স্বাস্থ্য ভালো হোক আর ওঁর পুত্র ঘরে ফিরে আসুন। তারপর আমি এখানে থাকা সম্পর্কে আমার ইরাদা পরিবর্তন করবো। কিন্তু যতোক্ষণ না আমি আশ্বস্ত হচ্ছি যে, এখানে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, ততোক্ষণ আমি দেশে ফিরে যেতে চাইবো না। এঁদের উপকার আমি ভুলতে পারি না। এঁরা আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন তখন, খোদার দুনিয়া যখন আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো। এ গৃহে পা রেখেছিলাম তখন, যখন এ গৃহ ছিলো হাসি-আনন্দে উচ্ছল, আর

এখন? এখন তার সর্বত্র ছেয়ে রয়েছে অন্ধকার। এ অবস্থা দেখে আমি পালিয়ে যেতে পারবো না এখান থেকে?'

জুলিয়ান মাথা নত করে খানিক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর তিনি মুনীরার মুখের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে বললেন ঃ 'আমি ক্যাপ্টেন ফ্রাঁসকের কাছ থেকে এঁদের কথা অনেক কিছু শুনেছি। এখানে পৌছে আমি যেসব ফরাসীদের সাথে দেখা করেছি, তাঁরাও আমায় অনেক কিছু বলেছেন। জিন, তুমি সত্যি করে বলো তো, তোমার এখানে থাকার কি শুধু এই যে, তুমি তোমার দীলে এঁদের উপকারের বোঝা অনুভব করছো?'

ঃ 'কেন, এ কারণ যথেষ্ট নয়?'

ঃ 'না। আমি মানি, এঁরা খুব ভালো এবং এঁরা তোমার যথেষ্ট উপকার করেছেন, কিন্তু তা' বলে তোমার আজীবন এখানে থাকার পক্ষে এ কারণ যথেষ্ট নয়। জিন, কিছু মনে করো না, যে নওজোয়ান এখন মারাঠাদের কয়েকখানায় বন্দী, ফরাসী তাঁবুতে তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছুই আমি শুনেছি।

এক মুহূর্তের মধ্যে মুনীরার চোখের সামনে আনওয়ার আলীর ছবি ভেসে উঠলো। অশ্রুসজল চোখে তিনি জুলিয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারি নি। কি বলতে চান আপনি?'

ঃ 'কিছু না, জিন! আমি শুধু দোআ করছি, যেনো তুমি তাঁকে নিয়ে কোনো মিথ্যা আশায় জড়িয়ে না পড়ো। এক ফরাসী আমার কাছে ধারণা প্রকাশ করেছেন, হয়তো তুমি....জুলিয়ান তাঁর মুখের কথাটি শেষ না ক'রে মুনীরার চোখের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন।

মুনীরা চট্ ক'রে উঠে গেলেন কিন্তু দরযার দিকে কয়েক পা গিয়েই হঠাৎ থেমে গেলেন।

জুলিয়ান বললেন ঃ 'থামো, জিন,! আমার কথা এখনো শেষ করি নি। তুমি তাঁকে ভালোবাসো। এমন এক নওজোয়ানকে ভালোবাসো। যাঁর দুনিয়া তোমার দুনিয়া থেকে আলাদা।'

মুনীরা কয়েক মুহূর্ত মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দৃষ্টির সামনে এমন একটা বাস্তব সত্য গুণ্ঠনমুক্ত হল, যা' একই সময়ে এমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি ভয়ানক। যে ঝড়কে তিনি দীর্ঘকাল তাঁর বুকের গভীরে চেপে রেখেছিলেন, তা' আজ বন্ধনমুক্ত হল। তিনি জুলিয়ানের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন ঃ 'হ্যাঁ জুলিয়ান আমি তাঁকে ভালোবাসি, কিন্তু তাঁর কাছে কোনো কিছুর প্রত্যাশা করি না।'

জুলিয়ান কণ্ঠস্বর নরম ক'রে বললেন ঃ 'নির্বোধ মেয়ে, বসো। তুমি নিজকে ছাড়া আর কাউকেও প্রতারিত করতে পারো না।'

মুনীরা চুপচাপ বসে থাকলেন। দু'হাত মুখ ঢেকে তিনি কাঁদতে লাগলেন শিশুর মতো। জুলিয়ান বললেন ঃ 'আমার বিশ্বাস, তোমার মনোভাব তাঁর অজানা নেই।'

মুনীরা অতি কষ্টে অবাধ্য অশ্রু সংযত করে জওয়াব দিলেন ঃ 'আমার সম্পর্কে কিছুই তিনি জানেন না এবং আমার মনোভাব তিনি জানুন, এটা আমি চাইও না।'

ঃ 'তা' সত্ত্বেও তুমি থাকতে চাও এখানে?'

ঃ 'হ্যাঁ।' মুনীরা সম্মতিসূচক জওয়াব দিলেন।

ঃ 'ধরে নাও, তিনি যদি আমার উপস্থিতিতে এখানে পৌঁছে যান, আর তুমি জানতে পাও যে, তাঁর দুনিয়ায় তোমার কোনো স্থান নেই, তখনো কি তুমি আমার সাথে যেতে চাইবে না?'

ঃ ' তা' আমি জানি না?'

ঃ 'ফ্রাসক আমায় বলেছিলেন যে, তাঁর সাথে তোমার প্রথম মোলাকাত হয়েছিলো পন্ডিচেরীতে।'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'তারপর তুমি তাঁরই সাথে সেরিংগাপটম পর্যন্ত সফর করেছিলে?'

মুনীরা কম্পিত কণ্ঠে বললেন ঃ 'খোদার কসম, এমন কথা বলবেন না। তাঁর সাথে সফর করার সময়ে এ কথা আমার কল্পনায়ও আসেনি যে, তিনি এক সময় আমার মনোযোগের কেন্দ্রস্থল হবেন।'

ঃ 'এও হতে পারে যে, তখন তোমার নিজস্ব অনুভূতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ছিলো না এবং লা গ্রাঁদের স্ত্রী হবার পরে এ বাস্তব সত্যটি তুমি অনুভব করেছো যে, তোমার জীবনে একটা শূণ্যতা র'য়ে গেছে।'

মুনীরা বেদনাকাতর কণ্ঠে বললেন ঃ 'আপনি প্রাণ ভরে আমায় গাল দিতে পারেন, কিন্তু 'স্বামীকে আমি ভালোবাসতে পারিনি, এমন কথা বলার এজাযত আমি আপনাকে দিবো না।'

জুলিয়ান বললেন ঃ 'জিন, তোমায় ছোট করা আমার লক্ষ্য নয়। আমার দৃষ্টিতে তুমি ফেরেশতা, কিন্তু আমি তোমায় বলতে চাই যে, ভালোবাসা ও করুণার মধ্যে অনেক তফাৎ। একজনের প্রতি তোমার ভালোবাসা ছিলো এবং আর একজনকে তুমি করুণা করেছিলে। তারপর তোমার করুণা জয়ী হল প্রেমের উপর এবং তুমি লা গ্রাঁদকে শাদী করলে।'

মুনীরা বললেন ঃ 'আপনি হয়তো ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছেন না, কিন্তু খোদা স্বাক্ষী, আমি তাঁর অবিশ্বাসভাজন স্ত্রী ছিলাম না।'

ঃ 'এ কথা তোমার বলবার প্রয়োজন নেই, জিন! আমি জানি, তোমার মতো রহমদীল মেয়ে অবিশ্বাসিনী হতে পারে না। তোমার দরদ দেখানোর জন্য এসব কথা আমি বলিনি। এখানে থাকা সম্পর্কে তোমার যিদের আসল কারণ জানা আমার পক্ষে জরুরী ছিলো এবং এখন আমি আশ্বস্ত হয়েছি। তুমি যেতে চাইলেও এখন আমি তোমায় সাথে নিতে চাইবো না। লা গ্রাঁদের আত্মার জন্যও এর চাইতে বড়ো

শান্তি আর কি হতে পারে যে, তার চলে যাওয়ার পর দুনিয়ায় তুমি একা নও। এক অফিসার আমার সাথে আলাপ প্রসংগে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, এখন মারাঠারা জংগী কয়েদীদের মুক্তি দিতে রাযী হবে। খোদা করুন, যেনো আমার উপস্থিতিতে তিনি এখানে পৌছেন আর আমি তোমার সকল উদ্বেগ দূর ক'রে দিতে পারি। নইলে আমি আমার ভাগের কাজ অপর কারুর উপর সোর্পদ ক'রে যাবো। এবার আমায় এজাযত দাও।'

ঃ 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

ঃ 'আমি ফরাসী শিবিরে থাকবো।'

ঃ 'এখানে কেন থাকছেন না আপনি?'

ঃ 'না, ওখানে থাকাই ভালো হবে আমার। ওখান থেকে লোকের সাথে মেলামেশার সুযোগ হবে আমার। এক ফরাসী অফিসারকে পেয়েছি আমার ছেলেবেলার দোস্ত। তিনি আমার জন্য মহীশূরে ভ্রমণ ও শিকারের বন্দোবস্ত ক'রে দেবার ওয়াদা করেছেন। কিন্তু এখানে যতোদিন আছি, বরাবর তোমার সাথে দেখা করবো।'

মুনীরা বললেন ঃ 'এখনো আমি আপনার স্ত্রীর কথা জিগ্‌গেস করিনি। তিনি কেমন আছেন?'

ঃ ' তিনি বেশ ভালোই আছেন। এখন তিনি দু'টি বাচ্চার মা।'

ঃ 'আপনি এখনো মরিশাসেই থাকেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু মনে হয়, ছুটির পর আমায় ফ্রান্সে ডেকে নেওয়া হবে।'

ঃ 'আপনি কি পদে আছেন।'

ঃ ' আমি কর্ণেল হয়ে গেছি।' বলে জুলিয়ান উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু মুনীরা বললেন ঃ 'একটু দেরী করুন। আমি মুরাদ আলীকে ডাকছি। তিনি আপনাকে তাঁবুতে পৌছে দেবেন।'

ঃ 'না, তাঁকে তকলীফ দেবার প্রয়োজন নেই। পথ আমি চিনি।'

মুনীরা জুলিয়ানের সাথে বেরিয়ে দেউড়ির দরযার কাছে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ভিতর বাড়ীতে চলে গেলেন।



কিছুক্ষণ পর মুনীরা প্রবেশ করলেন ফরহাতের কামরায়। তাঁর পায়ের আওয়ায শুনে ফরহাত চোখ খুললেন। মুনীরা কোনো কথা না বলে তাঁর শয্যার পাশে এক কুরসীতে বসলেন।

ফরহাত বললেন ঃ 'কি খবর, বেটি! তোমায় বড়োই পেরেশান মনে হচ্ছে। লা গ্রাঁদের ভগ্নিপতি কোনো দুঃসংবাদ নিয়ে আসেনি তো।'

মুনীরা হাসবার চেষ্টা করে জওয়াব দিলেন ঃ 'না, আম্মাজান, কোনো দুঃসংবাদ তিনি আনেন নি।'

ফরহাত মুরাদ আলীকে বললেন ঃ 'বেটা, তুমি গিয়ে বসো মেহমানের কাছে।'

মুনীরা বললেন ঃ 'উনি চ'লে গেলেন, আম্মাজান! ফরাসী শিবিরে এক দোস্তের কাছে তিনি থাকবেন।'

ঃ 'বেটি, তিনি তোমার মেহমান এবং তাঁকে এখানে রাখা তোমার উচিত ছিলো।'

ঃ 'আম্মাজান, তিনি এক দোস্তের কাছে থাকার ওয়াদা ক'রে এসেছেন, আর আপনার অসুস্থতার জন্যই আমি ওঁকে এখানে রাখবার জন্য পীড়াপীড়ি করেনি।'

ফরহাত মুরাদ আলীকে বললেন ঃ 'বেটা, তুমি গিয়ে তোমার ভাইয়ের সন্ধান নেও। ফউজী দফতরে হয়তো কোনো খবর এসে থাকবে।'

'বহুত আচ্ছা, আম্মাজান!ঃ বলে মুরাদ আলী বেরিয়ে গেলেন।

ফরহাত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুনীরাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'বেটি, সত্য করে বলো, লা গ্রাঁদের ভগ্নিপতি তোমার কোনো কথায় রাগ করে যান নি তো?'

ঃ 'না আম্মাজান, তিনি এখানে থাকার সময়ে নিয়মিত আমার কাছে আসার ওয়াদা করে গেছেন।'

ঃ 'বেটী, আমার ভয় হচেছ, তিনি তোমায় সাথে নিয়ে যেতে চাইবেন।'

ঃ 'আম্মাজান, তাঁর সাথে যেতে আমি অস্বিকার করেছি।'

এক মুহূর্তের জন্য ফরহাতের দুর্বল পান্ডুর মুখে ভেসে উঠলো কিছুটা সজীবতার আভাস! তিনি বললেন ঃ 'বেটী, কিছুক্ষণ আগে যখন তুমি নীচে চলে গেলে, তখন আমি ভাবলাম ঃ আমার দীলের কতো কথা আমি তোমায় বলতে পারিনি। আমার এক পুত্র মাসউদ আলী অনন্তপুরে কেল্লা হেফাযত করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলো এবং তার বড়ো ভাই সিদ্দিক আলী ছিলো সেই জংগী কয়েদীদের মধ্যে যাঁদেরকে ইংরেজ সেই কেল্লার সাথে দাঁড় করিয়ে গুলীর নিশানা বানিয়েছিলো। সিদ্দীক আলীর শাহাদতের মর্মান্তিক দিক ছিলো কি, জানো? এক অপরূপ সুন্দরী যুবতী তাকে বাঁচাবার জন্য এসে গেলো ইংরেজের বন্দুকের সামনে এবং গুলী খাবার পর সে জড়িয়ে ধরলো আমার পুত্রের লাশ। সেই অবস্থায় সে জান দিলো। তাদের লাশ অনন্তপুর কেল্লার কাছে এক গর্তে দাফন করা হয়েছে। বহু অনুসন্ধান করেও আমি এসব প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক জওয়াব পাইনি ঃ কে ছিলো সে যুবতী, কোত্থেকে এসেছিলো এবং কবে থেকে তাদের পরিচয় হয়েছিলো? তার কাল্পনিক ছবি ভেসে বেড়ায় আমার দৃষ্টির সামনে। এক মায়ের বুকে যে স্নেহ লুকিয়ে থাকে তাঁর মেয়ের জন্য, আমার দীলের মধ্যে তেমনি স্নেহ সঞ্চিত রয়েছে তার জন্য। কল্পনায় আমি কথা বলতাম তার সাথে, তার চুলের মধ্যে হাত চালাতাম। তারপর তুমি এলে আমার ঘরে। আমার মনে হল, কুদরত আমার অসহায়তায় রহম করেছেন। তিনি

আমায় দান করেছেন একটি জীবন্ত মেয়ে। তখন থেকে সেই যুবতীর প্রাপ্য সবটুকু মুহাব্বত, সবটুকু স্নেহ আমি তোমায় দিতে চেয়েছি।'

ফরহাত থেমে গিয়ে মুনীরার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন ঃ 'আমার মনের কথা বলার ভাষা নেই। আমার সময় হয়ে এসেছে। কুদরত হয়তো আমার যিন্দেগীর গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করে যাবার সময় দেবেন না। আনওয়ার আলী সম্পর্কে তোমার ধারণা কি, আমি আজো জানতে পারিনি। কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে ওয়াদা নিতে চাই, আমি মরে গেলে তুমি তার ইন্তেযার না ক'রে এখান থেকে চলে যাবে না। আমার পর এ ঘরে তোমার প্রয়োজন থাকবে।'

মুনীরা অশ্রু ভারাক্রান্ত চোখে বললেন ঃ 'আম্মাজান, এ ঘরে আমার প্রয়োজন না থাকলেও আমি খুশী হয়ে এ ঘর ছেড়ে যেতে পারবো না।'

ঃ 'বেটী, আমার ইচ্ছা, তুমি আনওয়ার আলীকে শাদী করো।'

মুনীরা মুখে কিছু না বলে মাথা নত করলেন।

ফরহাত শয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন এবং দু'হাত প্রসারিত করে বললেন ঃ 'মুনীরা, এদিকে এসো।'

মুনীরা এগিয়ে গেলে ফরহাত তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন। দীর্ঘ সময় তিনি তার সোনালী চুলের মধ্যে হাত বুলাতে থাকলেন। মুনীরা অতি কষ্টে উদ্ধত কান্নার বেগ সংযত করতে লাগলেন। খাদেমা দরযা দিয়ে উঁকি মেরে বললো ঃ 'বিবিজী, আপনার দুধ নিয়ে আসি?'

ঃ 'না, আমার ক্ষুধা নেই এখন। তুমি কলম, দোয়াত ও কাগজ নিয়ে এসো। আমি কিছু লিখতে চাই।

খাদেমা ফিরে চলে গেলো এবং কিছুক্ষণ পরে লেখার সরঞ্জাম এনে ফরহাতের কাছে একটি তেপায়ীর উপর রাখলো।

ঃ 'আপনি কি লিখবেন, আম্মাজান?' মুনীরা প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'আমি একটি জরুরী চিঠি লিখতে চাচ্ছি।'

ঃ 'আপনার কষ্ট হবে। আমি লিখে দেই, নইলে মুরাদ আলীর জন্য একটুখানি দেরী করুন।'

ঃ ' না আমি নিজেই লিখবো।'

মুনীরা উঠে গিয়ে কুরসীর উপর বসলেন এবং ফরহাত চিঠি লিখতে ব্যস্ত হলেন। কয়েক পংক্তি লেখার পর একটা কাগজ ছিড়ে ফেলে আর একটা কাগজে লিখতে লাগলেন। প্রায় ঘন্টাখানেক পর লেখা কাগজটা ভাঁজ করে ক'রে মুনীরার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ 'বেটি, আমার চলে যাবার পর আনওয়ার আলী ঘরে ফিলে এলে তাকে এ চিঠিটা দিও। '

মুনীরা বললেন ঃ 'খোদার দিকে চেয়ে এমন কথা বলবেন না। আমার বিশ্বাস তিনি এলে আপনি তাঁকে এগিয়ে আনবার জন্য নীচে গিয়ে দাঁড়াবেন।'

ফরহাত শয্যার উপর শুয়ে পড়ে বললেন ঃ 'বেটি, আমার বয়সের মানুষের সব সময়েই তৈরী থাকতে হয় দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার জন্য।



পরদিন ফরহাতের অবস্থা আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠলো এবং চারদিন কেটে গেলো জীবন-মৃত্যুর সংঘাতের মধ্যে। পঞ্চম দিন মধ্যরাত্রে মুরাদ আলী তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট। খাদেমা কয়েকদিন বিশ্রামের অবকাশ পায়নি। ফরহাতের শয্যার অপর দিকে সে গালিচার উপর গভীর নিদ্রায় অচেতন। ফরহাত মুরাদ আলীর দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন ঃ 'বেটা তুমি একটুখানি আরাম করোগে। আমার জন্য ভেবো না। আমি বিলকুল সুস্থ আছি।'

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'আম্মজান, দিনে আমি যথেষ্ট ঘুমিয়েছি।'

ঃ 'না, বেটা, তুমি যাও। তোমার চোখ ঘুমের নেশায় লাল হয়ে গেছে।'

মুনীরা চোখ মলতে মলতে কামরায় প্রবেশ করলেন। তিনি বললেন ঃ 'ভাইজান, আপনি গিয়ে আরাম করুন। আমি আম্মজানের কাছে বসছি।'

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'বোন, আপনার কয়েক ঘন্টা আরাম করা দরকার।'

ঃ 'আমার ঘুম পুরো হয়ে গেছে।' মুরাদ আলীর কাছে আর একটি কুরসীতে বসে মুনীরা বললেন।

ফরহাত বললেন ঃ 'যাও, বেটা, আরাম করো, আমার জন্য ভেবো না।'

মুরাদ আলী মায়ের কাছে থাকার জন্য যিদ ধরলেন, কিন্তু ফরহাত ও মুনীরার পীড়াপীড়িতে তিনি অনিচ্ছায় উঠে গেলেন। দরযার দিকে দু'তিন কদম এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে মুনীরাকে বললেন ঃ 'বোন, এক ঘন্টা পর আম্মাজানকে ওষুধ দেবেন। প্রয়োজন হলে আওয়ায দেবেন আমায়।'

ঃ 'বেটা, তুমি গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ো। দরকার হলে আমি নিজেই ডাকবো তোমায়।';

ঃ 'বহুত আচ্ছা, আম্মাজান!' বলে মুরাদ আলী বেরিয়ে গেলেন।

শেষ প্রহরে মুরাদ আলী কামরায় ছিলেন গভীর ঘুমে অচেতন। খাদেমা চীৎকার করতে করতে প্রবেশ করলো। মুরাদ আলী বিড় বিড় করে চোখ খুললেন। মুহূর্তের জন্য তিনি মোহাচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে থাকলেন খাদেমার দিকে।

ঃ 'মুরাদ, বিবিজী নেই। অতি কষ্টে কান্না সংযত করে খাদেমা বললো।

মুরাদ আলী শয্যা ছেড়ে ছুটে গেলেন সামনের কামরায়। ফরহাতের প্রশান্ত মুখ

দেখে মনে হয়, যেনো তিনি গভীর নিদ্রামগ্ন। মুনীরা কুরসির উপর নিশ্চল নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছেন তাঁর মুখের দিকে।

ঃ 'আম্মজান! আম্মজান!!' মুরাদ আলী ফরহাতের নাড়ির উপর হাত রেখে যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলেন। তারপর তিনি মুনীরার বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। মুনীরা চম্‌কে উঠে মুরাদ আলীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন। দেখতে দেখতে তাঁর খুবসুরত নীল চোখ দুটি অশ্রুতে ভরে উঠলো। তিনি ফিরে ফরহাতের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর মৃতদেহ।

মুরাদ আলী কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। খাদেমা দরযার কাছে দাঁড়ানো। তাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন ঃ 'হায়! তুমি যদি আগে আমায় জাগিয়ে দিতে!'

খাদেমা অতিকষ্টে কান্নার বেগ সংযত ক'রে বললো ঃ 'জি, আমি ঘুমিয়েছিলাম। মুনীরার চীৎকার শুনে যখন জেগে উঠলাম, তখন বিবিজীর শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে গেছে।'

মুনীরা গর্দান তুলে পুণরায় মুরাদ আলীর দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ ক'রে বললেন ঃ 'ভাইজান, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উনি আমায় বুঝতে দিলেন না যে, ওঁর সময় এসে গেছে। আমি মনে করেছিলাম যে, ওঁর অবস্থা ভালো হচ্ছে। আমর সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ চোখ মুদলেন এবং আমার মনে হল, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।



ফরহাতের ওফাতের তিন হফ্‌তা পর একদিন মুনীরা আশপাশের কতিপয় মহিলার সাথে নিজের কামরায় বসেছিলেন। খাদেমা এসে বললোঃ 'বিবিজী, মুরাদ আলী সাহেব আপনাকে ডাকছেন।'

ঃ 'তিনি কোথায়?' মুনীরা উঠে প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'জি, তিনি বারান্দায় দাঁড়ানো।'

মুনীরা দ্রুত পা ফেলে বারান্দার দিকে গেলেন। মুরাদ আলী সিপাহীর পোশাক পড়ে দাঁড়িয়ে। মুনীরা প্রশ্ন করলেন ঃ 'আপনি এত শীগ্‌গীর ফিরে এলেন। ওঁর কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো।'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'ফউজদার এ খবর সমর্থন করেছেন যে, মারাঠা নারগন্ড ও অন্যান্য স্থানের তামাম কয়েদীকে মুক্ত করে দিয়েছে। আজ ভোরে কতিপয় ফউজী অফিসার তাদের অভ্যর্থনার জন্য রওয়ানা হয়ে গেছেন। আমিও তাঁদের সাথে যাবার এজাযত চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার উপর আর এক যিম্মাদারী দেওয়া হয়েছে।'

ঃ 'কি ধরনের যিম্মাদারী?'

ঃ 'সুলতানে মোয়ায্‌মম সামরিক ক্ষতিপূরণের দিকে দ্বিতীয় কিস্তিতে ইংরেজের প্রাপ্য অর্থসহ আমায় মাদ্রাজ পাঠাচ্ছেন।

ঃ 'আপনি কবে যাচ্ছেন।' মুনীরা প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'আমাদেরকে এক ঘন্টার মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হবার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আপনার সম্পর্কে আমি খুবই পেরেশান, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার ফিরে আসার মধ্যে ভাইজান এখানে পৌঁছে যাবেন। মদ্রাজ যাবার ইচ্ছা আমার ছিলো না, কিন্তু ফউজদার সাহেব আমায় যখন জানালেন যে, সুলতানে মোয়াযয্‌ম ফউজের বড়ো বড়ো অফিসারের মোকাবিলায় এ যিম্মাদারী পালানের জন্য আমার নাম করেছেন, তখন আর আমি অস্বীকার করতে পারিনি। আমি জুলিয়ানের খোঁজ নিয়েছি। তিনি এখনো শিকার থেকে ফিরে আসেন নি। হয়তো দু'একদিনের মধ্যে পৌঁছবেন এখানে।'

মুনীরা বললেন ঃ 'আপনার বিশ্বাস আনওয়ার আলী মুক্ত কয়েদীদের সাথে আসছেন?'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'এখনো মুক্ত কয়েদীদের নামের তালিকা এখানে আসেনি। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, মারাঠা সকল কয়েদীকেই মুক্তি দিয়েছে এবং ভাইজান তাঁদের সাথে আছেন। আপাতত দোআ ছাড়া আর কিছু নেই আমাদের হাতে। এবার আমায় এজাযত দিন। একা একা মনে হলে পাশের কোনো মেয়েকে ডেকে নেবেন। খোদা হাফিজ!'

মুনীরা ধরা গলায় 'খোদা হাফিয' বললে মুরাদ আলী দ্রুত পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন দুপুরবেলা আসমানে মেঘ দেখা দিলো। মুনাওয়ার খান মুনীরার কামরায় এসে খবর দিলো ঃ 'মসিয়েঁ জুলিয়ান আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন।'

ঃ 'ওঁকে এখানে নিয়ে এসো।'

মুনাওয়ার ছুটে বেরিয়ে গেলো এবং কয়েক মিনিট পরেই জুলিয়ান কামরায় প্রবেশ করলেন। মুনীরার সামনে কুরসীর উপর বসে তিনি বললেন ঃ 'জিন, আমি আজ ফিরে এসেছি। এসেই মুরাদ আলী মাতার মৃত্যুসংবাদ শুনলাম। আমি বড়োই দুঃখিত। দুনিয়ায় এমন লোক খুব কমই পাওয়া যায়, যিনি অপরের দুঃখ-দরদকে মনে করেন নিজেরই দুঃখ-দরদ। শিবিরে খবর রটে গেছে যে, সকল কয়েদীকে মারাঠারা মুক্ত ক'রে দিয়েছে। কিন্তু আনওয়ার আলীর কোনো সন্তোষজনক খবর আমি পাইনি। জিন, আমি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে দোআ করছি, তিনি ফিরে আসুন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমায় ভালো-মন্দ যে কোনো খবরের জন্য তৈরী থাকতে হবে। আমি শুনেছি মারাঠাদের হিংস্র বর্বরতার বহু কাহিনী। কল্পনা করো যদি আনওয়ার আলীর কোনো ভালো খবর না আসে, তা'হলে সেরিংগাপটমে তোমার ভবিষ্যত কি হবে?'

মুনীরা অশ্রুভরা চোখে বললেন ঃ 'খোদার কসম, অমন কথা বলবেন না।'

জুলিয়ান সস্নেহে বললেন ঃ 'আমি তোমার দুশমন নই, জিন। আমি শুধু চাই যে, তুমি বাস্তবাদী হবে। আন্‌ওয়ার আলীকে ছাড়া এ দেশ তোমার জন্য স্বপ্নের জান্নাত হবে না। আমি ওয়াদা করছি তোমার কাছে যে, তাঁর সম্পর্কে পূর্ণরূপে আশ্বস্ত না হয়ে আমি এখান থেকে ফিরে যাবো না। মুক্ত কয়েদীরা কয়েকদিনের

মধ্যেই ফিরে আসবেন এখানে এবং দরকার হলে আমি আরো ছুটির জন্য আবেদন পাঠাবো। কিন্তু এ অবস্থায় তোমায় এখানে ছেড়ে যাওয়া চলতে পারে না।'

মুনীরা বললেন ঃ 'জুলিয়ান, আমি অকৃতজ্ঞ নই। আমি জানি, আপনি আমারই ভালোর জন্য এসব কথা বলছেন, কিন্তু আমি অসহায়। এ বাড়িঘর আমার জীবনের অংশ হয়ে গেছে। জীবন্ত থাকতে আমি সেরিংগাপটম ছাড়তে পারবো না। আপনি যখন প্রথমবার এ নিয়ে আলোচনা করেন, তখন আন্ওয়ার আলীর মা যিন্দাহ্ ছিলেন। আমি ভেবেছিলাম, যদি আন্ওয়ার আলী ফিরে এসে আমার কাছে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন যে, তাঁর দুনিয়ায় আমার কোনো স্থান নেই, তা'হলে হয়তো আমার অহমিকা আমায় থাকতে দেবে না এখানে। কিন্তু আজ আন্ওয়ার আলীর মা বেঁচে নেই আর আমার দীলের মধ্যে অহমিকারও কোনো স্থান নেই।'

ঃ 'এ 'ঘরে তোমার মর্যাদা কি হবে, তাঁর জন্যও তোমার কোনো পরোয়া নেই?'

মুনীরা জওয়াব দিলেন ঃ 'হ্যাঁ, আমার এখানে দাসী হয়ে থাকতেও কোনো আপত্তি নেই এখন। আন্ওয়ার আলী যদি ফিরে না আসেন, তা'হলে আমি মনে করবো, মায়ের মৃত্যুর পর মুরাদ আলীর এক বোনের প্রয়োজন আছে?'

জুলিয়ান কুরসি ছেড়ে উঠে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন কামরার ভিতরে। তারপর হঠাৎ মুনীরার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'জিন, মহীশূরের আবহাওয়া যে এক ফরাসী যুবতীর মন ও মস্তিষ্কে এতবড় বিপ্লব এনে দিয়েছে, তা' আমি জানতাম না। ভবিষ্যতে আমি আর এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো না তোমার সাথে। কিন্তু আমি একটা ওয়াদা তোমার কাছে দাবি করবো এবং তা' হচ্ছে এই যে, কোনদিন যদি এখানকার পরিস্থিতি তোমার ধারণা পরিবর্তন করতে বাধ্য করে, তা'হলে তুমি মুরাদ আলীর মতো আমায় ভাই মনে করো।'

মুনীরা ঠোটের উপর এক টুকরো বিষন্ন হাসি টেনে এন বললেন ঃ 'এখনো আমি আপনাকে আমার ভাই মনে করি।'

ঃ 'তা' হলে তুমি ওয়াদা করো আমার কাছে যে, কোনদিন তোমার স্বদেশের স্মৃতি তোমায় পীড়ন করলে আমায় খবর দেবে। তোমার চিঠি পেলেই আমি এখানে চলে আসবো।'

ঃ 'আমি ওয়াদা করছি। আমার ইচ্ছা, যতোদিন আপনি এখানে আছেন, আর কারুর কাছে না থেকে আমার এখানে থাকুন। নীচু তলার সব কামরা আপনার জন্য খালি ক'রে দেওয়া যাবে।'

জুলিয়ান বললেন ঃ 'না, শিকারে যাবার আগেই আমি হুকুম পেয়েছিলাম যে, ফিরে এসে আমায় শাহী মেহ্মান হিসাবে থাকতে হবে। তোমায় এখানে আসার আগে আমি জিনিসপত্র সরকারী মেহ্মানখানায় পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমি ওয়াদা করছি, আন্ওয়ার আলী কয়েকদিনের মধ্যে এখানে পৌঁছে গেলে তোমাদের কাছে আসবো।'

একুশ

রাতের বেলা আসমান ছিলো কিছুটা মেঘে ঢাকা। মুনীরা উপরতলার ছাতে এক বর্ষাতির নীচে শায়িত। মধ্যরাত্রের কাছাকাছি সময়ে মূষলধারে বর্ষণ শুরু হল এবং প্রবল হাওয়ার সাথে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা এসে তাঁকে জাগিয়ে দিলো গভীর ঘুম থেকে। বর্ষাতি থেকে বেরিয়ে তিনি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘনঘোর অন্ধকারে ধীরে পা ফেলে ফেলে তিনি বাড়ির দোতলায় প্রবেশ করলেন। হাত দিয়ে পথ ঠিক ক'রে গেলেন এক কামরার দরযার কাছে। আচানক নীচু তলায় একটা আওয়াজ শোনা গেলো এবং তিনি চম্‌কে দাড়িয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্তে তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি সিঁড়ি বেয়ে চলতে লাগলেন নীচু তলার দিকে।

বারান্দার ধারে পৌঁছে তাঁর চোখে পড়লো কয়েক কদম দূরে একটি কামরার খোলা দরযা দিকে বেরিয়ে আসা আলো। তিনি এগিয়ে যাবেন, না পিছু ফিরে যাবেন, কিছুক্ষণ তার ফয়সালা করে উঠতে পারলেন না। তারপর করীম খানের কণ্ঠস্বর শোনা গেলঃ 'মুনাওয়ার, তুমি গিয়ে খাদেমাকে জাগিয়ে বলো, এখ্‌খুনি খানা তৈরী ক্‌'রে নিয়ে আসুক।' আর একজন পরিচিত মধুর কণ্ঠে জওয়াব দিলেন ঃ 'না, না, খাদেমাকে জাগাবার প্রয়োজন নেই। পথেই আমি খানা খেয়েছি।' হঠাৎ মুনীরার কাছে যেনো সৃষ্টি-জগত এক অপূর্ব সুরঝংকারে গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো। তিনি কথা বলতে চান, কিন্তু তাঁর কণ্ঠে আওয়ায নেই। তিনি ছুটে যেতে চান কামরার মধ্যে, কিন্তু তিনি যেন পা তুলতে পারছেন না। বারান্দার অন্ধকার ও কামরার আলোর মাঝখানে কয়েক কদমের ব্যবধানে তাঁর কাছে যেনো পাহাড়ের প্রাচীর। কামরা থেকে মুনাওয়ার খানের আওয়ায ভেসে এলো ঃ 'জনাব, ছোট বিবিজী উপরে বর্ষাতির নীচে ঘুমিয়ে রয়েছেন। তাঁকে জাগিয়ে দেবো?'

ঃ 'না। এ সময়ে তাঁর আরামের ব্যাঘাত করবার প্রয়োজন নেই। তুমি যাও।'

মুনীরার দীল আনন্দের কম্পনের পরিবর্তে অভিযোগের ব্যথায় টনটন করে উঠলো। মুনাওয়ার ও করীম খান কামরা থেকে বেরিয়ে গেলে তিনি দেওয়ালের সাথে লেগে দাঁড়ালেন। তারা আঙিনায় অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি দ্বিধা-সংকোচে ধীরে ধীরে পা ফেলে গিলেন দরযার দিকে। প্রতি মুহূর্ত তাঁর বুকের কম্পন বেড়ে চলছে। তিনি উঁকি মেরে ভিতরে দেখলেন। কি যেনো ভেবে তিনি এগিয়ে না গিয়ে পিছু হ'টে দরযার করাঘাত করলেন।

ঃ 'কে?' আন্‌ওয়ার আলী প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'আমি ভিতরে আসতে পারি?' মুনীরা দহ্‌লিযে পা রেখে ভিতরে উঁকি মেরে বললেন।

ঃ 'জিন!' আন্‌ওয়ার আলী চম্‌কে শয্যা ছেড়ে উঠে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

মুনীরা কামরায় ঢুকলেন। কয়েক মুহূর্ত দু'জনই নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকলেন। অবশেষে আন্‌ওয়ার আলী কুরসি তুলে তাঁর কাছে রেখে বললেন ঃ 'আপনি জেগে আছেন, তা' আমি জানতাম না। তশরিফ রাখুন।'

মুনীরা বসে পড়লেন। তাঁর চোখে চক্‌চক্ করছে অশ্রু। দৃষ্টি তাঁর আন্‌ওয়ার আলীর মুখের উপর নিবদ্ধ। তিনি অভিযোগের ভংগীতে বললেন ঃ 'আপনি কখন পৌঁছ্‌লেন এখানে?'

ঃ 'প্রায় এক ঘন্টা হ'ল, আমি এখানে পৌঁছেছি। আম্মাজান সম্পর্কে আমি পথেই খবর পেয়েছিলাম।

ঃ 'আপনি খুব দুর্বল হয়ে গেছেন।'

ঃ 'এ মারাঠাদের কয়েদখানায় থাকার ফল।'

ঃ 'বসুন। আপনি ক্লান্ত।'

আন্‌ওয়ার আলী একটি কুরসি টেনে তাঁর সামনে বসলেন।

মুনীরা বললেন ঃ 'মুরাদ আলী মাদ্রাজে চলে গেছেন।'

ঃ 'হ্যাঁ, নওকররা আমায় বলেছে।'

ঃ 'আপনি খানা খাবেন না?'

ঃ 'না, আমি পথেই খানা খেয়ে এসেছি।'

ঃ 'আহা! আপনি যদি কয়েক হফ্‌তা আগে আসতেন! শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আম্মাজান আপনার ইন্তেযার করেছেন।'

ঃ 'তা, আমার হাতে ছিলো না। মারাঠাদের কয়েদ থেকে মুক্ত হয়ে পথে আমি আরাম করেছি খুব কম। আমার সাথীরা এখনো কয়েক মন্‌যিল দূরে। আম্মাজান আমার পথ চেয়ে রয়েছেন, সারা পথে এই ধারণা ছিলো আমার অতি বড়ো অবলম্বন। তাই কোনো ক্লান্তির অনুভূতি আমার ছিলো না। কিন্তু কাল যখন এক চৌকি থেকে খবর পেলাম যে, আম্মাজান নেই, তখন আমার হিম্মত নিঃশেষ হয়ে গেলো।'

মুনীরা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন ঃ 'আশ্চর্য ব্যাপার, কয়েদীদের মুক্তির খবর শোনার পর আমি দিনরাত আপনার ইন্তেযার করেছি। কিন্তু আজ আপনি এখানে আসছেন, আর আমি সন্ধ্যা হতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।' আন্‌ওয়াল আলী বললেন ঃ 'জিন, নওকররা বললো, পীড়িত অবস্থায় আপনি আম্মাজানের বহুত খেদ্‌মত করেছেন। আমি আপনার শোকর-গুযারী করছি। মুনাওয়ার বলছিলো, আপনার কোনো আত্মীয় এখানে এসেছেন। কে তিনি?'

ঃ 'তিনি গ্রাঁদের ভগ্নিপতি জুলিয়ান।'

ঃ 'তা'হলে তাঁর এখানেই থাকা উচিত ছিলো।'

ঃ 'ঘরে আম্মাজান পীড়িত। তাই তাঁকে এখানে রাখার জন্য পীড়াপীড়ি করেনি। এখন তিনি শাহী মেহ্‌মানখানায় রয়েছেন ।'

কিছুক্ষণ দু'জন নির্বাক বসে থাকলেন। আন্‌ওয়ার আলীর গর্দান নত হয়ে রয়েছে আর তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে ক্লান্তির চিহ্ন। মুনীরা হঠাৎ কুরসি ছেড়ে উঠে

দাড়াঁলেন। তারপর বললেন ঃ আপনার আরামের প্রয়োজন।

ঃ 'আপনি দাঁড়ান। আমি আপনাকে উপরে রেখে আসছি। 'বলে আন্ওয়ার আলী উঠে এগিয়ে গিয়ে চেরাগ হাতে তুললেন।

তারা কামরা থেকে বেরুলেন। বারান্দায় ঢুকতেই হাওয়ার একটা ঝাপটা এলো এবং আন্ওয়ার আলী হাতের আড়াল দিয়ে চেরাগ বাঁচালেন হাওয়া থেকে। কিছুক্ষণ পর তাঁরা পরস্পরের সাথে কোনো কথা না' ব'লে উপর তলার এক কামরায় প্রবেশ করলেন। আন্ওয়ার আলী ঘরের চেরাগ জ্বালিয়ে দিয়ে মুনীরাকে বললেন ঃ 'আপনি এবার আরাম করুন।'

মুনীরা কিছু বলতে চান, কিন্তু তাঁর বাক্শক্তি রুদ্ধ হয়ে এলো। আন্ওয়ার আলীর আচরণ তাঁর কাছে এক রহস্য। যে জান্নাত তিনি গড়ে তুলেছিলেন আন্ওয়ার আলীর সাথে পূর্নবার মোলাকাতের কল্পনাকে কেন্দ্র করে, তা যেনো কয়েক মিনিটের মধ্যে বিরাণ হয়ে গেছে। যে মানুষ স্নিগ্ধশীতল পানির ঝর্ণার কিনারে বসে থেকে তৃষ্ণা নিয়ে ফিরে যায়, তারই মতো অবস্থা তাঁর। কয়েক মিনিট আগে আন্ওয়ার আলীর কামরায় ঢুকতে গিয়ে যে উদ্যম-উৎসাহ জেগে উঠেছিলো তাঁর বুকের মধ্যে, তা যেনো ঠান্ডা হয়ে গেছে। যে নওজোয়ানকে তিনি দেখেছিলেন পন্ডিচেরীর বন্দরগাহে, কতো রূপান্তর ঘটেছে তাঁর। তাঁর সংক্ষিপ্ত সংযত আলাপ-আলোচনায় মনে হয় কুদরতের নিষ্ঠুরতম বিদ্রুপ। আন্ওয়ার আলী কামরা থেকে বেরিয়ে গেলে তিনি চুপচাপ বসে পড়লেন চারপায়ীর উপর।' কতোরকম চষ্টো ক'রেও তিনি বুঝে উঠতে পারেন না আন্ওয়ার আলীর আচরণের কারণ। তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন ঃ 'আমি জানি, মারাঠাদের কয়েদখানায় তুমি অগুণ্তি নিপীড়ন সহ্য করছো, আর মাকে হারানোর শোক তোমার কাছে অসহনীয়, কিন্তু হায়! তুমি যদি বুঝতে পারতে যে, আমি তোমার প্রত্যেক মুসীবতে শরীক হয়েছি। তুমি যখন যুদ্ধের ময়দানে, আমি তখন তোমার জন্য দোআ করেছি। তুমি যখন কয়েদখানায়, তখন তোমারই পথ চেয়ে রয়েছি আমি। তোমার মায়ের মৃত্যুর পর আমি অনুভব করেছি যে, এ দুনিয়ায় আমার চাইতে বেশী অসহায় ও বদনসীব নেই আর কেউ। কিন্তু এই অসহায়তা ও নিঃসংগতার দিনগুলো কি ক'রে কাটিয়েছি তা'ও তুমি জানতে চাইলে না?'



মুনীরা শয্যায় পড়ে দীর্ঘ সময় অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন। কয়েক ঘন্টা পর যখন চোখ খুললেন, তখন নামাযের সময় কেটে গেছে। আসমানের মেঘ কেটে গিয়ে সূর্যকিরণ এসে পড়ছে ঘরের মধ্যে। তিনি শয্যা ছেড়ে উঠে বাইরে গেলেন এবং হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এলেন কামরায়। তারপর বাক্স খুলে পোশাকের একটি জোড়া বের করলেন, কিন্তু লেবাস বদল না ক'রে কামরায় পায়চারি করতে লাগলেন। খাদেমা দরযা দিয়ে উঁকি মেরে বললো ঃ

'বিবিজী, মোবারক হোক। রাত্রে আন্ওয়ার আলী সাহেব এসেছেন। আজ আপনি খুব বেশী সময় ঘুমিয়েছেন। নাশ্‌তা নিয়ে আসি?'

ঃ 'উনি নাশ্‌তা করেছেন?'

ঃ ' জি হ্যাঁ।'

ঃ 'আমার এখন ক্ষিধে নেই। তুমি নীচে গিয়ে আমার পুরনো কাপড়ের বাক্সটা নিয়ে এসো।'

ঃ 'চামড়ার বাক্স?'

ঃ 'হ্যাঁ, আন্ওয়ার আলী সাহেব কি করছেন?'

ঃ 'জি, তিনি নাশ্‌তা করেই মুনাওয়ারের সাথে মায়ের কবরের দিকে গিয়েছিলেন। খুব কমজোর হয়ে গেছেন তিনি।' খাদেমা ফিরে চলে গেলো এবং কয়েক মিনিট পর একটি চামড়ার ব্রাক্স নিয়ে কামরায় প্রবেশ করলো।

কিছুক্ষণ পর মুনীরা হিন্দুস্তানী লেবাসের পরিবর্তে ফরাসী লেবাস পরিধান ক'রে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে উঁকি মারতে লাগলেন।

আন্ওয়ার আলী দরযায় করাঘাত করে বললেন ঃ 'আমি ভিতরে আসতে পারি কি?'

ঃ 'আসুন। এ আপনারই বাড়ি।'

আন্ওয়ার আলী কামরার ভিতরে এসে বললেনঃ 'খাদেমা বললো, আজ আপনি নাকি নাশ্‌তা খাননি?'

মুনীরা তার লেবাস সম্পর্কে আন্ওয়ার আলীর মুখে কিছু শুনতে চান, কিন্তু তাঁকে হতাশ হতে হল। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ 'আমার ক্ষিধে নেই।'

আন্ওয়ার আলী এক কুরসির উপর বসে বললেন ঃ 'জিন, বসো। তোমার সাথে কয়েকটা কথা আছে আমার।'

তিনি নত হয়ে সামনে বসলেন। আন্ওয়ার আলী গর্দান নীচু করে খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। অবশেষ তিনি বললেনঃ, 'আমি ভোরে আম্মাজানের কবরে ফাতিহা পড়ে সরকারী মেহ্‌মানখানায় গিয়েছিলাম।'

ঃ 'আপনি জুলিয়ানের সাথে দেখা করে এসেছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ। তিনি বললেন যে, এক হফ্‌তার মধ্যে তিনি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন। রাত্রে তুমি তো আমায় বলোনি যে, তিনি তোমায় নিতে এসেছেন।

মুনীরা কোনো জওয়াব দিলেন না। আন্ওয়ার আলী বললেনঃ 'জিন, আমার পক্ষে এ কথা বলা মোটেই সহজ নয়। কিন্তু এ জীবনে কতো তিক্ততা আমাদেরকে বরদাশ্‌ত্‌ করতে হয়েছে।

মুনীরা বললেন ঃ 'আপনি চান যে, আমি ওঁর সাথে চলে যাই?'

আন্‌ওয়ার আলী কি বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কথা তাঁর কণ্ঠে আট্‌কে গেলো। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে কুরসি থেকে উঠলেন। কিছুক্ষণ কামরার মধ্যে পায়চারি করে গিয়ে দাঁড়ালেন জানালার কাছে।

মুনীরা ধরা গলায় বললেন ঃ 'আপনি আমার প্রশ্নের জওয়াব দেননি।

আন্‌ওয়ার আলী তাঁর দিকে না তাকিয়ে বললেন ঃ 'জিন, আমার কাছে তোমার ভবিষ্যত আমার আকাংখার চাইতে প্রিয়।'

মুনীরা বললেন ঃ 'মসিয়েঁ, এখানে থেকে আমি আপনার পেরেশানী বাড়াবো না। আমি শুধু ইন্তেযার করছিলাম যে, আপনি এখানে এসে আমায় হুকুম শোনাবেন যে, এ ঘরের দরযা আমার জন্য বন্ধ।'

আন্‌ওয়ার আলী ফিরে দেখলেন। মুনীরার চোখে চক্‌চক্ করছে অশ্রু। তিনি অতি কষ্টে ঠোঁট চেপে কান্না সংযত করছেন। তিনি বললেন ঃ 'মসিয়েঁ, জুলিয়ানকে খবর দিন যে, আমি তৈরী। আর তাঁকে এক হফ্‌তা দেরী করতে হবে না।'

ঃ 'জিন এ এক নিরুপায় অবস্থা।'

ঃ ' আমি জানি। 'মুনীরা দু'হাতে মুখ লুকিয়ে বললেন।

ঃ জুলিয়ান এক্ষুণি আসবেন আর আমি চেষ্টা করবো, যাতে মুরাদ আলীর ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি থাকেন এখানে।'

মুনীরা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন ঃ 'না, না, খোদার কসম, আমায় আর শাস্তি দেবেন না।'

ঃ 'শাস্তি! কি বলছো তুমি, জিন? হায়! তোমার সাথে এ ঘরের বাকী আনন্দটুকুও বিদায় নেবে, তা' যদি তুমি জানতে!'

তিনি বললেন ঃ 'আমি শুধু জানি যে, এ ঘরে আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই।'

আন্‌ওয়ার আলী আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন ঃ 'জিন, এসব কথা আমি তোমায় মহীশূরের কোনো বন্দরগাহে জাহাজে তুলে দেবার সময়ে বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন আর সে সময়ের প্রতীক্ষা করতে পারছি না আমি। আমার সম্পর্কে তোমার কোনো ভুল ধারণা থাকা উচিত হবে না। আমি তোমায় যখন প্রথম দেখেছিলাম, তখন মহীশূরের সূর্য মধ্যাহ্ন আকাশে বিরাজমান এবং আমার মনে বিশ্বাস ছিলো যে, দুর্দশাপীড়িত মানবতাকে আবার আমরা যিন্দেগীর অফুরন্ত হাসি আনন্দের শরীক বানাতো পারবো। কিন্তু এখন সামনে এক ভয়াবহ অন্ধকার। মহীশূরের ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশ হইনি আমি। কিন্তু যে সোনালী প্রভাতের আলোয় আমি তোমায় দেখাতে পারতাম যিন্দেগীর সুন্দর সুন্দর মনযিল, তা' হয়তো এখনো বহুদূরে।'

মুনীরা উপরে গর্দান তুলে আশান্বিত দৃষ্টিতে তাকালেন আন্‌ওয়ার আলীর মুখের দিকে।

আনওয়ার আলী বললেন ঃ 'এই যুদ্ধ সমাপ্তির সাথে সাথেই আমাদের দুশমন এক নতুন যুদ্ধের বীজ বপন করেছে এবং আমায় ভাবতে হচ্ছে যে, সেই বন্য বর্বরতার যে মর্মান্তিক দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, কোনোদিন যদি আমাদেরই ঘরে তা' পৌছে যায়, তা'হলে কি হবে তোমার পরিণাম? বিগত যুদ্ধের সময়ে আমি দেখেছি জীবন্ত-জাগ্রত মানুষের বস্তি ভস্মস্তূপে পরিণত হতে! আমারই কওমের পুরুষদের কবর কাফনহীন লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি। হিংস্র নেকড়ের দল আমার কওমের মেয়েদের সাথে কি আচরণ করেছে, তার বর্ণনা আমি তোমায় দিতে পারবো না। যুদ্ধে যখমী হয়ে কয়েদীদের সাথে যখন এক বস্তি অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম, তখন গলিতে দেখেছি পরুষদের লাশ এবং ঘরে ঘরে শুনেছি মারাঠা সিপাহীদের অট্টহাস্য ও অসহায় নারীদের আর্ত চীৎকার। আমি যখমের দরুন অশক্ত অবস্থায় বলদের গাড়িতে শুয়েছিলাম আর আমার হাত-পা ছিলো বাঁধা। সেই মর্মবিদারী চীৎকারধ্বনি যেনো আজ আমার কানে বাজছে, জিন! তাই আমি চাই, কোনো নতুন তুফান আসার আগে তুমি চলে যাও নিজের দেশে। এ ঘরে কোনো প্রয়োজন নেই বলে নয়; বরং এসব ব্যাপার সত্ত্বেও যদি তুমি থাকতে চাও এখানে তা'হলে আমি এ বিষয়ে কোনো আলোচনাই করবো না।

মুনীরা বললেন ঃ এ ধারণা আপনার কি করে হল যে, আপনাকে নারায করে আমি এখানে থাকতে পারি?'

আনওয়ার আলীর সহনশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলো। তিনি বেদনার্ত কণ্ঠে বললেনঃ 'জিন, তোমার সম্পর্কে আমার অনুভূতি যদি তুমি জানতে চাও, তা'হলে শোন। আমি যখন কয়েদখানায় ছিলাম এবং মারাঠারা আমার মন ভেঙে দেবার জন্য যখন খবর শোনাতো যে, তারা সেরিংগাপটম পূর্ণরূপে অবরোধ করেছে ও কয়েকদিনের মধ্যেই তারা মহীশূরের দারুল হুকুমাতে তাদের পতাকা উত্তোলন করবে, তখন একদিন আমি দোআ করেছি, আহা! তুমি যদি ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে থাকতে তারপর আর একদিন দোআ করেছি, হায়! আর একবার যদি আমি তোমায় দেখতে পেতাম!'

মুনীরার মুখ থেকে বিষাদ-বেদনার মেঘ কেটে গেছে। তিনি বললেন ঃ 'আমি মনে করেছিলাম, আপনি আমায় ঘৃণা করেন।'

ঃ 'জিন, তোমার কথার অর্থ, আমি মানুষ নই। তোমার মুহাব্বত আমার যিন্দেগীর সব চাইতে বড়ো পরীক্ষা। সে পরীক্ষার ধারা শুরু হয়েছিলো সেদিন, যেদিন আমি তোমায় প্রথমবার দেখেছিলাম পন্ডিচেরীর বন্দরগাহে এবং তার কঠিনতম পর্যায় আসবে সেদিন, যখন মহীশূরের উপকূলে আমি তোমায় জানাবো বিদায়-সম্ভাষণ।'

মুনীরা বললেন ঃ 'আপনার এখনো ধারণা রয়েছে যে, আমাদের যিন্দেগীতে এমন পর্যায় আসতে পারে কখনো?'

আনওয়ার আলী বললেন ঃ 'আমার মুহাব্বত তোমায় আমার দুঃখ ও মুসীবতের ভাগী করবার এজাযত দেয় না, জিন? কিন্তু যার পথে প্রতিপদে দাঁড়িয়ে আছে

মুসীবতের পাহাড়, তাকেই যদি মনো করো তোমার অবলম্বন, তা'হলে তুমি আমায় নাশোকর গুযার দেখতে পাবে না কখ্‌খনো।'

খাদেমা কামরায় প্রবেশ করে বললো ঃ 'বিবিজী, জুলিয়ান সাহেব তশরীফ এনেছেন।'

মুনীরা আন্‌ওয়ার আলীকে বললেন ঃ 'আপনার কোনো আপত্তি না থাকলে ও'কে এখানে ডেকে আনা যাক।'

ঃ 'উনি তোমার আত্মীয়। আমার কি আপত্তি থাকবে?'

মুনীরা খাদেমা বললেন ঃ 'ওঁকে উপরে নিয়ে এসো।'

খাদেমা চলে গেলো এবং কিছুক্ষণ পর জুলিয়ান কামরায় প্রবেশ করে বললেনঃ 'জিন, তোমায় মোবারকবাদ।'

তিনি জওয়াব দিলেন ঃ 'মসিয়েঁ, আমার নাম জিন নয়, মুনীরা। আমার স্বদেশ ফ্রান্স নয়, মহীশূর। আমি পয়দা হয়েছি প্যারিতে নয়, সেরিংগাপটমে।'

জুলিয়ান ক্ষুন্ন হয়ে পর পর মুনীরা ও আন্‌ওয়ার আলীর দিকে তাকালেন।

মুনীরা বললেন ঃ 'হয়রান হওয়ার কারণ নেই। আমি মুসলমান হয়ে গেছি।'

'কবে? ঃ জুলিয়ান প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'সে অনেক দিনের কথা।'

আন্‌ওয়ার আলী তাঁর পেরেশানী সংযত করার চেষ্টা করে বললেন ঃ 'কিন্তু এ খবর আমায় তো কেউ বলেনি।'

ঃ 'আমি নওকরদের মানা করে দিয়েছিলাম।'

ঃ 'কিন্তু কেন?'

ঃ 'তা আমি জানি না।'

জুলিয়ান হেসে বললেন ঃ 'মসিয়েঁ, আপনাদের সরলতা আমায় অবাক করেছে। এবার বলুন আপনার শাদী কবে হচ্ছে?'

আন্‌ওয়ার আলী বললেন ঃ 'আমি মনে করেছিলাম, আপনি বুঝি জিনের সাথে ফ্রান্স সফরের পরামর্শ করতে এসেছেন।'

মুনীরা বললেন ঃ 'আমি আবার আপত্তি করছি, আমার নাম জিন নয়, মুনীরা।'

ঃ 'বুহুত আচ্ছা, মুনীরা! ভবিষ্যতে আমার এ ভুল আর হবে না। কিন্তু তুমি মসিয়েঁ জুলিয়ানের প্রশ্নের জওয়াব দাওনি। উনি প্রশ্ন করছেন ঃ 'আমাদের শাদী কবে হচ্ছে।'

মুনীরা কুরসী ছেড়ে উঠে দরযার দিকে যেতে যেতে বললেন ঃ 'এ প্রশ্নের জওয়াবের জন্য মসিয়েঁ জুলিয়ানকে কয়েকদিন দেরী করতে হবে।'

জুলিয়ান বললেন ঃ 'দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছো তুমি? আমি এক মাস দেরী করতে পারবো।'

ঃ 'আমি এখনো নাশতা করিনি। আপনি কিছু খাবেন?'

ঃ 'না, তুমি জলদী করো।'

মুনীরা কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর মস্তিষ্ক তখন আনন্দের সপ্তম আসমানে বিচরণ করছে।



জুলিয়ান হাসিমুখে আন্ওয়ার আলীকে বললেন ঃ 'আমার ভূল ধারণা ছিলো যে, আপনার ও জিনের মধ্যে ব্যবধানের শেষ পাঁচিল ভেঙ্গে দেবার জন্য আমায় থাকতে হবে এখানে। যাই হোক, আমার খেদমতের প্রয়োজন হয়নি আপনাদের, তার জন্য আমি খুশী।'

আন্ওয়ার আলী বললেন ঃ 'আপনি না বলছিলেন, আপনার সাথে যেত ওঁকে রাযী করার জন্যই আপনি রয়েছেন এখানে?'

ঃ 'আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম, সেরিংগাপটমের এক গর্বিত নওজোয়ানের সাথে নিজের ভবিষ্যত জড়িয়ে ফেলতে গিয়ে জিন কতোটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়।'

ঃ 'আমি গর্বিত, এ ধারণা আপনার কি করে হল?'

ঃ 'জিনের সাথে কয়েকটি কথা বলার পর আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, আপনাদের মধ্যে এখনো যে ব্যবধানটুকু রয়েছে, তা শুধু এই গর্বেরই ব্যবধান।'

ঃ 'জিন ছিলো আমার এক বন্ধুর স্ত্রী, এটাই কি আপনার কাছে যথেষ্ট নয়?'

ঃ 'মসিয়েঁ, আপনার গর্বই শুধু জিনকে লা গ্রাঁদের সাথে শাদী করতে প্ররোচিত করেছিলো। আপনাকে গর্বিত বলে আপনাকে ছোট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি আপনাকে অত্যন্ত উঁচু স্তরের লোকই মনে করি। আমি আপনার ত্যাগ ও আন্তরিকতা, আপনার সততা ও শরাফতের উপর বিশ্বাসী। এসব সত্ত্বেও আমি অনুভব করছি যে, আপনার সামনে গর্বের ব্যবধানটুকু না থাকলে এ কথা জানতে আপনার দেরী হত না যে, পন্ডিচেরীর বন্দরগাহে আপনি যে অসহায়া যুবতীকে প্রথম দেখেছিলেন, সে আপনাকেই তার আশা-আকাংখার কেন্দ্র বানিয়ে ফেলেছে।

ঃ 'মসিয়েঁ, পন্ডিচেরীতে আমি যে যুবতীকে দেখেছি, তিনি ছিলেন লা গ্রাঁদের বাগদত্তা এবং আমার সামনে যে বাঁধা ছিলো, তা'ছিলো একজন শরীফ লোকের হায়া ও আখলাক, গর্ব নয়; জিন সম্পর্কে আমি এ কথা শুনতে রাযী নই যে, তিনি বিশ্বস্ত স্ত্রী ছিলেন না।'

ঃ 'আমি এ কথা বলিনি যে, জিন বিশ্বস্ত স্ত্রী ছিলেন না। তিনি যদি আমার বোন হতেন, তা' হোলেও আমার দীলের মধ্যে তাঁর জন্য এর চাইতে বেশী ইয্যত

পোষিত হত না। আমি শুধু বলতে চাই যে, লা গ্রাঁদের অসহায়তায় আপনার মনে করুণা জেগেছিলো এবং আপনি জিনের দিক থেকে মুখ ফিরেয়ে নিয়েছিলেন। এর ফলে জিনের মনেও তাঁর প্রতি করুণা জাগলো এবং তিনি তাঁকে শাদী করলেন। লা গ্রাঁদ ছিলেন আমার প্রিয়জন এবং এই সদাচরণ ও করুণার জন্য আমি আপনাদের উভয়ের কাছেই শোকরগুযারী করছি। কিন্তু আমি যখন আপনার ও জিনের সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন আমায় বলতেই হয় যে, লা গ্রাঁদ আপনাদের এত বড়ো কোরবানী গ্রহণের হকদার ছিলেন না। কিন্তু এখন এ আলোচনায় কোনো ফায়দা নেই। এখন আমি শুধু আপনাকে এইটুকু বুঝাতে এসেছি যে, জিন এখন বিধবা হয়েছেন এবং তাঁকে আপনার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি আমায় আগে বলেন নি যে, আপনার জন্য তিনি নিজের মাযহাব বদল করে বসেছেন; নইলে আমি এখানে আপনার ইন্তেযার না করে একটা চিঠি লিখে রেখে যেতাম। এখন যদি আপনি এ বাস্তব সত্যটি ভালো করে উপলব্ধি করে থাকেন যে, আপনাদের পরস্পরকে প্রয়োজন, তাহোলে সেরিংগাপটমে আমার কার্য শেষ হয়ে গেছে। আমি এ হফতায় চলে যাচ্ছি। এবার আমার একটি প্রশ্নের জওয়াব দিন ঃ আপনাদের শাদী কবে হচ্ছে?'

আনওয়ার আলী কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে জুলিয়ানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি বললেন ঃ 'এই মুহূর্তে আমি এ প্রশ্নের সঠিক জওয়াব দিতে পারছি না। আমায় আমার ভাইয়ের আগমন প্রতীক্ষা করতে হবে। আপনার কি কিছুদিন এখানে থেকে যাওয়া সম্ভব নয়?'

ঃ 'না, জরুরী হলে আমি অবশ্যি থাকতাম, কিন্তু এখন আমার চলে যাওয়াই উচিত।'

ঃ 'তা' হোলে আজ থেকে আপনি আমাদের মেহ্মান। আমি এখানেই শাহী মেহ্মানখানা থেকে আপনার জিনিস-পত্র আনাচ্ছি।'

ঃ 'এ প্রস্তাব আমি মেনে নিচ্ছি।'

আনওয়ার আলী বললেন ঃ 'মসিয়েঁ জুলিয়ান, আপনি খুবই বুদ্ধিমান লোক। কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি। গোড়ার দিকে যদি আমার জিনের প্রতি কোনো আকর্ষণ থেকে থাকে, তা'হলে তার কারণ ছিলো শুধু এই যে, লা গ্রাঁদ ছিলেন আমার দোস্ত। লা গ্রাঁদের জীবদ্দশায় জিনের সাথে আমার সম্পর্ক ছিলো এমন, যা নিয়ে ভাই-বোন দু'জনই গর্ব করতে পারি। আমি যখন অতীতের দিকে ফিরে তাকাই, তখন আমি আজো অনুভব করি, যদি লা গ্রাঁদ আবার বেঁচে ওঠে আর আমি সেই অবস্থায় যদি আর একবার জিনকে সাথে নিয়ে পন্ডিচেরীর বন্দরগাহ্ থেকে সেরিংগাপটম সফর করি, তাহলে আমার কর্মনীতিতে কোনো পরিবর্তন আসবে না।'

জুলিয়ান বললেন ঃ 'দোস্ত, সে কথা আপনার বলার প্রয়োজন নেই। আপনি সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা, তা আমি স্বীকার করি। আমি এখানে পয়দা হইনি, তার জন্য আমি দুঃখিত, নইলে আপনাদের সাথে বাঁচামরাকে আমি সৌভাগ্য মনে করতাম।'

মুনাওয়ার খান কামরায় ঢুকে বললো ঃ 'জনাব, কয়েকজন লোক আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন।'

ঃ 'আচ্ছা আমি আসছি। দেখো, জিন নাশতা শেষ করে থাকলে তাঁকে উপরে পাঠিয়ে দিও।'

মুনাওয়ার খান জওয়াব দিলো ঃ 'জনাব, তিনি নীচে মহল্লার মেয়েদের সাথে বসে আছেন।'

আনওয়ার আলী জুলিয়ানকে ফরাসী ভাষায় বললেন ঃ 'কয়েকজন লোক আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। জিন নীচে পড়শি মেয়েদের সাথে ব্যস্ত। আপনি একটু বসুন। আমি এক্ষুণি আসছি।'

জুলিয়ান বললেন ঃ 'মনে হয়, আজ সারাদিন আপনি ব্যস্ত থাকবেন। তাই আমায় এজাযত দিন। সন্ধ্যার দিকে আমি ফিরে আসবো। আপনার এখানে আসার আগেই শাহী মেহ্‌মানখানার নাযিমের কাছ থেকে আমার এজাযত নিতে হবে।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে আপনি অবশ্যি আসবেন। নওকরকে আমি আপনার জিনিসপত্র নিয়ে আসার জন্য পাঠাবো।'

জুলিয়ান উঠে আন্‌ওয়ার আলীর সাথে চললেন। বাড়ির দেউড়ির কাছে এসে জুলিয়ানকে বিদায় করে আনওয়ার আলী দেওয়ানখানায় চলে গেলেন। সারাদিন তাঁর কাছে পড়শী ও বন্ধু-বান্ধবের আসা যাওয়া চললো এবং মুনীরার সাথে কথা বলারও মওকা মিললো না। রাতের বেলায় তিনি দেওয়ানখানার এক কামরায় জুলিয়ানদের সাথে খানা খেয়ে কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করলেন। দশটার কাছাকাছি সময়ে তিনি মেহ্‌মানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেওয়ানখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন। মুনাওয়ার খান তখনো দরযার দাঁড়িয়ে।

আন্‌ওয়ার আলী বললেন ঃ 'কে? মুনাওয়ার, তুমি কেন এখানে দাঁড়িয়ে?'

ঃ 'জনাব, আমি আপনার হন্তেযার করছিলাম।'

আন্‌ওয়ার আলী সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে বললেন ঃ 'যাও, আরাম করো গে।'

মুনাওয়ার খান বললেন ঃ 'জনাব, আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি।'

ঃ 'বলো।'

ঃ 'আমার ভয় হয়, হয়তো বিবিজী রেগে যাবেন।'

ঃ 'তা'হলে তোমার চুপ করে থাকাই ভালো।'

ঃ 'কিন্তু, জনাব, আমার মনে হয় ঘরের কোনো কিছুই আপনার কাছে পুশিদা থাকা উচিত হবে না। আমি কোনো খারাপ কথা বলবো না। কথা হচ্ছে, বিবিজী মুসলমান হয়ে গেছেন, আর এখন ওঁর নাম জিন নিয়, মুনীরা। আমি নিজের চোখে

দেখেছি ওঁকে নামায পড়তে।'

আন্‌ওয়ার আলী বললেন ঃ 'মুনাওয়ার, তুমি আমায় খুব ভালো খবর শোনালে। ভোরে আমি তোমায় এর পুরস্কার দেবো।'

মুনাওয়ার খান বললো ঃ 'জনাব, আর একটা কথা আমি বলবো আপনাকে। এইমাত্র বিবিজী এখানে আপনার পথ চেয়ে দাড়িঁয়েছিলেন। আমি কাছ দিয়ে যাবার সময়ে তিনি আমায় দেখে সরে গেলেন। আঙিনায় গিয়ে তিনি আমায় আওয়ায দিয়ে বললেন ঃ যেনো আপনি এলে আমি আপনাকে জানিয়ে দেই যে, তিনি খানা খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি আগেও তাঁকে কয়েকবার দেখেছি আপনার ইন্তেযার করতে।'

ঃ 'আচ্ছা, যাও, তুমি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।' বলে আনওয়ার আলী ভিতরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজের কামরায় পোশাক বদল করতে গিয়ে বিছানায় বালিশের উপর দেখতে পেলেন এক টুকরা কাগজ। কাগজটা তুলে টেনে চেরাগদানের কাছে গিয়ে বসে পড়লেন। খুলে মায়ের হাতের লিপি দেখে তিনি এক অপূর্ব আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন। আন্‌ওয়ার আলীর কাছে ফরহাতের লেখা শেষ লিপিতে লেখা রয়েছে ঃ

"নূরে চশম! আমি জানি না, তুমি কোথায় এবং কি অবস্থায় আছো। আমি পীড়িত অবস্থায় তোমায় এ চিঠি লিখছি। হয়তো আর বেশী সময়ে আমি তোমার ইন্তেযার করতে পারবো না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, মৃত্যুর পর আমার রূহের এ অশান্তি থাকবে না যে, আমার পর তোমার ভাই ছাড়া ঘরে আর কেউ থাকবে না তোমার ইন্তেযার করার জন্য, তুমি এসে দেখবে, মুনীরা তোমার পথ চেয়ে রয়েছে। ওর এক আত্মীয় এসেছেন ওকে নিয়ে যেতে, কিন্তু সে দেশে ফিরে যেতে অস্বীকার করেছে। তার অস্বীকৃতির কারণ তুমি বুঝবে। মুনীরা ইসলাম কবুল করেছে এবং আমার শেষ ইচ্ছা ছিলো যে, তুমি ওকে শাদী করবে। মায়ের কাছে তাঁর সন্তানের মনের কথা গোপন থাকে না। আমি জানি, তোমাদের পরস্পরের প্রয়োজন আছে।

মুনীরা আমার নিজের মেয়ে হলেও হয়তো আমার খেদমত এর চাইতে বেশী করতে পারতো না। আমার বিশ্বাস, তুমি অবশ্যি ফিরে আসবে। তোমার সম্পর্কে যেসব স্বপ্ন আমি দেখেছি, তা সব মিথ্যা হতে পারে না। আরো বিশ্বাস, তোমায় আমি আর দেখতে পাবো না। কিন্তু আমার রুহ্ হামেশা তোমাদের আনন্দে শরীক থাকবে।

-তোমার মা।"

আন্‌ওয়ার আলীর দু'চোখে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। চিঠিখানা তুলে তিনি ঠোঁটে ছোঁয়ালেন। চোখের অশ্রু গড়িয়ে পড়লো চিঠির উপর।

জুলিয়ান আনওয়ার আলীর গৃহে এক সপ্তাহ থাকার পর বিদায় নিলেন এবং তার দশদিন পর মুরাদ আলী ফিরে এলেন মাদ্রাজ থেকে। তারপর হল আনওয়ার

আলী ও মুনীরার শাদীর প্রস্তুতি। দু'হফতা পর তাঁরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। দাওয়াতে ওয়ালিমায় শরীক হলেন শহরের গণমান্য লোক, বড়ো বড়ো সরকারী কর্মচারী ও ফউজী অফিসার। মেহ্‌মানদের মধ্যে কয়েকজন এমনও ছিলেন, যাঁরা আন্‌ওয়ার আলীর সাথে মারাঠাদের কয়েদখানায় ছিলেন। বদরুয্‌মান খানকে মারাঠারা মুক্তি দিয়েছিলো সবার শেষে। শাদীর দু'দিন আগে তিনি পৌছলেন সেরিংগাপটমে এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শরীক হলেন দাওয়াতে। শাদীর পর কয়েকদিন ধরে শহরে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা দুলহানের জন্য তোহ্‌ফা নিয়ে আসতে থাকলেন ক্রমাগত। তাই একদিন মুনীরা আন্‌ওয়ার আলীকে বললেন ঃ 'এবার আমার কাছে এত কাপড়-চোপড় জমা হয়ে গেছে যে, আমার জন্য আপনাকে কয়েক বছর কোনো পোশাক বানাতে হবে না। আপনার এজাযত পেলে আমি কয়েকটি জোড়া পড়শী বিধবা ও গরীব মেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দেবো।

আনওয়ার আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'একটা নেক কাজের জন্য আমার এজাযত প্রয়োজন নেই। আমিও চাই, তোমার ফালতু জোড়াগুলো শহরের সেইসব মেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দাও, যাদের স্বামী যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন।'



শাদীর কয়েক হফতা পর সেরিংগাপটমে এক হাজার সওয়ারের নেতৃত্বগ্রহণ করলেন আনওয়ার আলী এবং মুরাদ আলী রিসালদার পদে উন্নীত হয়ে রওয়ানা হলেন চাতলদুর্গের পথে। যুদ্ধ সমাপ্তির পর বছর লর্ড কর্ণওয়ালিস ফিরে গেলেন ইংল্যান্ডে। তাঁর জায়গায় স্যার জন শোর গ্রহণ করলেন কোম্পানীর কার্যভার। সুলতানের যে দু'টি পুত্রকে যামানত হিসাবে ইংরেজেরা মাদ্রাজে নিয়ে গিয়েছিলো, তাঁদেরকে ফেরত পাঠালো লর্ড কর্ণওয়ালিসের ফিরে আসার প্রায় ছয় মাস পর। চুক্তির শর্ত মোতাবিক সুলতান টিপু প্রথম বছরেই ইংরেজের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিয়েছেন এবং তারপর শাহ্‌যাদাদের এই সুদীর্ঘকাল মাদ্রাজে আটক রাখার কোনো সংগত কারণ ছিলো না। কিন্তু নিযাম আলীর হস্তক্ষেপের দরুণ কোম্পানীর হুকুমত সন্ধিশর্তের বিরুদ্ধে কয়েক মাস ধরে শাহ্‌যাদাদের ফিরিয়ে দেবার দাবি অগ্রাহ্য করে এসেছে।

সুলতানের বিরুদ্ধে মীর নিযাম আলীর দুশমনী কার্যকলাপের বড়ো কারণ, তিনি যুদ্ধের ফলাফলের ব্যাপারে তুষ্ট ছিলেন না এবং মহীশূরের লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভিতর থেকে যে উচ্ছিষ্ট তাঁর ভাগে এসেছিলো, তাকে তিনি যথেষ্ট মনে করতে পারেননি। সুলতানের দখল থেকে কর্ণুল এলাকা ছিনিয়ে নেবার জন্য তিনি যিদ করে বসেছিলেন। ইংরেজ কিছুকাল পর্দার অন্তরালে থেকে তাঁকে উৎসাহিত করলো। কিন্তু দক্ষিণ হিন্দুস্তানের রাজনীতিতে এক অনুকূল পরিবর্তনের দরুন ইংরেজদের মনোভাবেও পরিবর্তন এলো এবং পরিবর্তিত অবস্থার চাপে তারা বাধ্য হয়ে নিযামের অংসগত দাবির পক্ষে সমর্থন ও সহযোগিতা দান করতে অস্বীকার করলো।

মারাঠা শাসকদের মধ্যে সব চাইতে প্রতিপত্তিশালী, হুঁশিয়ার ও দূরদর্শী মহাওজী

সিন্ধিয়া এসে পৌঁছালেন পুণায়। তাঁর অসামান্য প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে মারাঠা রাজনীতিতে গতি পরিবর্তন হল। সিন্ধিয়া মহীশূর সালতানাতকে মনে করতেন দক্ষিণ হিন্দুস্তানে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পথে শেষ প্রাচীর। তিনি পেশোয়া এবং তার মন্ত্রণাদাতা ও সেনানায়কদের বুঝালেন যে, তাঁরা আগের যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষ সমর্থন করে ভুল করেছেন। এক বাইরের বিপদকে তাঁরা টেনে এনেছেন নিজস্ব সীমান্তের কাছে। যে সুলতান টিপুর খান্দান বছরের পর বছর ধরে দক্ষিণ হিন্দুস্তানের দরযা পাহারা দিয়েছেন, তাঁদের সত্যিকার দুশমন তিনি নন; বরং সত্যিকার দুশমন তারা, যাদের কাঁধে বন্দুক রেখে দেশের ইয্যত ও আযাদীর দুশমনরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে দিল্লীর দিকে। সুলতান টিপুর শক্তির চাইতে মীর নিযাম আলীর দুর্বলতাকে তাঁদের ভয় করা উচিত, যিনি নিজস্ব হেফাযতের জন্য সংগীণের পাহারার প্রয়োজন অনুভব করেন। এখন তাঁরা সচেতন না হলে সেদিন সুদূর নয়, যেদিন হায়দরাবাদের প্রত্যেকটি শহরে পড়বে ইংরেজের ছাউনী এবং একে একে তাদের প্রত্যেককে সরে যেতে হবে তাদের পথ থেকে। তাঁদের বিপদের আসল কারণ মহীশূর নয়, হায়দরাবাদ।

সিন্ধিয়ার আগমনের পূর্বে সুলতান টিপু সম্পর্কে হরিপন্থের ধারণায় এক বড়ো বিপ্লব এসেছিলো এবং তিনি ইংরেজের পরিবর্তে সুলতান টিপুর সাথে মারাঠাদের প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু পরশুরাম ভাও ও নানা ফার্ণাবিসের বিরোধিতার দরুন তাঁর চেষ্টা নিস্ফল হল। এবার পুণায় সিন্ধিয়ার আগমনের ফলে হরিপন্থ ও তাঁর সমর্থক মারাঠা নেতৃবৃন্দের হাতে মযবুত হল এবং পেশোয়াকে নিযাম ও ইংরেজের পরিবর্তে সুলতান টিপুর দিকে ঝুঁকতে হয়। কিন্তু সিন্ধিয়া ও সুলতান টিপুর মধ্যে যখন চিঠিপত্র আদান-প্রদান চলছে, এই সময়ে সিন্ধিয়া ও হরিপন্থের পরপর মৃত্যু ঘটলো। সুতরাং তাঁদের চেষ্টার কোনো কার্যকরী ফল হল না। তথাপি পেশোয়া ও মারাঠা সরদারের মধ্যে এ অনুভূতি জাগলো যে, সুলতান টিপুর তুলনায় ইংরেজের দুশমনী ও মীর নিযাম আলীর সুযোগ-সন্ধানী মনোভাব সম্পর্কে বেশী খবরদার থাকা প্রয়োজন। পুণায় সিন্ধিয়ার অবস্থানের সময়ে ইংরেজ অত্যধিক পেরেশান হয়ে পড়েছিলো। তাঁর মৃত্যুতে তারা এক অতি বড়ো বিপদ কেটে গেছে বলে মনে করতে লাগলো। তথাপি মারাঠা রাজনীতিতে পরিবর্তনের আভাস পেয়ে তারা সুলতান টিপুকে যে কোনো ফ্রন্টে বিব্রত করে রাখার নীতি পরিবর্তন করার প্রয়োজন অনুভব করলো এবং মাদ্রাজে নযরবন্দ শাহ্যাদাদের ইয্যত ও সম্মানের সাথে ফেরত পাঠিয়ে দিলো।

সন্ধির শর্তে অসন্তুষ্ট হয়ে ঢুন্ডিয়া দাগ মহীশূর ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। এই সময়ের মধ্যে সে মারাঠাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলো। সে ধাড়ওয়াড়ের কাছে লুটতরাজ চালাবার পর হাদেরী ও শাহ্নূর দখল করে নিলো এবং সুলতান টিপুর খেদমতে দূত পাঠিয়ে মারাঠাদের কাছ থেকে দখল করে নেওয়া এলাকাগুলো ছিনিয়ে নেবার প্রস্তাব করলো। কিন্তু সুলতান টিপু তাঁর সাথে কোনোরূপ সংযোগ রাখতে অস্বীকার করলেন। ঢুন্ডিয়া দাগ সাহসী যোদ্ধাদের একটি

ক্ষুদ্র দল নিয়ে সুদীর্ঘকাল মারাঠাদের পেরেশান করতে লাগলো। অবশেষে পুণায় হুকুমত তাকে দমন করার জন্য দু'হাজার সওয়ার প্রেরণ করলো এবং ঢুন্ডিয়া দাগ তুমুল যুদ্ধের পর পরাজয় বরণ করে আধুনীর দিকে পালিয়ে গেলো।



একদিন মুনীরা তাঁর কামরায় বসে মুরাদ আলীর কাছে এক চিঠি লিখলেন ঃ 'প্রিয় মুরাদ! গত মাসে তুমি খবর দিয়েছিলে যে, শীগগিরই তোমায় ছুটি মিলবে। তারপর তোমার কোনো চিঠি আসেনি। তোমার ভাইজানের চিঠিরও কোনো জওয়াব তুমি দাওনি। আজকাল তোমার শাদী নিয়েই সাধারণভাবে আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছে এবং আমাদের ইচ্ছা, তুমি দু'তিন মাসের ছুটি নিয়ে ঘরে ফিরে এসো। আমি তোমার জন্য একটি পাত্রীর সন্ধান করেছি এবং আমার বিশ্বাস, আমার এ নির্বাচন তুমি অনুমোদন করবে। পাত্রী অত্যন্ত সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী এবং এক ভালো খান্দানের মেয়ে। তোমার ভাইজানকে এ ব্যাপার নিয়ে তার বাপের সাথে আলাপ করতে আমি বলেছিলাম, কিন্তু তিনি আলাপ শুরু করার আগে তোমার সম্মতি নেওয়া জরুরী মনে করেন।

আমি বেশ হাসিখুশীতেই আছি। তুমি শীগ্‌গিরই চলে আসার চেষ্টা করো। যদি কোনো কারণ'বশত জলদী আসা সম্ভব না হয়, তা'হলে জওয়াবে পাত্রীর মায়ের সাথে তোমার শাদীর প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করতে আমায় এজাযত দিও।'

-তোমার ভাবী মুনীরা।'

দু'হফ্‌তা পর এক বিকালে আন্‌ওয়ার আলী হাতে এক টুকরো কাগজ নিয়ে মুনীরার কামরায় ঢুকে বললেন ঃ 'মুনীরা, মুরাদ আলীর চিঠি এসেছে।' মুনীরার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি এগিয়ে এসে বললেন ঃ 'দিন।'

আন্‌ওয়ার আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'আমি পড়ে শোনাচ্ছি তোমায়।' তিনি কুরসির উপর বসলেন। আন্‌ওয়ার আলী চিঠির মর্ম পড়ে শোনাতে শুরু করলেন। মুরাদ আলী লিখেছেন ঃ

'ভাইজান! আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি সীমান্তের প্রতিরোধ চৌকি পরিদর্শনের জন্য গিয়েছিলাম। তাই আপনার ও ভাবীজানের চিঠির জওয়াব দিতে পারিনি। আমি একমাসের ছুটি পেয়েছি, কিন্তু আমি ঘরে ফিরে আসার আগে চাচা আকবর খানের ওখানে যেতে চাই। দীর্ঘকাল তাঁর কোনো খবর নেই। আমার মনে হয়, তাঁদের খোঁজ খবর নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। তাঁদের সাথে দেখা করার পর ছুটির বাকী দিনগুলো আপনাদের সাথে কাটাবার চেষ্টা করবো। কিন্তু ওখানে যদি বেশীদিন থাকতে হয়, তা'হলে আবার চাতলদুর্গেই ফিরে আসবো। ফউজদার ওয়াদা করেছেন, তিনি-চার মাস পর আমায় আবার ছুটি দেওয়া হবে।

এখন আমার ভাবীজানের কাছে কিছু বক্তব্য রয়েছে। তিনি আমার শাদীর প্রশ্ন

তুলেছেন। ভাইজান, আপনি আমার পক্ষে সুপারিশ করে বলবেন যে, ওসব কথা নিয়ে চিন্তা করার সময় আসেনি এখনো। ভাবীজানের খেদমতে আমার সালাম আরয করে দেবেন।'

মুনীরা হতাশ হয়ে বললেন ঃ 'আমি বুঝে উঠতে পারছি না, শাদীর ব্যাপারটা উনি এতটা গুরুত্বহীন কেন মনে করেন। হায়! মেয়েটিকে যদি আমি ওঁকে দেখাতে পারতাম!

আন্ওয়ার আলী হেসে বললেন ঃ 'পাত্রী দেখিয়ে কোনো ফায়দা হবে না। আমার ভাইকে আমি জানি।'

মুনীরা বললেন ঃ 'উনি শাদী করবেন না, এই আপনার মতলব?'

ঃ 'শাদী অবশ্যি করবেন?'

ঃ 'কবে?'

ঃ 'যখন তাঁর মরযী?'

বাইশ

একদিন দুপুর বেলা মুরাদ আলী আকবর খানের পল্লী থেকে প্রায় আট-দশ মাইল দূরে যোহরের নামায পড়ার জন্য নদীর কিনারে নেমে পড়লেন। জায়গাটির আশেপাশে ঘন জংগল। মুরাদ আলী রাস্তা থেকে একটুখানি সরে গিয়ে এক গাছের সাথে ঘোড়া বেঁধে নদীর পানিতে ওযু করার পর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি নামায শেষ করে উঠবার উপক্রম করলে অনুভব করলেন, যেনো একটা তীক্ষ্ণ কিছু তাঁর গর্দান স্পর্শ করছে। তাঁর বন্দুক সামনে পড়েছিলো, কিন্তু বন্দুক উঠাবার মওকা ছিলো না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তিনি সামনে ঝুঁকলেন এবং পরক্ষণেই এক লাফে একপাশে সরে দাঁড়ালেন। চোখের পলকে তিনি তলোয়ার খুলে নিয়েছেন, কিন্তু এরই মধ্যেই এক ব্যক্তির নেযার ফলা এসে স্পর্শ করলো তাঁর সিনা এবং ডানে-বাঁয়ে আরো দু'জন লোক বন্দুক উদ্যত করে দাঁড়ালো। লোকটিকে দেখে মনে হল মারাঠা। মুরাদ আলী ফিরে তাকাবার মধ্যেই আরো সশস্ত্র লোক তাঁর ঘোড়ার কাছে পৌছে গেলো। তিনি তলোয়ার ছুঁড়ে ফেললেন। মারাঠা নিশ্চিন্তে নেযাহ্ সরিয়ে প্রশ্ন করলো ঃ 'কে তুমি?'

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'এ প্রশ্ন আমারই করা উচিত ছিলো তোমাদের কাছে।'

মারাঠা আবার তাঁর নেযার ফলা তাঁর বুকের কাছে উদ্যত করে বললো তিক্ত কণ্ঠে ঃ 'তুমি এখনো মনে করছো যে, আধুনীর গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছো।'

ঃ 'আধুনি থেকে আমি আসেনি। আর কথা বলবার জন্য তোমাকে বারবার নেযা দেখাতেও হবে না। আমি জানি, আমি এখন তোমাদের নাগালের মধ্যে রয়েছি।'

ঃ 'কোত্থেকে এসেছো তুমি?'

ঃ 'আমি সেরিংগাপটম থেকে এসেছি।'

মারাঠা পেরেশান হয়ে সাথীদের দিকে তাকাতে লাগলো। মুরাদ আলী যিবের মধ্যে হাত দিয়ে চামড়ার একটি ছোট থলে বের করে তার সামনে রেখে বললেন ঃ 'আমি দুঃখিত, পথে আপনাদের সাথে দেখা হবে বলে আমি আশা করিনি, নইলে আমি আপনাদের হতাশ করতাম না। আমার কাছে এখন এই-ই রয়েছে।'

মারাঠা ঝুঁকে পড়ে থলেটি তুলে এগিয়ে এসে মুরাদ আলীর হাতে দিয়ে বললোঃ 'এটা আপনার কাছেই রাখুন। আপনি সেরিংগাপটম থেকে এসে থাকলে আমাদেরকে বন্ধু মনে করবেন। কিন্তু আমরা আপনাকে আরো খানিকটা তকলীফ দেবো। আপনার তলোয়ার বন্দুক তুলে নিয়ে আমাদের সাথে চলুন।'

ঃ 'কোথায়?' মুরাদ হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন।'

ঃ 'আমাদের সরদারের কাছে। আপনাকে বেশী দূর যেতে হবে না। '

ঃ 'আপনাদের সরদার কে?'

ঃ 'এখ্খুনি জানতে পারবেন। পেরেশান হবার কোনো কারণ নেই। আপনি সেরিংগাপটমের বাসিন্দা হলে দেখবেন, আমাদের সরদার আপনারই এক দোস্ত; আর যদি মিথ্যা বলে থাকেন, তা'হলে তা'ও আমরা জানতে পাবো এবং বাকী সফরের তকলীফ থেকে আপনি বেঁচে যাবেন।'

অপর এক ব্যক্তি হেসে বললো ঃ 'আর আমাদের সরদার যদি জানতে পারেন যে, আপনি মিথ্যা বলে জান বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন, তা'হলে আপনাকেই এই জংগলেরই কোনো গাছের সাথে ফাঁসি দেওয়া হবে।'

এক ব্যক্তি মুরাদ আলীর ঘোড়াটি ধরলো এবং বিনাবাক্য ব্যয়ে তিনি চললেন তাদের সাথে।



নদীর কিনারে ঘন জংগলে প্রায় আধ মাইল চলার পর এক জায়গায় মুরাদ আলীর নযরে পড়লো প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন লোক। তারা একটি জীর্ণ তাঁবুর আশপাশে উপবিষ্ট। মুরাদ আলীকে দেখেই তার আশে পাশে এসে জমা হল। এক নওজোয়ান চীৎকার করে বললো ঃ 'আরে, ইনি যে মহীশূর ফউজের অফিসার। আমি এঁকে কতোবার দেখেছি তোমরা এঁর উপর কোনো বাড়াবাড়ি করে থাকলে সরদার তোমাদের চামড়া খুলে নেবেন।'

মুরাদ আলীর পেরেশানী বিস্ময়ে রূপান্তরিত হতে লাগলো। খিমা থেকে বাহু ও গর্দানে পট্টি-বাঁধা একটি লোক বেরিয়ে এলো এবং মারাঠারা তাকে দেখেই এদিক ওদিক সরে গেলো। মুরাদ আলী তাকে প্রথম নযরই চিনলেন। লোকটি ঢুন্ডিয়া দাগ। সে এগিয়ে এসে মুরাদ আলীর দিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখে বললো ঃ

'আরে আপনি মুরাদ আলী?'

মুরাদ আলী অভিযোগের স্বরে বললেন ঃ 'খোদার শোকর, আপনি আমায় চিনতে পারলেন। নইলে আপনার লোকেরা এই বনের মধ্যেই ফাঁসি দেবার খোশখবর আমায় শুনিয়ে দিয়েছিলো।'

ঢুন্ডিয়া দাগ তাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন ঃ 'আপনার একটি চুলের বিনিময়ে আমি ওদের সবাইকে ফাঁসি দিতে পারি। কিন্তু আপনি এখানে কি করে এলেন?'

ঃ 'আমি আব্বাজানের এক দোস্তের সন্ধানে এসেছি। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরেই তাঁর পল্লী।'

ঃ 'আমার লোকেরা আপনার সাথে কোনো খারাপ-ব্যবহার তো করেনি?'

ঃ 'না; বরং এই মোলাকাতের জন্য আমি তাদের শোকরগুযার। কিন্তু আপনি এখানে কি করছেন? আমি শুনেছিলাম, আপনি নাকি শাহ্নূর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন?'

ঢুন্ডিয়া দাগ হেসে বললো ঃ 'দোস্ত, আমি তো একদিন পুণা পৌঁছবার স্বপ্নও দেখছিলাম, কিন্তু এবার আমার পরাজয় ঘটেছে। দাদুপন্থ গোফলে আমার আটশ' লোকের মোকাবিলা করতে এলো তিন হাজার সিপাহী নিয়ে। শাহ্নূর থেকে পালাবার পর মনে করেছিলাম, এ এলাকাটি হবে আমার জন্য নিরাপদ, কিন্তু মারাঠা এখানেও আমার অনুসরণ করছে। কালই আমি খবর পেয়েছি যে, মারাঠা সওয়াদের একটি দল দেখা গেছে এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে।'

ঃ 'মারাঠা সওয়ার? তা'হলে আপনি বলতে চান যে, মারাঠা সওয়ার আধুনি এলাকায় প্রবেশ করেছে?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'কিন্তু নিযাম এটা কি করে বরদাশ্ত করবেন?'

ঃ 'নিযামকে এখন অনেক কিছুই বরদাশ্ত করতে হবে। পুণার সেনাবাহিনী যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত এবং আমার বিশ্বাস এবার তারা সুলতানের পরিবর্তে নিযামের উপর তাদের শক্তি পরীক্ষা করবে।'

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'আপনি যখমী?'

ঃ 'আমার যখম সেরে এসেছে। আসুন।' ঢুন্ডিয়া দাগ মুরাদ আলীর হাত ধরে খিমার দিকে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর তাঁরা খিমার ভিতরে বসে নিশ্চিন্ত মনে আলাপ করছিলেন। ঢুন্ডিয়া দাগ বললো ঃ 'শাহ্নুরের উপর হামলা করার পর আমি সুলতানে মোয়ায্যমের কাছে এক দূত পাঠিয়ে মহীশূরের মারাঠা অধিকৃত এলাকা ছিনিয়ে নেবার প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু তাঁর তরফ থেকে জওয়াব পেলাম, যেনো আমি তাঁর জন্য কোনো জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবার চেষ্টা না করি। তিনি সন্ধির শর্ত কঠোরভাবে পালন

করে যাবেন।'

মুরাদ আলী প্রশ্ন করলেন ঃ 'এখন আপনার ইরাদা কি?'

ঢুন্ডিয়া দাগ জওয়াব দিলেন ঃ 'এখন মহীশূর ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল আমার নযরে পড়ে না। আমার মনীব আমার প্রতি নারায। কিন্তু কখনো কখনো আমার মনে হয়, আমি যদি গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ি, তা'হলে তিনি আমার সব অপরাধ ভুলে যাবেন। আপনি যদি সুলতানের কাছে হাযির হয়ে আমার সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন, তা'হলে খুব উপকার হয় আমার। আমার অবশিষ্ট লোকেরা বেশীদিন এ অবস্থায় টিকে থাকতে পারবে না।'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'আপনার সাহায্য করা আমার ফরয। আমি চাতলদুর্গ থেকে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি এবং এখান থেকে ফিরে গিয়েই আমি সেরিংগাপটম যাবার জন্য আরো ছুটি নেবার চেষ্টা করবো। আমার মর্যাদা এমন নয় যে, আমি সোজাসুজি সুলতানে মোয়ায্যমের সাথে এ বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি। তথাপি আমি আশা করছি যে, ওখানে আমার কোনো সাহায্যকারী জুটে যাবে। চাতল দুর্গ থেকে যদি অবিলম্বে ছুটি না পাই, তা'হলে.আপনাকে কিছুকাল প্রতীক্ষা করতে হবে। আপনার সাথীদের অবিলম্বে সাহায্য করার সহজতম পন্থা হচ্ছে তাদেরকে চাতলদুর্গের ফউজে ভর্তি করতে নেওয়া। আমার ফিরে যাবার পর তাদেরকে ওখানে পাঠিয়ে দিন। আমার বিশ্বাস, আমাদের ফউজদার তাদেরকে নিতে অস্বীকার করবেন না।'

ঢুন্ডিয়া দাগ বললো ঃ 'না, যতোক্ষণ না আমি সুলতানের তরফ থেকে মহীশূর সীমান্তে প্রবেশের এজাযত পাই, ততোক্ষণ এরা আমারই সাথে থাকবে। আমার বেশীরভাগ এখনো সুদুর বনে ও পাহাড়ে লুকিয়ে রয়েছে এবং আমি তাদেরকে এক জায়গায় জমা করবার চেষ্টা করবো। আমার দু'জন লোককে আমি আপনার সাথে পাঠাবো। আপনি কবে পর্যন্ত ফিরে যাবেন?'

ঃ 'এক হফ্‌তার মধ্যে আমি ফিরে আসবো। আপনি এখানে থাকলে আপনার লোকদের আমি সাথে নিয়ে যাবো।'

ঃ 'আমি এখানেই থাকবো, আর যদি কোনো কারণে আমায় কোনো আশ্রয়স্থল খুঁজতে হয়, তা'হলেও দু'টি লোক আমি এখানে রেখে যাবো। তারা আপনার ফিরে আসার প্রতীক্ষা করবে।

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'বহুত আচ্ছা, কিন্তু যদি কোনো কারণে তাদের সাথে আমার দেখা না হয়, তা'হলে তাদেরকে চাতলদুর্গে পাঠিয়ে দেবেন। এবার আমায় এজাযত দিন।'

ঃ 'এত শিগ্‌গীর! কম-সে-কম একদিন আমার এখানে থেকে যান।'

ঃ 'না, আজ সন্ধ্যার আগেই আমি ওখানে পৌঁছতে চাই। যদি সময় হয়, ফের্‌বার

পথে আপনার এখানে থেকে যাবো।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা, এই যদি হয় আপনার ইচছা, তা'হলে আপনাকে ঠেকিয়ে রাখবো না।'

খিমার বাইরে দ্রুতগামী ঘোড়ার আওয়ায শোনা গেল এবং মুরাদ আলী ও ঢুন্ডিয়া দাগ দ্রুত বেরিয়ে এলেন। এক সওয়ার ঢুন্ডিয়া দাগের কাছে এসে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লো এবং এগিয়ে এসে বললো ঃ 'মহারাজ, কাল যে সওয়ারদের আমরা দেখেছিলাম, তারা মারাঠা ফউজের সিপাহী নয়, লুন্ঠনকারী। গত কয়েকদিন ধরে তারা এ এলাকায় লুটতরাজ চালিয়ে যাচ্ছে। গত হফ্‌ফতায় এই এলাকার লোকেরা তাদেরকে মেরে সীমান্তের পারে পৌঁছে দিয়েছিলো, কিন্তু আবার তারা ফিরে এসেছে। এখন তারা জংগল থেকে বেরিয়ে আফগান বস্তির দিকে যাচ্ছে। আমি এক ঝোপের মধ্যে পালিয়ে থেকে তাদের সব কথা শুনেছি। তারা কোনো বস্তির উপর হামলা করতে যাচ্ছে।'

মুরাদ আলী পেরেশান হয়ে ঢুন্ডিয়া দাগকে বললেন ঃ 'দোস্ত , আমার গন্তব্যস্থল সেই আফগানদেরই একটি বস্তি। এখন আমার হয়তো আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হবে।'

ঃ 'আমি হাযির, জনাব!' বলে ঢুন্ডিয়া দাগ তার সাথীদের লক্ষ্য করে বললো ঃ 'তোমরা কি দেখছো? ঘোড়া তৈরী করো। সুলতান টিপুর এক বাহাদুর সিপাহী আজ তোমাদের সাহায্য চাচ্ছেন।'

ঢুন্ডিয়া দাগের সাথীরা তাদের ঘোড়া সাজাতে ব্যস্ত হলে সে বললো ঃ 'আমার তৈরী হতে মাত্র দু'মিনিট সময় লাগবে।'

ঃ 'না, না, আপনি যখ্‌মী আপনি আরাম করুন।'

ঃ 'আমার জন্য আপনি ভাববেন না। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। 'ঢুন্ডিয়া দাগ খিমার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন।

কিছুক্ষণ পর সে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে খিমার বাইরে এলো এবং ঘোড়ায় সওয়ার হল। মুরাদ আলী ছাড়া প্রায় পঁয়ত্রিশজন সিপাহী তার পিছু পিছু চললো।



প্রায় একঘন্টা বনের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে চলার পর তারা একদিকে বন্দুকের আওয়ায শুনতে পেলেন। ঢুন্ডিয়া দাগ ঘোড়া থামিয়ে হাত উঁচু করলে তার সাথীরা থেমে গেলো। সে বললো ঃ 'এখ্‌খুনি জংগল শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই আগে পায়দল চলতে হবে।'

ঢুন্ডিয়া দাগের সাথীরা অবিলম্বে তার হুকুম তামিল করলো এবং সাতজনকে ঘোড়ার হেফাযতের জন্য রেখে তারা এগিয়ে চললো। জংগলের আগে খানিকটা খালি যমিন, তারপর বস্তির কাছে আখক্ষেত শুরু হয়েছে। ঢুন্ডিয়া দাগ জলদী করে একটা

উঁচু গাছে চড়ে পরিস্থিতি দেখে নিয়ে নীচে নেমে মুরাদ আলীকে বললো ঃ 'ডাকাত ক্ষেতের আগে এক বাগানে জমা হয়ে সেখান থেকে গুলী ছুঁড়ছে। বাগানের ডানদিকে একটা ঝোঁপ। ঘন গাছপালার ভিতরে লুকানো ডাকাতের সংখ্যা আন্দায করতে পারিনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, পিছন থেকে আমাদের হামলায় তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে।'

মুরাদ আলী অস্থির হয়ে বললেন ঃ 'আমরা সময় নষ্ট করছি।'

ঢুন্ডিয়া দাগ সাথীদের ইশারা করলে তারা ছুটে আঁখক্ষেত পেরিয়ে যেতে লাগলো। শেষ ক্ষেতটির কিনারে পৌঁছে ঢুন্ডিয়া দাগ সাথীদের বললো ঃ 'তোমরা এখানে গা–ঢাকা দিয়ে থাকো। আমি এক্ষুণি ফিরে আসছি।'

ঢুন্ডিয়া দাগের সাথীরা এক সারিতে ক্ষেতের আল থেকে কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে গেলো এবং এবং সে নিজে যমিনের উপর শুয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললো। মুরাদ আলী তার অনুসরণ করলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে তারা দু'জনই ক্ষেতের আলের আড়ালে শুয়ে পড়ে বাগানের অবস্থা যাচাই করে নিলেন। বাগানের পিছন দিকটা খালি এবং মাঝে মাঝে গাছের সাথে ডাকাতদের ঘোড়া বাঁধা। ডাকাতদের সংখ্যা দেড়শ'-দুশোর কাছাকাছি। তারা বাগানের সামনের দিকে জমা হয়ে গাঁয়ের দিকে বাগানের আলটিকে ঘাঁটি বানিয়ে নিয়েছে। দশ-বারোজন ঘোড়ার হেফাযতে দাঁড়িয়ে আছে। মুরাদ আলী আশ্বস্ত হয়ে ঢুন্ডিয়া দাগের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'এখন আমাদের তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই। মনে হয়, বাগান ও গাঁয়ের মাঝখানে যথেষ্ট দূরত্ব রয়েছে এবং ডাকাতদের গুলী গাঁয়ের লোকদের কোনো ক্ষতি করতে পারছে না।'

ঢুন্ডিয়া দাগ বললো ঃ 'এই মুহূর্তে ওদের লক্ষ্য গাঁয়ের ক্ষতি করা নয়; বরং ডাকাতদের ইচ্ছা, গাঁয়ের লোক ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে এবং তারা খোলা ময়দানে শিকার করবার মওকা পাবে। গাঁয়ের লোক জওয়াবী গুলী না চালালে এতক্ষনে ওরা তাদের ঘর লুট করে বেড়াতো। আমি কয়েকজন লোক সাথে নিয়ে আখক্ষেত ঘুরে গিয়ে বাগানের ডানদিক দিয়ে হামলা করবো। আপনি বাকী লোক নিয়ে ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে থাকুন। ডাকাতরা যখন বিশৃঙ্খল হয়ে এদিকে ছুটে আসবে, তখন আপনারা হামলা করবেন। আমার বিশ্বাস, কয়েক মিনিটের মধ্যে ময়দান সাফ হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ পর ঢুন্ডিয়া দাগ পনেরোজন লোক নিয়ে আখক্ষেতের মধ্যে গায়েব হয়ে গেলো এবং মুরাদ আলী আল থেকে কয়েক কদম দূরে বাকী লোক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আচানক বাগানের ডানদিক থেকে বন্দুকের আওয়াযের সাথে সাথে ডাকাতদের ডাক-চীৎকার শোনা গেল। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাগানের পিছন দিকে সরতে লাগলো। ইতিমধ্যে মুরাদ আলী ও তাঁর সাথীরা আলের আড়ালে শুয়ে পড়ে বন্দুক সোজা করলেন। ঘোড়ার কাছে এসে ডাকাতরা এমন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লো যে, কেউ ঘোড়ার রশি খুলছে, আর অপর কেউ তার লাগাম ছিনিয়ে নিচ্ছে, কেউ তার ঘোড়ার রেকাবে পা রাখছে আর অপর একজন তার পা টেনে ধরে

নিজে সওয়ার হবার চেষ্টা করছে। মুরাদ আলী গুলী ছুড়বার হুকুম দিলেন এবং দেখতে দেখতে কয়েকজন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

কে যেনো চেঁচিয়ে বললো ঃ 'ভাগো, ভাগো, নিজ নিজ জান বাঁচাও। 'আমরা চারিদিক থেকে ঘেরার মধ্যে পড়ে গেছি।'

মুরাদ আলী বজ্রগম্ভীর আওয়াযে বললেন ঃ 'তোমাদের আর ভাগবার পথ নেই। নিজ নিজ হাতিয়ার ছুঁড়ে ফেলো।'

কয়েকজন ডাকাত হাতিয়ার ছুঁড়ে ফেললো। বাকী ডাকাতরা চীৎকার করতে করতে ছুটে পালাতে লাগলো। বাগানের পিছন ও ডান দিক থেকে আর একবার গুলীবৃষ্টি হতে থাকলো তারা বামদিকে ছুটে পালাতে বাধ্য হল। মুরাদ আলী ও তাঁর সাথীরা তলোয়ার নিয়ে বাগানে ঢুকে পড়লেন এবং পরাজিত ডাকাতদের তাড়িয়ে নিয়ে চললেন ভেড়া-বকরীর মতো। যারা ঘোড়ায় সওয়ার হবার মওকা পেলো, তারা পশ্চিম দিকের পথ ধরে পালাতে লাগলো আর বাকী লোক পয়দল ছুটলো তাদের পিছু পিছু। মুরাদ আলীর সাথীরা পিছু দাওয়া না করে যে ডাকাতরা হাতিয়ার সমর্পন করেছে, তাদেরকে জমা করতে লাগলো এক জায়গায়।

ঢুন্ডিয়া দাগ একটি বলিষ্ঠদেহ লোকের গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে এলো। তার সাথীরা চারজনকে ঘেরার মধ্যে ফেলেছে। ঢুন্ডিয়া দাগ দূর থেকে বুলন্দ আওয়াযে বললো ঃ 'আমরা ডাকাত দলের সরদারকে গ্রেফতার করে এনেছি।' কিছুক্ষণ পর তারা কয়েদীদের নিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে চলে গেলো গাঁয়ের সামনে এক খোলা ময়দানে। ঢুন্ডিয়া দাগ এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে বললো ঃ 'গায়ের লোকেরা এখানো গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে।'

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'ওরা হয়তো আমাদেরকে ডাকাতদের সাথী মনে করে বসে আছে।'

ঢুন্ডিয়া দাগ তাঁর সাথীদের লক্ষ্য করে বললো ঃ 'গাঁয়ের লোক আমাদের তরফ থেকে বন্ধত্বের প্রমাণ না পেয়ে বাইরে আসবে না। তাই এ কয়েদীদের গাছের সাথে লটকে দাও, আর সবার আগে ফাঁসি দাও দলের সরদারকে।'

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'না, এরা হাতিয়ার সমপর্ণ করেছে। আমি চাই এদেরকে আধুনীর হুকুমতের হাতে ছেড়ে দিতে।'

ঢুন্ডিয়া দাগ জওয়াবে বললো ঃ 'আধুনীতে যে ডাকাতদের হুকুমত চলছে, তারা আমার নযরে এদের চাইতেও নিকৃষ্ট।'

ঃ 'যা-ই হোক, আমি এদের সম্পর্কে কোনো ফয়সালা করতে পারছিনা।' ডাকাত-সরদার আশান্বিত হয়ে বললো ঃ 'সরকার, আপনারা আমার জান বাচাঁলে, আমি ভগবানের দোহাই দিয়ে বলছি, আর কখনো এ অপরাধ করবো না।'

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'এ এলাকার লোক তোমার ওয়াদার বিশ্বাস করতে

পারলে তোমার জান বাঁচাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

কয়েকজন লোক সামনের এক বাড়ির ছাতে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিলো। মুরাদ আলী এগিয়ে গিয়ে বুলন্দ আওয়াযে বললেন ঃ 'ভাইরা, আমরা তোমাদের দোস্ত। ডাকাত পালিয়ে গেছে। এবার তোমরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারো।'

ঢুন্ডিয়া দাগ তার সাথীদের বললো ঃ 'তোমরা ফিরে চলে যাও। এখানে তোমাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই। ডাকাতদের কোনো ঘোড়া পসন্দ হলে নিয়ে যেতে পারো, নইলে গাঁয়ের লোকদের জন্য রেখে যাও। আমরা এখনই জংগলে তোমাদের সাথে মিলিত হবো।'

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'ওদেরকে বলে দিন, একজন যেনো আমার ঘোড়াটা এখানে পৌঁছে দেয়। আমি এখান থেকেই এই এলাকার সরদারের গাঁয়ের দিকে রওয়ানা হয়ে যাবো।'

ঢুন্ডিয়া দাগের সাথীরা চলে গেলে কিছুক্ষণ পর বস্তির তিনজন লোক এক গলি থেকে বেরিয়ে এলো। মুরাদ আলী ও ঢুন্ডিয়া দাগ এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে মোসাফাহা করলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে গাঁয়ের লোকদের ভিড় এসে জমলো তাঁদের আশপাশে। মুরাদ আলীর সাথে কিছুক্ষণ আলোচনার পর তারা একবাক্যে ডাকাতদের মৃত্যুদন্ডের দাবি জানালো।

আচানক ডানদিক থেকে ঘোড়ার পদশব্দ শুনা গেলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেলো এক দ্রুতগামী সওয়ার দল। সবার আগে যে সওয়ার, তার লম্বা সোনালী চুল হাওয়ায় উড়ছিলো। সে ভিড়ের কাছে এসে পূর্ণ শক্তিতে ঘোড়ার বাগ টানলে গাঁয়ের লোক সরে গেলো এদিক ওদিক। এক মুহূর্তের জন্য মুরাদ আলীর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হল তার মুখের উপর। সওয়ার এক যুবতী। প্রথম নযরেই মুরাদ আলীর অন্তরে অনুভূতি জাগলো, যেনো একটি চিত্তাকর্ষক ছবি আচানক তাঁর চোখের সামনে ভেসে এসেছে অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতির অন্তরাল থেকে। এক বৃদ্ধ তার ঘোড়ার বাগ ধরে বললেন ঃ 'আপনার অনেক দেরী হয়ে গেছে। কিন্তু খোদার শোকর, এদের সময়মতো হস্তক্ষেপের ফলে আমাদের গাঁ বেঁচে গেছে। ডাকাতরা পালিয়ে গেছে, আর কয়েকজন সাথীসহ তাদের দলের সরদার গ্রেফতার হয়েছে।'

যুবতী তার কপালের উপর ছড়ানো চুলগুলো পিছনে সরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলোঃ 'ডাকাত-সরদার কোথায়?'

হাত-পা রশি দিয়ে বাঁধা একটি বলিষ্ঠদেহ লোকের দিকে বৃদ্ধ ইশারা করলো।

যুবতী ঘোড়া থেকে নেমে সরদারের দিকে এগিয়ে গেলো। মুরাদ আলী চাপা আওয়াযে গাঁয়ের একটি লোককে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এ যুবতী কে?'

ঃ 'সরদার আকবর খানের বেটি।'

ঃ 'সামিনা?'

ঃ 'জি হ্যাঁ।'

মুরাদ আলী নারীর সৌন্দর্য ও পুরুষোচিত শৌর্যের মূর্ত প্রতীকের দিকে না তাকিয়ে কল্পনা করছিলেন এক আপনভোলা ছোট্ট বালিকাকে। সামিনা তাঁর কাছ দিয়ে গিয়ে ডাকাত সরদারের কাছে থামলো। এক মুহূর্ত পরই সে তাকালো দর্শকদের ভিড়ের দিকে এবং তার তলোয়ার কোষমুক্ত করে ক্রুদ্ধ স্বরে বললো ঃ 'এ এখনো যিন্দা রয়েছে?' তারপর ফিরে সরদারের উপর পর পর দু'টি আঘাত করলো। তৃতীয়বার হাত তুললে মুরাদ আলী ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে একদিকে সরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ 'আর থাক। ও মরে গেছে।'

সামিনা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মুরাদ আলীর দিকে তাকালো, কিন্তু তাঁর লৌহকঠিন মুঠোর মধ্যে সে অসহায় হয়ে থাকলো। কয়েকজন সওয়ার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে এগিয়ে গেলো। কিন্তু পল্লীর লোকেরা তাদের পথরোধ করে চীৎকার করে বললো ঃ 'উনি আমাদের সাহায্য করছেন, আমাদের জান বাঁচিয়েছেন।'

সামিনা ভালো করে মুরাদ আলীর দিকে তাকাতে লাগলো এবং তার ক্রোধ বিস্ময়ে রূপান্তরিত হল। সে প্রশ্ন করলো ঃ 'আপনি কে?'

ঃ 'আমি মুরাদ আলী।'

সামিনা গর্দান নীচু করলো এবং মুরাদ আলী তার বাহু ছেড়ে এক কদম পিছিয়ে গেলেন। দর্শকরা হয়রান হয়ে তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে?'

সামিনা পুনরায় মুরাদ আলীর দিকে তাকালে তার চোখে প্রতিহিংসার আগুনের পরিবর্তে দেখা গেলো অশ্রুর ঝলক। সে বললো ঃ 'আপনি জানেন না, এরা আমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছে।'

ঃ ' আমি জানি, কিন্তু এ আমি বরদাশ্‌ত করতে পারি না যে, তুমি...'

এতটুকু বলতেই মুরাদ আলীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

ঃ 'এরা আমার বাপ ও ভাইকে কি অবস্থায় হত্যা করেছে, তা' আপনি জানেন না, নইলে আপনি আমার হাত ধরতেন না।'

মুরাদ আলী সর্বাংগ কম্পিত হয় উঠলো এবং তিনি বেদনা-কাতর কণ্ঠে বললেনঃ 'এ আমার জানা ছিলোনা।'

ঢুন্ডিয়া দাগ এগিয়ে মুরাদ আলীর কাঁধে হাত রেখে বললো ঃ 'দোস্ত, এ ধরনের লোকের উপর রহম করা পাপ। বলুন, বাকী কয়েদীদের সম্পর্কে আপনার ফয়সালা কি?'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'তাদের সম্পর্কে আমার ফয়সালা করার হক নেই।'

সামিনা বললো ঃ 'আপনি তাদের জান বাঁচাতে চাইলে আমার কোনো আপত্তি নেই।

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'এরা কোনো রহম পাবার যোগ্য নয়। তবু আমি চেয়েছিলাম এদেরকে আধুনীর হুকুমতের হাতে ছেড়ে দিতে।'

সামিনা বললো ঃ 'আধুনীর হুকুমতের তরফ থেকে এসব ব্যাপারে পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত করার এজাযত রয়েছে।'

ঢুন্ডিয়া দাগ বললো ঃ 'হায়! আমি যদি আপনাদের পঞ্চায়েতের ফয়সালা দেখে যেতে পারতাম! কিন্তু আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে।' তারপর মুরাদ আলীকে লক্ষ্য করে বললো ঃ 'আমি আপনার ফিরে আসার ইন্তেযার করবো। আপনি আমায় এজাযত দিন।'

সামিনা প্রশ্ন করলো ঃ 'আপনি ওঁর সাথে এসেছেন?'

ঃ 'জি হ্যাঁ।'

ঃ 'কিন্তু আপনাকে মারাঠা বলে মনে হচ্ছে যে?'

ঃ 'জি হ্যাঁ, কিন্তু প্রত্যেক মারাঠাই ডাকাত হয় না।'

ঃ 'আপনি আমার গোষ্ঠীর লোকদের সাহায্য করেছেন। আমি আপনার শোকর গুযারী করছি। কিন্তু আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

ঃ 'বোন আপনাদের কাছেই আমি থাকি।'

ঃ 'কোন জায়গায়?'

ঃ 'জংগলে যদি আবার কখনো আমার সাহায্য প্রয়োজন হয় আপনাদের, তা'হলে মুরাদ আলী জানেন, আমি কোথায় থাকি।' এই বলে ঢুন্ডিয়া দাগ সেখান থেকে চলে গেলো।'

এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে সামিনাকে বললো ঃ 'গাঁয়ের লোক বলছে, ডাকাত বেশী দূর যায়নি এবং তাদের বেশীর ভাগ ঘোড়া ফেলে পায়দল পালিয়েছে। আপনার এজাযত হলে তাদের পিছু ধাওয়া করা যেতে পারে।'

সামিনা জওয়াব দিলো ঃ 'এখন ওদের পিছু ছুটে যাওয়া কোনো ফায়দা হবে না। ওরা জংগলে ঢুকে গেছে আর সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে। তোমরা বিশজন লোক এই গাঁয়ের হেফাযতের জন্য রেখে যাও, আর কয়েদীদের পঞ্চায়েতের হাতে দিয়ে এসো।'



গাঁয়ের লোকদের সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করে সামিনা মুরাদ আলীকে লক্ষ্য করে বললো ঃ 'আসুন, আমি এবার ফিরে যাচ্ছি।'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'আমি আমার ঘোড়ার ইন্তেযার করছি।

সামিনা প্রশ্ন করলো ঃ 'কোথায় আপনার ঘোড়া?'

ঃ 'আমরা ডাকাতদের উপর হামলা করার আগে ঘোড়া রেখে এসেছিলাম এখান থেকে কিছু দূর জংগলের মধ্যে।'

গাঁয়ের একটি লোক বললো ঃ 'ডাকাতরা বাগানে কতকগুলো ঘোড়া ছেড়ে গেছে। আপনার সাথীরা কয়েকটা ঘোড়া নিয়ে গেছে, কিন্তু বাকীগুলো সেখানেই রয়েছে। আপনি পসন্দ করলে আমি ভালো দেখে একটি ঘোড়া আপনার জন্য নিয়ে আসি।'

ঃ 'না, ডাকাতদের ঘোড়া আপনাদের কাছে থাকবে। আমার ঘোড়া এখ্খুনি পৌঁছে যাবে।'

কিছুক্ষণ পর ঢুভিয়া দাগের এক সাথী মুরাদ আলীর ঘোড়া নিয়ে পৌঁছালো এবং তিনি গাঁয়ের লোকদের দোআ নিয়ে সামিনার সাথে চললেন। পথে বিভিন্ন বস্তির লোক তাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যেতে লাগলো এবং প্রায় পাঁচ মাইল চলার পর তাঁদের সাথে থাকলো মাত্র ত্রিশজন লোক। মুরাদ আলীর মন ও মস্তিস্ক আকবর খাঁন ও শাহ্বাযের মৃত্যু শোকে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। পথে তিনি সামিনা বা তার সাথীদের সাথে কোনো কথা বলতে পারলেন না। আকবর খান ও শাহ্বাযের বিভিন্ন ছবি যেনো ভেসে বেড়াচ্ছে তাঁর চোখের সামনে এবং তিনি কোন্ পথে যাচ্ছেন, কোন্ দিকে যাচ্ছেন ও কতোদূর পথ অতিক্রম করে এসেছেন, তার কোনো অনুভূতি নেই তাঁর ভিতরে। যে সামিনাকে কিছুক্ষণ আগে তিনি দেখেছেন খোলা মাথায়, এখন তার সোনালী কেশগুচ্ছ সাদা ওড়নায় ঢাকা। সে কখনো ছুটে চলতে চলতে ঘোড়ার পিছে থেকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় মুরাদ আলীর দিকে, কিন্তু কিছু বলবার উদ্যম নেই তার ভিতরে। এক টিলার কাছে এসে ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিলো এবং সাহস করে মুরাদ আলীকে বললো ঃ 'এবার আমরা এসে গেলাম বলে। আমাদের গাঁ এই টিলা থেকে মাত্র এক ক্রোশ দূরে।'

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'আমি মনে করেছিলাম, এ বস্তি থেকে তোমাদের গাঁ বেশী দূর হবে না।'

সামিনা জওয়াব দিলো ঃ 'ও বস্তিটি সীমান্তের দিকে আমাদের গোষ্ঠীর শেষ আবাদী এবং আমাদের গাঁ থেকে বেশ দূরে। আপনার আম্মাজান ও ভাইয়ের খবর কি?'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেন ঃ 'ভাইজান ভালোই আছেন আর আম্মাজান ইন্তেকাল করেছেন। তোমার আম্মাজান কেমন আছেন?'

ঃ 'তিনি ভালো আছেন?'

কিছুক্ষণ উভয়ই নির্বাক। তারপর মুরাদ আলী প্রশ্ন করলেন ঃ 'চাচাজান ও শাহ্বায কবে শহীদ হলেন?'

ঃ 'তাঁরা শহীদ হয়েছে, চার মাস হল।'

ঃ 'তানবীর আর হাশিম হায়দরাবাদে?'

ঃ 'জি হ্যাঁ। ওঁরা আব্বাজান ও ভাইজানের শাহাদতের পর এসেছিলেন এবং প্রায় দেড়মাস এখানে থেকে ফিরে গেছেন।

টিলা অতিক্রম করার পর তাঁদের কয়েকজন সাথী এক বস্তিতে এসে থামলো এবং সামিনা দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে বললেন ঃ 'এবার আমাদের জলদী ঘরে ফিরতে হবে। আম্মাজান এতক্ষণে পেরেশান হয়ে উঠেছেন।'

কিছুক্ষণ পর তাঁরা গাঁয়ের ভিতরে পৌছে গেলেন। সূর্য তখন অস্ত গেছে এবং গাঁয়ের মসজিদ থেকে ভেসে আসছে আযানের মধুর আওয়ায। মুরাদ আলী ঘোড়া থেকে নেমে সামিনাকে বললেন ঃ আমি নামায পড়ে আসছি।'

একটি লোক তাঁর ঘোড়ার বাগ ধরলো এবং মুরাদ আলী তাঁর কাধ থেকে বন্দুক নামিয়ে লোকটির হাতে দিয়ে চললেন মসজিদের দিকে।

তেইশ

মুরাদ আলী নামায শেষ করে ফিরে এসে দেখলেন, বাড়ির কয়েকজন নওকর দেউড়িতে তাঁর ইন্তেযার করছে। মুরাদ আলী তাদের সাথে মোসাফাহা করলেন। এর মধ্যে একটি অল্প বয়স্ক বালক ছুটে এসে তাঁকে বললো ঃ 'জনাব, বেগম সাহেবা আপনাকে ডেকেছেন।'

মুরাদ আলী তার সাথে চললেন। বাহির-বাড়ি পার হয়ে ভিতর-বাড়ির দেউড়ির কাছে এক প্রশস্ত কামরায় গিয়ে তাঁরা ঢুকলেন। কামরায় চেরাগ জ্বলছে। বালক ফিরে গেলো এবং মুরাদ আলী বসলেন এক কুরসীর উপর। কামরার দেওয়ালের কোথাও কোথাও বাঘ ও চিতার চামড়া লটকানো। এক কোনে একটি বড়ো কাঠের সিন্দুক।

আকবর খানের বিধবার সাথে তাঁর মোলাকাত মনে হয় তাঁর যিন্দেগীর এক নাযুক পরিস্থিতি। বিলকিস কামরায় প্রবেশ করলেন। এতক্ষণ বসে সান্ত্বনা ও আশ্বাসের যে কথাগুলো মুরাদ আলী আপন মনে গুছিয়ে এনেছিলেন, তা'যেনো কেমন এলোমেলো হয়ে গেলো মুহূর্তের মধ্যে। তিনি কুরসি থেকে উঠে শুধু' চাচীজান আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে নির্বাক হয়ে গেলেন।

ঃ 'বেঁচে থাকো, বেটা।' 'বলে বিলকিস এগিয়ে এসে মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে কুরসির উপর বসলেন।

মুরাদ আলী তাঁর সামনে বসে বললেন ঃ 'চাচীজান, এখনো চাচাজান ও শাহ্‌বায খানের মৃত্যু যেনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

ঃ 'বেটা, ওঁদের লাশ দেখেও আমি নিজকে ধোকা দেবার চেষ্টা করেছি যে, ওঁরা জীবিত। কিন্তু মৃত্যু এমন এক বাস্তব সত্য, যাকে স্বীকার না করে চারা নেই। আমরা সবাই মিলে এ বছরে হজ্জে যাবার ইরাদা করেছিলাম এবং তোমার চাচাজানের ইচ্ছা ছিলো যে, হজ্জে রওয়ানা হবার আগে আমরা কিছুদিন সেরিংগাপটমে থাকবো। সামিনা আমায় জানিয়েছে, তোমার আম্মাজানের ওফাতের খবর। বড়োই আফসোস হয়েছে আমার।'

ঃ 'চাচীজান, দীর্ঘকাল আমি এখানে আসার ইরাদা পোষণ করেছি। কিন্তু অবস্থার চাপে পড়ে আপনার খেদমতে হাযির হতে পারিনি।'

বিলকিস দোপাট্টা দিয়ে চোখের পানি মুছে বললেন ঃ 'তিনি তোমায় বারবার মনে করতেন।'

ঃ 'চাচীজান, সামিনা বা গাঁয়ের আর কোনো লোকের কাছ থেকে তাঁদের শাহাদতের পূরো বিবরণ জানতে চাওয়ার সাহস হয়নি আমার। আমি এখান থেকে অতো দূরে ছিলাম, তার জন্য হামেশা দুঃখ থাকবে আমার মনে।'

ঃ 'বেটা, ওঁদের মৃত্যুর বিবরণ বড়োই মর্মান্তিক। তুমি এখানে থেকেই বা কি করতে পারতে? এই ছিলো কুদরতের মঞ্জুর।'

মুরাদ আলীর অনুরোধে বিলকিস তাঁর স্বামী ও পুত্রের শাহাদতের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বললেনঃ 'একদিন আমরা হায়দরাবাদ থেকে তানবীরের শ্বশুরের ওফাতের খবর পেলাম এবং পরদিন সামিনার আব্বাজান হায়দরাবাদ যাবার জন্য তৈরী হোলেন। আমরা সবাই যেতে চাইলাম, কিন্তু তাঁর কথায় আমরা ইরাদা মুলতবী রাখলাম। হায়দরাবাদের দীর্ঘ সফরে শাহ্বাযের অসুবিধার চিন্তাই ছিলো তার বড়ো কারণ। তার দৃষ্টি শক্তি এতটা লোপ পেয়েছিলো যে, সাদা-কালোর পার্থক্য করতেও কষ্ট হত।

'শাহ্বাযের আব্বাজান গাঁয়ের ছয়জন লোক সাথে নিলেন এবং ভোরে হায়দরাবাদের পথে রওয়ানা হলেন। হায়! আমি যদি জানতাম যে, শেষবারের মতো আমি তাঁকে বিদায় দিচ্ছি। পরদিন পাশের বস্তির এক রাখাল চেঁচাতে চেঁচাতে এসে খবর দিলো যে, সে তাদের সরদার ও সাথীদের লাশ বনের মধ্যে দেখে এসেছে। দেখতে দেখতে গাঁয়ের লোকেরা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে রাখালের সাথে রওয়ানা হল। কিছুক্ষণ আমার হুঁশ ছিলো না। জ্ঞান ফিরে এলে জানলাম যে, শাহ্বাযও তাদের সাথে চলে গেছে। সামিনা তার ভাইয়ের পিছু পিছু যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু আমি তাকে বাধা দিলাম।'

'সন্ধ্যাবেলায় যখন গাঁয়ের লোকজন ফিরে এলো, ঘোড়ার উপর তারা তখন তোমার চাচাজান ও তাঁর সাথীদের লাশ ছাড়া শাহ্বায খান ও আরো চৌদ্দজনের লাশ বয়ে নিয়ে এসেছে। গাঁয়ের লোকেরা জানালো যে, এখান থেকে কয়েক মাইল গিয়ে জংগলের এক গাছের সাথে ঝুলানো পেয়েছিলো সামিনার আব্বা ও তাঁর সাথীদের। তারা যখন গাছ থেকে লাশ নামিয়ে নিচ্ছে, অমনি কাছের ঝোপের আড়াল থেকে ক্রমাগত গুলীবৃষ্টি হতে লাগলো। আমাদের কতক লোক যখমী হয়ে পড়ে গেলো। আমাদের লোকেরা জওয়াবী হামলা করলো এবং মারাঠারা কিছুক্ষণ মোকাবিলা করে পালিয়ে গেলো। তাঁরা পাঁচজন মারাঠাকে যিন্দা গ্রেফতার করলো এবং তাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল যে, মারাঠাদের নিয়মিত ফউজের কতক লোক মহীশূরের যুদ্ধের পর এদিকে এসেছে এবং সীমান্ত ডাকাতদের পরিচালনা করছে। গাঁয়ের লোক বললো যে, দুশমনের প্রথম গুলী লেগেছিলো শাহ্বাযের সিনায় এবং পড়ার সাথে সাথেই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছিলো।'

'ওঁর ছায়া উঠে যাবার পর সীমান্তপারে ডাকাত বর্গীরা সিংহ হয়ে উঠেছে, অথচ এ এলাকায় তারা পা রাখার সাহসও করতো না। দশদিনের মধ্যেই তারা এ এলাকায় এক বস্তির উপর হামলা করলো। আমাদের গায়ের কয়েকজন লোক খবর পেয়ে হামলাকারীদের মোকাবিলা করতে যাবার জন্য তৈরী হলো কিন্তু বেশীর ভাগ লোক তাদের সাথে যেতে ইতস্তত করলো। তারা যখন আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছিলো, সামিনা তখন দেউড়ির দরযার পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনছিলো।

'কিছুক্ষণ পর নওকর ছুটে এলো আমার কাছে। সে এসে খবর দিলো যে, সামিনা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বাইরে চলে গেছে। আমি জলদি করে দেউড়িতে পৌঁছে দেখলাম, সামিনা ঘোড়ার যিনের উপর বসে গাঁয়ের লোকদের মধ্যে বক্তৃতা করছে। তারা সরদারের মেয়ের মুখে বুযদীল ও আত্মসম্ভ্রমবোধহীন বলে নিন্দা বরদাশ্ত করতে না পেরে যুব-বৃদ্ধা নির্বিশেষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। তারা সওয়ার হয়ে বেরিয়ে গেলো। সামিনার ঘোড়া ছিলো সবার আগে। আমি দেউড়ির বাইরে গিয়ে যে পথরোধ করবো, এমন সাহস আমার হল না। এক নওকরকে আমি তাদের পিছনে পাঠিয়ে দিলাম, কিন্তু সে সামিনার ইরাদা ফিরাতে পারলো না। রাস্তার ভিতরে গাঁয়ের লোকেরাও তাঁকে বুঝাতে লাগলো, কিন্তু সে সবাইকে একই জওয়াব দিলো ঃ 'আমি সরদার আকবর খানের মেয়ে, আমার গোষ্ঠীর লোকদের হেফাযত আমার ফরয।"

'পথে আরো কতক বস্তির লোক তাদের সাথে শামিল হল। দুপুর বেলায় আমরা খবর পেলাম যে, বর্গীরা ত্রিশটা লাশ ময়দানে ফেলে পালিয়েছে আর দশজন লোককে ওরা গ্রেফতার করে এনেছে। সন্ধ্যার সময়ে সামিনা ফিরে এসে জানালো যে, তার আব্বাজানও তাঁর সাথীদের লাশ যে গাছে পাওয়া গিয়েছিলো, কয়েদীদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে সেই গাছের সাথে।

'গোষ্ঠীর লোক তাদের সরদারের মৃত্যুর পর আমাদেরই খান্দানের একজন প্রতিপত্তিশালী লোককে সরদারের পাগড়ী পরিয়ে দিয়েছিলো। এই ঘটনার পর সামিনার মর্যাদা সরদারের চাইতেও বেশী হয়ে গেছে। গোষ্ঠীর লোক তার ইশারায় জান দিতে তৈরী। হাশিম ও তাঁর খান্দানের কতক লোক শোক জানাবার জন্য এখানে এসেছিলেন এবং তাঁরা আমাদেরকে হায়দরাবাদ নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। আমিও মনে করেছিলাম যে, এ জায়গা আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। কিন্তু গোষ্ঠীর লোকদের অনুরোধে আমাদের ইরাদা বদল করতে হল। নয়া সরদার প্রত্যেক গাঁয়ের কিছু কিছু লোক নিয়ে আমাদের কাছে এসে বললেন ঃ "আপনারা চলে গেলে আমাদের মধ্যে কেউ এখানে থাকবে না। এখানকার লোকদের সাহস বজায় রাখার জন্য সামিনার এখানে থাকা প্রয়োজন।" সামিনাও বললো ঃ "আমি শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমার গোষ্ঠীর সংগ ছেড়ে যাবো না।"

সামিনার বাপ বলতেন ঃ " আমার আপনভোলা সামিনার সিনার মধ্যে রয়েছে এক সিংহের দীল।" আজ আমাদের গোষ্ঠীর তামাম লোক গাইছে তার বাহাদুরীর যশ।

শাহ্‌বায ও তাঁর আব্বাজানের ওফাতের দু'মাস পর মারাঠা বর্গীরা আবার সীমান্ত পার হয়ে আমাদের বস্তি লুট করবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সামিনা কয়েকবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তাদেরকে ভাগিয়ে দিলো। তারপর কিছুদিন অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিলো। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে আবার তারা শুরু করেছে লুটতরাজ।'

বিলকিস এই পর্যন্ত বলে নির্বাক হ'য়ে গেলেন। মুরাদ আলী বললেন ঃ 'চাচীজান, সামিনার শৌর্য আজ আমায়ও মুগ্ধ করেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমার মনে হয়, চাচাজান ও ভাই শাহ্‌বাযের মৃত্যুর পর আপনাদের এখানে থাকা ঠিক নয়।'

ঃ 'আমিও তাই ভাবি, কিন্তু সামিনার মরযীর বিরুদ্ধে এ ঘর ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখান থেকে আমাদের চলে যাওয়াকে সে মনে করে গোষ্ঠীর লোকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিভংগ। বেটা, সামিনার অনেক কার্যকলাপ আমার কাছে এক রহস্য। ভাই ও বাপের মৃত্যুর পর আমি তার চোখে কখনো অশ্রু দেখিনি। কিন্তু প্রতিদিন সে চেরাগ জ্বালিয়ে দেয় তাঁদের কবরে। শাহ্‌বায সাধারণত এই কামরায়ই থাকতো এবং তার মৃত্যুর পর সামিনা এরই মধ্যে জমা করেছে তার সব রকম স্মৃতিচিহ্ন। ওই সিন্দুকে তাঁর তলোয়ার-বন্দুক ছাড়া আরো রয়েছে তার কাপড় জুতা। এই তার ঘোড়ার যিন। কামরার দেওয়ালের সাথে ঝুলানো তার শিকার-করা বাঘ ও চিতার চামড়া। এ কামরায় হামেশা তালা লাগানো থাকে। নিজে ছাড়া আর কাউকে কামরা সাফ করার এজাযতও দেয় না সামিনা। সে নিজেই যে আজ তোমাকে এই কামরায় রাখার ব্যবস্থা করেছে, এটা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত।

'শাহ্‌বায সামিনাকে খুবই স্নেহ করতো এবং দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর শাহ্‌বাযের যিন্দেগীর সব চাইতে বড়ো আকর্ষন ছিলো সামিনা। সবসময়েই সে থাকতো তার সাথে সাথে। তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে, এই অনুভূতি তার মনে সে জাগতো দিতো না কখনো। ঘরে বসে থাকতে থাকতে শাহ্‌বায যখন অস্থির হয়ে উঠতো, তখন সামিনা তাকে নিয়ে যেতো বাইরে বেড়াতে। গোড়ার দিকে সে হাত ধরে ধরে চলতো, তারপর সামিনার পিছু পিছু চলতে তার অসুবিধা হত না। সে বলতো ঃ "সামিনাকে আমি দেখি একটা হালকা ছায়ার মতো, কিন্তু ওর পায়ের আওয়াযেই আমি পথ দেখি নেই।"

'দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও শাহ্‌বাযের ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর শখ কমেনি কোনদিন। গোড়ার দিকে আমার ধারণা ছিলো, পূর্ণ বিশ্রামে তার দৃষ্টি আবার ফিরে আসবে, কিন্তু কোনো ফায়দা যখন হল না, তখন তার আব্বাজান তাকে ঘোড়ায় সওয়ারী করবার এজাযত দিলেন। সে ও সামিনা প্রতিদিন ভোরে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেতো। সামিনাকে প্রতি মুহূর্তে শাহ্‌বাযের জন্য কোনো না-কোনো আকর্ষণ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতে হত। তারপর যেদিন জানলাম যে, শাহ্‌বায সামিনার সাথে বাইরে ঘেরার কাছে নিশানার অভ্যাস করে থাকে, সেদিন আমি খুবই হয়রান হয়ে পড়লাম। সেখানে গিয়ে দেখি, শাহ্‌বায ও সামিনা কয়েকজন নওকরের সাথে আঙিনায় দাঁড়ানো। তাদের সামনে পাঁচিলের সাথে একটি কাঠের ফলক আর শাহ্‌বাযের হাতে বন্দুক।

সামিনা একটা পাথর হাতে নিয়ে বললো ঃ "ভাইজান, তৈরী হন।" শাহ্বায পাঁচিলের দিকে বন্দুক সোজা করে ধরে বললো ঃ "আমি তৈরী।-" তারপর সামিনা ফলকের উপর পাথর মারলে আওয়ায শুনেই শাহ্বায বন্দুক চালিয়ে দিলো। আমি দেখলাম, যেখানে সামিনার পাথরের আঘাত লেগেছিলো, তার পাশেই শাহ্বাযের গুলীর আঘাতে এক ছিদ্র হয়ে গেছে। এক নওকর খালি বন্দুকটি তার হাত থেকে নিয়ে একটি ভরা বন্দুক তার হাতে দিলো। এমনি কয়েকবার আমি তাকে গুলী করতে দেখলাম সেখানে দাঁড়িয়ে। সামিনা যখন বলে ঃ "আপনার নিশানা আমার পাথরের খুব কাছে এসে লেগেছে," অমনি তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পর তাদের আব্বজানও এলেন সেখানে। এ দৃশ্য দেখে তিনি নিঃশব্দ পদক্ষেপে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। শাহ্বাযের কয়েকটি নিশানা দেখার পর তিনি একটি লম্বা ছড়ি আনিয়ে বললেন ঃ "বেটা, এবার সামিনার বদলে আমি তোমার পথ দেখাচ্ছি।" তিনি দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে ফলকের কাছে দাঁড়ালেন তারপর ছড়ি দিয়ে ফলকের উপর ঠক্ঠক্ আওয়ায দিয়েই শাহ্বাযকে গুলী করতে বললেন। শাহ্বায বললো ঃ "আব্বাজান, আপনার আওয়ায আমার লক্ষ্যের খুব কাছে শুনতে পাচ্ছি।" তিনি জওয়াব দিলেন "আমার জন্য ভেবো না তুমি। আমি ফলক থেকে বেশ দূরে আছি। এবার তৈরী হও।" তারপর তিনি ঠক্ঠক্ করে আবার আওয়ায করতেই শাহ্বায গুলী চালিয়ে দিলো। তার নিশানা হল সম্পূর্ণ নির্ভুল। তারপর কয়েক হফ্তায় শাহ্বায এত অভ্যস্ত হয়ে গেলো যে, পঞ্চাশ-ষাট কদম দূরে শব্দ শুনে সে নিশানা লাগাতে পারতো। সামিনা একে মনে করতো তার জীবনের এক বড়ো কৃতিত্ব।

'সামিনা আমার সামনে কখনো তার ভাই বা বাপের কথা বলে না, কিন্তু আমি বুঝি যে, আমার তুলনায় তার যিন্দেগী আরো বেশী ভয়াবহ। আমি আমার মনের দুঃখ অপরের কাছে বলে হালকা করি, কিন্তু সে তার দুঃখের শরীক করে না কাউকেও।'

এক নওকর কামরার ভিতরে উঁকি মেরে বললো ঃ 'জনাব, গাঁয়ের লোক বাইরে এসে জমা হচ্ছে তারা আপনার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে।'

বিলকিস বললেন ঃ 'তুমি গিয়ে তাদেরকে বসতে দাও। খানা খেয়ে উনি বাইরে যাবেন।'

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'আমি খানা খাবার আগে তাদের সাথে দেখা করে এলে ভালো হয় না?'

ঃ 'না, বেটা, ওখানে তোমার দেরী হবে। আমি এখ্খুনি তোমার খানা পাঠাচ্ছি।' বলে বিলকিস কামরার বাইরে চলে গেলেন।



রাত দশটার সময়ে মুরাদ আলী কামরার মধ্যে বিছানায় শুয়ে আছেন। দিনের সব ঘটনা তাঁর কাছে মনে হয় যেনো একটা স্বপ্ন। এর আগে সে আপন-ভোলা ছোট্ট মেয়ে সামিনাকে তিনি দেখেছিলেন, সে কতো বদলে গেছে! সেই মেয়েটিকে

কল্পনা করে তার ঠোঁটে ভেসে উঠতো হাসির রেখা। তিনি ভাবতেন, সামিনা এতদিনে বড়ো হয়ে গেছে। এখন হয়তো সে তাঁকে দেখে চিনতে পারবে না, আর তিনিও চিনতে পারবেন না তাকে। কয়েক বছর পর হয়তো তাঁর নামও মনে করতে পারবে না সে।-সেরিংগাপটম থেকে রওয়ানা হবার পর পথের মনযিলে মনযিলে আকবর খান ও শাহ্বাযের সাথে তাঁর মোলাকাতের কল্পনার সাথে সাথে তাঁর চোখের সামনে কখনো কখনো ভেসে উঠেছে সামিনার কল্পরূপ এবং বর্তমানের মধ্যে রয়েছে ছয় বছরের ব্যবধান। তারপর আবার তাঁর মনে আচানক ধারণা জেগেছে, সামিনা এতদিনে জোয়ান হয়ে উঠেছে এবং সে হয়তো আসতেও চাইবে না তাঁর সামনে। এ কল্পনা তাঁর মনকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

এখন সামিনাকে তিনি দেখেছেন। কিন্তু তাঁর মানসিক উদ্বেগ না কমে বরং বেড়েই গেছে। কালের বৈপ্লবিক বিবর্তন আকবর খানের কন্যা ও শাহ্বাযের ভগ্নীকে ফুল নিয়ে খেলা করার পরিবর্তে তলোয়ার ধরতে বাধ্য করেছে। মুরাদ আলীর কাছে এ নির্মম সত্য অসহনীয়। বারবার তিনি আপন মনে বলছেন ঃ 'সামিনা! আহা! আমি যদি তোমাদের ঘরের দরজায় সারা জীবন পাহারা দিতে পারতাম! হায়! মানব-সমাজের পরিবেশ থেকে যদি আমি সেই যুলুম ও বন্য বর্বরতার আগুন নিভিয়ে দিতে পারতাম, যে আগুন তোমায় চার-দেওয়ালের বাইরে যেতে বাধ্য করেছে।'

দীর্ঘ সময় অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করে মুরাদ আলীর চোখে নেমে এলো ঘুমের মায়া। ভোরে যখন তাঁর চোখ খুললো, তখন নামাযের সময় হয়ে গেছে। তিনি যলদী করে বেরিয়ে মসজিদের দিকে চললেন। নামায শেষ করে ফিরে এসে দেখলেন, সামিনা তাঁর বিছানা গোছাচ্ছে। বেখেয়াল হয়ে তিনি কামরার ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং পেরেশান হয়ে বললেন ঃ 'মাফ করো। আমি জানতাম না যে, তুমি এখানে।

সামিনা বেপরোয়াভাবে জওয়াব দিলেনঃ 'আমি আপনার কামরা সাফ করছিলাম।' তারপর এক কুরসীর উপর রাখা কয়েকটি কাপড়ের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ 'এ কাপড়গুলো আপনার জন্য।'

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'তোমার এ তকলিফের প্রয়োজন ছিলো না। আমার ঘোড়ার যিনে বাঁধা থলের ভিতরে কয়েকটা ফালতু কাপড় রয়েছে।'

সামিনা মুরাদ আলীর দিকে না তাকিয়ে বললেন ঃ 'ভাইজান মরার আগে কয়েকটা কাপড় বানিয়েছিলেন এগুলো এমনি পড়ে রয়েছে্ এ জোড়াটি আমি নিজেই তৈরী করেছি।' সামিনা এই বলে ধীরে ধীরে দরযার দিকে এগিয়ে গেলেন।'

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'সামিনা, দাঁড়াও।

সামিনা দাঁড়ালেন।

ঃ 'আমি তোমায় কয়েকটা কথা বলবো।'

সামিনা তাঁর দিকে ফিরে তাকালো এবং মুরাদ আলী কেমন হতভম্ব হয়ে

দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি অতি কষ্টে বললেন ঃ 'আমি তোমায় খুব মনে করেছি, সামিনা! কিন্তু এই অবস্থায় যে আমাদের দেখা হবে, তা' আমি কল্পনাও করিনি। তোমার ভাই ও আব্বাজানের মৃত্যুতে আমি বড়োই দুঃখিত হয়েছি।'

ঃ 'তাদের সাথে আপনার গভীর মুহাব্বত ছিলো, তা' আমি জানি। আধুনীতে আপনি আমার ভাইকে সাহায্য করেছিলেন তার জন্য আমি আপনার শোকর গুযারী করি। তিনি আপনাকে খুব মনে করতেন।'

মুরাদ আলী কিছুটা দ্বিধা করে বললেন ঃ 'সামিনা, আমার মনে হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমার ও চাচীজানের এখানে থাকা ঠিক নয়। হায়দরাবাদ তোমার জন্য অধিকতর নিরাপদ। হায়! অবস্থা যদি এমন হত যে, আমি তোমাদেরকে সেরিংগাপটমে দাওয়াত দিতে পারতাম।'

সামিনা চূড়ান্ত সংকল্পের আওয়াযে বললেন ঃ 'আমরা এখানে থাকার ফয়সালা করেছি। আমাদের সম্পর্কে আপনি পেরেশান হবেন না।'

মুরাদ আলীর আর কিছু বলার হিম্মত হল না। সামিনা কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। মুরাদ আলী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কুরসির উপর।



মুরাদ আলী যতোদিন থাকলেন, তার মধ্যে সামিনার সাথে পুনরায় আলাপ করার মওকা জুটলো না। কিন্তু বিলকিস সকাল-সন্ধ্যায় তার কাছে আসেন ও অতীতের ঘটনাবলী নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। বিলকিসের সামনে বসে যখন তিনি সামিনার কথা ভাবেন, তখন এক অসহনীয় বোঝা অনুভব করেন মনের মধ্যে। কামরার বাইরে তার সময় কাটে বেশীর ভাগ আশপাশের বস্তির লোকদের সাথে মোলাকাত ক'রে। তারা তাকে মনে করে তাদের উপকারী বন্ধু। তারপর তিনি ফিরে এসে কামরার পরিচ্ছন্নতা অথবা জিনিসপত্রের শৃঙ্খলা ও মামুলী পরিবর্তন দেখে বুঝতে পারেন যে, সামিনা এসেছিলেন কামরার মধ্যে। কখনো তার মনে ধারণা জাগে, সামিনা তার সামনে আসতে সংকোচ বোধ করেন এবং তার দীল অভিযোগে পূর্ণ হয়ে যায়। তারপর তিনি নিজেই সামিনার কার্যকলাপের সমর্থনে দলীল সন্ধান করেন ঃ 'বাপ ও ভাইয়ের মৃত্যুশোক সামিনার মন ও মস্তিষ্ককে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে আর আমিই তাকে এ গাঁ ছেড়ে হিজরত করার পরামর্শ দিয়ে রাগিয়ে দিয়েছি'। তারপর তিনি কল্পনায় সামিনার কাছে সাফাই পেশ করেন ঃ 'সামিনা, আমার কথার অর্থ তা' নয়। আমি জানি, তুমি বাহাদুর। তোমার শিরায় বয়ে যাচ্ছে এক আত্মসম্ভমশীল পিতার রক্তধারা। কিন্তু তুমি এক বালিকা, কুদরত তোমায় অগ্নিঝড়ের মোকাবিলা করার জন্য পয়দা করেন নি। এ গাঁ তোমাদের জন্য নিরাপদ নয়, এ কথা বলবার হক আমার আছে।'

পঞ্চম দিন এশার নামায পড়ে গাঁয়ের মসজিদ থেকে ফিরে এসে তিনি দেখলেন, যে কমবয়সী বালকটি তার জন্য সকাল-সন্ধ্যায় খানা নিয়ে আসে, তার কামরার দরযায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুরাদ আলী তার কাঁধে হাত রেখে বললেন ঃ 'তুমি গিয়ে

চাচীজানকে বলো, আমি তাঁর সাথে দেখা করতে চাই।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা, জনাব।' বলে বালক চলে গেলো এবং মুরাদ আলী কামরায় প্রবেশ করলেন।

কিছুক্ষণ তিনি অস্থিরভাবে কামরার মধ্যে পায়চারি করলেন। বিলকিস কামরায় ঢুকে বললেন ঃ 'কি ব্যাপার, বেটা।'

ঃ 'চাচীজান, তশরীফ রাখুন।'

তিনি এক কুরসির উপর বসে পড়লেন এবং মুরাদ আলী তার সামনে অপর এক কুরসির উপর বসে বললেন ঃ 'চাচীজান, আমি এই অসময়ে আপনাকে এখানে আসার তকলীফ দিয়েছি, মাফ করবেন। কথা হচ্ছে, আমি এখন ফিরে যেতে চাই। আপনার এজাযত পেলে আমি ভোরে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবো।'

ঃ 'না বেটা, এত জলদী করো না।'

ঃ 'চাচীজান, আমার ইচ্ছা, আপনি আমায় খুশী হয়ে এজাযত দিন।'

ঃ 'আমি তোমায় ঠেকিয়ে রাখতে পারি না, কিন্তু তুমি আর কয়েকদিন থাকতে পারো না? তোমায় এখানে পেয়ে আমরা অনেক দুঃখ ভুলেছি।'

ঃ 'চাচীজান, আপনি জানেন, এখান থেকে আমি খুশী হয়ে যাচ্ছি না।' কিন্তু আমি নিরুপায়।

ঃ 'বহুত আচ্ছা বেটা, তুমি ওয়াদা করো আমাদেরকে ভুলে যাবে না।'

ঃ 'চাচীজান, আমি আপনাদেরকে কি করে ভুলবো?' ঃ 'মুরাদ আলী বিষণ্ন কণ্ঠে জওয়াব দিলেন।

কিছুক্ষণ উভয়ই নীরব থাকলেন। অবশেষে মুরাদ আলী বললেন ঃ 'চাচীজান, সেদিন আমি সামিনাকে বলেছিলাম যে, আপনাদের পক্ষে হায়দরাবাদ চলে যাওয়াই ভালো হবে। কিন্তু সে হয়তো আমার উপর নারায হয়েছে।'

ঃ 'না বেটা, সে তোমার উপর নারায নয়। সে জানে যে, দুনিয়ায় তোমার চাইতে বড়ো শুভাকাংখী আর কেউ নেই। কিন্তু এখনো তার মস্তিষ্কে ভাই ও বাপের মৃত্যুশোক গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। আমার বিশ্বাস, কিছুদিনের মধ্যে তার মন আশ্বস্ত হবে।'

ঃ 'মুরাদ আলী বললেন ঃ 'চাচীজান, আমার সব চাইতে বড়ো আফসোস, আমি আপনাদের সেরিংগাপটমে আসার দাওয়াত দিতে পারিনি। বিগত যুদ্ধের পর আমরা সেরিংগাপটমের আকাশে দেখেছি এক নতুন ঝড়ের পূর্বাভাস, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার সে ঝড় অতিক্রম করে যেতে পারবো। আমি শুধ আপনার ও সামিনার জন্য নয়; বরং এখানকার প্রত্যেকটি মানুষের জন্য খোশখবর নিয়ে আসতে পারবো যে,

এখন মহীশূরের সরজমিন প্রত্যেক মুসলমানের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল।

মুরাদ আলী ও বিলকিস আরো কিছুক্ষণ কথা বলতে থাকলেন। অবশেষে বিলকিস উঠে বললেন ঃ 'বেটা, ভোরে তুমি সফর শুরু করবে। আমি ভোরে তোমায় বিদায় দিতে আসবো।'

ঃ 'না চাচীজান, আপনি তকলিফ করবেন না। আমি শেষরাতে রওয়ানা হয়ে যাবো।'

বিলকিস কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তিনি অশ্রুসজল চোখে বললেন ঃ 'আবার তুমি কবে আসবে।'

ঃ 'চাচীজান, যদি মহীশূরের অবস্থা ভালো হয়ে যায়, তা'হলে আমি খুব শীগগিরই চলে আসবো। হয়তো আমার সাথে ভাই ও ভাবীজানও আসবেন। দোআ করবেন, যেনো যুদ্ধের বিপদ-সম্ভাবনা কেটে যায়।'

ঃ 'তোমার ভাই ও ভাবীজানকে আমার সালাম দিও।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা।'

ঃ 'আচ্ছা বেটা, খোদা হাফিয।' কথা কটি বলার সাথে বিলকিসের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়লো।

ঃ 'খোদা হাফিয, চাচীজান!'

বিলকিস অশ্রু মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তার কম বয়সী নওকরটি কামরায় প্রবেশ করে বললো ঃ 'জনাব, বিবিজী বললেন, আপনি নাকি ভোরে চলে যাচ্ছেন?'

ঃ ' হ্যাঁ, আমি শেষ রাত্রে চাঁদ উঠলেই এখান থেকে রওয়ানা হবো।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা, আমি আপনাকে জাগিয়ে দেবো।'

ঃ 'আমায় জাগাবার প্রয়োজন নেই। তুমি বাইরে নওকরদের বলে দাও, যেনো চাঁদ উঠতেই তারা আমার ঘোড়া তৈরী করে দেয়। এই ফালতু কাপড়গুলো নিয়ে আমার থলের মধ্যে রেখে দাও।' নওকর পাঁচিলের সাথে লাগানো আলনা থেকে কাপড়গুলো গুছিয়ে নিয়ে বললো ঃ 'জনাব, শেষ রাত্রে আপনার ঘুম না ভাঙলে আমি কি করবো? আপনাকে জাগিয়ে না দিলে বেগম সাহেবা রাগ করবেন।'

মুরাদ আলী হেসে বললেন ঃ 'তুমি গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাও। হ্যাঁ, একটু দাঁড়াও।' তিনি জিব থেকে একটি আশরাফী বের করে এগিয়ে গিয়ে নওকরের জিবের মধ্যে ফেলে দিলেন।

বালক কুণ্ঠিত হয়ে বললো ঃ 'না, জনাব, এটা আমি নিতে পারি না।'

ঃ 'তা কেন?'

ঃ 'জনাব, সামিনা বিবি জানলে আমার জান মেরে ফেলবেন।'

মুরাদ আলী তাকে বাহু দ্বারা জড়িয়ে ধরে দরযার দিকে ঠেলে নিয়ে বললেন ঃ 'ভেবো না কিছু সামিনা বিবি কিছু জানবেন না।'



শেষ রাত্রে মুরাদ আলী তৈরী হয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করেছেন, অমনি বাইরে কারুর হালকা পদশব্দ শোনা গেল। তারপর আধখোলা দরযার একটা কেওয়াড় খুলে গেলে সামিনা এক মুহূর্ত উঁকি মেরে কুণ্ঠিত পদক্ষেপে ভিতরে ঢুকলেন।

মুরাদ আলী মুহূর্তের জন্য দ্বিধাকুণ্ঠিত ও পেরেশান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সামিনা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'আপনি চলে যাচ্ছেন?'

ঃ 'হাঁ, আর আমার দুঃখ ছিলো যাবার সময় তোমার সাথে দেখা হবে না বলে।'

সামিনা বললেন ঃ 'রাত্রে আম্মাজান আমায় বললেন, আপনি চলে যাচ্ছেন। আমি তখ্খুনি আপনার কাছে আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনার আরামের সময় বলে আসিনি। আপনাকে আমি বলতে চাই, আমি আপনার উপর নারায হইনি।'

মুরাদ আলী মনে এবার অভিযোগের বদলে জেগে উঠলো কৃতজ্ঞতার মনোভাব। তিনি বললেন ঃ 'সামিনা, বসো। আমি তোমায় একটা জরুরী কথা বলবো।'

সামিনা মুহূর্তের জন্য গর্দান তু'লে তাঁর দিকে তাকালেন এবং খানিকটা ইতস্তত করে এক কুরসির উপর বসলেন।

মুরাদ আলী বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন ঃ 'সেরিংগাপটম থেকে রওয়ানা হবার সময় এ কথা আমার কল্পনায়ও আসেনি যে, আমি তোমায় এই অবস্থায় দেখবো। সামিনা, বর্তমানে আমরা এমন এক সময় অতিক্রম করে চলেছি, যখন ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তথাপি এই আশা নিয়ে এখান থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি যে, আবার যখন ফিরে আসবো, তখন এখানকার অবস্থা বদলে যাবে, আর তোমার মুখে আমি আর একবার দেখবো সেই হাসি, যা কয়েক বছর আগে দেখেছিলাম।'

সামিনা বললেন ঃ 'আমার ধারণা ছিলো, আপনি আরো কিছুদিন এখানে থাকবেন।'

ঃ 'হায়! মহীশূরের অবস্থা যদি এমন হত যে, আমি বাকী জীবন নিশ্চিন্তি এখানে কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু যে কর্তব্যের অনুভূতি তোমায় এখানে থাকতে বাধ্য করেছে, তাই আমায় সেরিংগাটপমে ডেকে নিচ্ছে। তুমি এক গোষ্ঠীর সরদারের বেটি, আর আমি মহীশূরের শাসকের সিপাহী। এক ক্ষুদ্র ভূ-খন্ডের সাথে তোমার মুহাব্বতের কারণ, এর উপর তোমার বাপ ও ভাইয়ের বুকের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে এবং মহীশূর সালতানাতের সাথে আমারও মুহাব্বত রয়েছে, কারণ তার পতাকার হেফাযতের জন্য জান দিয়েছেন আমার বাপ ও দু'ভাই। আমরা দু'জনই অসহায় ও নিরুপায়। কিন্তু অবস্থা অনুকূল হলে আমি অবশ্যি আসবো; আর যদি

আমি এখানে না আসতে পারি, তা'হলে মনে করো না যে, আমি তোমায় ভুলে গেছি। আমি আগুন ও রক্তের মাঝে দাঁড়িয়েও আকবর খানের বেটি ও শাহ্বাযের বোনের জন্য দোআ করতে থাকবো।'

সামিনা কিছু বলতে চান, কিন্তু তার যবান নির্বাক হয়ে গেলো। তিনি মুরাদ আলীর দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এক মুহূর্তে দুনিয়ার সকল অনুভূতি এসে কেন্দ্রীভূত হল তার চোখে। তিনি একবার কেঁপে উঠে কম্পিত আওয়াযে বললেন ঃ 'আমি মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার পথ চেয়ে থাকবো।

মুরাদ আলী কামরার এক কোণ থেকে বন্দুক তুলে গলায় ঝুলাতে ঝুলাতে বললেন ঃ 'খোদা হাফিয।' কিন্তু সামিনা তাঁর দিকে আর একবার মুখ তুলে তাকাতে সাহস করলেন না। মুরাদ আলী দরযার দিকে এগিয়ে গেলেন, একবার থমকে দাঁড়ালেন, তারপর দ্রুতপদে বাইরে চলে গেলেন।

সামিনা কিছুক্ষণ নির্বাক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং তারপর ধীরে পা ফেলে কামরার বাইরে গেলেন। আঙিনা পার হতে হতে তার দু'চোখে আচ্ছন্ন করলো অশ্রুর পর্দা। নিজের কামরায় ঢুকে ফোঁপাতে ফোঁপাতে লুটিয়ে পড়লেন শয্যার উপর।

'সামিনা! সামিনা!!' ঃ কামরার অপর কোণ থেকে এলো বিলকিসের আওয়ায।

অন্তহীন চেষ্টা সত্ত্বেও সামিনা তার কান্না সংযত করে রাখতে পারলেন না। বিলকিস নিয শয্যা ছেড়ে উঠে তার কাছে গিয়ে বললেন ঃ 'সামিনা, কি হল? তুমি কাঁদছো?'

ভারাক্রান্ত আওয়াযে সামিনা বললেন ঃ 'আম্মাজান, উনি চলে গেছেন।' বিলকিস সামিনার মাথাটি কোলে টেনে নিয়ে বসে তার চুলের মধ্যে হাত চালাতে চালাতে বললেন ঃ 'ও আবার আসবে, বেটি! অবশ্যি আসবে।'

সামিনা বললেন ঃ 'আম্মজান!'

ঃ 'হ্যাঁ, বেটি!'

ঃ 'আম্মাজান, আপনি ভুল বলেছেন। উনি রাগ করেন নি আমার উপর।'

ঃ 'না বেটি, আমি বলেছিলাম, তোমার কথা হয়তো পেরেশান করেছে ওঁকে।'



আড়াই মাস পর মুরাদ আলী ও গাযী শাহী মহলের এক প্রশস্ত কামরায় আরো কয়েকজন সাক্ষাতপ্রার্থীর সাথে উপবিষ্ট। এক অফিসার কামরায় প্রবেশ করে গাযী খানকে সালাম করে বললেন ঃ 'জনাব, তশরিফ নিয়ে আসুন।'

গাযী খান কুরসী থেকে উঠে মুরাদ আলীকে বললেন ঃ 'তুমি থাকো এখানে। দরকার হলে তোমায় ডাকা হবে ভিতরে।'

গাযী খান ফউজী অফিসারের সাথে কামরার বাইরে গেলেন এবং মুরাদ আলী পেরেশান ও উদ্বিগ্ন হয়ে বসে থাকলেন। প্রায় দশ মিনিট পর অফিসারটি আবার কামরার মধ্যে এসে মুরাদ আলীকে বললেন ঃ 'আসুন।'

মুরাদ আলী নিঃশব্দে তাঁর সাথে চললেন। কিছুক্ষণ পর তারা গিয়ে পৌঁছলেন। মুরাদ আলীর সাথে অফিসারটি এক কামরার সামনে থেকে বললেন ঃ

'আপনি ভিতরে যান।'

মুরাদ আলী আশা করেন নি যে, গাযী খানের সাথে তাঁকেও সুলতান টিপুর খেদমতে হাযির হতে হবে। তাঁর উদ্বেগ এতক্ষণে ভীতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তিনি দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে কামরায় প্রবেশ করলেন। মহীশূরের শাসক তাঁর মসনদে ও গাযী খান তাঁর সামনে উপবিষ্ট। মুরাদ আলী সালাম করে আদবের সাথে দাঁড়ালেন।

সুলতান বিলম্ব না করে প্রশ্ন করলেন ঃ 'তুমি ঢুন্ডিয়া দাগকে কোথায় দেখলে?'

ঃ 'আলীজাহ্! আদুনীর এক জংগলে তাঁর সাথে আমার দেখা।'

ঃ 'তুমি সেখানে গেলে কি করে।'

ঃ 'আলীজাহ্! সেই এলাকার এক খান্দানের সাথে আমাদের দীর্ঘকাল ধরে যোগাযোগ রয়েছে। আমি তাঁদের কাছে গিয়েছিলাম।'

সুলতান বললেন ঃ ঢুন্ডিয়া দাগ একটি উদ্ধত স্বভাব লোক। গাযী বাবাকে তার সুপারিশের জন্য আমার কাছে নিয়ে আসা তোমার উচিত হয়নি।'

মুরাদ আলী দমে গেলেন। তথাপি তিনি সাহস করে বললেন ঃ 'আলীজাহ্! তিনি এক ভালো সিপাহী এবং অতীতের ত্রুটির জন্য তিনি দুঃখিত।'

ঃ 'ঢুন্ডিয়া দাগ এমন লোক নয়, যে নিজের ত্রুটির জন্য লজ্জিত হয়।'

ঃ 'আলীজাহ্! মহীশূর ছাড়া তাঁর আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই।'

ঃ 'বসো।' সুলতান হাতের ইশারা করে বললেন।

মুরাদ আলী গাযী খানের পাশে এক কুরসিতে বসলেন।

সুলতান কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। অবশেষে বললেন ঃ 'আবেগ দ্বারা চালিত লোকদের আমি পসন্দ করি না, কিন্তু তাঁর খেদমত আমি স্বীকার করি। সে এখন কোথায়?'

ঃ 'আলীজাহ্! তিনি আধুনির দিকে আমাদের সীমান্তে আপনার হুকুমের ইন্তেযার করছেন।'

সুলতান, বললেন ঃ 'তুমি আমার তরফ থেকে তাকে খবর পাঠাও যে, সে সেরিংগাপটমে 'আসতে পারে, কিন্তু এ হবে তার জন্য শেষ মওকা। আবার কোনো ভুল করলে তাঁকে এক সাধারণ সিপাহীর প্রাপ্য সাজা দেওয়া হবে। আমরা মীর নিযাম আলী, ইংরেজ ও মারাঠার সাথে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সন্ধিশর্ত মেনে চলতে চাই।

মুরাদ আলীর মুখ আনন্দে প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন ঃ 'আলীজাহ্! ঢুন্ডিয়া দাগের দু'জন লোক আমি সাথে নিয়ে এসেছি। হুকুম হলে আজই আমি তাদেরকে এই খবর নিয়ে পাঠাতে পারি।"

ঃ 'বহুত আচ্ছা। কিন্তু মনে রেখো, ঢুন্ডিয়া দাগ আবার কোনো অন্যায় করলে গাযী বাবার আর কোনো সুপারিশ নিয়ে আসবেন না আমার কাছে।'

ঃ 'আলীজাহ্! তিনি তাঁর কার্যকলাপের জন্য অনুতপ্ত এবং আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে তাঁর দিক থেকে কোনো অন্যায় হবে না।'

মুরাদ আলী ও গাযী খান উঠে আদবের সাথে সালাম করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মুরাদ আলী বললেন ঃ 'আমি আপনার বহুত শোকর গুযারী করি।'

গাযী খান বেপরোয়া হয়ে জওয়াব দিলেন ঃ 'বেটা, তোমার শোকর গুযারীর প্রয়োজন নেই। তোমার জন্য আমি কিছু করিনি। কেবল আমার ফউজের জন্য এক বাহাদুর সিপাহীর সুপারিশ করেছি। ঢুন্ডিয়া দাগকে আমার তরফ থেকেও পয়গাম পাঠাবে যে, আমার বাহিনীতে একজন অভিজ্ঞ অফিসারের জায়গা খালি রয়েছে।'

ছয় সপ্তাহ পর সেরিংগাপটমের গলি ও বাজারে ঢুন্ডিয়া দাগের ফিরে আসার খরব রটলো এবং তাঁর দু'শো ফউজকে আবার সুলতানের ফউজে ভর্তি করা হল। কয়েকদিন পর শোনা গেলো, ঢুন্ডিয়া দাগ ও তার কয়েকজন সাথী ইসলাম কবুল করেছে এবং তার নাম হয়েছে মালিক জাহান খান।

চব্বিশ

যুদ্ধের পর সুলতানের সবটুকু মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হল সালতানাতের সংগঠন, সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দিকে। কিন্তু মীর নিযাম আলী কর্ণুল বিরোধ খুচিয়ে তুলে এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন। গোড়ার দিকে মীর নিযাম আলীর আশা ছিলো, কর্নুলের উপর তাঁর দাবী, চরিতার্থ করার ব্যাপারে তিনি ইংরেজ ও মারাঠার সাহায্য পাবেন, কিন্তু মারাঠা নিযামের খাতিরে সুলতানের বিরাগভাজন হতে রাযী হল না এবং স্যার জন শোর শুধু নিযামের লাভের জন্য সুলতানের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করা সমীচীন মনে করলেন না। তথাপি মীর নিযাম আলীর বিশ্বাস ছিলো, তিনি শক্তি প্রয়োগে কর্ণুল দখল করে নিলে নয়া যুদ্ধ-বিগ্রহের আশংকায় সুলতান টিপু মাথা তুলতে সাহস করবেন না এবং এই ব্যাপার নিয়ে যুদ্ধ বেধে গেলে ইংরেজ ও মারাঠা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে সমর্থন করতে বাধ্য হবে।

ইসায়ী ১৭৯৫ সালের গোড়ার দিকে সুলতানের উপর চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে মীর নিযাম আলীর লশ্‌করের গতিবিধি শুরু হল এবং সুলতানের পেরেশান প্রজারা আর একবার মহীশূরের আকাশে দেখতে পেলো যুদ্ধের ঘনঘটা। কিন্তু একদিন মীর

নিযাম আলী বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে খবর শুনলেন যে, পুণা থেকে মারঠাদের পংগপালের মতো অগুণ্‌তি সেনাবাহিনীর অগ্রগতি শুরু হয়েছে এবং এবার তাদের গতি সেরিংগাপটমে দিকে নয়, হায়দরাবাদের দিকে। আবার কয়েকদিন পর তিনি খবর পেলেন যে, এই হিংস্র বর্বরতার সয়লাব দাক্ষিণাত্যের সীমান্ত অতিক্রম করেছে। মীর নিযাম আলীকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ময়দানে নামতে হল। মারাঠা তাঁকে শোচনীয়রূপে পরাজিত করলো এবং সন্ধির জন্য অত্যন্ত অপমানজনক শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করলো। তারা মুশীরুল-মুলককে যামানত হিসাবে তাদের সাথে নিয়ে গেলো। মীর আলম হলেন উযিরে আযম হিসাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত।

যুদ্ধ সমাপ্তির এক সপ্তাহ পর মীর আলম ও ইমতিয়াযদৌলা নিযামের মসনদের সামনে বসেছিলেন। মীর নিযাম আলী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন অবস্থায় মীর আলমকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'তুমি বলেছিলে আমরা কর্ণুল যবরদস্তি দখল করে নিলে আমাদের দেখাদেখি মারাঠা ও ইংরেজ ফউজ মহীশূরের আরো কয়েকটি এলাকা দাবী করবে। তারপর যখন মারাঠাদের গতিবিধির খবর এলো, তখন তুমি আমায় খোশখবর শোনালে যে, মহীশূরের কয়েকটি এলাকা দখল করতে তারা আমাদেরকে ছাড়িয়ে আগে যেতে চাচ্ছে। তারপর যখন জানা গেলো যে, তাদের গতি আমাদেরই দিকে, তখনো তুমি পুরো আস্থার সাথে বলেছিলে যে, আমাদের উপর তাদের কোনো বাড়াবাড়ি ইংরেজ বরদাশত করবে না; স্যার জন শোর খুব ভালো মানুষ এবং মারাঠা হামলার খবর পেয়েই তিনি আমাদের সাহায্যের জন্য ফউজ পাঠাবেন। এখন এক হফতা ধরে তুমি আমায় আশা দিয়ে যাচ্ছো যে, ইংরেজ মারাঠাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি করতে সম্মত হবে। তুমি কেনিয়াদের সাথে আলোচনা করছিলে। তোমাদের সে আলোচনার ফল কবে প্রকাশ পাবে, তাই আমি জানতে চাই।'

মীর আলম বললেন ঃ 'আলীজাহ্! স্যার জন কেনিয়াদে এক্ষুণি হুযুরের খেদমতে হাযির হবেন।'

ইমতিয়াযুদ্দৌলা বললেন ঃ 'আলীজাহ্! কেনিয়াদের উপস্থিতিতে আমাদের পরাজয় বদল হোতে পারে না। খুব বেশী হলে বলবেন যে, এই ঘটনার জন্য স্যার জন শোর খুবই দুঃখিত এবং আমি তাঁর মুখ থেকে এ ধরনের কথা বহুবার শুনেছি।'

মীর আলম ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ইমতিয়াযুদ্দৌলার দিকে তাকালেন, এবং মীর নিযাম আলীকে পুনরায় বললেন ঃ 'আলীজাহ্, দক্ষিণাত্যের উপর মারাঠারা সুলতান টিপুর ইশারায় হামলা করেছে। ইংরেজ মারাঠাদের সংকল্প সম্পর্কে অবহিত ছিলো না, নইলে তারা অবশ্যি হস্তক্ষেপ করতো। এ যুদ্ধে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু তাতে এতটা ফায়দা অবশ্যি হবে যে, ইংরেজ কর্ণুলের উপর আমাদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হবে। আমি কেনিয়াদেরকে এ কথা মানিয়ে নিয়েছি যে, সুলতান টিপু গোপনে গোপনে মারাঠাদের মিত্র বনে গেছেন।'

ইমতিয়াযুদ্দৌলা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন ঃ 'আমার বিশ্বাস, মহীশূরের বিরুদ্ধে ইংরেজের নতুন যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে গেলে তারা মীর আলমের যে কোনো কথা

মানতে রাযী হবে, কিন্তু যুদ্ধ জয়ের পরে তারা যে মহীশূরের বিজিত এলাকাগুলোর উপর অধিকার কায়েম করবার চেষ্টা করবে না, তার যামানত কোথায়? আলীজাহ্, আমি আবার আরয করছি, দক্ষিণ হিন্দুস্তানে সুলতান টিপু ব্যতিত দাক্ষিণাত্যের আর কোনো বন্ধু নেই। আজ মারাঠারাও বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করছে যে, গত যুদ্ধে তারা সুলতান টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজের সমর্থন করে ভুল করেছে। কিন্তু আমরা এখনো শত্রু-মিত্রের প্রভেদ করতে পারিনি।'

এক অফিসার কামরায় প্রবেশ করে কুর্ণিশ করে বললেন ঃ 'আলীজাহ্, স্যার জন কেনিয়াদে হুযুরের খেদমতে হাযির হবার এজাযত চাচ্ছেন।'

ঃ 'তাঁকে বলো যে, আমরা এক ঘন্টা তাঁর ইন্তেযার করছি।'

অফিসার বিনীতভাবে সালাম করে বেরিয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পর স্যার জন কেনিয়াদে কামরায় ঢুকে নিযামের সাথে মোসাফাহা করার পর মীর আলমের সামনে এক কুরসির উপর বসে বললেন ঃ 'ইওর হাইনেস, আমি এইমাত্র খবর পেলাম যে, মাদ্রাজের হুকুমত পেশওয়া ও নানা ফার্ণাবিসকে সতর্ক করে চিঠি পাঠিয়েছেন।'

ইমতিয়াযুদ্দৌলা বললেন ঃ 'জনাব, আমরা আপনার শোকরগুযারী করি, কিন্তু সতর্ক করে চিঠি দিয়ে কি হবে?'

ঃ 'আমার বিশ্বাস, মারাঠা পুনরায় এরূপ সাহস করবে না।'

ঃ 'আপনাদের হুঁশিয়ারি চিঠির প্রভাব যদি এতই হয়ে থাকে, তা' হলে যুদ্ধের আগেই এ তকলিফ করা উচিত ছিলো।'

কেনিয়াদে ইমতিয়াযুদ্দৌলার দিকে মনোযোগ না দিয়ে নিযামকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'ইওর হাইনেস, আমি আপনাকে আর একটি খোশখবর শোনাচ্ছি। পুণা থেকে আমি খবর পেয়েছি যে, মারাঠা সরদারদের মধ্যে বিরোধ বেধে গেছে।'

ইমতিয়াযুদ্দৌলা আবার বললেন ঃ 'মারাঠা সরদারদের বিরোধ আমাদের ইয্যত ও আযাদীর যামানত হ্যতে পারে না। আমরা শুধু জানতে চাই, ভবিষ্যতে তারা দাক্ষিণাত্যের উপর হামলা করলে আপনাদের কর্মপন্থা কি হবে?'

কেনিয়াদে জওয়াব দিলেন ঃ 'আমার বিশ্বাস মারাঠা আর এই ধরনের পদক্ষেপ করবে না।'

মীর নিযাম আলী বললেন ঃ 'মারাঠাদের ভবিষ্যতে এই ধরনের পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখার শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে আমাদের মধ্যে এক প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করা এবং যদি আপনারা পসন্দ করেন, তাহলে সুলতান টিপুকেও এই চুক্তিতে শরীক করা যেতে পারে। মারাঠা আমাদেরকে সুলতানের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে বাধ্য করেছে।'

কেনিয়াদে বললেন ঃ 'সুলতান টিপু আপনাদের সাথে একটি মাত্র শর্তে প্রতিরক্ষা চুক্তি করতে রাযী হবেন তা হচ্ছে. আপনারা বিজিত এলাকাগুলো তাঁকে প্রত্যার্পন করবেন। আমার মনে হয়, কোনো অবস্থায়ই এ শর্ত আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। '

মীর নিযাম আলী চিন্তায় পড়লেন। ইমতিয়াযদ্দৌলা বললেন ঃ 'সুলতান টিপু যদি তাঁর হারানো এলাকা দাবী না করে আমাদের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি করতে সম্মত হন, তা'হলে আপনাদের কর্মপন্থা কি হবে?।'

কেনিয়াদে জওয়াব দিলেন ঃ 'তারপর আমাদের চিন্তা করতে হবে, এই চুক্তির বিরুদ্ধে মারাঠার অবলম্বনীয় ব্যবস্থা কি হবে।'

কিছুক্ষণ কামরার মধ্যে স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো এবং নিযাম অন্তহীন অসহায়তা ও উদ্বেগের দৃষ্টিতে কেনিয়াদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে কেনিয়াদে বললেন ঃ 'ইওর হাইনেস, আমাদের উপর আপনার বিশ্বাস থাকা উচিত। আমাদের বিশ্বাস, মারাঠার উপর আমাদের হুঁশিয়ারী নিস্ফল হবে না। আর তারা যদি সোজা পথে না আসে, তা'হলে আমরা পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে আপনাদের সমর্থন করবো।'

মীর নিযাম আলী বললেন ঃ 'কিন্তু আমাদের সাথে আপনাদের প্রতিরক্ষা চুক্তি করতে আপত্তি কি?'

ঃ 'আমরা শুধু ভয় করি, এই চুক্তির ফলে মারাঠারা উত্তেজিত হবে এবং টিপুর সাথে মিলে যাবে।'

নিযাম বললেন ঃ 'কিন্তু সুলতান টিপু আমাদের সাথে চুক্তি করতে সম্মত হলেও কি আপনাদের এ আশংকা দূর হবে না।'

ঃ 'না।'

ঃ 'তা কেন?'

ঃ 'তার কারণ, মারাঠারা আমাদের নিয়ত সম্পর্কে সন্দেহ করবে। আমরা এতটুকু দায়িত্ব গ্রহণ করতে তৈরী যে, মারাঠা ভবিষ্যতে কখনো আপনাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। কিন্তু কোম্পানী সুলতান টিপুর সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি করে মারাঠাদের প্রতিপক্ষ হতে রাযী নয়।'

স্যার জন্য কেনিয়াদে প্রায় এক ঘন্টা নিযামের সাথে বিতর্ক করে চলে গেলেন এবং মীর নিযাম আলী ইমতিয়াযদ্দৌলাকে বললেন ঃ 'ইমতিয়ায, তুমি আজই সুলতান টিপুর কাছে পয়গাম পাঠাও যে, আমরা তার সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি আলোচনা করতে প্রস্তুত।'

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সুলতান টিপুর দূত হায়দরাবাদ পৌঁছে গেলেন এবং মীর নিযাম আলীর সাথে তার দীর্ঘ আলোচনা শুরু হয়ে গেলো। সুলতান টিপু মীর নিযাম আলীর অতীত ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলে যেতে সম্মত হলেন। কিন্তু মীর নিযাম

আলী সুলতান টিপুর প্রতি তার আকর্ষণ প্রকাশ করে ইংরেজের বাজারে তার দাম বাড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। তিনি একদিকে সুলতানের দূতদের সাথে মোলাকাত করছিলেন, অপরদিকে তার চর স্যার জন কেনিয়াদেকে প্রভাবিত করার জন্য গুজব ছড়াচ্ছিলো যে, মহীশূরের শাসক মীর নিযাম আলীকে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছেন এবং এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে যে, দাক্ষিণাত্য ও মহীশূরের হুকুমত মারাঠা ব্যতীত ইংরেজেরও বিরুদ্ধে কোনোরূপ প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করবেন। কিন্তু মীর নিযাম আলীর মুনাফেকী কার্যকলাপ বেশীদিন সুলতান টিপুকে ধোকা দিতে পারলো না এবং তিনি তার দূতদের ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।



গত যুদ্ধের ফলে অর্ধেক সালতানাতের আয় থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও মহীশূরের মহিমান্বিত সংগঠনকর্তা কয়েক বছরের মধ্যে আর একবার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও প্রতিবেশী শক্তিসমূহের মনোযোগ নিজের দিকে আকৃষ্ট করলেন। সেরিংগাপটম, চাতলদুর্গ, বাংগালোর, বিডনোর ও মহীশূরের অন্যান্য শহরে অগুণ্তি কারখানা কায়েম হল। এসব কারখানার উৎপন্ন পণ্য প্রাচ্যের বাজারে ইউরোপীয় পণ্যের চাইতে আরো বেশী করে সমাদৃত হল।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ ও ফরাসীদের মোকাবিলার জন্য সুলতান বাইরের দেশসমূহে বাণিজ্য কায়েম করতে লেগে গেলেন। মহীশূরের ঘর সমূহে ফরাসী, তুর্কী, আরব, ইরান, চীন ও আর্মেনিয়ার কিছুসংখ্যাক বণিক আবাদ হয়েছিলো। নিজস্ব প্রজাদের বাণিজ্যের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য সুলতান হুকুমতের তত্ত্বাবধানে একটি বাণিজ্য সংস্থা কায়েম করলেন এবং প্রত্যেকেই তাতে অংশীদার হবার সুযোগ পেলো। *

কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে খোদাদাদ সালতানাত হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলো। অন্যান্য রাজ্যে লক্ষ লক্ষ কিষাণ মাত্র কতিপয় জমিদার বা জায়গীরদারের আয়েশ-আরামের সংস্থান করতে বিব্রত থাকতো। কিন্তু মহীশূরের নতুন নতুন কৃষি পরিকল্পনার ফলে যেসব ভূমি আবাদ হত, তাতে চাষীদের অধিকার সর্বোপরি স্বীকৃতি লাভ করতো এবং বড়ো বড়ো জমিদারদের ফালতু ভূমি চাষীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হত।

সীমাবদ্ধ সংগতির দরুন বড়ো রকমের ফউজ পোষণের সামর্থ্য সুলতানের ছিলো না। তথাপি মহীশূরের তৃতীয় যুদ্ধের পর সুলতান তাঁর রাজ্যের প্রতিরক্ষা ও

---

* এই সংস্থা কায়েম করার লক্ষ্য ছিলো ধনিক শ্রেণীর পরিবর্তে সাধারণ মানুষের কল্যান সাধন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে লোক এই সংস্থায় পাঁচ হাজারের বেশী টাকা পূঁজি হিসাবে নিয়োগ করতো সে বছরে শতকরা বারো টাকা হারে মুনাফা পেতো। পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত পূঁজি, নিয়োগ করলে মুনাফা পাওয়া যেতো শতকরা পঁচিশ টাকা হারে। কিন্তু পাঁচ থেকে পাঁচশ পর্যন্ত পুঁজি নিয়োগকারী অংশীদারকে দেওয়া হত শতকরা পঁন্চিশ টাকা মুনাফা। অনুন্নত তব্কাকে মনে করা হত সরকারী সাহায্যের অধিকতর যোগ্য। ফলে মহীশূরে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তব্কার ব্যবধান হ্রাস পেয়ে এক মধ্যবিত্ত তব্কা জন্ম লাভ করছিলো।

বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রয়োজন কঠোরভাবে নিজস্ব নৌবহর মযবুত করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন। সুতরাং মাংগালোর ও ওয়াজেদাবাদ উপকূলে জংগী ও তেজারতী জাহাজ নির্মাণের হুকুম দেওয়া হল এবং অল্পকালের মধ্যে মহীশূরের নৌ-বহরে বাইশটি জংগী ও বিশটি তেজারতি জাহাজ সংযোজন করা হল। সুলতান নিজে এসব জাহাজের মডেল তৈরী করে দিয়েছিলেন।

মহীশূরের দুশমনরা সুলতানের অর্ধেক সালতানাত ছিনিয়ে নেবার পর মনে করেছিলো যে, এরপর তিনি পুনরায় মাথা তুলতে পারবেন না এবং তার জনগণের ভুমিসংক্রান্ত ও আর্থিক সমস্যা তাতে হামেশা পেরেশান করে রাখবে। কিন্তু মহীশূরের পুনরায় উদ্যম-উৎসাহের নতুন দুনিয়া আবাদ হতে দেখে তারা হয়রান হল। মহীশূরবাসীর যে ক্ষতকে তারা চিরস্থায়ী ও আরোগ্যের অতীত মনে করতো, তা অপ্রত্যাশিতভাবে মিলিয়ে গেলো। যে কাফেলাকে তারা ভয়াবহ অন্ধকারের কোলে ঠেলে দিয়েছিলো, তা আবার এক অবিশ্বাস্য সংকল্প ও সহিষ্ণুতার সাথে এগিয়ে চলেছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পানে। যে বস্তিকে তারা বিরাণ করে দিয়েছিলো, তা আবার আবাদ হয়ে চলেছে। মহীশূরের রাখাল, কিষাণ, মজদুর, সিপাহী, ব্যবসায়ী ও শিল্পী আবার বলে উঠেছে ঃ 'মহীশূর আমার।'

ইংরেজরা অনুভব করছিলো যে, হিন্দুস্তানে তাদের পথের শেষ বাধার প্রাচীর আবার মযবুত হয়ে উঠেছে। এখন দিল্লী পৌঁছতে হলে এ কেল্লা মিসমার করে দেবার প্রয়োজন অনিবার্য। সুলতান টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজের নুতন যুদ্ধ-সংকল্পে কিছুসংখ্যক বাইরের যুদ্ধবাজও শামিল ছিলো।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টের উত্থানের সাথে সাথে ফ্রান্সের প্রাণহীন দেহে জেগে উঠলো নুতন প্রাণচাঞ্চল্য। এই তরুণ সেনাপতির নেতৃত্বে ফ্রান্সের সেনাবাহিনী অস্ট্রিয়ার শাহানশাহ্‌কে পরাজিত করার পর ইতালীর উপর তাদের বিজয় পতাকা উড্‌ডীন করেছে। এক দুর্বল শক্তিহীন সাম্রাজ্যের সমাপ্তির পর ফ্রান্সে আবির্ভাব হল এক দৃঢ়সংকল্প নেতার। একই হামলায় নেপোলিয়ান ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য বিপর্যস্ত করে দিলেন এবং ইংরেজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তাদের আধিপত্য বিস্তারের পথে এক নতুন বিপদ সম্ভাবনা দেখতে পেলো। এ কথা উপলব্ধি করতে তাদের অসুবিধা হল না যে, ইউরোপে নেপোলিয়নের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে হিন্দুস্তানী অধিকৃত এলাকা হেফাজত করতে তাদের মুশকিল হবে এবং সুলতান টিপু তার অবশিষ্ট শক্তি নিয়েও তাদের জন্য এক ভয়াবহ বিপদের কারণ হয়ে উঠবেন। সুতরাং স্যার জন শোরের অবসর গ্রহণের পর তারা হিন্দুস্তানে তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য বলিষ্ঠতর করার জন্য একজন মযবুত ও হুঁশিয়ার লোকের প্রয়োজন অনুভব করলো। বৃটিশ জাতির মনোনীত সাম্রাজ্যবাদী কূট-কৌশলের পূর্ণ অধিকারী এই মযবুত ও হুঁশিয়ার লোকটি ছিলেন রিচার্ড ওয়েলেসলী (আর্ল অব মনিংটন)।



ওয়েলসলী গবর্ণর জেনারেলের কার্যভার গ্রহণের পর অবিলম্বে মহীশূরের উপর হামলা করার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। তাই তিনি কোম্পানীর সেনাবাহিনীকে করমন্ডল ও মালাবার উপকূলে সমবেত হবার হুকুম দিলেন। মহীশূরের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের জন্য ওয়েলেসলীর শুধু একটি বাহানার প্রয়োজন ছিলো এবং তিনি সুলতান টিপুর বিরুদ্ধে দোষারোপ করলেন যে, তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে ফরাসীদের সাথে চক্রান্ত করছেন এবং তাঁর দূত মরিশাসের গভর্ণরের মাধ্যমে ফরাসী হুকুমতের সাথে এক প্রতিরক্ষা ও সামরিক চুক্তি সম্পাদন করেছেন। আসল ব্যাপার ছিলো শুধু এই যে, নিযাম ও মারাঠা তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ফরাসী সিপাহী ও অফিসারদের ভর্তি করেছিলো। সুলতান টিপুও কয়েকজন অভিজ্ঞ ইউরোপীয় অফিসারের প্রয়োজন অনুভব করলেন। মহীশূরের দু'জন ব্যবসায়ী ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্যে মরিশাস যাচ্ছিলেন। সুলতান তাঁদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, মরিশাসে কোনো যোগ্য লোক পাওয়া গেলে যেনো তাঁরা তাদেরকে সাথে নিয়ে আসেন। ব্যবসায়ীরা মরিশাসে পৌঁছে তথাকার ফরাসী গভর্ণরের সাথে মোলাকাত করলেন। তাঁরা প্রায় একশ' বেরোযগারে লোক সাথে নিয়ে আসার এজাযত পেলেন। কিন্তু এই একশ' লোকের মধ্যে মাত্র কয়েকজন কম বেশী করে সামরিক অভিজ্ঞতা ছিলো এবং বেশীর ভাগ ছিলো এমন কয়েদী, যাদেরকে মরিশাসের হুকুমত জেল থেকে বের করে সেরিংগাটমের ব্যবসায়ীদের হাতে ন্যস্ত করে জাহাজে তুলে দিয়েছিলো, কিন্তু কোম্পানী এই অজুহাত দিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় বইয়ে দিলো। কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই থেকে শরু করে লন্ডন পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচারকারীরা গুজব প্রচার করলো যে, ইংরেজের বিরুদ্ধে মহীশূর ও ফ্রান্সের মধ্যে চুক্তি হয়ে গেছে। মরিশাসের ফরাসী ফউজ শীগগিরই হিন্দুস্তানের উপকূলে নেমে যাবে এবং সুলতান টিপু তাঁদের পৌঁছামাত্রই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।

মরিশাসের ঘটনা সম্পর্কে ওয়েলেসলী ব্যতীত অন্যান্য ইংরেজের পরস্পর বিরোধী বর্ণনা তাদের ভিত্তিহীন দোষারোপকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, সুলতান টিপু প্রকৃতপক্ষে মরিশাসের গভর্ণরের মাধ্যমে ফরাসী সরকারের সাথে কোনো চুক্তি করেছিলেন, তা'হলেও কোনো বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন লোক সুলতানের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপণে ইংরেজের অধিকার স্বীকার করবেন না। অতীতের ঘটনাবলী বিবেচনা করলে সুলতানের নিকৃষ্টতম দুশ্‌মনও দোষারোপ করতে পারে না যে, তিনি সন্ধিশর্ত পালনে কোনো ত্রুটি করেছেন এবং ইংরেজের শ্রেষ্ঠ সমর্থকও তাদের উপর্যুপরী অসদাচরণের ঘটনাবলী ঢাকা দিয়ে রাখতে পারেন না।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সেরিংগাপটম চুক্তির রহস্যময় তাৎপর্য থেকে প্রমাণ করে দিয়েছিলো যে, ইংরেজ যুদ্ধ বা শান্তির কোনো ব্যাপারে কোনো বিশেষ নীতির অনুগত নয়। তাদের ক্রমাগত চুক্তিভংগের পর এটা শুধু সুলতানের হক নয়; বরং

অবশ্য কর্তব্য ছিলো যে, তিনি তাদের হিসাব চুকিয়ে দেবার কোনো মওকা নষ্ট করবেন না। সুলতান যদি ফরাসীদের উপর নির্ভর করতে পারতেন এবং তাদের সাহায্যে ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়াতে পারতেন এবং তা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় বসে থাকতেন, তা'হলে আমরা তাঁর কার্যকলাপকে মনে করতাম তাঁর দূরদৃষ্টি ও স্বাধীনতাকামী মনোভাবের অবমাননা। কিন্তু মহীশূরের এই বিরাট পুরুষ একই গর্তে বারবার পতিত হবার মতো লোক ছিলেন না। ফরাসীরা মাংগালোরে যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁকে ধোকা দিয়েছিলো এবং তারপর তিনি ইংরেজ, মারাঠা ও মীর নিযাম আলীর সাথে সকল যুদ্ধ নিঃসংগ অবস্থায় চালিয়ে গিয়েছিলেন। ফরাসী সরকারের চুক্তিভংগের বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাবের পরিচয় এই ঘটনা থেকে পাওয়া যায় যে, যুদ্ধের প্রায় এক বছর পর যখন পন্ডিচেরীর ফরাসী গভর্ণর ইংরেজের দুশ্‌মনীর দরুন বাধ্য হয়ে সুলতানের সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন, তখন তিনি তার জওয়াব দিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং বাধ্য হয়ে ফরাসীদের পন্ডীচেরী খালি করে যেতে হয়েছিলো।

তারপর প্রশ্ন হলো, সেরিংগাপটমের ব্যবসায়ীরা মরিশাস থেকে সুলতানের ইশারায় কয়েকজন লোক সাথে এনেছিলো। ব্যাপারটি কতোটা কৌতুকজনক যে, মারাঠা ও নিযামের ফউজে অসংখ্য ফরাসী ইংরেজের পক্ষে কোনো বিপদের কারণ হল না, কিন্তু সুলতান মাত্র একশ লোককে ফউজে নিযুক্ত করায় তাদের জন্য কঠিন বিপদ-সম্ভাবনার কারণ হল! আর সেই একশ' জনের মধ্যেও মাত্র চল্লিশজন ছিলো ফরাসী, আর বাকী মরিশাসের স্থানীয় বাসিন্দা। সুলতানের ফউজে কোনো ফরাসী বা ইউরোপীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন না। কিন্তু মীর নিযাম আলীর ফউজের পনেরো হাজার সিপাহী ছিলো এক ফরাসী সেনানায়কের পরিচালনাধীন। সিন্ধিয়ার চল্লিশ হাজার ফউজের শিক্ষাদাতা ছিলো একজন ফরাসী।

ইংরেজ মরিশাসের ঘটনা অবলম্বন করে দু'টি কথা রটিয়েছিলো। প্রথমত, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মিসর ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ জয় করে স্থলপথে হিন্দুস্তানের দিকে অগ্রসর হবেন এবং সুলতান টিপু তাঁর সাথে মিলিত হবেন। দ্বিতীয়ত, মরিশাসের গভর্ণর জেনারেল সুলতান টিপুর সাথে ওয়াদা করেছেন যে, শীগ্‌গীরই ত্রিশ-চল্লিশ হাজার সিপাহী সুলতানের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করা হবে। মরিশাসে ফরাসীদের এত বড়ো ফউজ মওজুদ ছিলো, এ কথাটি ইংরেজের বর্ণনা দ্বারাই মিথ্যা প্রমানিত হয়েছে। সুলতান টিপুর মতো বহুদর্শী লোক মরিশাসের সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, এ কথা আমরা মানতে পারি না। অপর কৌতুককর ব্যাপার হচ্ছে, সুলতান টিপুর জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে যুদ্ধের ময়দানে এবং তাঁর সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না যে, তিনি মিসর ও মহীশূরের মধ্যে স্থলপথে সফরের সংকট সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি।

ইংরেজের এসব গুজব রটানোর কারণ ছিলো এই যে, তারা নিযাম, মারাঠা ও অন্যান্য হিন্দুস্তানী শাসককে এ দিয়ে অত্যধিক পেরেশান করে তুলতে পারবে এবং

তাদেরকে বুঝাতে পারবে যে, সুলতান টিপু ও নেপোলিয়ানের ঐক্যের দরুন হিন্দুস্তানের শাসকদের জন্য অতি বড়ো বিপদ আসন্ন হয়ে এসেছে।

সুলতান টিপু এসব ভিত্তিহীন দোষারোপ খন্ডন করলেন, কিন্তু ইংরেজ যুদ্ধের এত বড়ো সুযোগ হারাতে রাযী হল না। তারা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে অথবা ইউরোপে মোকাবিলা করবার আগে, হিন্দুস্তানে যে সব শক্তি তাদের জন্য বিপদ সম্ভাবনার কারণ হতে পারে, তাদের সাথে বোঝাপড়া করতে চাইলো।

তথাপি ওয়েলেসলী তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী অবিলম্বে যুদ্ধ শুরু করতে পারলেন না। মাদ্রাজের গভর্ণর তাঁকে খবর দিলেন যে, কোম্পানীর ফউজ ছয় মাসের আগে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারবেন না। তারপর যখন খবর পৌঁছলো যে, জেনারেল বোনাপার্টের সেনাবাহিনী মিসরে প্রবেশ করেছে এবং কিছুকাল হিন্দুস্তানের সকল মনোযোগ ভূমধ্যসাগরের দিকে নিবদ্ধ রাখতে হবে, তখন তারা সুলতানের বিরুদ্ধে দুশমনী কর্মপন্থা পরিবর্তনের আশু প্রয়োজন অনুভব করলো। এবার তারা মহীশূরের উপর হামলার পরিবর্তে সেরিংগাপটম চুক্তির বিরোধিতা করে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক অধিকৃত এলাকাগুলো সম্পর্কে সুলতানের সাথে আলোচনা করতে সম্মত হল। তুর্কী খলীফার তরফ থেকে সুলতান টিপুর খেদমতে পত্র পেশ করা হল যে, ফ্রান্স ইসলামের দুশমন, তাই কোনো মুসলমান শাসকের তার সাথে সংযোগ রাখা উচিত নয়। ইংরেজের বিরুদ্ধে সুলতানের কোনো অভিযোগ থাকলে খলীফা তার সালিসীর জন্য প্রস্তুত।



লর্ড ওয়েলেসলীর সামরিক কর্মনীতিতে পরিবর্তনের আর একটি কারণ এও ছিলো যে, আফগানিস্তানের ওয়ালী যামান শাহ্‌র লাহোরের দিকে অগ্রগতির খবরও তাঁর কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো। তিনি আশংকা করছিলেন যে, যামান শাহ্ দিল্লী পৌঁছে গেলে গোটা হিন্দুস্তানের মুসলমান ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে এবং সুলতান টিপু পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবার চেষ্টা করবেন। সুলতানের দূত যামান শাহ্‌র দরবারে অবস্থান করছিলেন এবং এই দুই মুসলমান শাসকের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ পত্রালাপ চলছিলো। লর্ড ওয়েলেসলী মিসরে নেপোলিয়ানের উপস্থিতিতে যতোটা পেরেশান ছিলেন, ততোধিক আতংকিত হয়েছিলেন লাহোরের দিকে যামান শাহ্‌র অগ্রগতিতে। এহেন পরিস্থিতিতে শান্তির জন্য প্রয়োজন ছিলো অনুকূল সময় পর্যন্ত সুলতান টিপুর বিরুদ্ধে তাদের সামরিক সংকল্পকে বন্ধুত্বের পুরু পর্দার আবরণে ঢেকে রাখার।

দিল্লীর দিক থেকে যামান শাহ্‌র মনোযোগ অপরদিকে নিবদ্ধ করার জন্য মাহ্‌দী আলী খান নামে তাদের এক হুঁশিয়ার চরকে কাজে লাগালো। মাহ্‌দী আলী খান ছিলো এক ইরানী খান্দানের লোক এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর তরফ থেকে তাকে বু'শহরে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়েছিলো। ওয়েলেসলীর নির্দেশে সে ইরানের

শাসকের দরবারে প্রতিপত্তি হাসিল করলো এবং শিয়া-সুন্নী বিরোধের সুযোগে তাকে এমন করে যামান শাহ্‌র বিরুদ্ধে প্ররোচিত করলো যে, তিনি একদিকে খোরাসানের উপর হামলা করলেন এবং অপর দিকে হিরাতের পদচ্যুত শাসনকর্তাকে ফউজী সাহায্য দিয়ে যামান শাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সম্মত করলেন। এই অবস্থায় যামান শাহ্‌কে দিল্লীর দিকে অগ্রগতির সংকল্প ত্যাগ করে ফিরে যেতে হল।

হিন্দুস্তানের যে মুসলমানরা গত চল্লিশ বছর ধরে পানিপথের ময়দানে আবার এক আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালীর ইন্তেযার করছিলো, মাহ্‌দী আলী খানের ষড়যন্ত্র একদিকে তাদের শেষ অবলম্বন ছিনিয়ে নিলো, অপরদিকে হায়দরাবাদ, পূণা ও অযোদ্যার মতো শাহে ইরানের দরবারেও ইংরেজের প্রভাব প্রতিপত্তির পথ খোলাসা করে দিলো। মাহ্‌দী আলী খান ইরানের শাহ্‌কে এরূপ আশ্বাসও দিলো যে, ইংরেজ যামান শাহ্‌র কাছ থেকে ইরানের হারানো এলাকা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে এবং ইরানের শাসক খোরাসান ও হিরাতের উপর তাদের চাপ অব্যাহত রাখলেন, যতোক্ষণ না ইংরেজ হিন্দুস্তানে তাদের ইরাদা পূর্ণ করতে পারে।

ভূমধ্যসাগরে নেপোলিয়ানের জংগী নৌবহরের ধ্বংস ও লাহোর থেকে যামান শাহ্‌র প্রত্যাবর্তনের পর লর্ড ওয়েলেসলীর আতংক দূর হল, যার জন্য তিনি মহীশূরের হামলার ইরাদা মুলতবী রেখেছিলেন। দিল্লীর দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পথের শেষ বাধার পাথর সরিয়ে ফেলার জন্য তিনি অধীর হয়ে উঠলেন এবং সুলতানের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটলো।

যামান শাহ্‌র প্রত্যাবর্তন হিন্দুস্তানের ইতিহাসের এক ভয়াবহ ঘটনা। ইসায়ী ১৭৬১ সালে যখন আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী পানিপথের যুদ্ধে অবতরণ করেন, মারাঠা তখন জাতীয় ঐক্যের দরুন এক বিশাল ফউজ নিয়ে এসেছিলো ময়দানে, কিন্তু এতদিনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। মারাঠা আভ্যন্তরীণ বিরোধে বহুধা-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে যামান শাহ্‌র মোকাবিলা করার মতো শক্তি নেই। এ কথা সত্য যে, দিল্লীর মযলুম ও অসহায় শাসক দ্বিতীয় শাহে আলম মহাওজী সিন্ধিয়ার পর এখন দৌলত রাও সিন্ধিয়ার হাতের ক্রীড়নক, কিন্তু দিলীর উপর মারাঠাদের আধিপত্যের কারণ তাদের অসাধারণ শক্তি নয়, বরং তার কারণ ছিলো এই যে, দিল্লীর নামেমাত্র শাহানাশাহ্‌ এতটা দুর্বল হয়ে গেছেন যে, নিজস্ব তাজের বোঝা বহন করাও তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিমের রাজপুত্র রাজ্যগুলিও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এহেন পরিস্থিতিতে ইংরেজ হয়ে উঠলো হিন্দুস্তানে আধিপত্যের সব চাইতে বড়ো দাবিদার। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় তাদের আধিপত্য কায়েম হয়ে গেছে। অযোধ্যার অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, সেখানে ইংরেজ রেসিডেন্ট শুজাউদ্দৌলার উত্তরাধিকারীদের চাইতে বেশী ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে। দক্ষিণে ত্রিবাংকুরের রাজা তাদের সামন্ত এবং আর্কটের শাসক এক নিস্প্রাণ দেহের মতো ইংরেজের সংগীণের সাহায্যে মসনদনশীন হয়েছেন। পুণা ও হায়দরাবাদের শাসকরা প্রকৃতপক্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানীর শাসন মেনে নিয়েছেন। এহেন পরিস্থিতিতে দিল্লীর তখ্‌ত ও তাজ দখল করার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীরতা খুবই স্বাভাবিক। ইংরেজ তাদের অগ্রগতির পথের বহু পাথর সরিয়ে ফেলেছে, কিন্তু যামান শাহ্‌র অগ্রগতি তাদের উদ্যম-উৎসাহ ঠাণ্ডা করে দিলো। তারা জানতো, যামান শাহ্‌র সাথে যুদ্ধ বাধলে সুলতান টিপু নিরপেক্ষ থাকবেন না। শুধু সুলতান টিপুই নন; বরং হিন্দুস্তানের বেশীর ভাগ শাসক, বিশেষ করে মারাঠা যামান শাহ্‌কে দুশ্‌মন মনে না করে বরং তাকে তাদের পরিত্রাতা মনে করে তারই পতাকাতলে সমবেত হবে, কারণ ইংরেজের সামরিক সংকল্প সম্পর্কে মারাঠাদের কোনো ভুল ধারণা ছিলো না।

মিসরের দিকে নেপোলিয়ানের অগ্রগতি ও পাঞ্জাবের দিকে যামান শাহ্‌র হামলার সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আলমবরদাররা তাদের ইতিহাসে এক নাযুকতম পরিস্থিতির মোকাবিলা করছিলো, কিন্তু এই দু'টি ভয়াবহ বিপদের সময় আসন্ন হওয়ামাত্রই হিন্দুস্তান আর একবার এই নেকড়েদের শিকার ভুমিতে পরিণত হলো। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পূর্ব বা পশ্চিমে কোনো নতুন বিপদে মোকাবিলা করবার আগে মহীশূরের উপর হামলা করার জন্য বেতাব হয়ে উঠলো।



একদিন অপরাহ্নে মহীশূরের দেওয়ান মীর সাদিক সুলতানের সাথে মোলাকাতের পর মহলের বাইরে বেরিয়ে এলে দেউড়ির সামনে মালিক জাহান খান তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে অনুনয়ের স্বরে বললেনঃ 'হুযুর দেওয়ান সাহেব, আমি কিছু আরয করতে চাই।'

ঃ 'কি ব্যাপার? মীর সাদিক বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'জনাব, ভোর থেকে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু এতক্ষণে সুলতানে মোয়ায্‌যমের কদমবুসির সুযোগ পাইনি। আপনি আমায় সাহায্য করুন। তার খেদমতে হাযির হওয়া আমার খুবই প্রয়োজন।'

ঃ 'সুলতান মোয়ায্‌যম আজকাল খুবই ব্যস্ত। আমি তোমার কোনো সাহায্য করতে পারবো না।'

ঃ 'জনাব, বড়োই জরুরী ব্যাপার। খোদার কসম, আমায় সাহায্য করুন।'

ঃ 'তুমি আমার সময় নষ্ট করছো।' বলে মীর সাদিক দেউড়ির বাইরে গেলেন, কিন্তু মালিক জাহান খান তার পথরোধ করে বললেনঃ 'দাঁড়ান, জনাব! আমি সুলতানে মোয়ায্‌যমকে জানাতে চাচ্ছি যে, মহীশূরের বিরুদ্ধে এক বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র চলছে।'

ঃ ষড়যন্ত্র?'ঃ মীর সাদিক চমকে উঠে বললেন।

ঃ 'হ্যাঁ, জনাব, আমার কাছে একটা চিঠি রয়েছে।

ঃ 'কার চিঠি?'

ঃ 'তাতে কারুর নাম নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ইংরেজের কোনো চর মহীশূরে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম লিখেছে এ চিঠি।'

মীর সাদিকের মুখ আচানক পাণ্ডুর হয়ে উঠলো, কিন্তু নিজকে সংযত করে বললেন ঃ 'এখানে কথা বলা ঠিক হবে না। তুমি এসো আমার সাথে।'

মালিক জাহান দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে চললেন তার সাথে। প্রায় দশ মিনিট পর তিনি মীর সাদিকের সাথে তার খুবসুরত বাড়ির একটি কামরায় প্রবেশ করলেন। মীর সাদিক একটি প্রশস্ত মেযের সামনে কুরসির উপর বসে বললেনঃ 'এবার বসে নিশ্চিন্ত মনে কথা বলো।'

মালিক জাহান খান তার সামনে বসে বললেনঃ 'জনাব, আপনি আমায় এখানে না এনে সুলতানের সামনে নিয়ে গেলে অতি বড়ো মেহেরবানী হত। ব্যাপারটি এমন যে, এদিকে অবিলম্বে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার।'

মীর সাদিক জওয়াব দিলেনঃ 'সুলতানে মোয়ায্‌যম ভোর থেকে কাজে ব্যস্ত। এখন তাঁর খানিকটা আরামের প্রয়োজন। আমি সন্ধ্যায় আর একবার মোলাকাতের চেষ্টা করবো। এবার বলো, কি করে চিঠিটা তোমার হাতে এলো?'

ঃ 'জনাব, আমি দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত চৌকির হেফাযতে নিযুক্ত ছিলাম। দু'টি লোক রাতের বেলায় এক জায়গায় সীমান্ত পার হয়ে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করবার চেষ্টা করলো। পাহারাদাররা তাদেরকে বাধা দিলো। কিন্তু তারা পালাবার চেষ্টা করলে পাহারাদাররা গুলী চালিয়ে দিলো। একজন বেঁচে গেলো, কিন্তু অপর ব্যক্তি যখমী হয়ে পড়ে গেলো। সীমান্তরক্ষীরা তাকে বেহুঁশ অবস্থায় নিয়ে এলো আমার কাছে। আমি তার জামায় তালাশ করে বের করলাম এই চিঠি। কিছুক্ষণ পর যখমী লোকটি কাতরাতে কাতরাতে চোখ খুললে আমি চেষ্টা করলাম তার কাছ থেকে চিঠির খবর জানতে। আমার প্রশ্নের জওয়াব না দিয়ে সে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। তারপর আচানক তার শ্বাস বেরিয়ে গেলো। মরার সময়ে তার মুখ নড়ছিলো, কিন্তু যথেষ্ট চেষ্টা করেও আমি কোনো কথা শুনতে পেলাম না। প্রথমে আমি চিঠি নিয়ে বাংগালোরের ফউজদারের কাছে যেতে চেয়েছিলাম। তারপর মনে করলাম, সুলতানের কাছে আসা আরো ভালো হবে।'

মীর সাদিক বললেনঃ 'চিঠিটা আমি দেখতে চাই।'

মালিক জাহান খান একটুখানি ইতস্তত করে জিব থেকে চিঠি বের করে মীর সাদিকের সামনে পেশ করলেন। মীর সাদিক কাগজখানা খুলে পড়লেন এবং আর একবার তার মুখের উপর ছড়িয়ে পড়লো একটা পাণ্ডুর আভা। চিঠিতে লেখা রয়েছেঃ

'জনাবে আলা! পত্রবাহক নির্ভরযোগ্য লোক এবং সে সকল জরুরী কথা আপনাকে যবানী আরয করবে। আপনি আমাদেরকে যে জরুরী খবর সংগ্রহ করে

দেবার ওয়াদা করেছিলেন, তা এখনো পৌঁছেনি। বর্তমানে অবস্থা এমন হয়ে উঠেছে যে, আপনার তরফ থেকে একটুখানি বিলম্ব আমাদের জন্য কঠিন ক্ষতির কারণ হতে পারে। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, যদি আপনি নিজস্ব ওয়াদা পালন করেন, তাহলে আপনার সকল দাবিই পূরণ করা হবে। এখন আপনাকে চিঠিপত্র না লিখে যবানী পয়গামে তুষ্ট থাকতে হবে। আপনার অন্যান্য সাথীকে আমার সালাম পৌঁছাবেন। আমি আপনার জওয়াবের ইন্তেযার করছি। -আপনার দোস্ত।'

মীর সাদিক কাগজখানা জাহান খানের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেনঃ 'এ চিঠিটা আমার কাছে রহস্যময় মনে হয়। যা হোক, ব্যাপারটা সুলতানে মোয়ায্যমের সামনে পেশ হওয়া দরকার। আমি দারোগাকে দিয়ে পয়গাম পাঠাচ্ছি, কিন্তু আজ তিনি এত ব্যস্ত যে, হয়তো আমিও আজ তার সাথে আবার দেখা করার মওকা পাবো না। তাই সুলতানে মোয়ায্যমের সাথে আজকের পরিবর্তে কাল মোলাকাতের চেষ্টা করাই ভালো।'

ঃ 'কিন্তু দেওয়ান সাহেব, সমস্যাটি বড়োই নাযুক, আর আমি আজই ফিরে যেতে চাই।'

মীর সাদিক বললেনঃ 'আমি তোমায় বলেছি যে, আজ সুলতানে মোয়াযযম খুবই ব্যস্ত, আর এই সময়ে আমি যদি ফিরে গিয়ে তার সাথে মোলাকাতের আবেদন জানাই, তাহলে আমায় এ চিঠির সত্যতা সম্পর্কে কোনো অভ্রান্ত প্রমাণ পেশ করতে হবে, নইলে সুলতানে মোয়ায্যম মনে করবেন যে, আমি তাকে অহেতুক পেরেশান করছি।'

জাহান খান বললেনঃ 'দেওয়ান সাহেব, মাফ করবেন, আমি আপনার মতলব বুঝতে পারছি না।'

মীর সাদিক বললেনঃ 'আমার মতলব, চিঠিটা আমার কাছে মনে হয় একটা ঠাট্টা। সম্ভবত দুশ্‌মন আমাদেরকে পেরেশান করার জন্য একটা দুষ্টবুদ্ধি চালিয়েছে। এতে না আছে লেখকের নাম, আর না আছে প্রাপকের পরিচয়। আমি চাই না যে, সুলতানে মোয়ায্যম আমায় এক বেঅকুফ মনে করেন। কালও সুলতানের সাথে তোমার মোলাকাতের বন্দোবস্ত করার সময়ে আমি এ চিঠির সত্যতা সম্পর্কে কোনো দায়িত্ব নেবো না। তুমি যাতে মোলাকাতের সময় পাও, শুধু তারই চেষ্টা আমি করবো। কিন্তু যদি তুমি এখনই সুলতানে মোয়ায্যমের সাথে মোলাকাত জরুরী মনে করো, তা'হলে তোমার পূর্ণিয়ার কাছে চলে যাওয়াই ভালো। সুলতানে মোয়ায্যম তাকে কোনো বিষয়ে পরামর্শের জন্য বিকালে তলব করেছেন। তিনি যদি সুলতানকে বলে দেন যে, তুমি কোনো জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এসেছো, তা'হলে হয়তো আজই তুমি মোলাকাতের সময় পেয়ে যাবে। তুমি বললে আমি পূর্ণিয়াকে নিজের তরফ থেকে একটা চিঠি লিখে দিতে পারি।'

মালিক জাহান খান পেরেশান হয়ে বললেনঃ 'আমি শোকরগুযারী করি, কিন্তু পূর্ণিয়ার কাছে আমি এ চিঠির কথা বলতে চাই না।'

ঃ 'তোমার জানা দরকার যে, সুলতানে মোয়ায্‌যমের দরবারে পূর্ণিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি আমার চাইতে অনেক বেশী।'

ঃ 'না জনাব, আপনি পূর্ণিয়ার কাছে এ চিঠির কথা বলবেন না। আমি কাল পর্যন্ত ইন্তেযার করতে পারবো।'

মীর সাদিক ভালো করে জাহান খানের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি পূর্ণিয়ার উপর নির্ভর করতে পারছো না।'

ঃ 'জনাব, তার উপর নির্ভর করতে আমি অহেতুক ঘাবড়াচ্ছি না। আমার ভয় হয়, যদি পূর্ণিয়া এ চিঠির কথা জানতে পারেন, তা'হলে তার চেষ্টা হবে, যাতে...'

জাহান খান কথাটি পূরা না করে দ্বিধাগ্রস্ত ও পেরেশোন অবস্থায় মীর সাদিকের দিকে তাকাতে লাগলেন।

মীর সাদিক অনেকটা গুরুগম্ভীর আওয়াযে বললেনঃ 'তুমি কি বলতে চাও?'

ঃ 'জনাব, আমার মনে হয়, মরার সময়ে দুশমনের চর পুর্ণিয়ার নাম নেবার চেষ্টা করছিলো।'

মীর সাদিকের মুখে প্রথমবার আশ্বাসের দীপ্তি দেখা গেলো। তিনি বললেনঃ 'সুলতানের এক উযিরের উপর এহেন দোষারোপ খুবই সংগীণ এবং তার সামনে এই ধরনের কথা বলার বদলে তোমার নিজের জান সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। তুমি সঠিক জানো যে, গুপ্তচর দেওয়ান পূর্ণিয়ার নাম করেছিলো?'

ঃ 'জনাব, সঠিক জানলে আমি কারুর পরামর্শ না নিয়েই তার মাথাটা কেটে এনে সুলতানের হুযুরে পেশ করে দিতাম। আমি এ দাবি করছি না যে, আমি ভালো করে পূর্ণিয়ার নাম শুনেছি। মরবার সময়ে গুপ্তচরের ঠোঁট নড়ছিলো এবং আমার মনে হল, সে পূর্ণিয়ার নাম শুনেছি। মরবার সময়ে গুপ্তচরের ঠোঁট নড়ছিলো এবং আমার মনে হল, সে পূর্ণিয়ার নাম করছে। এর সবটা আমার ভুল ধারণাও হতে পারে।'

মীর সাদিক কুরসি থেকে উঠে বললেনঃ 'আমি এক দায়িত্বহীন লোকের কথায় মনোযোগ দিয়ে ভুল করেছি, কিন্তু আমি আরও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে রাযী নই। আমি ওয়াদা করেছিলাম যে, কাল সুলতানে মোয়ায্‌যমের সাথে তোমার মোলাকাতের ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করবো। কাল ভোরে যদি তুমি মহলের দরযায় পৌছে যাও, তা'হলে আমি চেষ্টা করবো, যাতে তোমার মোলাকাতের আবেদন সুলতানের খেদমতে পৌছে যায়। তারপর তুমি কি বলতে চাও, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তুমি যে এ চিঠির কথা আমায় বলেছো, তাও আমি স্বীকার করবো না। তুমি এক সিপাহী এবং তোমার আন্তরিকতা বিবেচনায় হয়তো সুলতানে মোয়ায্‌যম তোমার ভূলক্রটি উপেক্ষা করবেন, কিন্তু আমি এক উযির।'

ঃ 'জনাব, আপনার কথা আমি সুলতানকে বলবো না গাযী বাবা সেরিংগাপটমের বাইরে, নইলে আমি আপনাকে পেরেশান করতাম না। কাল শাহী মহলের দরযায়

আমি আপনার ইন্তেযার করবো।'

ঃ 'তুমি কোথায় থাকবে?'

ঃ 'জনাব, আমি সুলতানের ফউজের এক অফিসারের গৃহে থাকবো।'

ঃ 'সে অফিসারটির নাম কি?'

ঃ 'মুরাদ আলী।' বলে মালিক জাহান খান উঠে দাঁড়ালেন।

মীর সাদিক বললেনঃ 'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ভোর থেকে তুমি কিছু খাওনি।'

ঃ 'জনাব, আমি কাল সন্ধ্যা থেকে খানা খাইনি। রাতভর আমি সফর করেছি আর ভোর থেকে শাহী মহলে তওয়াফ করছি।'

ঃ 'তা' হলে বসো। আমি তোমার জন্য খানা পাঠাচ্ছি।'

ঃ 'না জনাব, আপনি তকলীফ করবেন না।'

ঃ 'তকলীফ কোথায়? সুলতানের এক বিশ্বস্ত সিপাহীর খেদমত আমার ফরয।' বলে মীর সাদিক উঠে কামরার বাইরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর মীর সাদিকের এক নওকর মালিক জাহান খানের খানা এনে হাযির করলো। ততোক্ষণে তার দু'জন কর্মচারী জরুরী খবর নিয়ে ছুটে চলেছে মীর কমরুদ্দীন ও পূর্ণিয়ার বাসভবনের দিকে।

খানার কয়েক লোকমা গিলতেই মালিক জাহান খানের মাথা ঘুরতে লাগলো। প্রথমে তার মনে হল, হয়তো গত কয়েক ঘন্টার ক্লান্তি ও ক্ষুধার দরুন এমনটি হচ্ছে কিন্তু যখন তার হুশ লোপ পেতে লাগলো, তখনি তিনি জলদী উঠে দাঁড়ালেন। মীর সাদিকের নওকর এগিয়ে এসে বললোঃ 'কি ব্যাপার, জনাব? আপনার তবিয়ত ভালো নেই?'

ঃ 'আমি ঠিকই আছি।' ধরা গলায় বলে মালিক জাহান খান দরযার দিকে কয়েক কদম গিয়েই ধড়াম করে পড়ে গেলেন মেঝের উপর।

নওকর তাঁর জিব থেকে কাগজ বের করে নিয়ে বাইরে গিয়ে দরযা বন্ধ করে দিলো। কিছুক্ষণ পর মীর সাদিক তাঁর বাসভবনের এক প্রশস্ত কামরার মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। মীর কমরুদ্দীন ভিতরে এসে কোনো ভূমিকা না করেই বললেনঃ 'আপনার চিঠি পেয়ে আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। মালিক জাহান খান কোথায়?'

ঃ 'অপর কামরায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে। আপনি চিঠিটা আগে পড়ে নিন। তারপর সব ঘটনা আমি বলবো আপনাকে।'

মীর কমরুদ্দীন মীর সাদিকের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে পড়লেন। তারপর ভীত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ জাহান খানের হাতে কি করে এলো এ চিঠি?'

ঃ 'জাহান খানের সাথীরা আপনাদের দূতকে ফিরতি পথে সীমান্ত পার হওয়ার সময়ে কতল করে ফেলেছে।'

মীর কমরুদ্দীন কিছুক্ষণ নির্বাক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি আবার চিঠিটার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'কিন্তু আপনার কি করে ধারণা হল যে, এ চিঠির কারণে আমাদের কোনো বিপদ-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে?'

ঃ 'মরার সময়ে দূত আমাদেরই এক সাথীর নাম করবার চেষ্টা করেছিলো।'

ঃ 'সে সাথীটি কে?'

ঃ 'পূর্ণিয়া। তাঁকেও আমি খবর পাঠিয়েছি, কিন্তু তিনি এখনো আসেন নি। এখন মালিক জাহান খানের একটা কিছু বন্দোবস্ত করা আপনাদের কাজ। আমি তাঁর খানার সাথে যে অষুধ দিয়েছি, তার নেশা দু'তিন ঘন্টা পর কেটে যাবে।'

ঃ 'আমার ধারণা, আমাদের সহজতম কাজ হবে ওঁকে কতল করে ফেলা।'

ঃ 'না, আমাদের জন্য সহজতম পন্থা হবে ওঁকে পূর্ণিয়ার হাতে ছেড়ে দেওয়া।'

ঃ 'আপনার ধারণা, পূর্ণিয়া ওঁকে কতল করবার পরামর্শ দেবেন না?'

ঃ 'নিশ্চয়ই দেবেন, কিন্তু আমি ওঁকে কতল করার চাইতে কয়েদ করে রাখার পক্ষপাতী। কমপক্ষে যতোক্ষণ না আমরা আশ্বস্ত হতে পারি যে, তাঁর কোনো সাথী এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত নয়। আপনি আজই কয়েকজন হুঁশিয়ার লোক সীমান্তে পাঠিয়ে দিন। জাহান খানের লোক এ ব্যাপারে কতোটা অবহিত, তারা সে সম্পর্কে সন্ধান নেবে। তারপর ওঁর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা যাবে। আপাতত আমাদের চেষ্টা হবে, যাতে জাহান খান এক নাম-না জানা কয়েদী হিসাবে কয়েদখানায় আটক থাকে আর সুলতানের সাথে ওঁর দেখা না হয়। লর্ড ওয়েলেসলী ও মীর নিযাম আলীর ওয়াদা ঠিক হলে কয়েক মাস পর মালিক জাহান খানের মতো লোক আমাদের জন্য কোনো বিপদের কারণ হবে না। আমার মনে সব সময়েই আশংকা, পূর্ণিয়া কখনো আমাদেরকে ধোকা না দেন, কিন্তু এ চিঠিখানা এখন আমাদের হাতে একখানা তলোয়ার হয়ে থাকবে। পূর্ণিয়া কম-সে-কম তাঁর নিজস্ব নিরাপত্তার ভয়ে আমাদের ইশারায় চলতে বাধ্য হবে।'

বাইরে কারুর পদশব্দ শোনা গেলো এবং মীর কমরুদ্দীন বললেনঃ 'হয়তো তিনি এসে গেলেন।'

পূর্ণিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে কম্পিত পদে কামরায় প্রবেশ করলেন। মীর সাদিক কোনো ভূমিকা না করেই বললেনঃ 'আসুন, জনাব। আপনার খোশ কিসমতি যে, মালিক জাহান সুলতানের সাথে মোলাকাত না করে আমার কবজায় এসে গেছেন। আপনার দূত ফিরতি পথে সীমান্ত পার হতে গিয়ে কতল হয়ে গেছে। সে তামাম ঘটনা মালিক জাহান খানের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিলো। আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি। মালিক জাহান খান পাশের কামরায় পড়ে রয়েছে বেহুঁশ

হয়ে। এখন জরুরী হচ্ছে, আপনি ওঁকে কিছুদিন আপনার যিম্মায় রাখুন।'

রাতের বেলায় মালিক জাহান খান সেরিংগাপটমের কয়েদখানায় এক কুঠরীতে পড়ে থাকলেন এবং কয়েদখানার দারোগা তাঁকে পাহারাদারদের যিম্মা করে নির্দেশ দিলেনঃ 'এ কয়েদী এক বিপজ্জনক চর এবং পূর্ণিমায় মহারাজের কঠোর হুকুম কয়েদখানার কোনো কর্মচারী এর সাথে কোনো কথা বলবে না।'

পঁচিশ

ইয়াসী ১৭৯৯ সালের গোড়ার দিকে ইংরেজদের সামরিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। জেনারেল হিয়ার্সের নেতৃত্বে একুশ হাজার সিপাহী অগ্রগতির জন্য হুকুমের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। কোম্পানীর প্রায় সাত হাজার সিপাহীর আর একটি ফউজ জেনারেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে কানানূরে এসে শিবির সন্নিবেশ করলো। হায়দরাবাদ থেকে ষোলো হাজার সিপাহী কর্নেল ওয়েলেসলীর* নেতৃত্বে আম্বুরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। তাছাড়া কর্নেল ব্রাউন ও কর্নেল রীডের পরিচালনাধীনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আর একটি ফউজ ত্রিচিনোপলীর দিকে অগ্রসর হবার জন্য তৈরী হচ্ছিলো।

আগের যুদ্ধে অর্ধেক সালতানাতের অধিকার হারানো সত্ত্বেও ইংরেজ যে শাসককে হিন্দুস্তানের সব চাইতে বড়ো প্রতিরক্ষা দুর্গ মনে করতো, তাঁরই বিরুদ্ধে চলছিলো এ ব্যাপক যুদ্ধপ্রস্তুতি। ছয় বছরে মহীশূরের ব্যাঘ্রের যখম মিলিয়ে গিয়েছিলো এবং ইংরেজ তীব্রভাবে অনুভব করছিলো যে, সুলতান টিপুর প্রতি নিশ্বাসের সাথে তাদের ভবিষ্যতের জন্য জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন বিপদ-সম্ভাবনা।

* কর্নেল আর্থার ওয়েলেসলী লর্ড ওয়েলেসলীর ছোট ভাই। পরে তিনি ডিউক অব ওয়েলিংটন নামে খ্যাত হন এবং ইংরেজ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে পরাজিত করেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও মীর নিযাম আলীর গতিবিধি শুরু হওয়ার পর তাঁদের যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পর্কে সুলতানের কোনো ভুল ধারণা ছিলো না। শেরে মহীশূর আর একবার মুষ্টিমেয় সিপাহী নিয়ে শকুন ও নেকড়ের অসংখ্য সেনাবাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। পশ্চিমের যুদ্ধ সংকল্পের মোকাবিলায় আলমে ইসলামকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করার জীবনপণ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। তুরস্কে আলমে ইসলামের সব চাইতে বড়ো রক্ষক ইংরেজের দোআ-গো বনে গেছেন। ইরানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রেখেছে। আফগানিস্তানের ওয়ালী যামান শাহ্ তখনো নিজস্ব সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েছেন এবং হিন্দুস্তানে যে সব ভাগ্যান্বেষী মোগল সালতানাতের ধ্বংসস্তূপের উপর নিজস্ব আধিপত্যের মসনদ সাজাচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এ দুর্ভাগা দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করার মতো কেউ ছিলেন না। যেসব কুকুর শুকনো হাড়ের ভাগ পাওয়ার জন্য শিকারীর সাথে সাথে চলতে

থাকে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হিন্দুস্তানী মিত্রদের অবস্থা ছিলো তার চাইতেও নিকৃষ্টতর।

হিন্দুস্তানী রাজনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিলো মারাঠাদের মধ্যে। তারা ইতিপূর্বে কয়েকবার সুলতানের বিরুদ্ধে ইংরেজের সমর্থন করেছে, কিন্তু এবার তারা অতীতের ভুল বুঝতে লাগলো। মারাঠাদের মধ্যে সুলতানের বড়ো সমর্থক টিকুজী হোলকার মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী যশোবন্ত রাও তাঁর পূর্বপুরুষের মতোই সুলতান টিপুকে মনে করতেন বিদেশী আধিপত্যের পথে সব চাইতে বড়ো বাধার প্রাচীর। তেমনি মহাদেজী সিন্ধিয়ার উত্তরাধিকারী দৌলত রাও সিন্ধিয়াও তীব্রভাবে উপলব্ধি করছিলেন যে সুলতান টিপুর পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরবর্তী হামলা হবে মারাঠাদের উপর। পুণা দরবারে সিন্ধিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি সুলতান টিপুর জন্য আশাসূচক অবস্থা সৃষ্টি করেছিলো এবং পেশোয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিবর্তে সুলতান টিপুকে সমর্থন দানের সম্মতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব দুর্বলতা ও পরিবর্তনশীল মনোভাবের দরুন তাঁর সংকল্প কার্যে পরিণত হল না। মারাঠা এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকলো, এই ছিলো সুলতান টিপুর বড়ো সাফল্য।



একদিন মধ্যরাত্রে আন্ওয়ার আলী ও মুনীরা চাতল দুর্গের প্রশস্ত বাসভবনের এক কামরায় ঘুমিয়েছিলেন। কে যেনো দরযায় খট্খট করে আওয়ায করলেন।

ঃ কে ওখানে?' আন্ওয়ার আলী গভীর ঘুম থেকে জেগে দরযার দিকে এগিয়ে বললেন।

বাইরে থেকে পরিচিত কণ্ঠে আওয়ায এলোঃ 'আমি মুরাদ আলী, ভাইজান।'

আন্ওয়ার আলী ছুটে গিয়ে দরযা খুললেন। মুরাদ আলীর সাথে কেল্লার এক পাহারাদার মশাল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আন্ওয়ার আলী ভাইয়ের কাছে গিয়ে বললনে ঃ 'তুমি- এই সময়ে? সব খবর ভালো তো?'

ঃ 'পেরেশানীর কোনো কারণ নেই, ভাইজান। আমি শুধু আপনাদেরকে দেখতে এসেছি। ভাবীজান কেমন আছেন?'

ঃ 'তিনি বিলকুল ভালো আছেন।' বলে আন্ওয়ার আলী সিপাহীর হাত থেকে মশাল নিয়ে মুরাদ আলীকে সাথে করে এক কামরায় প্রবেশ করলেন। মশাল দিয়ে ঘরের চেরাগ জ্বেলে নিলেন। তারপর মশালটি বারান্দায় রেখে ফিরে এসে তিনি মুনীরাকে আওয়ায দিলেন।

সামনের কামরা থেকে মুনীরার আওয়ায এলোঃ 'কে এসেছেন?'

ঃ 'মুরাদ এসেছে, মুনীরা।'

ঃ 'মুরাদ।' মুনীরা ছুটে এলেন কামরার ভিতরে। আনন্দ ও উদ্বেগের মিশ্র মনোভাব নিয়ে তিনি তাকালেন মুরাদ আলীর দিকে।

মুরাদ আলী সালাম করে বললেনঃ 'ভাবীজান, ঘাবড়ানোর কারণ নেই। আমি আপনাদের কুশল জানতে এসেছি।'

আন্‌ওয়ার আলী বললেনঃ 'মুরাদ, তুমি কোনো অভিযানে যাচ্ছো। বসো। মুনীরা, নওকরদের জাগিয়ে ওর খানার বন্দোবস্ত করো।'

ঃ 'ভাইজান, আমি খানা খেয়ে এসেছি। আপনারা তশরীফ রাখুন। কিছুক্ষণ কথা বলে আমি এখান থেকে চলে যাবো।'

ঃ 'তুমি কোথায় যাচ্ছো?' আন্‌ওয়ার আলী কুরসির উপর বসে বললেন।

ঃ 'ভাইজান, আমি আফানিস্তানের ওয়ালী যামান শাহ্‌র কাছে যাচ্ছি সুলতানে মোয়ায্‌যমের এক জরুরী পয়গাম নিয়ে। আমার সাথীরা মাংগালোরের বন্দরগাহ্ থেকে জাহাজে সওয়ার হবেন এবং আমি কুণ্ডাপুর থেকে তাঁদের সাথে শামিল হবো। সিন্ধু উপকূলে পৌঁছে আমরা স্থলপথে সফর করবো। গাযী বাবা ও সৈয়দ গাফফারের সুপারিশে আমার উপর অর্পণ করা হয়েছে এ অভিযানের ভার। আমি সুলতানে মোয়ায্‌যমের খেদমতে আবেদন করলাম যে, যাবার আগে যদি আমায় আপনাদের খেদমতে হাযির হবার এজাযত দেন, তা'হলে মাংগালোরের জাহাজের আগেই কুণ্ডাপুর পৌঁছে যাবো। সুলতানে মোয়ায্‌যম বললেন যে, চাতল দুর্গের পরিবর্তে শীগ্‌গিরই আপনাকে সেরিংগাপটমে একটি দায়িত্বপুর্ণ কাজের যিম্মাদারী দেওয়া হবে। সৈয়দ গাফফারও আমায় বলছিলো যে, সেরিংগাপটমে নায়েব ফউজদারের পদে একজন নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞ অফিসারের প্রয়োজন। তাই আপনাকে এক হফতার মধ্যে সেরিংগাপটমে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।'

আন্‌ওয়ার আলী বললেনঃ 'বর্তমানে যামান শাহ্ হিন্দুস্তানের মুসলমানদের শেষ আশাস্থল। সেরিংগাপটমের খবরে জানা গেছে যে, লর্ড ওয়েলেসলী সুলতানের সাথে শেষ যুদ্ধ করার ফয়সালা করেছেন। শুধু যামান শাহ্‌র হামলার ভয়েই তিনি যুদ্ধ থেকে দূরে রয়েছেন।'

মুরাদ আলী বললেনঃ 'ভাইজান, আজকাল সুলতানের নামে লর্ড ওয়েলেসলীর চিঠিপত্রের ধরন মহীশূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই সমার্থক মনে হয়। গতবারে যামান শাহ্ লাহোর থেকে ফিরে না গেলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আচরণে এ পরিবর্তন আসতো না। এবার আফগানিস্তান থেকে আমাদের দূত খবর পাঠিয়েছে যে, যামান শাহ্ আবার লাহোর রওয়ানা হচ্ছেন এবং এবার তিনি দিল্লী না পৌঁছে বিরাম নেবেন না। খোদা করুন, যেনো এ খবর সত্য হয়। যামান শাহ্ লাহোর পৌঁছে বিরাম নেবেন না। খোদা করুন, যেনো এ খবর সত্য হয়। যামান শাহ্ লাহোর পৌঁছলে আমার এ অভিযান খুব সংক্ষিপ্ত হবে। নইলে আমায় আফগানিস্তান যেতে হবে এবং সেখান থেকে কালাতের পথের ফিরে আসবো।'

আন্ওয়ার আলী বললেনঃ 'মুরাদ, সুলতান তোমায় এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের ভার দিয়েছেন। আমি তোমায় কামিয়াবীর জন্য দোআ করি। হায়! যামান শাহ হিন্দুস্থানের মুসলমানের জন্য আর এক আহ্মদ শাহ্ আবদালী হতে পারতেন! তুমি ক্লান্ত, কিছুক্ষণ আরাম করে নাও। তোমায় অবিলম্বে যেতে হলে আমি ভোরে তোমায় তুলে দেবো।'

মুরাদ আলী জিব থেকে একটি ছোট্ট থলে বের করে আন্ওয়ার আলীর সামনে পেশ করে বললেনঃ 'ভাইজান, এই নিন, আমি এর হেফাযত করতে পারছি না।'

মুনীরা প্রশ্ন করলেনঃ 'এর মধ্যে কি?'

আন্ওয়ার আলী থলেটি মুনীরার হাতে দিয়ে বললেনঃ 'এ খুব দামী জওয়াহেরাত। সামলে রেখো।'

কিছুক্ষণ পর মুরাদ আলী এক কামরায় গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন। ভোরের আযানের সাথে সাথে আন্ওয়ার আলী তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে বললেনঃ 'মুরাদ, ওঠো। নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। আমি তোমার জন্য তাযাদম ঘোড়ায় যিন লাগিয়ে দিয়েছি, আর তোমার ভাবী নাশতা তৈরী করে রেখেছেন।'

মুরাদ আলী ভাইয়ের সাথে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করলেন এবং ফিরে এসে নাশতা খেতে বসলেন। আন্ওয়ার আলী তাঁর সাথে কয়েক লোকমা খেলেন, কিন্তু মুনীরা বিষণ্ন মুখে কাছে বসে রইলেন। মুরাদ আলী বললেনঃ 'ভাবীজান, আপনি কিছু খাবেন না?'

ঃ 'এ সময়ে আমার ক্ষিধে নেই।' 'মুনীরা অত্যন্ত ক্ষীণ আওয়াযে বললেনঃ 'আমি একটু দেরীতেই নাশতা করি।' তারপর আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেনঃ 'মুরাদ, তুমি আগের চিঠিতে তোমার চাচীর ওখানে যাবার ইচ্ছা জানিয়েছিলে।'

ঃ হ্যাঁ, ভাবীজান, বহুতদিন হল, তাঁদের সাথে দেখা হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিলো, কয়েকদিনের জন্য ওখান হয়ে আসবো। কিন্তু এ কাজ ওখানে যাওয়ার চাইতেও জরুরী।'

ঃ 'তুমি কোনো চিঠিও লেখনি তাঁদেরকে?'

ঃ 'সেরিংগাপটম থেকে রওয়ানা হবার সময়ে আমি তাঁদেরকে এক চিঠি লিখে জানিয়েছি যে, আমার অভিযান শেষ হলে তাঁদের ওখানে যাবো।'

নাশতা খতম করে আন্ওয়ার ও মুরাদ উঠে দাঁড়ালেন। মুরাদ আলী বললেনঃ 'ভাবীজান, এবার আমায় এজাযত দিন।'

মুনীরা বললেনঃ 'মুরাদ, জলদী ফিরে আসার চেষ্টা করো।'

ঃ 'ভাবীজান, আমি ইনশা আল্লাহ খুব জলদী ফিরবো। আপনি আমার অভিযানের কামিয়াবীর জন্য দোআ করবেন।'

আন্‌ওয়ার আলী হেসে বললেনঃ 'মুনীরা প্রত্যেক নামাযের সময় তোমার জন্য দোআ করে থাকে।'

মুরাদ আলী মুনীরাকে 'খোদা হাফিয, বলে গৃহের বাইরে বেরুলেন। কেল্লার দরযায় পাহারাদার তাঁর ঘোড়ার বাগ ধরে দাঁড়িয়েছিলো। মুরাদ আলী মোসাফাহার জন্য হাত বাড়ালেন, কিন্তু আন্‌ওয়ার আলী দুহাত প্রসারিত করে তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। তারপর তাঁর কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে তিনি বললেনঃ 'মুরাদ, খোদা হাফিয।'

ঃ 'খোদা হাফিয, ভাইজান।' বলে মুরাদ আলী পাহারাদারের হাত থেকে ঘোড়ার বাগ ধরে সওয়ার হলেন। তারপর তিনি ঘোড়া হাঁকালেন। আন্‌ওয়ার আলী এতক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, আচানক এগিয়ে গিয়ে চীৎকার করে বললেনঃ 'দাঁড়াও, আমার একটা কথা আছে তোমার সাথে।'

মুরাদ আলী ঘোড়া থামালেন এবং ফিরে ভাইয়ের দিকে তাকালেন। আন্‌ওয়ার আলী ঘোড়ার বাগ ধরে বললেনঃ 'মুরাদ, আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন এখনো বাকী রয়েছে। এবার আমি প্রথম অবকাশ পেলেই চাচা আকবর খানের বাড়িতে যাবো। চাচীজানকে বলা দরকার যে, আমাদের দু'টি খান্দানের মধ্যে যে সম্পর্ক চাচা আকবর খানের যিন্দেগীতে কায়েম ছিলো, তাঁর মৃত্যুর পর তা'খতম হয়ে যায়নি। তুমি আমাদের মতলব বুঝলে?'

ঃ 'হ্যাঁ ভাইজান, আপনি অবশ্যি যাবেন। আপনার নিজের সুযোগ না হলে কম-সে-কম কোনো নওকরকে পাঠিয়ে তাঁদের কুশল জেনে নেবেন।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা, খোদা হাফিয।

মুরাদ আলী বললেনঃ ভাইজান, বর্তমান অবস্থায় আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারি না, কিন্তু আমি যদি কোনো কারণে ফিরে আসতে না পারি, তা'হলে আমার বিশ্বাস, আপনি সামিনা ও তার মায়ের দিকে খেয়াল রাখবেন।' তারপর তিনি আন্‌ওয়ার আলীর তরফ থেকে কোনো জওয়াবের প্রতীক্ষা না করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।



ইসায়ী ১৭৯৯ সালের মার্চ মাসের গোড়ার দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও মীর নিযাম আলীর সেনাবাহিনী বিভিন্ন ফ্রন্টে মহীশূরের উপর হামলা করলো। দুশমনের মোকাবিলায় মহীশূরের যুদ্ধ সামগ্রী ছিলো খুবই কম। তথাপি শান্তির সময়ে সুলতান টিপু যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, তা বিবেচনা করে পূর্ণ আস্থা পোষণ করা হচ্ছিলো যে, দুশমন বাহিনী তাদের অন্তহীন যুদ্ধসামগ্রী থাকা সত্ত্বেও বর্ষার মওসুমের আগে সেরিংগাপটম পর্যন্ত পৌছতে পারবে না এবং বর্ষার মওসুম খোদাদাদ সালতানাতের জন্য আবার এক অপরাজেয় সহযোগী প্রমাণিত হবে, কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলী তাঁর সেনাবাহিনীকে অগ্রগতির হুকুম দেবার পূর্বে এ বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চিন্ত

হয়েছিলেন যে, এ যুদ্ধ কয়েক হফতার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে এবং লর্ড কর্ণওয়ালিসের মতো তাঁকে সেরিংগাপটমের প্রাচীরের সামনে বর্ষার মওসুমে ধ্বংস ও বরবাদীর মোকাবিলা করতে হবে না। ওয়েলেসলীর নিজস্ব ও মীর নিযাম আলীর অসংখ্য লশকরের চাইতে বেশী ভরসা ছিলো সেই গাদ্দার ও জাতিদ্রোহীদের উপর, যারা সেরিংগাপটমে বসে চালিয়ে যাচ্ছিলো সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

খোদাদাদ সালতানাতের জন্য সব চাইতে বড়ো প্রতিকূল পরিস্থিতি ছিলো এই যে, সেখানে এমন মুসলমানের সংখ্যা ছিলো অতি নগণ্য, যাঁরা এক বিশাল সালতানাত গড়ে তোলায় হায়দর আলী সুলতান টিপুর মতো মহিমান্বিত শাসকদের আকাংখা সমর্থন করতে পারতেন। এই শূন্যতা পূরণের জন্য মহীশূরের শাসকরা হিন্দুস্তানের আনাচে কানাচে সন্ধান করে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ গুণীর সমাবেশ করবার চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধিবৃত্তি ও হিম্মতের অধিকারী প্রত্যেকটি মানুষের জন্য মহীশূরের কামিয়াবী ও তরক্কীর পথ ছিলো উন্মুক্ত। হায়দর আলী ও তাঁরপর সুলতান টিপুর মহত্বের দরুন যেখানে সে যুগের শ্রেষ্ঠ ওলামা, সিপাহী, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও শিল্পীর সমাবেশ হয়েছিলো মহীশূরে, সেখানে এমন সুযোগসন্ধানীর ঘাটতিও ছিলো না, যারা শুধু খোদাদাদ সালতানাতের সমৃদ্ধির সুযোগই লুটে যাচ্ছিলো। মহীশূরের অবস্থা যতোক্ষণ অনুকূল ছিলো, ততোক্ষণ তারা তাদের ভবিষ্যৎ জড়িত রেখেছে সুলতানের সাথে। কিন্তু এই ভাগ্যাণ্বেষীরা যখন দেখলো যে, সুলতান টিপু একা বেশীদিন সারা দুনিয়ার সাথে লড়তে পারবেন না, তখন তারা নিজস্ব ভবিষ্যত জড়িত করলো ইংরেজের সাথে। মহীশূরের তৃতীয় যুদ্ধের পরই তারা অনুভব করতে লাগলো যে, খোদাদাদ সালতানাতের বুনিয়াদ নড়ে গেছে এবং এ বিশাল ইমারত ঘুর্ণিবাত্যা ও ঝড়ের আঘাত উপেক্ষা করে বেশীদিন টিকে থাকতে পারবে না। নেপোলিয়ান যদি প্রাচ্যের দিকে এগিয়ে আসতেন অথবা যামান শাহ্ও যদি আহমদ শাহ্ আবদালীর মতো ইসলাম প্রীতির ঝাণ্ডা তুলে পানিপথ পর্যন্ত পৌঁছে যেতেন, তা'হলে হয়তো সুলতানের সাহচর্য ত্যাগ করতে চাইতো না তারা, কিন্তু এখন অবস্থার রূপান্তর ঘটেছে। এসব ভাগ্যান্বেষী নিজস্ব ইয্যত ও আধিপত্যের জন্য তারা সুলতানের সমর্থন করতে পারতো, কিন্তু ইয্যতের মৃত্যু বরণ করতে তারা তাঁর সাথী হতে চাইতো না।

সুতরাং দুশমনের অগ্রগতির পূর্বেই গাদ্দার উযির ও নিমকহারাম অফিসারদের এক সুসংহত দল তাদেরকে জরুরী তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছিলো। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও মীর নিযাম আলীর সেনাবাহিনীর সিপাহ্সালারদের জানা ছিলো, সেরিংগাপটমের দিকে তাদের জন্য কোন্ রাস্তা নিরাপদ ও কোন্টি বিপজ্জনক। কোন্ কোন্ কেল্লা ও চৌকির রক্ষীরা সময় এলে সুলতানের সাথে গাদ্দারী করে তাদের সাথে মিলিত হবে, তাও তারা জানতো। আগেকার যুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে সুলতান টিপুর ঝটিকা-বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে ইংরেজ ও তাদের মিত্ররা থাকতো বেখবর। কিন্তু এবার প্রতি মুহূর্তে তারা খবর পাচ্ছিলোঃ আজ সুলতানের শিবির রয়েছে অমুক জায়গায়, এখন তিনি অমুক ফ্রন্ট থেকে পিছু হটে অমুক

জায়গায় জওয়াবী হামলার সংকল্প করছেন; অমুক কেল্লা বা ফউজের অফিসারকে খরিদ করা হয়েছে এবং সে তোমাদের পথরোধ করবে না, অমুক অমুক সেনাদল সুলতানের বিশ্বস্ত এবং তারা শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করতে থাকবে। দুশমন তাদের প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী যুদ্ধের নক্‌শা তৈরী করছিলো।

মার্চের প্রথম সপ্তাহে সুলতান টিপু পর্যাপটমের নিকটে শিবির সন্নিবেশ করলেন। জেনারেল স্টুয়ার্টের অগ্রগামী সেনাদল তাঁর নাগালের মধ্যে এসে গেলো এবং সুলতানের আকস্মিক হামলায় তাদের ধ্বংস নিশ্চিত হয়ে উঠলো, কিন্তু কোনো এক গাদ্দার সুলতানের সংকল্প সম্পর্কে জেনারেল ষ্টুয়ার্টকে যথাসময়ে সতর্ক করে দিলো এবং তিনি অবিলম্বে সেনা সাহায্য পাঠিয়ে তাঁর ফউজকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। তা'সত্ত্বেও কয়েকটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে সুলতান টিপুরই জয় হল, কিন্তু অন্যান্য ফ্রন্টে জেনারেল হিয়ার্সের অগ্রগতির দরুন সুলতান টিপুকে পর্যাপটম ছেড়ে যেতে হল।

সুলতান টিপু পর্যাপটম থেকে সেরিংগাপটম ফিরে গিয়ে জেনারেল হিয়ার্সের বিরুদ্ধে জওয়াবী হামলার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হলেন। মীর মুঈনুদ্দীন ও পূর্ণিয়ার উপর যিম্মাদারী অর্পণ করা হল যে, তাঁরা সেরিংগাপটমের পথে জেনারেল হিয়ার্সের লশকরকে যথাসম্ভব বেশী সময় বিব্রত করে রাখবেন। কিন্তু তারা কোনরূপ বাধা না দেওয়ায় জেনারেল হিয়ার্সের অগুণ্তি সেনাবাহিনী বিনা অসুবিধায় মলুলী পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। পূর্ণিয়া ও মীর মুঈনুদ্দীনের গাদ্দারীর ফল অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রমাণিত হল। তাঁরা একটু খানি নেক নিয়তের প্রমাণ দিলে কয়েকদিনের মধ্যে জেনারেল হিয়ার্সের মলুলী পৌঁছা সম্ভব হত না। জেনারেল হিয়ার্স যে আড়ম্বর সহকারে সফর করছিলেন, তা' আন্দায করা যায় এই ঘটনা থেকে যে, ষাট হাজার বলদ জুড়ে দেওয়া হয়েছিলো রসদ ও যুদ্ধসামগ্রীবাহী গাড়ির সাথে। তাছাড়া আরো হাজার হাজার উট বোঝাই করা হয়েছিলো জিনিসপত্র দিয়ে এবং কয়েকটি হাতী শুধু তোপ টানার কাজে লাগানো হয়েছিলো। এমনি করে মীর নিযাম আলীর ফউজের সাথে হাতী ও উট ছাড়া আরো ছিলো ছত্রিশ হাজার বলদ। খাদ্যসামগ্রীবাহী ও খিমাবরদানের সংখ্যা ছিলো যোদ্ধা সিপাহীদের পাঁচগুণ বেশী। পানিপথের যুদ্ধের পর হিন্দুস্তানের কোনো রাজপথে এত বড়ো কাফেলা দেখা যায়নি। প্রায় এক লক্ষ বলদ, উট ও হাতির খোরাকের ব্যবস্থা খুব সোজা ব্যাপার ছিল না। মাংগালোর পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে কাফেলার অবস্থা এমন হল যে, পথের প্রত্যেক মনযিলে অসংখ্য জানোয়ার খোরাকের অভাবে মারা গেলো এবং জেনারেল হিয়ার্সকে নিরুপায় হয়ে বহু দ্রব্যসামগ্রী পথের মধ্যে নষ্ট করে দিতে হল।*

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও হায়দরাবাদের লশ্‌করের অগ্রগতি ছিলো এমন অসংবদ্ধ ও মন্থর যে, তারা প্রতিদিন বহু কষ্টে পাঁচ-সাত মাইল ক'রে পথ চলতো। তাদের একমাত্র আশ্বাস ছিলো এই যে, সুলতান তাদের পথরোধ করতে যে জেনারেলদের হুকুম দিয়েছিলেন, তারা দুশ্‌মনের কাছে না এসে কয়েক মন্‌যিল দূরে দূরে থাকতো। মীর মুঈনুদ্দীন ও পূর্ণিয়া গাদ্দারী না করলে তাঁদের সামান্যতম হস্তক্ষেপ দুশমনের

*লর্ড ওয়েলস্‌লীর বর্ণনা মোতাবিক মাংগালোর পৌঁছার মধ্যে তাঁরে ভারবাহী জানোয়ার এত বেশী মারা গিয়েছিলো যে, ইংরেজ ফউজের অগ্রগতি মুলতবী রাখা ব্যতীত কোনো গত্যন্তর ছিলো না।

সকল পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দিতে পারতো। জেনারেল হিয়ার্সের লশ্‌করকে সুসংবদ্ধ ফউজ মনে হত না, মনে হত যেনো গাঁয়ের বরাত। পথের সংকটময় ঘাঁটি ও অসমতল রাস্তায় এমন অসংখ্য স্থান ছিলো, যেখানে মহীশূরের নৈশ হামলাকারী সওয়ারদের হামলা ধ্বংসকর হতে পারতো। পথে জেনারেল হিয়ার্সের সব চাইতে বড়ো সমস্যা ছিলো হাজার হাজার বলদের গাড়ি ও সাজ-সরঞ্জামের হেফাজত। পূর্ণিয়া ও মুঈনুদ্দীন জেনারেল হিয়ার্সের পথরোধ করতে না পারলেও তাঁর পক্ষে সাজ-সরঞ্জাম বোঝাই কয়েক মাইল লম্বা বলদের গাড়ি সারি নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সফর করা সম্ভব হত না। আট বছর আগে লর্ড কর্ণওয়ালিস সেরিংগাপটমের উপর হামলা ক'রে ভারী সরঞ্জামের দরুন শোচনীয় ধ্বংস বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদি সতর্ক হ'য়ে এবার জেনারেল হিয়ার্সের পথরোধ করার চেষ্টা করা হত, তা'হলে তাঁর দিনের কর্মসূচী মাসের পর মাস মুলতবী রাখতে বাধ্য করা যেতো।

এ কথা সত্য যে, আট বছর আগে যেমন ছিলো, ১৭৯৯ সালে সুলতানের ফউজী সংগতি তেমন ছিলো না, কিন্তু মারাঠাদের নিরপক্ষেতার দরুন সুলতানের অবশিষ্ট শক্তি নিয়ে পূর্ণ আত্মনির্ভরতা সহকারে নিযাম ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মিলিত শক্তির মোকাবিলা করা অবশ্যি সম্ভব ছিলো। কম-সে-কম ইসায়ী ১৭৯৯ সালের বর্ষার মওসুম পর্যন্ত জেনারেল হিয়ার্সের সেনাবাহিনীকে সেরিংগাপটম থেকে দূরে ঠেকিয়ে রাখা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হত না। তারপর যুদ্ধকালের দৈর্ঘ্য সুলতানের তুলনায় লর্ড ওয়েলেসলী ও মীর নিযাম আলীর পক্ষে অধিকতর বিপজ্জনক হতে পারতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, খোদাদাদ সালতানাতের ভিতরকার গাদ্দার বাইরের হামলাকারীর চাইতে বেশী বিপজ্জনক প্রমাণিত হল।

এহেন পরিস্থিতিতে সুলতান তাঁর ঝটিকাবাহিনী সাথে নিয়ে সেরিংগাপটম থেকে বেরিয়ে এলেন এবং মলুলীর কাছ জেনারেল হিয়ার্সের সেনাবাহিনীর গতিরোধ করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সুলতানের অফিসারদের গাদ্দারীর দরুন জেনারেল হিয়ার্স পথের সংকটময় মন্‌যিলগুলো পার হয়ে এসেছেন। সুলতান মলুলীর কাছে উপর্যুপরি হামলা ক'রে দুশ্‌মনের অসংখ্য সিপাহীকে মৃত্যুর গহবরে পাঠালেন, কিন্তু জেনারেল হিয়ার্সের অগুণ্‌তি ফউজের সামনে তাঁরা দাঁড়াতে পারলেন না। তারপর যখন আচানক খবর এলো যে, পশ্চিম থেকে বোম্বাইয়ের বাহিনী সেরিংগাপটমের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন মুললীর আশপাশে চূড়ান্ত যুদ্ধের ইরাদা বর্জন করে তাঁকে পিছু হটতে হল। জেনারেল হিয়ার্স তাঁর পশ্চাদ্ভাগে সুলতানের হামলার বিপদ সম্ভাবনা অনুভব করে সোজা সেরিংগাপটমের দিকে না গিয়ে দীর্ঘ পথ ধরলেন। মহীশূরের গাদ্দারদের প্রভাব-প্রতিপত্তির দরুন সেদিকে কোনো বাধার আশংকা ছিলো না। কেল্লার দু' মাইল দূরে তাঁরা শিবির সন্নিবেশ করলেন। এবার সেরিংগাপটমের দ্বীপ ও জেনারেল হিয়ার্সের ফউজী তাঁবুর মাঝখানে কাবেরী নদী ছাড়া আরো ছিলো সুলতানের বহির্ভাগের চৌকিসমূহ। সেখানকার তোপখানা ইংরেজের কঠিন ক্ষতি সাধন করছিলো। জেনারেল হিয়ার্স কয়েকবার উপর্যুপরি হামলা করে চৌকিগুলো দখল করে নিলেন এবং

সেরিংগাপটমের পাঁচিল থেকে প্রায় এক মাইল দূরে তাঁর ভারী তোপ বসালেন।

জেনারেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বাধীনে বোম্বাইয়ের সেনাবাহিনী সুলতানের বিশ্বস্ত অফিসারদের বাধাদানের ফলে সেরিংগাপটম থেকে কয়েক মাইল দূরে পড়েছিলো। জেনারেল হিয়ার্স স্টুয়ার্টের সাহায্যের জন্য কয়েকটি সেনাদল পশ্চিমদিকে পাঠালেন। সুলতান টিপু এ অবস্থার সম্পর্কে অবহিত হয়ে মীর কমরুদ্দীনকে স্টুয়ার্টের পথরোধ করার জন্য পাঠালেন। কিন্তু দুভার্গ্যবশত মহীশূরের এ ভাগ্যান্বেষী অফিসারও গাদ্দারদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর তরফ থেকে কোনো বাধার মোকাবিলা না করে জেনারেল হিয়ার্সের সেনাদল বোম্বাইয়ের লশকরের সাথে মিলিত হল এবং অনতিকাল মধ্যে তারা সেরিংগাপটমের নিকটে পৌঁছে গেলো। হামলাকারী সেনাবাহিনীর যে কাজ সমাধা করতে কয়েকমাস লাগতো, তা' কয়েকদিনে সম্পন্ন হয়ে গেলো।

এপ্রিল মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও মীর নিযাম আলীর তামাম ফউজ সেরিংগাপটমের আশপাশে এসে জমা হল। কিন্তু যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও জেনারেল হিয়ার্স অনুভব করতে লাগলেন যে, আড়াই সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধের ফয়সালা হয়ে না গেলে তাঁর হাজার হাজার সিপাহীকে অনশনে মরতে হবে। তিনি আশা করেছিলেন যে, বোম্বের ফউজ তাদের সাথে নিয়ে আসবে যথেষ্ট রসদসামগ্রী। কিন্তু জেনারেল স্টুয়ার্টের আগমনে তিনি জানতে পারলেন যে, নিজের সিপাহীদের জন্য তিনি রসদের ঘাটতি অনুভব করছেন। সুতরাং ১৮ই এপ্রিলের পর তিনি তাঁর সিপাহীদের অর্ধেক রেশন দিয়ে চালিয়ে নেবার হুকুম দিলেন। তাঁর নিজস্ব অনুমান মোতাবিক এমনি অর্ধেক রেশনেও মাত্র আঠারো দিন চলতে পারতো।* ভারবাহী জানোয়ারদের খোরাকের অবস্থা ছিলো এর চাইতেও খারাপ। এহেন অবস্থায় পরবর্তী আড়াই তিন সপ্তাহ ছিলো দক্ষিণ হিন্দুস্তানের ইতিহাসের এক চূড়ান্ত সংকটময় সময়। বর্ষার মওসুম পর্যন্ত যুদ্ধ বিলম্বিত হলে কোনো মোজেযাই ইংরেজদের ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারতো না। কয়েকদিনের মধ্যে সেরিংগাপটম দখল করা জেনারেল হিয়ার্সের জন্য এক জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে উঠছিলো। তখনো সেরিংগাপটমের পাঁচিল হামলাকারী লশকরের মধ্যে কয়েকটি প্রতিরক্ষা চৌকির ব্যবধান রয়েছে এবং চৌকিগুলো দখল ক'রে কেল্লার উপর কার্যকরীভাবে গোলাবর্ষণ সম্ভব ছিলো না। জেনারেল হিয়ার্স গুরুতর ক্ষতি সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে কয়েকদিন উপর্যুপরি হামলা চালাতে থাকলেন চৌকিগুলোর উপর। ২৬শে এপ্রিলের মধ্যে কেল্লার আশপাশে তাঁরা এমন কয়েকটি স্থান দখল করে নিলেন, যেখান থেকে তোপের গোলাবর্ষণ করে প্রাচীর গাত্রে গর্ত বানানো যেতে পারে।

ছাব্বিশ

শাহী মহলের এক কামরায় সুলতানের উযিরবৃন্দ এবং বেসামরিক ও সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদল সমবেত হয়েছেন। বাইরে উপর্যুপরি তোপের আওয়ায শোনা

* জেনারেল হিয়ার্স ১৮ই এপ্রিল লর্ড ওয়েলেসলীর নামে প্রেরিত এক পত্রে জানানঃ 'আজ ভোরে চাউলের সঠিক পরিমাণ জানা গেছে। যোদ্ধা সিপাহীদের মাত্র অর্ধেক রেশন দিয়েও মাত্র আঠারো দিন চালিয়ে নিতে পারি। মে মাস পর্যন্ত কর্নেল রীড রসদ নিয়ে না পৌঁছলে আমাদের খাদ্য ভাণ্ডার সম্পূর্ণ খতম হ'য়ে যাবে।'

যাচ্ছে। সমাগত লোকদের দৃষ্টি সামনে কামরার দরযার দিকে নিবদ্ধ। তাঁদের মুখ দেখে মনে হয়, তাঁরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতীক্ষা ঘটনার প্রতীক্ষা করে রয়েছেন। আচানক সুলতান টিপু ফউজী লেবাস পরিহিত অবস্থায় বেরিয়ে এলেন। সমাগত ব্যক্তিগণ আদব সহকারে দাঁড়িয়ে গেলেন। সুলতান তাঁদেরকে বসবার ইশারা দিয়ে দ্রুতপদে গিয়ে মসনদে উপবেশন করলেন। তারপর কয়েক মুহূর্ত মজলিসে সমাগত ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে সুলতান বললেনঃ 'মহীশূরের যুদ্ধে সেরিংগাপটমের চার দেওয়ালের মধ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এটা আমার কাছে সব চাইতে পীড়াদায়ক। এ যুদ্ধ এড়ানোর জন্য আমি সর্ববিধ চেষ্টাই করেছি। কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য দুশমন যে সব শর্ত পেশ করেছে, তা'হচ্ছেঃ প্রথমত, আমি আমার অর্ধেক সালতানাত তাদেরকে ছেড়ে দেবো এবং দু'কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করবো। দ্বিতীয়ত, আমার চার পুত্র ও ফউজের চারজন বেড়ো অফিসারকে যামানত হিসাবে তাদের হাতে দেবো। আমায় এ শর্ত মন্যুর করার জন্য চব্বিশ ঘন্টা এবং যামানত পেশ করার ও ক্ষতিপূরণের অর্ধেক অর্থ আদায়ের জন্য আটচল্লিশ ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে। আমি নিজস্ব ফয়সালা দেবার আগে তোমাদের মতামত জানতে চাই।'

দরবারের লোকদের মধ্যে একটা শূন্যতা ছেয়ে গেলো। মীর সাদিক তাঁর ডানে বাঁয়ে পূর্ণিয়া, কমরুদ্দীন, মীর মুঈনুদ্দীন ও অন্যান্য উযিরদের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে উঠে বললেনঃ 'আলীজাহ্ ! প্রজাদের ভবিষ্যত চিন্তা করা শাসকের কর্তব্য। আমরা হুযুরের খাদেম এবং হুযুরের ইশারায় জান দেওয়া আমাদের ঈমানের অংশ।'

মীর সাদেক বসে পড়লেন এবং মীর মুঈনুদ্দীন উঠে বললেনঃ 'আলীজাহ্, এহেন অবস্থায় দুশমনের শর্ত মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের কোনো চারা নেই। সেরিংগাপটমকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ....."

সুলতান মীর মুঈনুদ্দীনের মুখে উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং তাঁর আওয়ায গলায় আটকে গেলো। পিছনের সারিতে ফউজের নওজোয়ান অফিসাররা অন্তহীন উদ্বেগের মধ্যে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। সুলতান মীর মুঈনুদ্দীনকে বললেনঃ 'বলুন, খামোশ হয়ে গেলেন কেন?'

মুঈনুদ্দীন সাহস করে বললেনঃ 'আলীজাহ্ আমি বলতে চাচ্ছি যে, বর্তমান অবস্থায় বেশী সময় আমরা দুশমনকে সেরিংগাপটমের চার দেওয়ালের বাইরে ঠেকিয়ে রাখতে পারবো না। দুশমনের শর্ত খুবই অবমাননাকর, তা' আমি মানি। কিন্তু আমার ভয় হয়, আজ সন্ধির মওকা হারালে কয়েকদিন পর তারা আমাদেরকে আরো কঠোর শর্ত মানতে বাধ্য করবার চেষ্টা করবে।'

মহীশূর ফউজের বিচক্ষণ অফিসার গাযী খানের ভ্রূ পর্যন্ত পেকে সাদা হয়ে গেছে। মীর মুঈনুদ্দীন বসে পড়লে তিনি উঠে বললেনঃ 'সুলতানে মোয়াযযম, আমাদের মধ্যে দুশমনের সংকল্প সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করবার মতো কেউ

নেই। ইংরেজ আমাদেরকে বারংবার ধোকা দিতে পারে না। এ তাদের শেষ শর্ত নয়; বরং জেনারেল হিয়ার্সের ধারণা, হুযুরের সাহেবযাদারা যখন তাঁর কবযায় চলে যাবেন, তখন তিনি এর চাইতে নিকৃষ্ট শর্ত মানতেও আমাদেরকে বাধ্য করতে পারবেন। যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ হতাশ হলেও আমার কাছে এ ধরনের শর্ত কখনো গ্রহণযোগ্য হত না। কিন্তু সেরিংগাপটমের যে চল্লিশ হাজার প্রাণপণ যোদ্ধা আপনার হুকুমে জান দেওয়াকে তাদের যিন্দেগীর সব চাইতে বড়ো সৌভাগ্য মনে করে, তাদের শৌর্য ও সাহসের উপর ভরসা আছে আমার। মীর মুঈনুদ্দীন জেনারেল হিয়ার্সের শর্ত কবুল করবার পরামর্শ দিয়ে সেই স্বাধীনতাকামীদের সঠিক মনোভাব প্রকাশ করেননি, তার জন্য আমি দুঃখিত। আমি পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে বলতে পারি, দুশমন এ যাবত যে সাফল্য হাসিল করেছে, তার কারণ এ নয় যে, মহীশূরের সিপাহীরা কোনো ময়দানে বুয্দীলী বা আত্মসম্ভ্রবোধহীনতার পরিচয় দিয়েছে বরং তার কারণ শুধু এই যে, আমাদের ফউজের কোনো কোনো পরিচালক বিভিন্ন ফ্রন্টে অন্তহীন অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের সকল সিপাহ্সালার কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিলে আজ দুশ্মন লশকরকে সেরিংগাপটম থেকে কয়েক মন্যিল দূরে থাকতে হত। মহীশূরের সিপাহীরা এ কথা মানতে রাযী নয় যে, প্রত্যেক ফ্রন্টে দুশমন তাদেরকে পরাজিত করার পর এখানে পৌছে গেছে। তাদের একমাত্র অভিযোগ, কয়েকটি ময়দানে তাদেরকে শৌর্য প্রদর্শনের মওকা দেওয়া হয়নি। এই মুহূর্তে আমি আমার কোনো সাথীর অতীত ত্রুটির সমালোচনায় কোনো ফায়দা দেখতে পাচ্ছি না। তথাপি এ কথা আমি অবশ্যি বলবো, আজো যদি আমরা এই সংকল্প নিয়ে বেরোই যে, আমরা অতীতের ত্রুটির পুনরাবৃত্তি হতে দেবো না, তা'হলে কয়েকদিনের মধ্যেই দুশ্মনের সকল পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।'

গাযী খানের বক্তৃতার মধ্যে পিছনের সারিতে উপবিষ্ট ফউজী অফিসারদের মুখে আশার উজ্জ্বল দীপ্তি দেখা দিতে লাগলো। তিনি বসে পড়লে শেষ সারি থেকে উঠে আন্ওয়ার আলী বললেনঃ 'আলীজাহ্, গাযী বাবা দুশমনের সন্ধিশর্ত সম্পর্কে সকল স্বাধীনতাকামী মানুষের মনোভাবের প্রতিধ্বনি করেছেন। যে সব মানুষকে আপনি ইয্যতের যিন্দেগীর পথ দেখিয়েছেন, তাদের কাছে এ শর্ত তলোয়ারের আঘাতের চাইতেও অধিকতর পীড়াদায়ক। এখনো আমরা যিন্দা রয়েছি এবং এ শর্তের বিরুদ্ধে আমাদের কবরে, মাটিও প্রতিবাদ করবে। সৈয়দ সাহেব (মীর মুঈনুদ্দীন) আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, আজ যদি আমরা দুশমনের সন্ধিশর্ত কবুল না করি, তা'হলে কয়েকদিন পর তারা আমাদেরকে আরো কঠোর শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করবার চেষ্টা করবে। কিন্তু যদি গোস্তাখী না হয়, তা'হলে আমি তাঁর খেদমতে আরয করবো যে, মৃত্যুর আগে আমাদের কবরে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করা উচিত হবে না। আজ যখন আমাদেরকে এখানে হাযির হবার হুকুম দেওয়া হয়েছে, তখন আমরা মনে করেছি যে, আমাদেরকে এখানে হাযির অতীতের ত্রুটি সম্পর্কে চিন্তা করবার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং যে

সিপাহীরা অভিযোগ করছে যে, সেরিংগাপটম থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে দুশমনকে বাধা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি তাঁদেরকে, ফিরে গিয়ে আমরা তাদেরকে আশ্বস্ত করতে পারবো। আমাদের মধ্যে কোনো কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি জেনে শুনে দেশের নিরাপত্তাকে ঠেলে দিয়েছেন বিপদের মুখে, এই ধরনের গুজব তাদেরকে পেরেশান করে দিয়েছে। আলীজাহ্! আমি কারুর উপর দোষারোপ করছি না। কিন্তু বিগত ঘটনা বিবেচনায় মহীশূরের ক্ষুদ্রতম সিপাহীরও এ কথা বলবার হক রয়েছে যে, দুশ্মনের অগ্রগতি প্রতিরোধের ব্যাপারে আমাদের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি যে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, তার নযীর মহীশূরের অতীত ইতিহাসে পাওয়া যাবে না।'

মীর মুঈনুদ্দীন, মীর কমরুদ্দীন মীর সাদিক ও পূর্ণিয়ার আপাদমস্তক অস্বস্তির ভাব পরিস্ফূট হয়ে উঠলো, কিন্তু সুলতানের অগ্নি দৃষ্টির সামনে মুখ খুলবার সাহস হল না কারুর। আনওয়ার আলী আরো বক্তব্য পেশ করে বললেনঃ 'আলীজাহ্, আমাদের সামনে রয়েছে দু'টি মাত্র পথ। এক হচ্ছে, আমরা পূর্ণ শক্তিতে দুশ্মনের মোকাবিলা করবো এবং আমরা তাদের কাছে প্রমাণ করে দেবো যে, এ দেশের বাচ্চা বুড়ো জোয়ান সবাই আযাদীর মূল্য আদায় করতে প্রস্তুত। দ্বিতীয় পথ হচ্ছে, লড়াই না করে গোলামীর যিন্দেগী নিয়ে তুষ্ট থাকা। প্রথম পথ ধরলে আমাদেরকে এক দীর্ঘ ধৈর্য-সাপেক্ষ যুদ্ধের দুঃখকষ্টের মোকাবিলা করতে হবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনার জীবনপণ যোদ্ধারা সকল দুঃখ-কষ্টের তুফানের ভিতর দিয়ে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে যেতে পারবে। যদি আমরা দ্বিতীয় পথ ধরি, তা'হলে আমাদের অবস্থা মৃত্যুভয়ে আত্মহত্যাকারীদের চাইতে আলাদা কিছু হবে না। জেনারেল হিয়ার্স একদিকে সেরিংগাপটমের আশপাশে তাদের আবেষ্টনী পুরো করছেন, অপর দিকে সন্ধি আলোচনা অব্যাহত রাখতে চাইছেন। তার অর্থ এছাড়া আর কিছু নয় যে, যতোক্ষণ না তাদের তলোয়ার আমাদের শাহ্রগ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, ততোক্ষণ তাঁরা আমাদেরকে আত্মতুষ্ট করে রাখতে চান।'

সুলতান টিপু হাত উঁচু করলে আন্ওয়ার আলী খামোশ হয়ে গেলেন। সুলতান বললেনঃ নওজোয়ান, কি করে তুমি ভাবলে যে, আমি দুশ্মনের এই অবমাননাকর শর্ত মেনে নেবার জন্য তৈরী হয়েছি?'

আন্ওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'আলীজাহ্, আপনি যে এই অবমাননাকর শর্ত মেনে নেবেন, তা' আমার কল্পনায়ও আসতে পারে না। আমি শুধু বলতে চাই, আমাদের মধ্যে যদি কেউ ইংরেজের সংকল্প সম্পর্কে কোনো মিথ্যা আশা পোষণ করেন, তা'হলে তাঁদের দূর হয়ে যাওয়া উচিত। আমাদের জন্য শুধু সেই সন্ধিশর্তই হবে সম্মানজনক, যা'লেখা হবে মহীশূরের সিপাহীর তলোয়ারের মুখে। আমি আমাদের পরিচালক ও সাথীদের খেদমতে আরয করছি, এই যুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে হলে তাদেরকে পুরো নেক নিয়তের সাথে শপথ করতে হবে যে, ভবিষ্যতে আর অতীতের সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করবেন না। যে ফউজকে আমরা কয়েকমাস মহীশূরের সীমান্তে বাধা দিয়ে

রাখতে পারতাম, সেই ভুলের জন্যই তারা কয়েক দিনের মধ্যে সেরিংগাপটমের চার দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে আমি হতাশ হইনি, কিন্তু এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমরা আর কোনা ভুলত্রুটি বরদাশ্‌ত করে যেতে পারবো না। প্রত্যেক পর্যায়ে আমাদেরকে এমন লোক সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, যাদের চোখে ইংরেজের গোলামী তকমা সুদৃশ্য অলংকারের মতো লোভনীয়।

আন্‌ওয়ার আলী তাঁর বক্তব্য শেষ করে বসে পড়লেন। সুলতান টিপু বললেনঃ অতীতের ঘটনা সম্পর্কে আমি বেখবর নই। আমি এ কথাও স্বীকার করি যে, আমার কোনো কোনো নির্ভরযোগ্য অফিসার লজ্জাজনক গাফলতি ও ত্রুটির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিলে দুশ্‌মনের লশকর আজ সেরিংগাপটম থেকে বহু ক্রোশ দূরে থাকতো। কিন্তু এই মুহূর্তে অতীতের ঘটনাবলী নিয়ে বিতর্ক করে কোনো ফায়দা নেই। আমি তোমাদের প্রত্যেককে অতীত ত্রুটির প্রতিকারের মওকা দিচ্ছি। আমি দুশ্‌মনের অবমাননাকর সন্ধিশর্ত অগ্রাহ্য করবার ফয়সালা করেছি। তার কারণ আমার পুত্রদের চিন্তা নয়। যদি এসব শর্ত স্বীকার করে নেওয়ায় আমার জনগণের কোনো ফায়দা দেখতে পেতাম এবং ইংরেজ যামানত হিসাবে আমার পুত্রদের সবাইকে দাবি করতো, তা'হলে আমি তোমাদের পরামর্শ না নিয়েই তাদেরকে ইংরেজের হাত সমর্পণ করে দিতাম। কিন্তু আমার কাছে আমার জনগণের প্রত্যেকটি শিশুর ভবিষ্যত আমার পুত্রদের ভবিষ্যতের চাইতে প্রিয়তর। যদি তোমরা মনপ্রাণ দিয়ে আমায় সাহায্য করো এবং ওয়াদা করো যে, ভবিষ্যতে তোমাদের তরফ থেকে আর কোনো ত্রুটি হবে না, তা'হলে তোমাদেরকে নিশ্চয়তা সহকারে খোশখবর দিতে পারি যে, খোদা এ যুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান করবেন। মহীশূরে তোমাদের ইয্‌যত ও আযাদীর পতাকা অবনমিত হবে না।

'দুশ্‌মনের অবস্থা আমাদের কাছে পুশিদা নেই। এই মুহূর্তে তাদের সিপাহীরা অর্ধেক রেশনে দিন কাটাচ্ছে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তারা ক্ষুধায় মরতে শুরু করবে। চারার ঘাটতির দরুন হাজার হাজার ঘোড়া ও বলদ প্রতিদিন মারা যাচ্ছে। কয়েকদিনের মধ্যে বর্ষা শুরু হয়ে যাবে। জেনারেল হিয়ার্স তীব্রভাবে অনুভব করছেন যে, বর্ষার মওসুমের পূর্বে যুদ্ধ খতম না হলে তাঁকে এক শোচনীয় ধ্বংসের মোকাবিলা করতে হবে। তোমাদের প্রতি মুহূর্তে সচেতন থাকা প্রয়োজন। যে দিন কাবেরী নদীর পানি স্ফীত হয়ে উঠতে থাকবে, আমি সেদিন তোমাদেরকে পূর্ণ নিশ্চয়তা ও আশ্বাসের সাথে খোশখবর শোনাতে পারবো যে, আমরা যুদ্ধ জয় করেছি। বর্ষার মওসুমে দুশ্‌মনের অগুণ্‌তি ফউজ থাকবে আমাদের রহম ও করমের উপর এবং আমরা জওয়াবী হামলা না করে কেবল রসদ ও সেনা সাহায্যের পথ রোধ করে দুশ্‌মনের শিবিরকে এক প্রশস্ত কবরস্তানে রূপান্তরিত করতে পারবো। এই মুহূর্তে আমাদের সামনে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে এই যে, বর্ষার মওসুমের শুরু পর্যন্ত দুশমনকে সেরিংগাপটমের চার দেওয়াল থেকে দূরে রাখতে হবে আমাদেরকে এবং বর্ষার দিকে তাদের অবস্থা ভারী বোঝা নিয়ে জলার মধ্যে আটকে মরা হাতীর চাইতে আলাদা হবে না। তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন করতে

পারোঃ দুশ্‌মন তাদের গুরুতর ক্ষতি সত্ত্বেও যদি বর্ষার শেষ পর্যন্ত সেরিংগাপটম অবরোধ করে থাকে, তা'হলে আমরা কতোদিন তাদের মোকাবিলা করতে পারবো? আমার জওয়াব হচ্ছেঃ নিজস্ব শক্তির চাইতে আমাদের দুর্বলতার অনুভূতিই দুশ্‌মনকে এই যুদ্ধের দিকে টেনে এনেছে। ইউরোপ ও হিন্দুস্তানে আসন্ন বিপদ থেকে মুক্ত হয়েই তারা সেরিংগাপটমের উপর হামলা করেছে এবং তাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে, বাইরে থেকে কোনো সাহায্য আমরা পাবো না। কিন্তু আমি খোদার রহমত সম্পর্কে হতাশ হইনি। দুশ্‌মন যে অবস্থার ফায়দা নিয়েছে, তা' প্রতি মুহূর্তে বদলে যেতে পারে। যামান শাহ্‌র ফিরে যাওয়ার অর্থ এ নয় যে, কুদরত আমাদের শেষ অবলম্বন চিরকালের জন্য ছিনিয়ে নিয়েছেন। আমি লাহোরে যে দূত পাঠিয়েছি, সে খবর পাঠিয়েছে যে, কতকগুলো বিশেষ অবস্থায় নিরুপায় হয়ে আফগানিস্তানের শাসককে ফিরে যেতে হয়েছিলো। আফগানিস্তানের অবস্থা দূরস্ত করেই তিনি ফিরে আসবেন এবং যতোক্ষণ হিন্দুস্তান থেকে ইংরেজের হামলার বিপদ সম্ভাবনা চিরদিনের জন্য দূর না হবে, ততক্ষণ তিনি বসবেন না। আমার দূত যামান শাহ্‌র পিছু পিছু লাহোর থেকে আফগানিস্তান রওয়ানা হয়ে গেছে এবং খোদার ইচ্ছা হলে সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে না। তোমরা শীগ্‌গিরই খোশখবর শুনতে পাবে যে, যামান শাহ্‌ পুনরায় দিল্লীর পথ ধরেছেন। আমি আরো আশা করি, ভূমধ্যসাগরে ফ্রান্সের জংগী নৌবহরকে পরাজিত করে ইংরেজ যতোটুকু নিশ্চিন্ত হয়েছে, তা' নেহায়েত ক্ষণস্থায়ী প্রমাণিত হবে এবং নেপোলিয়ান ইউরোপে খুব শীগ্‌গিরই এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করবেন যে, ইংরেজকে তাতে জড়িত হয়ে হিন্দুস্তান থেকে সরে পড়তে হবে।

এই যুদ্ধে মারাঠাদের নিরপেক্ষতা আমাদের সব চাইতে বড়ো সাফল্য। তারা যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বন্ধু মনে করে না, এ হচ্ছে তারই প্রমাণ। এখনো আমি তাদেরকে আমাদের সাথে মিলিত হতে সম্মত করতে পারিনি, অথাপি আমি আশা করি, যদি কিছুকাল এ যুদ্ধ চলতে থাকে এবং আমরা মযবুত হয়ে দুশ্‌মনের মোকাবিলা করতে পারি, তা'হলে মারাঠা এ দেশকে কোম্পানীর যুদ্ধসংকল্প থেকে নাজাত দেবার জন্য আমাদের সাহায্য করতে সম্মত হবে। তাদেরকে শুধু এতটুকু আশ্বাস দেওয়া প্রয়োজন যে, মহীশূরের সিপাহীরা হিন্দুস্তানের নিকৃষ্টতম দুশ্‌মনের বিরুদ্ধে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে যাবার ফয়সালা করেছে।

'আমি প্রত্যেক দিক দিয়েই এই যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে আশান্বিত, কিন্তু পূর্ণ আশান্বিত না হলেও তোমাদেরকে আমায় বলতে হবে যে, আমাদের লড়াই করা ছাড়া কোনো চারা নেই। এ দুনিয়ায় ইয্‌যত ও আযাদীর যিন্দেগীর সকল দরযা বন্ধ হয়ে যাবার পর আমাদের সামনে একটি পথ সব সময়েই খোলা থাকবে এবং সে পথ হচ্ছে ইয্‌যতের মৃত্যুর পথ। তোমাদের দুশ্‌মনের সংকল্প কি এবং তোমরা ইযযতের যিন্দেগী অথবা ইয্‌যতের মৃত্যুর আকাংখী হলে কুদরত তোমাদের কাছে কি দাবি করে, শুধু তাই বলবার জন্যই আমি তোমাদেরকে জমা করেছি এখানে। এরপর আর তোমাদের কোনো অবহেলা ও ত্রুটি আমি বরদাশত করবো না। এখন তোমরা যেতে পারো।'



সেই রাত্রে ফউজের কতিপয় অফিসার কেল্লার এক প্রশস্ত কামরায় সেরিংগাপটমের ফউজদার সৈয়দ গাফফারের সামনে উপবিষ্ট। আন্ওয়ার আলী কামরায় প্রবেশ করে সৈয়দ গাফ্ফারকে সালাম করে বললেনঃ 'জনাব, মাফ করবেন। আমার একটুখানি দেরী হয়ে গেলো। উত্তরদিকের পাঁচিলের উপর দুশ্‌মনের তীব্র গোলাবর্ষণের ফলে আমার দু'জন শ্রেষ্ঠ অফিসার যখমী হয়েছেন। তাদের মধ্যে এক নওজোয়ানের অবস্থা খুব নাযুক একং কিছুক্ষণ আমায় তার কাছে থাকতে হয়েছে।'

সৈয়দ গাফ্ফার তাঁকে বসার জন্য ইশারা করে সমাগত ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'গাযী খান এখনো আসেন নি। আমরা তাঁর জনা বেশী সময় ইন্তেযার করতে পারবো না। আমি আপনাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের জন্য এখানে জমা হবার তকলীফ দিয়েছি, কিন্তু আমার কথা শুরু করার আগে আমি আপনাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিতে চাই যে, আমাদের কোনো কথা এ কামরার বাইরে যাবে না।'

এক অফিসার উঠে বললেনঃ 'আমরা সবাই হলফ করতে তৈরী।

ঃ 'আপনাদের হলফ করবার প্রয়োজন নেই। আপনাদের উপর আমার বিশ্বাস রয়েছে। আমি শুধু বলতে চাই যে, আপনাদের মধ্যে কেউ বিন্দুমাত্র অসতর্ক হলে আমাদের সংকট বৃদ্ধি পাবে। 'সৈয়দ গাফ্ফার কামরার দরযায় দাঁড়ানো দু'টি পাহারাদারের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'তোমরা দরযা বন্ধ করে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক। গাযী বাবা তশ্‌রীফ আনলে তাঁকে ভিতরে পাঠিয়ে দিও। আর কারুর এদিকে আসার এজাযত নেই।'

পাহারাদাররা অবিলম্বে হুকুম তামিল করলো এবং সৈয়দ গাফ্ফার পুনরায় সমাগত ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে বললেনঃ 'আমাদের কয়েকজন সাথী এই ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, সুলতানে মোয়ায্যম এখনো সেইসব বড়ো বড়ো অফিসারের বিরুদ্ধ কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি, যাঁরা দুশমনদের পথরোধ করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট গাফ্লতি, অবহেলা ও বদনিয়তের পরিচয় দিয়েছেন।'

মজলিসে সমবেত ব্যক্তিদের সৃষ্টি সহসা নিবদ্ধ হল আন্ওয়ার আলীর মুখের উপর এবং তিনি জলদী উঠে বললেনঃ 'জনাব, আমি স্বীকার করছি যে, যাঁরা সালতানাতের অযোগ্য, অবিশ্বস্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন অনুভব করেন, আমিও তাঁদের সাথে একমত। শুধু আমিই নই, সুলতানের প্রত্যেকটি জীবনপণ যোদ্ধা এই পরিস্থিতিতে পেরেশান হয়ে পড়েছেন।'

সৈয়দ গাফফার খানিকটা গরম হয়ে বললেনঃ 'আন্ওয়ার আলী, বসে পড়ো। তোমাদের এ মনোভাব সংযত করা প্রয়োজন। এ পরিস্থিতিতে আমিও কম পেরেশান নই। কিন্তু আমি এইমাত্র সুলতানের সাথে মোলাকাত করে এসেছি এবং আমি তোমাদেরকে আশ্বাস দিতে পারি যে, এ ব্যাপার সম্পর্কে তিনি আমাদের

চাইতে অধিকতর অবহিত। তুমি তোমার বক্তব্যে প্রথম সারিতে উপবিষ্ট কয়েকজনের সম্পর্কেই শুধু অস্পষ্ট ইশারা করেছো, কিন্তু তুমি জানো না, এ বিষ কতো দূরে ছড়িয়ে গেছে। যদি কয়েকজন বড়ো লোকের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করে এ সমস্যার সমাধান হত, তা'হলে সুলতানে মোয়ায্যম তাতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করতেন না। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের অফিসাররা সেরিংগাপটমের ভিতর ও বাইরের গাদ্দারদের যে তালিকা পেশ করেছেন, তা' আমাদের প্রত্যাশার চাইতে অনেকখানি দীর্ঘ এবং তাদের মধ্যে এমন বহু লোকের নাম শামিল রয়েছে যারা কাল পর্যন্ত সুলতানের জীবনপণ যোদ্ধাদের প্রথম কাতারে গণ্য হতেন এবং তাঁদের অতীত খেদমত বিবেচনায় তোমারও বিশ্বাস করতে মুশ্‌কিল হবে যে, তাঁরা সুলতানের সাথে গাদ্দারী করতে পারেন সুলতানে মোয়ায্যমের শুধু এই আফসোস যে, দুশ্‌মনের তলোয়ার যখন আমাদের শাহ্‌রগের কাছে পৌঁছে গেছে, তহনই তিনি জানতে পেরেছেন তাঁদের সংকল্প। দুশ্‌মনের অগ্রগতির আগে যদি তিনি এ পরিস্থিতি জানতে পারতেন, তা'হলে তাঁদের সাথে বোঝাপড়া করতে মুশ্‌কিল হত না, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমরা কোনো দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারছি না। দুশ্‌মন একদিকে রসদের ঘাটতি ও অপরদিকে বর্ষার মওসুম আসার ভয়ে আগামী দশ-পনেরো দিনের মধ্যে সেরিংগাপটমের উপর চূড়ান্ত হামলা করার চেষ্টা করবে এবং এই সময়ের মধ্যে আমরা কোনো আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিপদ টেনে আনতে পারি না। আমাদেরকে খুব বেশী হলে তিনি সপ্তাহ সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। তারপর দুশ্‌মন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েই আমরা ঘরের সাফাইর দিকে মনোযোগ দিতে পারবো। সেরিংগাপটমের ভিতর ও বাইরে গাদ্দারদের একই সংগে গ্রেফতার করা এবং কাউকেও গোলযোগ সৃষ্টির বা পালিয়ে যাওয়ার মওকা না দেওয়া নেহায়েত জরুরী। গাদ্দারদের উপর অবিলম্বে হাত দেওয়া সুলতানে মোয়ায্যমের দ্বিধার কারণও এই যে, আমাদের গুপ্তচর বিভাগ যেসব লোকের তালিকা পেশ করেছে, তাদের মধ্যে এমন বহু লোক রয়েছে যাদের বিরুদ্ধে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

আন্‌ওয়ার আলী বললেনঃ 'আপনি বলতে চান যে, মীর কমরুদ্দীন, মীর মুঈনুদ্দীন ও পূর্ণিয়ার মতো লোকেরা এখনো অপরাধী সাব্যস্ত হন নি?'

সৈয়দ গাফ্‌ফার জওয়াব দিলেনঃ 'ঘটনার আলোকে তাঁদের উপর অযোগ্যতা বা বুয্‌দীলীর অপরাধ আরোপ করা ঠিক হতে পারে, কিন্তু তাঁদেরকে গাদ্দার প্রমাণ করার মতো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আমাদের গুপ্তচর এখনো পেশ করতে পারে নি। পূর্ণিয়ার সম্পর্কে আমি এতটা বলতে পারি যে, সামরিক অভিযানের জন্য তাঁর নির্বাচন ছিলো সম্পূর্ণ ভূল এবং তিনি আপাতদৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি করেন নি। কিন্তু কমরুদ্দীন ও সৈয়দ সাহেব সম্পর্কে সুলতানে মোয়ায্যমের ধারণা আমাদের অনুরূপ। সুলতানে মোয়ায্যম আমায় আশ্বাস দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে তাঁদেরকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদারী দেওয়া হবে না। তথাপি যতোক্ষণ তাঁরা ফউজে রয়েছেন, মহীশূরের প্রত্যেক বিশ্বস্ত অফিসার ও সিপাহীকে কড়া নযর রাখতে হবে। মুঈনুদ্দীন

ও কম্‌রুদ্দীন ছাড়া আরো প্রায় ত্রিশজন লোকের বিরুদ্ধে গোপন তদন্ত শুরু হয়ে গেছে এবং যতোক্ষণ না তদন্তের ফল আমাদের সামনে আসে, ততোক্ষণ তাদের কার্যকলাপের দিকে নযর রাখতে হবে আমাদেরকে।

এক অফিসার উঠে বললেনঃ 'সেই ত্রিশজন লোক কারা?'

ঃ 'তাদের নাম গাযী বাবার কাছ থেকে জানা যাবে, কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি, এখনো তিনি কেন এলেন না?'

আচানক কামরার বাইরে কয়েকজন লোকের কোলাহল শোনা গেলো এবং সমাগত লোকেরা অবাক-বিস্ময়ে দরযার দিকে তাকাতে লাগলেন। বাইরে থেকে এক ব্যক্তি উঁচু গলায় বললোঃ 'ফউজদার সাহেব ব্যস্ত আছেন, আপনি ভিতরে যেতে পারবেন না।' তারপর অপর এক ব্যক্তি গুরুগম্ভীর আওয়াযে বললোঃ 'ফউজদার সাহেবকে বলো, গাযী বাবা যখমী হয়েছেন এবং তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ।'

সৈয়দ গাফ্‌ফার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে গিয়ে দরযা খুলে প্রশ্ন করলেনঃ গাযী বাবা কোথায়? কি করে তিনি যখমী হলেন?'

ঃ 'জনাব, তিনি এইমাত্র কেল্লার দরযার কাছে পৌছে পড়ে গেলেন। সিপাহীরা তাঁকে তুলে দরযার কাছেই এনে শুইয়ে দিয়েছে। তিনি বেহুঁশ এবং তাঁর লেবাস রক্তাক্ত হয়ে গেছে। চিকিৎসক বলছেন যে, যখমী খুবই বিপজ্জনক।'

সৈয়দ গাফ্‌ফার আর কিছু না বলে সিপাহীর সাথে চললেন। তাঁর সাথীরা এতক্ষণে কামরার বাইরে এসে গিয়েছিলেন। তাঁরাও চললেন তাঁর পিছু পিছু। কিছুক্ষণ পর গাযী খানের শয্যাপার্শ্বে এসে তাঁরা দাঁড়ালেন। মহীশূরের বৃদ্ধ জেনারেল তখন মৃত্যু যাতনায় কাতর। চিকিৎসক তাঁর সিনায় যে পট্টি বেঁধেছেন, তাও রক্তে তর হয়ে গেছে। সৈয়দ গাফ্‌ফার ঝুঁকে পড়ে নাড়ির উপর হাত রেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন চিকিৎসকের দিকে।

ঃ 'ওঁর সিনায় গুলী লেগেছে।' চিকিৎসক বললেন।

ঃ 'গাযী বাবা কোথায় ছিলেন? কি করে যখমী হলেন? ব্যথাতুর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন সৈয়দ গাফ্‌ফার।

গাযী বাবা জওয়াবে তাঁর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং ডুবন্ত আওয়াযে বললেনঃ 'আমি এদিকে আসছিলাম-পথে মালিক জাহান খানের সন্ধান পাওয়া গেলো।- আর আমি......

গাযী খান এই পর্যন্ত বলে কাশতে লাগলেন এবং তার সাথে সাথেই রক্তধারা ছিটকে পড়লো মুখ থেকে। তারপর তিনি চোখ বন্ধ করলেন। ভারাক্রান্ত আওয়াযে সৈয়দ গাফ্‌ফার প্রশ্ব করলেনঃ 'গাযী বাবা, মালিক জাহান খান কোথায়?'

গাযী খান চোখ খুললেন এবং সাথে সাথেই একটা ভারী নিশ্বাস পড়লো। আনওয়ার আলী অন্তহীন বেদনাতুর অবস্থায় এগিয়ে গাযী খানের পেশানীর উপর

হাত রেখে বলে উঠলেনঃ 'গাযী বাবা, খোদার ওয়াস্তে বলুন, কি করে যখমী হলেন আপনি? মালিক জাহান খান কোথায়?'

গাযী খানের ঠোঁট আস্তে নড়ে উঠলো, কিন্তু আন্‌ওয়ার আলী একটা ক্ষীণ আওয়াযের বেশী কিছু শুনতে পেলেন না। কয়েক মুহূর্ত পর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সাথে শেষ হয়ে গেলো তাঁর জীবনের সফর।

চিকিৎসক বাইরে যেতে থাকলে আন্‌ওয়ার আলী জলদী তাঁর পথরোধ করে বললেনঃ 'আমার আশা, আপনি যে কথা এই কামরায় শুনেছেন, তা' আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন। মালিক জাহান খান দীর্ঘকাল নিখোঁজ। সম্ভবত, গাযী খানের হত্যাকারীর সন্ধান করার পর আমরা মালিক জাহান খানেরও সন্ধান পাবো। কেউ আপনাকে প্রশ্ন করলে শুধু বলবেন যে, গাযী বাবা বেহুঁশ অবস্থায় ওফাত পেয়েছেন।'

চিকিৎসক বললেনঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার তরফ থেকে কোনো কথা প্রকাশ হবে না।'

চিকিৎসক বেরিয়ে গেলে আন্‌ওয়ার আলী বাকী লোকদের সম্বোধন করে বললেনঃ 'এ ব্যাপারে আমাদেরকে অন্তহীন গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতে হবে। গাযী বাবা একটা ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের ফলে নিহত হয়েছেন। তিনি আমাদের বৈঠকে শরীক হতে আসছিলেন এবং তাঁর ন'টার সময়ে এখানে পৌঁছবার কথা ছিলো। তাঁর বাসভবন ও কেল্লার মাঝখানে প্রায় দশ মিনিটের পথ। তাই পৌনে ন'টায় তিনি রওয়ানা হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আমাদেরকে কোনো অনুমানের আশ্রয় নিতে হবে না। গাযী বাবার রওয়ানা হবার সময় তাঁর বাসভবন থেকে জানা যাবে, যদি তিনি ন'টার আগে রওয়ানা হয়ে থাকেন, তা'হলে আমাদের সামনে প্রশ্ন ওঠেঃ যখমী হয়ে এখানে আসার আগে প্রায় দেড় ঘন্টাকাল তিনি কোথায় ছিলেন?' আমরা কেবল এতটা জানতে পেরেছি যে, তিনি মালিক জাহান খানের সন্ধানে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোন্‌দিকে গিয়েছিলেন এবং মালিক জাহান খান সম্পর্কে কে তাঁকে খবর দিয়েছিলেন, এসব প্রশ্নের জওয়াব আমাদের কাছে নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস মামুলী অনুসন্ধানের পরই আমরা এ ঘটনার মূলে পৌঁছে যেতে পারবো। গাযী বাবা কোনো অজ্ঞাতনামা লোক ছিলেন না। সেরিংগাপটমের শিশুরাও তাঁকে জানতো। শহরের বাজার বা গলির ভিতর দিয়ে চলতে নিশ্চয়ই কেউ তাঁকে চিনে থাকবে। কম-সে-কম রাতের পাহারাদাররা তাঁকে কোনো না কোনো জায়গায় অবশ্যি দেখেছে। গাযী বাবার সাথে মালিক জাহান খানের অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিলো। সম্ভবত তাঁর হত্যাকারীরা তাঁকে ধোকা দেবার জন্যই মালিক জাহান খান সম্পর্কে কোনো কাল্পনিক কাহিনী তাঁকে শুনিয়েছিলো। কিন্তু মালিক জাহান খান যদি সেরিংগাপটমে মওজুদ থাকেন, তা'হলে আমার মনে হয়, তাঁর জীবনও বিপদের মুখে; কেননা মহীশূরের যে দুশমন গাযী বাবাকে হত্যা করেছে, সে মালিক জাহান খানকেও যিন্দা ছেড়ে দেবার বিপদ বরণ করে নেবে না। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে সে যখন জানতে পারবে যে, গাযী বাবা মরবার আগে মালিক জাহান খান সম্পর্কে কিছু বলে গেছেন, তাই আমি আপনাদেরকে অনুরোধ

করছি যে, আমাদেরকে এই দুর্ঘটনার অনুসন্ধান করতে গিয়ে অন্তহীন সতর্কতা সহকারে কাজ করতে হবে।'

সৈয়দ গাফ্ফার সস্নেহে আন্ওয়ার আলীর কাঁধে হাত রেখে বললেনঃ 'আমি তোমায় এর অনুসন্ধানে পূর্ণ ক্ষমতা দিচ্ছি।'



এক রাত্রে মুনীরা তাঁর কামরায় একা বসেছিলেন। বাইরে বিভিন্ন দিক থেকে ক্রমাগত তোপ ও বন্দুকের গর্জন শোনা যাচ্ছে। গন্ধক ও বারুদের ধোয়ায় আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। পরিচারিকা কামরায় প্রবেশ করে বললোঃ 'বেগম সাহেবা! খান সাহেব আজও আসবেন না হয়তো। বহুত দেরী হয়ে গেলো। আপনার খানা নিয়ে আসি?'

মুনীরা জওয়াব দিলেনঃ 'না আমার ভুখ নেই এখন। তুমি ঘুমোও গে। উনি এসে গেলে আমি নিজেই খানা নিয়ে আসবো।'

পরিচারিকা বললোঃ 'বিবিজী, দুশমন আজ সারাদিন দম নেয় নি। তাদের তোপ সারাটা দিন আগুন বর্ষণ করেছে। মুনাওয়ার বলছিলো এইমাত্র কয়েকটা গোলা এসে পড়েছে আমাদের পাশে। আমাদের কাছেই একটা বাড়ির ছাত ফুটো হয়ে গেছে।'

মুনীরা জওয়াব দিলেনঃ 'মুনওয়ার এ খবর সবার আগে আমায় শুনিয়েছে এবং পাশের বাড়ির ছাতে যে গোলা পড়েছে, তার আওয়ায আমিও শুনেছি।'

পরিচারিকা বললোঃ 'আপনি কয়েক লোকমা খেয়ে নিলেই ভালো হত।'

ঃ 'আমি খেয়ে নেবো। তুমি যাও।'

পরিচারিকা কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো মুনীরা কুরসি থেকে উঠে জানালার সামনে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পর গিয়ে শুয়ে পড়লেন শয্যার উপর। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করার পর চোখে নেমে এলো নিদ্রার আবেশ। আচানক সিড়িতে পদশব্দ শুনে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দৃষ্টি দরযার দিকে নিবদ্ধ হল এবং বুকে অনুভব করলেন আনন্দের কম্পন। আনওয়ার আলী কামরায় প্রবেশ করলে তিনি গিয়ে বেএখ্তিয়ার জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। আনওয়ার আলী তাঁর সোনালী কেশগুচ্ছের উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে ক্লান্ত আওয়াযে বললেনঃ 'মুনীরা, তুমি এখনো জেগে রয়েছো?'

মুনীরা গর্দান তুললেন- হাসলেন- আর তার সাথে সাথেই খুবসুরত চোখ দু'টি থেকে ঝরে পড়লো অশ্রুবিন্দু।

তিনি বললেনঃ 'তশরীফ রাখুন। আমি খানা নিয়ে আসি।

আন্ওয়ার আলী বিছানার উপর বসে বললেনঃ 'আমি খানা খেয়েছি। এখন আমার খানিকটা বিশ্রামের প্রয়োজন।'

ঃ 'আপনার তবিয়ত ভালো তো? বড়োই দুর্বল হয়ে গেছেন আপনি।' মুনীরা কুরসি কাছে টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললেন।

ঃ 'আমি ক্লান্ত মুনীরা, বড়ো ক্লান্ত আমি। যদি সকল অফিসারের উপর সমভাবে নির্ভর করতে পারতাম, তা'হলে এ যুদ্ধ হত খুবই সহজ। কিন্তু সব সময়েই আমাদের ভয়, বিভিন্ন লোক যে কোনো সময়ে আমাদেরকে ধোকা দিতে পারে। গত তিন রাত্রে খুব বেশী হলে ছয়-সাত ঘন্টা ঘুমোবার মওকা পেয়েছি। আজ আমি ক্লান্তি ও ঘুমে অভিভূত হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম এবং সৈয়দ গাফ্ফার আমায় ঘরে এসে ভোর পর্যন্ত বিশ্রাম করে যাবার হুকুম দিলেন।'

মুনীরা বললেনঃ 'আমার বিশ্বাস হয় না, মহীশূরের কোনো সিপাহী সুলতানের সাথে গাদ্দারী করতে পারে।'

ঃ 'মুনীরা, মহীশূরের সাধারণ সিপাহীর দিক থেকে কোনো বিপদ নেই আমাদের। তারা মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত সুলতানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। উঁচু তবকার স্বার্থলোভী মানুষদের নিয়ে আমাদের বিপদ। অন্ধকার পথে তারা চলতে চায় না কওমের সাথে।'

মুনীরা প্রশ্ন করলেনঃ 'এইসব বিশ্বাসের অযোগ্য লোকদের কেন সরিয়ে দেওয়া হয় না ফউজ থেকে?'

আন্‌ওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ 'মুনীরা, কখনো এমন অবাঞ্ছিত সময় আসে, যখন সঠিক পদক্ষেপেও বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায় না। আমাদের ইতিহাসে এখন এমন দিন যাচ্ছে যে, আমরা কোনো আভ্যন্তরীণ বিরোধ বরণ করে নিতে পারছি না। কিন্তু খোদার মেহেরবানী হলে দু'সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধো অবস্থা আমাদের অনুকূলে এসে যাবে এবং আমরা আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারবো। দুশমনের সাথে ষড়যন্ত্রকারী গাদ্দারের সংখ্যা কতো, তা' আমরা আজো জানতে পারি নি। তথাপি তোমায় আশ্বাস দেবার জন্য আমি বলতে পারি যে, যাদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে, তাদেরকে এ যুদ্ধের সময়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদারী দেওয়া হবে না। বঞ্চিত সময় এসে গেলে তোমরা একই সাথে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ খবর শুনতে পাবে। প্রথমত, আমরা দুশমনকে পিছু হটে যেতে বাধ্য করবো; দ্বিতীয়ত, সেরিংগাপটমের ভিতরে এবং সেরিংগাপটমের বাইরে বিভিন্ন শহর ও কেল্লায় সুলতানের বিরুদ্ধে এক বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারী সকল অপরাধীকে গ্রেফতার করে আনবো। এও হতে পারে যে, আজো যারা আমাদের দৃষ্টির অগোচর রয়েছে, পরিবর্তিত অবস্থায় তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করে সুলতানের বিশ্বস্ত বলে আত্মপরিচয় দেবার চেষ্টা করবে এবং আমরা ফউজের মধ্যে বিশৃংখলা ও অসন্তোষ সৃষ্টি না করেই ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে নাজাত হাসিল করতে পারবো।'

মুনীরা কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে প্রশ্ন করলেনঃ 'তা'হলে আপনার বিশ্বাস, কয়েকদিনেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাবে?'

ঃ 'হ্যাঁ মুনীরা, আমার বিশ্বাস তাই। যে সিপাহীরা সুলতান টিপুর মতো পরিচালক পেয়েছে, তারা খোদার রহমত থেকে হতাশ হতে পারে না।'

আন্ওয়ার আলী জুতো খুলে শয্যার উপর শুয়ে পড়লেন। মুনীরা একটুখানি ঝুঁকে তাঁর নাযুক খুবসুরত আঙুলগুলো স্বামীর চুলের মধ্যে চালাতে চালাতে বললেনঃ 'গাযী খানের হত্যাকারীদের কোনো সন্ধান মিললো?

ঃ 'না, এখনো আমরা সফল হতে পারিনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই মরদে মুজাহিদের রক্ত ব্যর্থ যাবে না।'

মুনীরা বললেনঃ 'আমি এখনই আপনার আসার আগে ভাবছিলাম, এই সময় মুরাদ কোথায়। লাহোর থেকে আফগানিস্তানের পথে যাবার পর কোনো খবরই সে দিলো না।'

ঃ 'আমার মনে হয়', যামান শাহ্র সাথে যদি তার মোলাকাত হয়ে থাকে, তা'হলে খুব শীগ্গিরই সে ফিরে আসবে।' বলে আন্ওয়ার আলী চোখ বন্ধ করলেন এবং কয়েক মিনিট পর গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন।



সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পর মীর কমরুদ্দীন তাঁর শানদার মহলের এক কামরায় টহল দিচ্ছেন এক নওকর দরযার দিকে উঁকি মেরে বললোঃ 'হুযুর, সৈয়দ সাহেব তশরীফ এনেছেন।'

কমরুদ্দীন জলদী করে বাইরে গিয়ে দেখলেন, মীর মুঈনুদ্দীন বারান্দার সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেছেন। কমরুদ্দীন এগিয়ে গিয়ে তাঁর সাথে মোসাফাহা করে বললেনঃ 'আপনি বহুত দেরী করেছেন। আমি খুবই পেরেশান ছিলাম। এখনো আমাদের বাকী দোস্তদের কেউ পৌঁছেন নি।'

মীর মুঈনুদ্দীন বললেনঃ 'মীর সাদিক তাদেরকে এখানে আসতে মানা করেছেন।'

মীর কমরুদ্দীন পেরেশানী ও উদ্বেগের মনোভাব নিয়ে মীর মুঈনুদ্দীনের দিকে তাকালে মুঈনুদ্দীন সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ 'মীর সাহেব, পেরেশানীর কারণ নেই। বর্তমান অবস্থায় আমাদের পরস্পর আলাদা হয়ে থাকা জরুরী। এইমাত্র মীর সাদিকের একটি লোক আমার কাছে পয়গাম নিয়ে এসেছে যে, হুকুমতের গুপ্তচর বিশেষ করে আমার ও আপনার পেছনে লেগে রয়েছে। তাই আমাদের বাকী সাথীদের আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন। আমার ও আপনার ব্যাপার মীর সাদিক, বদরুয্যামান খান ও মীর গোলাম আলী থেকে ভিন্ন রকমের। বদরুয্যামান সম্পর্কে তো সুলতান এ কথা শুনতেই রাযী হবেন না যে, তিনি কোনো চুক্তি ভংগ করতে পারেন। পুর্ণিয়া ফউজী ব্যাপারে নিজস্ব অযোগ্যতা ও নির্বুদ্ধিতা স্বীকার করার পর তাঁর উপর সুলতানের সন্দেহ যথেষ্ট পরিমাণে দূর হয়ে গেছে, কিন্তু যেসব অফিসার সরাসরি আমাদের

অধীনে ছিলো, তাদের উপর কড়া নযর রাখা হচ্ছে। আমাদেরকে যে এখনো গ্রেফতার করা হয়নি, তার সব চাইতে বড়ো কারণ, সুলতানের দরবারে বদরুয্যামান খানের প্রভাব-প্রতিপত্তি এখনো কমেনি এবং অবস্থা পুরোপুরি অবগত হবার আগে এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ না করা হয়, তাঁর এ পরামর্শ মেনে নেওয়া হয়েছে।'

কমরুদ্দীন হেসে বললেনঃ 'আমাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার না করার বড়ো কারণ হচ্ছে, মীর সাদিকের চেষ্টায় গাদ্দারের তালিকায় এমন কতকগুলো লোকের নাম শামিল করে দেওয়া গেছে, যাঁদেরকে মহীশূরের সিপাহীরা সন্দেহ সংশয়ের উর্ধ্বে মনে করেন। আপনি শুনে অবাক হবেন যে, গুপ্তচর বিভাগের এক বড়ো অফিসার মীর সাদিকের হাতের মুঠোয়।'

ঃ 'তিনি কে?'

ঃ 'তা আমি জানি না। মীর সাদিক আমাদেরকে সব কিছু জানানো জরুরী মনে করেন নি। সেরিংগাপটমের ভিতরে ও সেরিংগাপটমের বাইরে আমাদের সকল সাথীকে তিনি জানেন, কিন্তু তাঁর বেশীর ভাগ সাথীর সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। ইংরেজ কোন্ দিন কোন্ সময়ে সেরিংগাপটমের উপর চূড়ান্ত হামলা করবে, তা' তিনি জানেন। পাঁচিলের কোন্ অংশে ভাঙন সৃষ্টি করা যাবে এবং জেনারেল হিয়ার্সের রাস্তা সাফ করার জন্য কি ব্যবস্থা করা যাবে, তা'ও তাঁর জানা আছে।'

মীর মুঈনুদ্দীন বললেনঃ 'আমার বারবার মনে হয়, আমরা এতগুলো হুঁশিয়ার লোককে আমাদের সাথী মনে করতে গিয়ে ভূল না করি। যুদ্ধের অবস্থা বদলে গেলে এসব হুঁশিয়ার লোকের কাছ থেকে এটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয় যে, তারা দুশমনের কামিয়াবী সম্পর্কে হতাশ হয়ে তাঁদের স্বার্থ সুলতানের সাথেই জড়িয়ে নেবেন। তাঁরা যদি সুলতানের সাথে গাদ্দারী করতে পারেন, তা'হলে আমাদেরকেও ধোকা দিতে পারবেন। আমাদের বিরুদ্ধে এতসব ব্যাপার তাঁদের জানা আছে যে, যখন ইচ্ছা, ফাঁসির রশি আমাদের গলায় পরিয়ে দিতে পারবেন।'

কমরুদ্দীন জওয়াব দিলেনঃ 'সৈয়দ সাহেব, যতোক্ষণ মালিক জাহান খান সেরিংগাপটমের কয়েদখানায় মওজুদ, ততোক্ষণ মীর সাদিকের দিক থেকে কোনো বিপদ নেই আমাদের। তিনি পূর্ণিয়াকে নিজের সাথে রাখার জন্য মালিক জাহান খানের হত্যার বিরোধিতা করেছিলেন। এখন আমাদের চেষ্টার বিষয়, যতোক্ষণ আমাদের আশংকা দূরা না হচ্ছে, ততোক্ষণ যেনো মালিক জাহান খানের চুলও স্পর্শ না করে এবং আমি তার বন্দোবস্ত করে রেখেছি। কয়েদখানার দারোগা আমার সাথে রয়েছে। তা'ছাড়া এমন একটি লিপি আমার হতে রয়েছে, যা' শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মীর সাদিকের শাহ্‌রগের উপর খঞ্জরের কাজ দেবে।'

মীর মুঈনুদ্দীন হতবুদ্ধি হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন এবং কমরুদ্দীন একটুখানি চুপ করে থেকে বললেনঃ 'আমার কাছে সুলতানের নামে মালিক জাহান খানের লিখিত এক আবেদনপত্র রয়েছে। তাতে তিনি তাঁর গ্রেফতারীর সকল কাহিনী বর্ণনা করেছেন।'

ঃ 'সে আবেদন আপনার হাতে পৌঁছলো কি করে?'

মীর কমরুদ্দীন জওয়াব দিলেনঃ 'আমি কয়েদখানায় দারোগাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং সে মালিক জাহান খানকে দিয়ে আবেদনপত্রটি লিখিয়ে আমার কাছে এনে দিয়েছে। এখন অবস্থা হয়েছে এই যে, কয়েদখানার দারোগা, মীর সাদিক ও আমি পরস্পরকে ধোকা দিতে পারি না। সতর্কতার খাতিরে আমি এই আবেদনপত্রের কথা পূর্ণিয়া ও মীর সাদিককে বলে রেখেছি। আমাদের জন্য সকল সাথীকেই বলে রাখার প্রয়োজন ছিলো যে, ফাঁসির রশি আমাদের সবারই জন্য সমভাবে পীড়দায়ক হবে।'

মুঈনুদ্দীন বললেনঃ 'মীর সাহেব, গাযী খানের হত্যা এখনো আমার কাছে এক রহস্য।'

ঃ কিন্তু আমার কাছে এটা কোনো রহস্য নয়। আমার বিশ্বাস, মীর সাদিকের লোকেরাই তাঁকে হত্যা করেছে। তাঁকে হত্যা করার কারণ, তিনি যেমন ছিলেন বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ, তেমনি ছিলেন আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক।'

ঃ 'আপনি মীর সাদিকের কাছে তাঁর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন?'

ঃ 'না, কিন্তু গাযী খানের হত্যার পূর্বে মীর সাদিক একদিন আমার সাথে যে কথা বলেছিলেন, তা' থেকে আমি আন্দায করেছিলাম যে, তাঁর লোকেরা গাযী খানের পিছু লেগে রয়েছে।

সাতাশ

ইসায়ী ১৭৯৯ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে সেরিংগাপটমের উপর দুশমনের গোলাবর্ষণ চললো প্রচণ্ড বেগে। মহীশূরের গাদ্দাররা প্রতিরক্ষা সম্পর্কে যাবতীয় খবর দুশ্‌মনকে দিয়ে রেখেছে এবং শহরের দুর্বল অংশের উপর দুশ্‌মনের গোলাবর্ষণ চলছে অধিকতর তীব্রতার সাথে। ইংরেজ ধীরে ধীরে তাদের কেল্লাধ্বংসী কামান সামনে এগিয়ে নিচ্ছে এবং তাদের পদাতিক দল হামলা করার জন্য পাঁচিলের ধারে খন্দক খোদাই করেছে। কেল্লার বাইরের পাঁচিলের ঘাঁটিগুলো থেকে দুশ্‌মনের উপর সেরিংগাপটমবাসীদের গোলাবর্ষণ অধিকতর কার্যকরী হতে পারতো এবং তাদেরকে সহজেই পিছু হটিয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু যেসব অফিসার কওমের গাদ্দারদের সাথে মিলিত হয়েছিলো, তারা শুধু লোক দেখানো কার্যকলাপেই তুষ্ট ছিলো। যেখানে সুলতানের বিশ্বস্ত অফিসাররা মওজুদ ছিলেন, দুশ্‌মনদের কেবল সেইসব ঘাঁটিতেই তীব্র বাধার মোকাবিলা করতে হয়েছিলো।

এই তুফানের মুখে সাধারণ সিপাহীদের উদ্যম অব্যাহত রাখাই ছিলো সুলতানের জন্য এক অতি বড়ো সমস্যা। তিনি কখনো পায়দল আর কখনো ঘোড়ার সওয়ার হয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন তার

কোনো ক্লান্তি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অনুভূতি নেই, কিন্তু গাদ্দাররা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সুলতানকে দেখলেই তারা দুশ্‌মনের উপর গোলা ছুঁড়তে থাকে, তারপর সুলতানের দৃষ্টি অপর কোনো ফ্রন্টের দিকে নিবদ্ধ হলেই তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে। সুলতানের বিশ্বস্ত অফিসাররা পরিস্থিতির গতি ফিরাবার জন্য দিনরাত ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু তাঁদের হিম্মত, ত্যাগ ও আন্তরিকতা দেশের দুশ্‌মনদের ইরাদার সাথে পেরে ওঠে না। যেসব অফিসার মীর সাদিকের নির্দেশে কাজ ক'রে যায়, তারা লোক দেখানো গোলা বর্ষণের সময়ে দেখে নেয় যে, দুশমন তাদের গোলার নাগালের বাইরে রয়েছে।

৩রা মে তারিখে পাঁচিলের কয়েকটি জায়গায় ভাঙন সৃষ্টি হল এবং শহরের স্থানে স্থানে আগুন লাগানো হল। সুলতান মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বিভিন্ন ঘাঁটিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শেষ রাত্রে তিনি মহলের দিকে না গিয়ে উত্তরের পাঁচিলের সাথে এক খিমায় খানিকক্ষণ আরাম করলেন। ভোরে নামায শেষ করে বাইরে গিয়ে খিমার দরযার সামনে দাঁড়ানো দেখলেন কয়েকজন ফউজী অফিসার আর কয়েকজন হিন্দু সাধু ও জ্যোতিষীকে। এক অফিসার এগিয়ে এসে তাঁকে সালাম করে বললেনঃ 'আলীজাহ্! রাতের বেলা দুশ্‌মনের ক্রমাগত গোলাবর্ষণে শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এক প্রকাণ্ড ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে।'

সুলতান অবিলম্বে তাঁর ঘোড়া আনবার হুকুম দিলেন, কিন্তু সেরিংগাপটমের এক মশ্‌হুর জ্যোতিষী হাতজোড় করে বললেনঃ 'অন্নদাতা, আজকের দিন আপনার জন্য বড়োই অশুভ। তাই মহলে ফিরে যাওয়াই আপনার উচিত।'

সুলতান হেসে বললেনঃ 'তুমি আমায় মৃত্যুভয় দেখাতে চাইলে হতাশ হবে।'

ঃ 'না না, অন্নদাতা, আজ আপনি বাইরে যাবেন না।'

সুলতান বললেনঃ 'এ দুনিয়ার প্রত্যেক মুসাফিরেরই রয়েছে এক শেষ মন্‌যিল এবং আমি আমার তক্‌দীর থেকে পালাবার চেষ্টা করবো না।'

জ্যোতিষী বললেনঃ 'অন্নদাতা, ভগবান আপনাকে চিরদিন নিরাপদ রাখুন, কিন্তু আজ আপনি অবশ্যি কিছু দান করবেন।'

সুলতান কাছে দাঁড়ানো সিপাহীর কাছ থেকে ঘোড়ার বাগ ধরে রেকাবে পা রেখে বললেনঃ 'সোনা-চাঁদি দানের জন্য আমার হুকুম পৌঁছে গেছে মহলের দারোগার কাছে, কিন্তু এক শাসকের সব চাইতে বড়ো দান হতে পারে তাঁর প্রজাদের ইয্‌যত ও আযাদীর জন্য তাঁর নিজ বুকের কয়েকটি রক্তবিন্দু।'

সুলতান যিনের উপর বসেই দ্রুত ঘোড়া ছুটালেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ভাঙনের কাছে পৌঁছলে আন্‌ওয়ার আলী তাঁর পথরোধ করে ঘোড়ার বাগ ধরে বললেনঃ 'আলীজাহ্, আগে যাবেন না।'

সুলতান বললেনঃ 'কেন? কি ব্যাপার? তুমি এত ভয় পেলে কেন?'

আন্‌ওয়ার আলীর তরফ থেকে জওয়াব আসার আগেই পরপর তোপের তিনটি গোলা এসে পড়লো কয়েক কদম দূরে এবং লোহার একটা টুকরা চলে গেলো সুলতানের বাহু ছুঁয়ে। বামদিকে ফউজী অফিসার ও সিপাহীদের একটি দল দাঁড়িয়ে। সুলতানকে দেখেই তিনজন তাঁর দিকে ছুটে এলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বদরুয্‌যামান, দ্বিতীয় মীর সাদিক ও তৃতীয় ইউরোপীয় দলসমূহের প্রধান অফিসার মসিয়েঁ চীপওয়ে। তাঁদের কাছে আসার মধ্যেই ভাঙনের কাছে আরো কয়েকটি গোলা এসে পড়লো। সুলতান ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। বদরুয্‌যামান খান, মীর সাদিক ও ফরাসী অফিসার সালাম করার পর আদবের সাথে সুলতানের সামনে দাঁড়ালেন। ফরাসী অফিসার কোনো ভূমিকা ছাড়াই বললেনঃ 'হুযুর, আমি কিছু বলবার এজাযত চাই।'

ঃ 'বলো।'

ঃ 'আলীজাহ্‌, আপনার জীবনপণ যোদ্ধাদের জনা এ পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। এখন এ কথা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই যে, আমাদের ফউজে এমন কতকগুলো গাদ্দার অবশ্যি রয়েছে, যারা তাদের ঘাঁটিতে বসে দুশমনকে পথ দেখাচ্ছে। কেল্লার সব চাইতে দুর্বল অংশের উপর ক্রমাগত গোলাবর্ষণ স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে যে, আমাদের কোনো দুর্বলতা দুশমনের কাছে পুশিদা নেই। দুশমন চারদিক থেকে তাদের ঘাঁটি এত কাছে নিয়ে এসেছে যে, তারা যে কোনো মুহর্তে সেলিংগাপটমের উপর হামলা করতে পারে। আমাদের জন্য বর্ষার মওসুম পর্যন্ত যুদ্ধ বিলম্বিত করা জীবন-মরণ সমস্যা, কিন্তু কোনো অতি দায়িত্বশীল অফিসারের অতীত কার্যকলাপ বিবেচনায় আমার এমন প্রত্যাশা নেই যে, বেশীদিন আমরা দুশমনকে সেরিংগাপটমের পাঁচিলের বাইরে ঠেকিয়ে রাখতে পারবো। যদি আমায় বুযদীল বা নিমকহারাম মনে করা না হয়, তা'হলে আমি......'

ঃ 'বলো, থামলে কেন? তুমি কোনো সুষ্ঠু প্রস্তাব পেশ করতে পারলে আমি তা' শুনতে তৈরী।'

ঃ 'আলীজাহ্‌, আমার পরামর্শ হচ্ছে, আপনি সেরা অথবা চাতলদুর্গকে কেন্দ্র করে দুশমনের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যান। যদি আপনি দশ হাজার সওয়ার ও পাঁচ হাজার পদাতিক সাথে নিয়ে যান, তা'হলেও সেরিংগাপটমের প্রতিরক্ষা শক্তিতে বিশেষ কোনো ঘাটতি দেখা যাবে না। সেরিংগাপটমের যদি কোনো আসন্ন বিপদ থাকে, তা'হলে তা' সেই গাদ্দারদের তরফ থেকে, যাদের ষড়যন্ত্রের দরুন হুযুরের বিশ্বস্ত সিপাহীরা তাদের বাহাদুরীর পরিচয় দেবার মওকা পায়নি। যদি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, তা'হলে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমি সেরিংগাপটমের হেফাযতের দায়িত্ব নিচ্ছি।'

মীর সাদিক বদরুয্‌যামানের দিকে তাকিয়ে পরে বললেনঃ 'আলীজহা, মসিয়েঁ চীপওয়ে ও তাঁর সিপাহীদের আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা আমি স্বীকার করি, কিন্তু হুযুর সেরিংগাপটম থেকে চলে গেলে আমাদের সিপাহীদের উদ্যম ভেঙ্গে যাবে। সেরিংগাপটমে কোনো ষডযন্ত্র চলছে, তা' আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের

মধ্যে কোনো নিমকহারাম থাকলেও হুযুরের এখান থেকে চলে যাওয়া ঠিক হবে না; নইলে তাদের উদ্যম আরো বেড়ে যাবে।'

মীর সাদিক বললেনঃ 'আলীজাহ্, আমি শুধু আরয করতে চাই, আমাদের ঢাল-তলোয়ার শুধু আপনার ব্যক্তিত্ব। আমাদের সিপাহী, আমাদের তোপ ও বন্দুক অথবা আমাদের পাঁচিল ও খন্দক আপনার অভাব পূরণ করতে পারে না।'

ফরাসী অফিসার হতাশ হয়ে বললেনঃ 'আলীজাহ্, আমার প্রস্তাব যদি হুযুরের মঞ্জুর না হয়, তা'হলে আমি আরয করতে চাই, হুযুরের বিরুদ্ধে ইংরেজের সব চাইতে বড়ো অভিযোগ যে, তাদের নিকৃষ্টতম দুশমন ফরাসীরা আপনার ফউজে নিযুক্ত রয়েছে। যদি আমাদেরকে কোরবানী দিয়েও দুশমনের সাথে সন্ধি করতে পারেন, তা'হলে মহীশূরের কল্যাণের জন্য আমার সকল সাথী ইংরেজের কয়েদখানায় যেতে তৈরী।'

ঃ 'না, তা' কক্ষণো হতে পারে না।' সুলতান টিপু চূড়ান্ত ফয়সালার স্বরে বললেনঃ 'আমার আহবানে যারা নিজ জন্মভূমি ছেড়ে এখানে এসেছে, সেই শরীফ বাহাদুর ও বিশ্বস্ত সিপাহীদের আমি দুশমনের হাতে ছেড়ে দেবো না কিছুতেই। মহীশূরের এক সাধারণ সিপাহীর কাছেও এব্যাপারটি অসহনীয়।'

সুলতান ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সিপাহীদের ভিড়ের দিকে গেলেন এবং তারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। সুলতান তাদের কাছ গিয়ে বললেনঃ 'কেন তোমরা এই ভাঙা পাঁচিল মেরামত করো নি।'

এক অফিসার জওয়াব দিলেনঃ 'আলীজাহ্, আমরা শেষরাত্রে সৈয়দ গাফফারের হুকুমে এর মেরামত শুরু করেছিলাম, কিন্তু মীর সাহেবের ধারণা, দুশমনের গোলাবর্ষণ থেমে যাবার ইন্তেযার করা আমাদের উচিত।'

ঃ 'কোন্ মীর সাহেব? সুলতান ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'দেওয়ান সাহেব, আলীজাহ্!'

সুলতান ফিরে পেছন দিকে তাকালেন। ইতিমধ্যে মীর সাদিক ও তাঁর সাথীরা কাছে এসে গেলে সুলতান ঘোড়ার বাগ ফিরিয়ে মীর সাদিককে বললেনঃ 'তুমি জানো, এই ভাঙা পাঁচিলে আর দুশমনের খন্দকের মধ্যে দূরত্ব বেশী নয়, তা'সত্ত্বেও তুমি এদেরকে ভাঙা পাঁচিল মেরামত করতে মানা করছো।'

ঃ 'আলীজাহ্, দুশমনের গোলাবর্ষণ ছিলো খুবই তীব্র এবং আমি সিপাহীদের জান অকারণে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া ভালো মনে করিনি।' সুলতান বললেনঃ 'কয়েকটি জানের জন্য গোটা মহীশূরের ইয্যত ও আযাদী বিপন্ন করা যেতে পারে না। আমার হুকুম, অবিলম্বে এই ভাঙা পাঁচিল বন্ধ করো এবং বাকী অফিসারদের হুকুম দাও, যেনো তারা নিজ নিজ ঘাঁটিতে চলে যায়।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা, আলীজাহ্!'

তারপর সুলতান পূর্বদিকে বাগ ঘুড়িয়ে ঘোড়া ছুটালেন। প্রায় তিন ঘন্টা শহরের সকল ঘাঁটি দেখাশুনা করে অফিসার ও সিপাহীদের যরুরী নির্দেশ দিয়ে এবং রাতের যুদ্ধে আহত সিপাহীদের দেখে তিনি নিজস্ব মহলের দিকে চললেন।



দুপুর বেলা। উত্তর দিককার পাঁচিলের মাঝখান বরাবর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ হচ্ছে। সৈয়দ গাফফার তাঁর কতিপয় অফিসারকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন দিক ঘুরে সেখানে পৌঁছলেন। তাঁরা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটতে ছুটতে এক বুরুজের দিকে এগিয়ে গেলেন। ডানদিক থেকে যেনো কার আওয়ায এলোঃ 'ফউজদার সাহেব, দাঁড়ান।'

সৈয়দ গাফফার থেমে গেলেন এবং সেরিংগাপটমের কয়েদখানার দারোগা এগিয়ে এসে বললোঃ 'আমি অনেকক্ষণ আপনার পিছু পিছু ছুটছি। দক্ষিণ দরযার কাছেও আমি আপনার পথরোধ করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আপনি আমার দিকে নযর না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আপনার আগে সুলতানে মোয়ায্যমের খেদমতেও আমি হাযির হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পেরে উঠিনি।'

কাছের পাঁচিলের উপর এক গোলা এসে পড়লো এবং ইঁটের কতকগুলো টুকরো ছড়িয়ে পড়লো এদিক ওদিক। সৈয়দ গাফফার বললেনঃ 'তোমার যা কিছু বলবার থাকে, জলদী বলো। আমার সময় নষ্ট করো না।'

দারোগা বললো' ঃ 'জনাব, কেল্লার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে বড়ো ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে, সে দিকে অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।'

ঃ 'পাঁচিলের ভাঙন নিয়ে তোমার পেরেশান হতে হবে না। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত তা'বন্ধ করা হবে। আমি সেখানে যথেষ্ট সিপাহী পাঠিয়েছি। মীর সাদিক, ওখানে রয়েছেন। যদি তুমি কোনো ভালো পরামর্শ দিতে পারো, তা'হলে তাঁর কাছে চলে যাও।'

সৈয়দ গাফ্ফার এই পর্যন্ত বলে দ্রুত সিঁড়ির উপর উঠতে লাগলেন এবং দেখতে দেখতে বুরুজের উপর পৌঁছলেন। বুরুজের ভিতর তিনটি তোপ পাতা। আন্ওয়ার আলী দূরবীণের সাহায্যে দরিয়ার পারে দুশমনের গতিবিধি লক্ষ্য করার পর তোপচীদের জরুরী নির্দেশ দিচ্ছেন। সৈয়দ গাফ্ফার তাঁর হাত থেকে দূরবীণ নিয়ে চোখে লাগিয়ে বললেনঃ 'মনে হয়, দুশমন আজ তাদের তোপ আরো এগিয়ে এনেছে, কিন্তু দরিয়ার কিনারে তাদের খন্দকে পূর্ণ প্রশান্তি বিরাজ করছে।'

আন্ওয়ার আলী বললেনঃ 'পাঁচিলের পূর্বদিকের সামনে আমরা দুশমনের বেশীর ভাগ তোপখানা পিছু হটিয়ে দিয়েছি।'

সৈয়দ গাফ্ফার দূরবীণ নীচু করে বললেনঃ 'আমায় পানি দাও।'

এক সিপাহী তাঁর পানির পাত্র নামিয়ে তাঁর সামনে ধরলে তিনি কয়েক ঢোক

পানি গিললেন এবং তাঁর ক্লান্ত শীর্ণ মুখে ননতুন করে দেখা দিলো সজীবতা। কয়েদাখানার দারোগা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো এবং তাঁর সামনে এসে বললো ঃ 'জনাব, আপনার সাথে আমি জরুরী কথা বলতে চাই।'

সৈয়দ গাফফার বললেনঃ 'আমি তোমায় মীর সাদিকের কাছে যেতে বলেছিলাম না।'

ঃ 'জনাব, আমি মীর সাদিকের সাথে কথা বলতে পারলে সারা শহরে আপনাকে খুঁজে বেড়াতাম না। মীর সাদিক যদি জানতে পান যে, আমি এই মুহূর্তে আপনার কাছে রয়েছি, তা'হলে আমায় আর কথা বলবার মওকা দেবেন না।'

ঃ 'কি বলতে চাও তুমি?'

ঃ 'জনাব, আমি বলতে চাই যে, গতরাত্রের শেষদিকে এক ইংরেজ অফিসার বড়ো ভাঙনটার দেখাশুনা করতে এসেছিলো। মীর সাদিক সেখান থেকে বাইরে গিয়ে তাঁর সাথে গোপনে আলাপ করেছেন।'

সৈয়দ গাফ্ফার মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। তারপর নিজকে সামলে নিয়ে তিনি বললেনঃ 'তুমি জানো, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের গুজব ছড়ানোর শাস্তি মৃত্যু?'

ঃ 'তা আমার জানা আছে জনাব। কিন্তু এটা গুজব নয়। মীর সাদিক যখন জেনারেল হিয়ার্সের গুপ্তচরের সাথে সেরিংগাপটমের সওদা করছিলেন, তখন সেখানে আরো কয়েকজন অফিসার ছিলেন এবং তাঁদের একজন ছিলো আমার পুত্র।'

'তোমর পুত্র?' সৈয়দ গাফ্ফার ও আন্ওয়ার আলী সমস্বরে বললেন। আন্ওয়ার আলী ও সৈয়দ গাফ্ফারের মতো তোপখানার সিপাহীরাও বিস্ময় ও উদ্বেগের সাথে দারোগার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সৈয়দ গাফ্ফার তাদের মধ্যে এক অফিসারের হাতে দূরবীণ দিয়ে বললেনঃ 'তোমরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকো।'

আন্ওয়ার আলী দারোগাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'আপনার পুত্রের নাম সুলায়মান।'

ঃ 'জি হ্যাঁ।'

ঃ 'সে সাক্ষ্য দেবে?'

ঃ 'জি না, সে মরে গেছে। আজ ন'টার সময়ে যখমী অবস্থায় তাকে আমার কাছে আনা হয়েছিলো। মরবার সময়ে সে অনুরোধ করে গেছে, যেনো আমি সুলতানের কাছে গিয়ে তার ও আমার অপরাধ স্বীকার করি। সে বলে গেছে যে, আজ একটার সময়ে ইংরেজ সেই ভাঙনের দিক দিয়ে হামলা করবে। আপনারা মীর সাদিকের গাদ্দারীর এ কাহিনী বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমার কাছে রয়েছে তার জীবন্ত প্রমাণ। মালিক জাহান খানকে আপনারা জানেন। তিনি এখন সেরিংগাপটমের কয়েদ খানায় মাটির নীচের একটি কুঠরীতে পড়ে রয়েছেন। মীর সাদিক, মীর

কমরুদ্দীন, পূর্ণিয়া ও মুঈনুদ্দীনের হুকুমে আমি তাঁকে কায়েদখানায় রেখেছিলাম। এই অপরাধ করতে আমায় রাযী করতে তাঁরা আমায় প্রচুর অর্থ দিয়েছিলেন এবং সাথে সাথে আমায় ধমক দিয়েছিলেন যে, আমি এ রহস্য প্রকাশ করলে তাঁরা আমায় মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দেবেন।

'অতীত দিনগুলোতে আমি বিবেকের দংশনে অস্থির হয়ে গাযী খানের কাছে আমার লোক পাঠিয়ে এ ঘটনার খবর দেবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তাঁকে কয়েদখানার পথে কতল করে ফেলা হল এবং আমার যে লোক তাঁর সাথে আসছিলো, সে হামলার সময়ে পালিয়ে এসেছে। কারা হত্যাকারী, তা' আমি জানি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ হত্যাও গাদ্দারদের ষড়যন্ত্রের ফল, কারণ গাযী বাবার যিন্দা থাকাকে তারা বিপজ্জনক মনে করতো। গাযী খানের হত্যার পর আমি আমার ভবিষ্যত তাদেরই সাথে জড়িত করেছিলাম। তাঁরা আমার পুত্রকে ইংরেজের কাছ থেকে একটা বড়ো জায়গীর দেওয়াবার ওয়াদা করেছিলো। এখন আমার না আছে যিন্দেগীর প্রতি আকর্ষণ, আর না আছে মৃত্যুর ভয়। আমার শুধু আফসোস, এ রহস্য প্রকাশ করেও কোনো ফায়দা হবে না। আমার পুত্র মরবার সময়ে বলে গেছে যে, আজ দুপুর একটার সময়ে দুশমন সাধারণ হামলা করবে।'

ঃ 'একটার সময়ে! সৈয়দ গাফ্‌ফার জলদী তাঁর জিব থেকে ঘরি বের করে বললেনঃ 'আর এখন একটা বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকী। তুমি আমাদের এতখানি সময় নষ্ট করলে।'

সৈয়দ গাফ্‌ফার ঘোড়া ছুটালেন এবং আন্‌ওয়ার আলী তাঁকে অনুসরণ করলেন। বাকী সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে এদিক ওদিক বেরিয়ে গেলো। কয়েক মিনিট পর সৈয়দ গাফ্‌ফার ও আন্‌ওয়ার আলী পাঁচিলের সেই বড়ো ভাঙনের কাছে পৌছলেন। কিন্তু অবস্থা দেখে সৈয়দ গাফ্‌ফারের বিস্ময়ের অবধি থাকলো না। কিছুক্ষণ আগে যেখানে সুলতানের হুকুমে দু'হাজার সিপাহী মোতায়েন করা হয়েছিলো, সেখানে মাত্র পনেরো বিশজন লোক দাঁড়িয়ে! আশপাশের পাঁচিলের ঘাঁটিগুলোতেও সিপাহীদের সংখ্যা মনে হল খুব কম। সৈয়দ গাফ্‌ফার সিপাহীদের কাছে ঘোড়া থামিয়ে চীৎকার করে বললেনঃ 'বাকী লোক কোথায়?'

এক সিপাহী জওয়াব দিলোঃ 'জনাব, মালখানায় বেতন উসুল করতে গিয়েছে।'

ঃ 'কার এজাযত নিয়ে?'

ঃ 'দেওয়ান সাহেব মীর সাদিক হুকুম দিয়েছেন।'

সৈয়দ গাফ্‌ফার ও আন্‌ওয়ার আলী ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে ভাঙ্গন থেকে খানিকটা দূরে সিঁড়ির পথে পাঁচিলের উপর উঠে গেলেন এবং দরিয়ার পারে দুশমনের খন্দকের দিকে দেখতে লাগলেন। সেখানে দুশমনের গতিবিধির চিহ্ন না দেখে সৈয়দ গাফফার আশ্বস্ত হয়ে আন্‌ওয়ার আলীকে বললেনঃ 'দারোগার কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। এখন একটা বেজে গেছে।'

ঃ 'ওদিকে দেখুন। আন্ওয়ার আলী একদিকে হাতের ইশারা করে বললেন।

সৈয়দ গাফ্ফার বিস্ফোরিত চোখে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তাকিয়ে দেখলেন, হাজার হাজার ইংরেজ খন্দক ও ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে অবিরাম গতিতে ছুটে আসছে পাঁচিলের দিকে। সাথে সাথেই এক অফিসার পাঁচিলের উপর ছুটে এসে দূর থেকে সৈয়দ গাফ্ফারকে চিনতে পেরে চীৎকার করে উঠলোঃ 'জনাব, দুশ্মন উত্তর-পূর্বদিকের ঘাঁটিগুলো থেকে বেরিয়ে দরিয়া পরা হবার চেষ্টা করছে।'

সৈয়দ গাফ্ফার আনওয়ার আলীকে বললেনঃ 'তুমি অবিলম্বে সুলতানের খেদমতে পৌঁছাবার চেষ্টা করো এবং তাঁকে বুঝিয়ে বলো, যেনো তিনি অবিলম্বে সেরিংগাপটম থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। এখন দুশমনের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার শেষ পন্থা হচ্ছে তাঁর চাতলদুর্গে চলে যাওয়া।'

আনওয়ার আলী ছুটে পাঁচিল থেকে নীচে নেমে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেলেন।



খান্দকগুলো থেকে প্রায় একশ' গজ দূরে হামলাকারী ফউজের পথে ছিলো দরিয়ার বাধা এবং দরিয়ার প্রস্থ তিনশ' গজের কাছাকাছি। গরমের মওসুমের শুরু থেকে এ যাবত বৃষ্টি কম হওয়ায় পানির গভীরতা কোথায়ও হাঁটু পর্যন্ত, আর কোথাও কোথাও কোমর পর্যন্ত। দরিয়ার আগে ষাট গজ চওড়া খন্দক এবং খন্দক থেকে আগে পাঁচিলের ভাঙন। সামরিক দৃষ্টিভংগীতে জেনারেল হিয়ার্সের এ হামলা আত্মহত্যার নামান্তর এবং আশপাশের বুরুজের উপর থেকে মুষ্টিমেয় সিপাহীর বাধা অতি বড়ো ফউজের সংকল্পকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারে, কিন্তু পাঁচিলের ভাঙ্গনের আশপাশে পাঁচিলের উপর যেসব অফিসার রয়েছে, তাদের বেশীর ভাগই দেশের গাদ্দারদের সাথে তাদের আত্মার সওদা করে বসে আছে। সৈয়দ গাফফারের হুমকিতে ভয় পেয়ে তারা গুলী ছুঁড়তে শুরু করলো, কিন্তু তাদের নিশানা ঠিক নেই। মাত্র কয়েকটি বিশ্বস্ত লোক নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালন করছে।

হামলাকারীদের একটি দল খন্দকের কাছে পৌঁছে গেছে। সৈয়দ গাফ্ফার এক সিপাহীর হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে পর পর কয়েকবার গুলীবর্ষণ করলেন এবং তাতে কয়েকজন লোক যখ্মী হয়ে পড়ে গেলো। তার সাথেই এক অফিসার ও পাঁচজন সিপাহী ছুটতে ছুটতে ভাঙনের কাছে এক ঘাটিতে প্রবেশ করলেন এবং তিনজন গাদ্দারকে মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দিয়ে ঘাঁটির তোপগুলো হাত করে দুশমনের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করে দিলেন। তারপর দুশ্মনের তোপখানা সক্রিয় হয়ে উঠলো এবং ভাঙনের আশেপাশে গোলাবর্ষণ শুরু করলো। সৈয়দ গাফ্ফার গুলী ছুঁড়ে বন্দুক ভর্তি করছেন আর তাঁর ডানে বাঁয়ে, আগে পিছে এসে পড়ছে তোপের গোলা। এক বিশ্বস্ত সিপাহী এগিয়ে তাঁর বাহু ধরে বললোঃ 'জনাব, এখান থেকে সরে যান।'

সৈয়দ গাফফার গর্জন করে উঠলেনঃ 'তুমি আমার দিকে না তাকিয়ে দুশ্‌মনের দিকে খেয়াল রেখো।'

সিপাহী কোনো কথা না বলে পিছু হটে গেলো। সৈয়দ গাফফার ডানদিকে তাকিয়ে দেখলেন, আর এক সিপাহী কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে বন্দুকের লক্ষ্য আসমানের দিকে করে রেখেছে।

ঃ 'গাদ্দার!' বলে সৈয়দ গাফফার ক্রোধোম্মত্ত হয়ে বিদ্যুৎগতিতে তলোয়ার কোষমুক্ত করে তার মাথাটা কেটে ফেললেন। তারপর তিনি বুলন্দ আওয়াযে চীৎকার করে উঠলেনঃ 'যালিমদল! এখনো তোমরা সামলে গেলে আমরা যুদ্ধে জয়ী হতে পারবো। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফউজের দশ হাজার সিপাহী এখানে এসে জমা হবে। সুলতানের মোয়ায্‌যম খোদ এখানে তশরীফ আনছেন। যারা যিল্লাতের কয়েক টুকরা রুটির বিনিময়ে তোমাদেরকে চিরকালের জন্য ইংরেজের গোলাম বানাতে যাচ্ছে, খোদার দিকে চেয়ে তাদের সাথে মিলবার চেষ্টা করো না।' সাথে সাথেই তোপের এক গোলা এসে লাগলো সৈয়দ গাফ্‌ফারের মাথায় এবং তাঁর লাশ দেখা গেলো পাঁচিলের উপর।

সৈয়দ গাফ্‌ফারের পতনের সাথে সাথে পাঁচিলের উপর কে যেনো সাদা ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরলো। তারপর যখন সিপাহীদের দল সেখানে পৌছলো, তখন জানা গেলো, যে দরিয়া, খন্দক ও পাঁচিল বছরের পর বছর বিদেশী আধিপত্যের পথ রোধ করেছিলো, দুশমন মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তা' পার হয়ে এসেছে। পাঁচিলের উপর ইংরেজের ঝাণ্ডা এই বাস্তব সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করছিলো যে, যে কওম গাদ্দারদের তার কোলে আশ্রয় দিয়ে পোষণ করে রাখে, তার বিশালকায় কেল্লাও প্রমাণিত হয় বালুর উপর তৈরী গৃহ বলে।

ভাঙনের আশপাশে পা জমানোর পর ইংরেজ ফউজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে উত্তর ও দক্ষিণের পাঁচিলের উপর সদর্পে এগিয়ে চললো। পাঁচিলের নীচে যে সৈন্যদল জমা হচ্ছিলো, সৈয়দ গাফফারের মৃত্যু ও মীর সাদিকের গাদ্দারীর খবর তাঁদেরকে এমন নিরুৎসাহ্ করে দিলো যে, তারা জওয়াবী হামলা না করে ভিতরের পাঁচিলের দিকে ছুটে চললো। ভিতর ও বাইরের পাঁচিলের মাঝখানে পানিতে ভরা আর একটি খন্দক। এ খন্দক যদিও বাইরের খন্দকের মতো বেশী চওড়া নয়, তথাপি তা' পার হোতে গলে ভিতরকার পাঁচিল হেফাযতকারী সিপাহীদের গোলাবর্ষণ অত্যধিক ধ্বংসকর প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু ইংরেজদের কয়েকটি দল অবিলম্বে হামলা করলো এবং মহীশূরের সিপাহীদের ডানে বাঁয়ে হটিয়ে দিয়ে ভিতরের খন্দক পার হয়ে ভিতরের পাঁচিলের কয়েকটি অংশ দখল করে নিলো।



আন্‌ওয়ার আলী ঘোড়া ছুটিয়ে বিচ্ছিন্ন সিপাহীদের কাছে এসে থামলেন এবং শ্যেনদৃষ্টিতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার পর বুলন্দ আওয়াযে বললেনঃ 'মহীশূরের

মুজাহিদ দল, হিম্মতের পরিচয় দাও। সুলতানে মোয়ায্‌যম তশরীফ আনছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বেশীর ভাগ ফউজ এখানে জমা হয়ে যাবে। আগে বাড়ো এবং আরো দুশ্‌মন ফউজকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দেবার চেষ্টা করো। দুশ্‌মনের যে দল কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করেছে, তাদের কাছে প্রমাণ করে দাও যে, কয়েকটি শৃগাল হাজারো সিংহের আযাদীর সওদা করতে পারে না।'

এই কথা বলে আন্‌ওয়ার আলী ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে ভিতরের পাঁচিলের দিকে ধাবমান ইংরেজ সৈন্যদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যোদ্ধাদের কয়েকটি দল তাঁর সাথে এগিয়ে গেলো এবং ইংরেজ ভিতরের খন্দকের কাছে কয়েকটি লাশ ফেলে বাইরের পাঁচিলের দিকে সরে যেতে লাগলো।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর ইংরেজদের আরো কয়েকটি সৈন্যদল সেখানে পৌছে গেলো এবং মহীশূরের সিপাহীরা ভিতরের খন্দকের পাশ দিয়ে পূর্বদিকে হটে যেতে লাগলো। মহীশূরের কতিপয় সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে যুদ্ধরত সিপাহীদের পশ্চাদ্ভাগে পৌছলো এবং একজন বুলন্দ আওয়াযে বললেনঃ 'সিপাহীরা! দুশমন আমাদের বেশীর ভাগ ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। এখন বিফলে জান দেবার চেষ্টা করো না। হাতিয়ার সমর্পণ করো। আমি তোমাদের জান বাঁচাবার যিম্মা নিচ্ছি।'

আন্‌ওয়ার আলী ফিরে তাকালেন। লোকটি মীর মুঈনুদ্দীন। তাঁর পিছনে সাদা ঝাণ্ডা হাতে মীর সাদিক। সাথীদের কয়েক কদম পিছনে তৃতীয় গাদ্দার মীর কমরুদ্দীন। আন্‌ওয়ার আলী গযবের স্বরে চীৎকার করে বললেনঃ 'সিপাহীরা, এরা সেই গাদ্দার, যারা যিল্লতের কয়েকটি টুকরার বিনিময়ে ফিরিংগিদের সাথে তোমাদের ইয্‌যত ও আযাদীর সওদা করেছে। এই যুদ্ধে তোমাদের যে ভাই-বেটারা শহীদ হবেন, তাদের রক্তের ঋণ থাকবে এদের গর্দানের উপর।'

ইংরেজ ফউজের অফিসাররা গাদ্দারদের চিনতে পেরে সিপাহীদের থামালো এবং মুহূর্তকালের জন্য লড়াই বন্ধ হল। সেলিংগাপটমের সিপাহীরা দ্বিধা ও পেরেশানীর মধ্যে কখনো দুশমনের দিকে, আর কখনো মীর মুঈনুদ্দীন ও তার সাথীদের দিকে তাকাতে লাগলো। আচানক মীর কমরুদ্দীন তার ঘোড়ার বাগ ঘুরিয়ে দ্রুত ছুটে চললেন। আন্‌ওয়ার আলী আবার চীৎকার করে বললেনঃ 'বেঅকুফদল! গাদ্দারদের ভাগবার মওকা দিও না। সুলতানে মোয়ায্‌যম তাদেরকে মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দেবার হুকুম দিয়েছেন।'

মুঈনুদ্দীন ও তার সাথীরাও তাদের ঘোড়ার বাগ ফিরিয়ে নিলেন। আন্‌ওয়ার আলী তার ক্ষুদ্রাকার তোপ চালালেন। মীর সাদিকের বাহুতে গুলী লাগলো এবং তার হাতের সাদা ঝাণ্ডা পড়ে গেলো। সাথে সাথেই আরো কয়েকজন সিপাহী গুলী চালালো এবং সাত ব্যক্তি যখমী হয়ে পড়ে গেলো ঘোড়া থেকে। এক গুলী লাগলো মুঈনুদ্দীনের ঘোড়ার পায়ে। ঘোড়া যখমী হয়ে খন্দকের কাছে পড়ে গেলো এবং মীর মুঈনুদ্দীন যমিন থেকে ছিটকে পড়লেন খন্দকে। সাথে সাথে ইংরেজরা হামলা করলো এবং আন্‌ওয়ার আলী ও তাঁর বেশীর ভাগ সাথী তাদের মোকাবিলা করতে

বাধ্য হলেন, কিন্তু এক নওজায়ান পূর্ব দরযার কাছে তাঁকে ধরে ফেললো। মীর মুঈনুদ্দীন চীৎকার করে উঠলেনঃ 'খোদার কসম, আমায় ছেড়ে দাও। আমি গাদ্দারী করিনি। আমি শুধু তোমাদেরকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। আমি তোমাদের উযির, তোমাদের সুলতানের খাদেম।

আমি মীর মুঈনুদ্দীন মুখের কথা শেষ হল না। সিপাহীর তলোয়ার তার মাথায় লাগলে তিনি মাটিতে পড়ে তড়পাতে লাগলেন। এরই মধ্যে তিনজন সওয়ার মীর কমরুদ্দীন ও মীর সাদিকের পিছু পিছু ছুটলো।

সুলতান তাঁর রক্ষীবাহিনীসহ এসে হাযির হলেন এবং তাঁকে দেখামাত্র উত্তর দিকের ভিতর ও বাইরের পাঁচিলের মধ্যবর্তী যুদ্ধরত মুজাহিদদের মনে এক নব জীবনের তরংগদোলা জেগে উঠলো এবং তারা দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সুলতান তাঁর ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রথম সারিতে পৌঁছলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মহীশূরের সিপাহীদের কয়েকটি দল তাঁর পাশে এসে জানবাযি রেখে লড়াই শুরু করলো। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইংরেজ উভয় পাঁচিলের মাঝখানকার কতকগুলো ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে এবং উঁচু থেকে তাদের গুলী সুলতানের যোদ্ধাদের জন্য কঠিন বিপদ সৃষ্টি করেছিলো। যেসব অফিসার দেশের গাদ্দারদের সাথে তাদের ভবিষ্যত জড়িত করছিলো, তাঁরা ছিলো সে ফ্রন্টে অনুপস্থিত, কিন্তু এ সমস্যা তখন মহীশূরের যোদ্ধাদের জন্য কোনো পেরেশানীর কারণ ছিলো না। তাঁদের ইয্যত ও আযাদীর মুহাফিয তখন তাদেরই সাথে। তাঁরা ভুলে গেছেন যে, হফতা ও মাসের সফর কয়েক মিনিটের মধ্যে অতিক্রম করে দুশমন প্রবেশ করেছে সেরিংগাপটমে। তাঁরা ভুলে গেছেন যে, তাঁদের উপর গুলী বর্ষণ হচ্ছে। যে মহান পথপ্রদর্শক তাঁদের সিনায় সঞ্চার করেছিলেন যিন্দেগীর উদ্দীপনা, তিনিই যে এখন মৃত্যুর দরযায় করাঘাত করছেন, এ বাস্তব সত্য সম্পর্কে বেখবর নন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের কাছে এখন মৃত্যুর মুখ যিন্দেগীর চাইতেও সুন্দর-হৃদয়গ্রাহী। সুলতান টিপু যখমী হয়েছেন এবং সিনার যখম নিয়ে তিনি অনুভব করছেন অপরিসীম তৃপ্তি। সুলতানের দেহের খুন ঝরছে সেরিংগাপটমের মাটিতে এবং তিনি তাঁর বুকের খুনে উর্বর করে তুলতে চান তার প্রতি ধূলিকণাকে।

দ্বিতীয়বার গুলী লাগার পর শেরে মহীশূরের দেহ দুর্বলতায় ভেঙ্গে পড়তে লাগলো, কিন্তু তিনি লড়াই করে যেতে লাগলেন। মহীশূরের যোদ্ধারা জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে বেপোরোয়া হয়ে তাঁর সহযোগিতা করছে। ভিতরের খন্দকের আশপাশে দুশমনের লাশের স্তূপ হয়ে গেছে। অসংখ্য ইংরেজ যখমী হয়ে খন্দকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরছে। পাঁচিলের উপর থেকে দুশমনের দু'দিককার গুলীবৃষ্টি ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। মহীশূরের শহীদানের সংখ্যা কয়েক হাজারে পৌঁছে গেছে। যখমের দরুন সুলতানের হিম্মত নিঃশেষ হয়ে এলে দেহরক্ষী দলের অফিসার বললেনঃ 'আলীজাহ্! এখন আর নিজকে দুশমনের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।'

সুলতান চূড়ান্ত সংকল্পের আওয়াযে জওয়াব দিলেনঃ 'আমার কাছে সিংহের যিন্দেগীর এক লমহা শৃগালের হাজার বছরের যিন্দেগীর চাইতে শ্রেয়ঃ।'

কিছুক্ষণ পর সুলতান তাঁর অফিসারদের নিয়ে পুনরায় ঘোড়ার উপর সওয়ার হলেন এবং মহীশূরের সিপাহীরা তাঁর পিছু পিছু কেল্লার বহির্ভাগের দিকে সরে যেতে লাগলো, কিন্তু উত্তর দরযার কাছে পৌছে তাঁরা বুঝলেন যে, সেখানেও বিভিন্ন ঘাঁটি দুশমনের হাতে চলে গেছে। সশস্ত্র সিপাহী ছাড়া শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের এক অন্তহীন জনতা বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করছে এবং ইংরেজ সংগীণের সাহায্যে তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করছে। মহীশূরের সিপাহীদের দরযার দিকে আসতে দেখে তারা ফিরে গিয়ে গুলীবর্ষণ শুরু করলো। সাথে সাথেই কেল্লার পাঁচিলের বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে গুলীবৃষ্টি হতে লাগলো। একটি গুলী সুলতানের ঘোড়ার পেটে লাগলে ঘোড়াটি পড়ে তখখুনি মরে গেলো। ঘোড়ার সাথে পড়ে যাবার সময়ে সুলতানের শিরস্ত্রাণ আলাদা হয়ে পড়লো। সুলতান কাঁতে কাঁপতে উঠলেন কিন্তু সামলে নেবার আগেই তাঁর সিনায় লাগলো আর এক গুলী এবং তিনি অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে গেলেন। কাছে দাঁড়ানো এক ইংরেজ সুলতানের কোমর থেকে একটি রত্নখচিত তলোয়ার খাপ কেড়ে নেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু শেরে মহীশূরের দেহে তখনো যিন্দেগীর শেষ ক'টি শ্বাস অবশিষ্ট রয়েছে এবং এ অবমাননা তিনি বরদাশত করতে পারলেন না। সুলতান উঠে আচানক তলোয়ার উঁচু করে পূর্ণ শক্তিতে তার উপর আঘাত করলেন। ইংরেজ তার বন্দুক এগিয়ে ধরলো। সুলতানের তলোয়ার বন্দুকে লেগে ভেঙে গেলো। তখ্খুনি আর এক ইংরেজ তার বন্দুকের নল তাঁর কর্ণমূলে রেখে গুলী করে দিলো। যে সূর্যের রোশনীতে মহীশূরবাসী দেখেছিলো আযাদীর সুন্দর সুন্দর মনযিল, সে সূর্য অস্তাচলে ডুবে গেলো চিরদিনের জন্য।

আন্ওয়ার আলী যখন সুলতানকে পড়ে যেতে দেখলেন, তখন তাঁর রানে গুলী লেগেছে। তাঁর সাথীরা দরযার কাছে ইংরেজদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে রত। তিনি কয়েকজন সিপাহীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে সুলতানের লাশের কাছে পৌছলে পাঁচিলের উপর থেকে এক গুলী এসে তাঁর মাথায় লাগলো এবং মুহূর্ত মধ্যে তিনি কাঁপতে কাঁপতে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। ইতিমধ্যে সুলতান শহীদের লাশের উপর এসে পড়েছে কতিপয় যোদ্ধার লাশ এবং আন্ওয়ার আলী অর্ধ অচেতন অবস্থায় দেখতে পেলেন শুধু তাঁর পা দু'টি। তিনি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মাথাটি রাখলেন সুলতানের পায়ের উপর। গুলী মাথার খুলির উপর দিয়ে পিছলে যাওয়ায় তাঁর যখম খুব গভীর ছিলো না। তাঁর আগে পায়ের যখম থেকে রক্ত ঝরার দরুন তাঁর দেহ যথেষ্ট দুর্বল হয়ে গেছে। হুঁশ ফিরে এলে তিনি উঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পর পর কয়েকজন যোদ্ধা যখমী হয়ে পড় গেছেন তার দেহের উপর।

কিছুক্ষণ পর যখন তিনি অতি কষ্টে লাশের স্তূপ থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন ময়দান সাফ হয়ে গেছে, এবং ইংরেজ ফউজের কয়েকটি দল দরযার সামনে দূর বিস্তৃতি লাশগুলো দলিত করে ভিতরে প্রবেশ করছে। আন্ওয়ার আলী আবার চোখ

বন্ধ করে শু'য়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে চুপ করে শু'য়ে থাকলেন। শহরের অন্যান্য অংশে মানুষের আর্তচীৎকার তখনো প্রকাশ করছে যে, মহীশূরবাসীদের উপর তখনো পাইকারী হত্যা চলছে অব্যাহত গতিতে।

'সুলতান শহীদ হয়ে গেছেন। আমাদের আযাদীর পতাকা অবনমিত হয়ে গেছে। মাত্র কয়েকটি মানুষের গাদ্দারীর দরুন আজ মহীশূরের কতো সন্তান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, কতো নারীর সতীত্ব বিনষ্ট বিনষ্ট হচ্ছে। কতো নারী বিধবা ও কতো শিশু, এতিম হয়ে গেছে! আমার বাপ, আমার ভাই, আমার অসংখ্য দোস্ত ও সাথীর কোরবানীর ফল কি হল? মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে আমরা ছিলাম এক আযাদ ওয়াতনের মালিক। আমরা অতীত নিয়ে গর্ব করতে পারতাম আর আমাদের দীলের মধ্যে বর্তমানের মুসীবতের সাথে লড়াই করবার হিম্মত ছিলো। আমরা নিজস্ব ভবিষ্যত সম্পর্কে সুন্দর স্বপ্ন দেখতে পারতাম। আর এখন আমাদের অতীত, আমাদের বর্তমান ও আমাদের ভবিষ্যত এই লাশের স্তূপের নীচে চাপা পড়ে গেছে। সুলতান ফত্‌হে আলী টিপু শহীদ হননি; বরং আমরা সবাই মরে গেছি। যে মাটিতে সুলতান টিপুর রক্ত ঝরে পড়ছে। আমাদের ভবিষ্যত বংশধররা তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখবে তাদের চোখের পানিতে। আজকের দিনের পর মহীশূরের সূর্য আর কোনদিন দেখবে না আমাদের মুখে আনন্দের হাসি, মহীশূরের হাওয়ার মর্মরধ্বনি আমাদের বুকে জাগিয়ে দেবে না আযাদীর সুর ঝংকার। যে কওমের বড়ো বড়ো লোক সুলতান টিপুর মতো হিতাকাংখী শাসককে ধোকা দিয়েছে, কাযা ও কদরের মালিক তাদেরকে রহম ও সদ্ব্যবহারের যোগ্য মনে করবেন না কখনো।' এই ধরনের চিন্তা করতে করতে আন্‌ওয়ার আলী উঠে কম্পিত পদক্ষেপে একদিকে চলতে লাগলেন। কোনো কোনো ঘরে শোনা গেলো নারীকণ্ঠের আর্তচীৎকার আর তাঁর গতিও দ্রুততর হতে লাগলো। তার সকল কল্পনা সংকুচিত হয়ে মুনীরার দিকে কেন্দ্রীভূত হল। সেরিংগাপটমের পরিবেশে প্রত্যেকটি আর্ত চীৎকার তাঁর কানে মুনীরার আর্তনাদ বলে প্রতীয়মান হতে লাগলো। আচানক তাঁর মনে হল, তাঁর তলোয়ার ফেলে এসেছেন পিছনে ফেলে আসা লাশের স্তূপের উপর। তিনি জলদী ঝুঁকে পড়ে এক সিপাহীর তলোয়ার তুলে নিলেন। এখন গৃহে পৌছা হয়েছে তাঁর কাছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। দুশ্‌মনের দৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য তিনি এক সংকীর্ণ গলিপথে প্রবেশ করলেন।

মহীশূরের সিপাহীরা বিশৃংখল অবস্থায় ছুটছে এদিক ওদিক। কয়েকটি নওজোয়ান আন্‌ওয়ার আলীকে চিনতে পেরে তাঁর কাছে জমা হল। এক ব্যক্তি তাঁর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে এসে তাঁর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলো কাছেই একটি দেউড়ির ভিতরে। আন্‌ওয়ার আলী চিৎকার করে উঠলেনঃ আমায় ছেড়ে দাও, কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমায়?'

লোকটি কয়েদখানার দারোগা। সে বললোঃ 'আপনার যখমের রক্ত বন্ধ করা দরকার।'

আন্‌ওয়ার আলীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও দারোগা ও তার সাথীরা তাঁকে যবরদস্তি এক খাটে শুইয়ে দিলো এবং এক সিপাহীর কোমরবন্দ দিয়ে তাঁর যখমের উপর পট্টি বেঁধে দিলো।

ঃ 'আপনার মাথার যখম তেমন উদ্বেগজনক নয়, কিন্তু পায়ের যখম খুব গভীর। আমি আশপাশে চিকিৎসক খুঁজে দেখি।'

আন্‌ওয়ার আলী যন্ত্রণাব্যঞ্জক স্বরে চীৎকার করে উঠলেনঃ 'চিকিৎসকের ইন্তেয়ার করার মতো সময় নেই আমার।'

দারোগা বললোঃ 'যদি আপনি সুলতানে মোয়ায্‌যমের খোঁজ করতে চান, তাহলে আপনার সে চেষ্টা নিস্ফল। শহরে গুজব রটেছে যে, তিনি সেরিংগাপটম ছেড়ে চলে গেছেন।'

ঃ 'এ গুজব মিথ্যা।' আন্‌ওযার আলী বললেন 'আমি তাঁকে নিজে চোখে দেখেছি শহীদ হতে।'

আন্‌ওয়ার আলীর পাশে সমবেত লোকদের মুখে হতাশা ছেয়ে গেলো। ভিতর থেকে এক বৃদ্ধা মাথায় করাঘাত করতে করতে বেরিয়ে এলো দেউড়ির দিকে। সে বললোঃ 'সুলতানে মোয়ায্‌যম শহীদ হয়েছেন আর তোমরা পরস্পরের মুখ দেখছো। হায়! আমার পুত্র যদি আজ যিন্দা থাকতো!'

দারোগা বললোঃ 'বোন, এখন আমরা কিছুই করতে পারি না। সুলতান শহীদ হয়ে থাকলে আমাদের তলোয়ার ভেঙে গেছে, আমাদের বাহু ভেঙে গেছে।'

গলির মধ্যে ঘোড়ার পদশব্দ শোনা গেলো। এক সিপাহী আধখোলা দরযা দিয়ে উঁকি মেরে দরযা বন্ধ করে দিয়ে বললোঃ 'এ মীর নিযাম আলীর সিপাহী।'

আন্‌ওয়ার আলী ও তার সাথীরা দম বন্ধ করে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন। অবশেষে সওয়াররা চলে গেলে এক সিপাহী দরযা খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখে আস্তে বললোঃ 'ওরা চলে গেছে।'

আন্‌ওয়ার আলী দারোগাকে বললেনঃ 'তুমি মালিক জাহান খানের সম্পর্কে কি করেছো?'

'কিছু না।' দারোগা বললোঃ 'আমি এখনো কয়েদখানার দিকে যেতে পারিনি। আমি মীর সাদিকের সন্ধান করছিলাম। ভেবেছিলাম, এক গাদ্দারকে শেষ করে আমার গুনাহ্‌র বোঝা হয়তো হালকা করতে পারবো। কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার হল না। মীর সাদিকের পরিবর্তে আমি দেখছি তার লাশ। কয়েকটি লোক উপর্যুপরি তলোয়ারের আঘাতে তার চেহারা বিকৃত করে দিয়েছে। শুনলাম, মীর মুঈনুদ্দীনও মারা গেছে।'

আন্‌ওয়ার আলী বললেনঃ 'এখন আর গাদ্দারদের কথা ভাববার সময় নেই। তোমরা এক্ষুণি কয়েদখানায় চলে যাও এবং মালিক জাহান খানকে বের করে আনার চেষ্টা করো। আমার হিম্মত নিঃশেষ হয়ে গেছে, নইলে আমিও চলতাম তোমার সাথে।'

দারোগা বললোঃ 'আমার সাথে যাবার প্রয়োজন নেই আপনার। ইংরেজের দখলে যাবার আগে যদি আমি কয়েদখানায় পৌছতে পারি, তা'হলে মালিক জাহান খানকে বের করে আনতে কোনো অসুবিধা হবে না আমার।'

গলির মধ্যে নারী-পুরুষের আর্ত চীৎকার শোনা গেলো। আন্ওয়ার আলী জলদী এগিয়ে গিয়ে দরযা খুলে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। জনতা পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে ছুটে চলেছে এবং তাদের পিছে কিছুসংখ্যক ইংরেজ মারধর করতে করতে আসছে। আন্ওয়ার আলী কিছুক্ষণ দরযার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইংরেজরা জনতাকে তলোয়ার নিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে গেলে তিনি তার সাথীদের নিয়ে দেউড়ির বাইরে গিয়ে পিছন থেকে ইংরেজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে প্রায় বিশজন ইংরেজ ভূপতিত হল। সাথে সাথে শহরবাসীরাও ফিরে হামলা করলো। প্রায় পাঁচ মিনিট পর ইংরেজ ফউজের পুরো দলটি মৃত্যুর কবলে পতিত হল। তারপরই আন্ওয়ার আলীর দেহের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলো এবং তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। এক সিপাহী বললোঃ 'ওঁকে ঘরে পৌছে দেওয়া প্রয়োজন।'

আটাশ

আন্ওয়ার আলীর হুঁশ যখন ফিরে এলো, তখন তিনি তাঁর বাড়ির নীচুতলার এক কামরায় পড়ে রয়েছেন। মুনীরা, বাড়ির নওকর ও এক চিকিৎসক তাঁর শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে। রাত হয়ে গেছে এবং কামরায় একটি ফানুস জ্বলছে। শুশ্রুষাকারীদের দিকে এক মুর্হূতে তাকাবার পর আন্ওয়ার আলীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল মুনীরার মুখের উপর। মুনীরা মোহাচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আন্ওয়ার আলী পানি চাইলে মুনাওয়ার জলদী করে পানির পেয়ালা ভরে আনলো। করীম খান তাঁকে ধর তুললো এবং আন্ওয়ার আলী পানি পান করার পর পুনরায় মাথা রাখলেন বালিশের উপর। চিকিৎসক তাঁর থলে থেকে একটি শিশি বের করে কয়েক ঢোক অসুখ পেয়ালায় ঢেলে আন্ওয়ার আলীকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'এ অষুধটা পান করার পর আপনি তাকত অনুভব করবেন। আপনার যখম আমি দেখেছি। মাথার যখম চামড়ার নীচে যায়নি এবং গুলী বেরিয়ে যাবার পর পায়ের যখমও তেমন বিপজ্জনকে নয়। সময়মতো রক্ত বন্ধ হলে আপনার অবস্থা এমন হত না।'

আন্ওয়ার আলী কোনো জওয়াব না দিয়ে অষুধটা গিলে ফেললেন এবং কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন চিকিৎসকের দিকে। যে মুনীরাকে এতক্ষণ মনে হচ্ছিলো দুঃখ-বেদনা ও হতাশার প্রতিমূর্তি, এখন তিনি আশান্বিত হয়ে তাকাতে লাগলেন স্বামীর মুখের দিকে। চিকিৎসক মুনীরাকে সম্বোধন করে বললেনঃ 'আপনি প্রতি ঘন্টায় দু'ঢোক করে এই অষুধটা পান করতে থাকুন। সম্ভব হলে ভোর হবার আগে আমি আর একবার দেখে যাবার চেষ্টা করবো।'

আন্‌ওয়ার আলী বললেনঃ 'হাকীম সাহেব, আপনি আপনার সময় নষ্ট করবেন না। আজ সেরিংগাপটমের প্রত্যেক গলিতেও প্রত্যেক ঘরে অসংখ্য যখমী পড়ে রয়েছে। তাদের দিকে মনোযোগ দেওয়াই আপনার উচিত।'

হাকীম তাঁর থলেটি তুলে নিয়ে বললেনঃ 'শহরে গুজব রটেছে যে, সুলতানে মোয়াযযম শহীদ হয়ে গেছেন।'

হাকীম কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন। মুনাওয়ার, করীম খান ও খাদেমা এক মিনিট দ্বিধাগ্রস্ত' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর খাদেমা হাত দিয়ে ইশারা করে দরযার দিকে এগিয়ে গেলো এবং আর সবাই তার পিছু পিছু চললো। আন্‌ওয়ার আলী মুনীরার দিকে তাকিয়ে অলক্ষ্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন। মুনীরা এগিয়ে গিয়ে মাথাটি রাখলেন তাঁর বুকের উপর।

ঃ 'মুনীরা!' আন্‌ওয়ার আলী তাঁর সোনালী চুলের উপর হাত বুলিয়ে বললেন। 'আমি জান্নাতের দরযায় করাঘাত করে ফিরে এসেছি। আমি লাশের স্তূপের মধ্যে পড়েছিলাম এবং সেখানে আমি তোমার আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম। সব ঘটনা আমার কাছে ছিলো একটা স্বপ্ন। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যখন মুর্শিদাবাদের উপর এই ধরনের অন্ধকার ছেয়ে গেলো, তখন আমার বাপ মহীশূরের আসমানে দেখেছিলেন নতুন উষার আভাস। তাই তিনি এসেছিলেন সেরিংগাপটমে। কিন্তু সেরিংগাপটমে নেমে এসেছে যে তিমির রাত্রি, তাতে প্রভাতী তারার অস্তিত্ব নেই। আজকের দিনের পর আযাদী-সন্ধানী যে কাফেলা বেরিয়ে যাবে সেরিংগাপটম থেকে, সামনে ভয়াবহ অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই।

'মুনীরা তুমি যে দেশের অন্ধকার দেখে ভয় পেয়ে এসেছিলে এখানে, সেখানে আজ আযাদীর সুর ঝংকৃত হচ্ছে। তোমার দেশবাসী তাদের ভাগ্য নিয়ে আজ সন্তুষ্ট থাকতে পারে, কিন্তু আমার মহীশূরের গৌরব গরিমা আজ অতীতের ইতিকাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে। তোমার সাহচর্যে আমার যিন্দেগীর প্রতিটি শ্বাস ছিলো আনন্দে ভরপুর।, কিন্তু আমি যদি জানতাম যে, আমার কওমের তকদীর মীর সাদিকের মতো গাদ্দারের হাতে এসে যাবে, তাহলে আমি তোমার জীবনসাথী হবার আকাংখা করতাম না। আমি চেয়েছিলাম সারা দুনিয়ার খুশী তোমার পায়ে ঢেলে দিতে, কিন্তু আজ আমার পুঁজি এক লুণ্ঠিত কওমের অশ্রুধারা ব্যতীত আর কিছু নেই। লাশের স্তূপের মধ্যে পড়ে থেকে আমি বারংবার ভেবেছি, হায় ! যদি তুমি সেরিংগাপটমে না থাকতে, আর আমি এই পরাজিত কওমের আর্তনাদ না শুনে জান দিয়ে দিতাম। মরবার আগে আমি তোমায় কোনো নিরাপদ জায়গায় দেখতে চেয়েছিলাম-এমন এক নিরাপদ জায়গায়, যেখানে হীন গাদ্দারী ও দেশদ্রোহিতার সংস্পর্শ নেই।'

আন্‌ওয়ার আলীর কথা শুনতে শুনতে মুনীরার মর্মব্যথা ফুঁপিয়ে কান্নায় এবং ফুঁপিয়ে কান্না চাপা আর্তনাদে রূপান্তরিত হল। তিনি যখন মাথা তুললেন, তখন তাঁর মুখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেছে।

ঃ 'আন্ওয়ার!' তিনি স্বামীর দিকে তাকিয়ে যন্ত্রণাব্যঞ্জক স্বরে বললেন। 'আমার জন্মভূমি ফ্রান্স নয়, সেরিংগাপটম এবং নিজস্ব বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে আমার কোনো অভিযোগ নেই। হাসি আনন্দময় যে দিনগুলি আমি আপনার সাথে কাটিয়েছি, তাই আমার জীবনের সব চাইতে বড়ো পুঁজি। আপনার সাথে ভবিষ্যতের অন্ধকারতম মনযিলসমূহের দিকে চলতেও আমার পা কাঁপবে। মহীশূরের যমিন যদি আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা চলে যাবো কোনো সুদূর দেশে। সেরিংগাপটমের স্মৃতি সেখানেও আমায় দান করবে আনন্দ। কাবেরীর কিনারের এক টিলার উপর আপনার সাথে দাঁড়িয়ে আমি প্রথম দেখেছিলাম সেরিংগাপটমের দৃশ্য। যে আনন্দঘন মুহূর্তগুলি আমি কাটিয়েছি এই গৃহের চার দেওয়ালের ভিতরে, তা আমার বাকী যিন্দেগীর মাস ও বছরগুলোকে ছেয়ে থাকবে।'

আন্ওয়ার আলী বললেনঃ 'মুনীরা! সেরিংগাপটম ছেড়ে আমি যাবো না। সুলতান টিপুর দেহের খুন ঝরে পড়েছে যে মাটির উপর, সেই মাটিতে দাফন হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে আমি চাই না। মরবার আগে সেরিংগাপটমে আমার বহু কাজ বাকী রয়েছে। সেরিংগাপটমের শহীদানের রূহের কসম, যে গাদ্দারেরা আমার দেশবাসীর ইয্যত ও আযাদীকে মনে করেছে তেজারতের মাল, তাদেরকে আমি যিন্দা ছেড়ে দেবো না। এ শকুনের দল ফিরিংগির ভিড়ে মিলে আমাদের দেহের গোশত ঠুকরে খেতে পারবে না।'

কে যেনো কামরার দরযায় করাঘাত করলো। আন্ওয়ার আলী চুপ করে গেলেন। মুনীরা প্রশ্ন করলেনঃ 'কে ওখানে?'

মুনাওয়ার ভিতরে উঁকি মেরে বললোঃ বিবিজী, দুধ এনেছি।'

ঃ 'নিয়ে এসো।' মুনীরা বললেনঃ

মুনাওয়ার খান এক দুধের পেয়ালা তশতরির উপর রেখে কামরায় প্রবেশ করলো। মুনীরা আনওয়ার আলীকে হাত দিয়ে ধরে তুললেন এবং দুধের পেয়ালা তাঁর সামনে তুলে ধরলেন। কয়েক ঢোক দুধ পান করে আন্ওয়ার আলী আবার শয্যায় শুয়ে পড়লেন। মুনাওয়ার খান খালি পেয়ালা নিয়ে ফিরে যেতে থাকলে আন্ওয়ার আলী বললেনঃ 'মুনওয়ার, উপর তলার বড়ো কামরা থেকে সব বন্দুক, ছোট তোপ ও বারুদ এনে আমার কাছে রেখে দাও।'

মুনীরা বললেনঃ 'আপনাকে এর চাইতে নিরাপদ কোনো জায়গায় রেখে এলেই কি ভালো হয় না? শহরে তো আপনার বহু বন্ধু আছেন।'

আন্ওয়ার আলী বললেনঃ 'আজ সেরিংগাপটমে আমার কোনো বন্ধুর গৃহই নিরাপদ নয়।'

মুনাওয়ার খান জলদী করে চারটি বন্দুক, দু'টি ছোট কামান ও বারুদের পাঁচটি থলে এনে আন্ওয়ার আলীর কামরায় রেখে বললোঃ 'জনাব, হুকুম হলে বন্দুকগুলো ভরে দেই।'

ঃ 'হ্যাঁ।'

মুনাওয়ার খান মেঝের উপর একে একে বন্দুকগুলো বোঝাই করে আন্‌ওয়ার আলীর শিয়রে দেওয়ালের সাথে দাঁড় করিয়ে রাখলো এবং ছোট কামানগুলো তেপায়ীর উপর রেখে দিলো। তারপর সে বলেলাঃ 'করীম খানও সইস বাইরে দেউড়ির দরযায় পাহারা দিচ্ছে। সইসের কাছে বন্দুক ছিলো না। আমি তাকে আমার বন্দুক দিয়েছি। এজাযত হলে এখান থেকে একটা বন্দুক নিয়ে যাই।'

ঃ 'না।' আন্‌ওয়ার আলী জওয়ার দিলেনঃ 'আমার তরফ থেকে তুমি তাদেরকে হুকুম দিও, যদি কেউ গৃহে প্রবেশ করবার চেষ্টা করে, তাহলে ওরা যেনো বাধা না দেয়। তোমরা এখন তোমাদের জান বিপন্ন করে আমায় কোনো ফায়দা পৌঁছাতে পারবে না। আমি শুধু চাই, কেউ ভিতরে ঢুকতে চাইলে তোমরা আমায় খবর দিও।'

মুনাওযার খান কিছুক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আন্‌ওয়ার আলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললোঃ 'ভাইজান, আমার একটা অনুরোধ'।

ঃ 'বলো।'

ঃ 'ভাইজান, আমার অনুরোধ, দুশমন এসে গেলে আপনি আমার জন্য কামরায় দরযা বন্ধ করে দেবেন না। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমি আপনার কাছে থাকতে চাই।'

'না, মুনাওয়ার! ঃ আন্‌ওয়ার আলী বেদনাব্যঞ্জক স্বরে বললেনঃ তুমি চলে যাও।'

মুনাওয়ার খান অশ্রুসজল চোখে আনওয়ার আলীর দিকে তাকিয়ে নত মস্তকে দরযার দিকে চললো।

ঃ 'দাঁড়াও।' আন্‌ওয়ার আলী বললেন।

মুনাওয়ার থামলো। আন্‌ওয়ার আলী মুনীরাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'মুনীরা, মুরাদ আম্মাজানের যে থলে আমাদের কাছে দিয়েছিলো, তা কোথায়?'

ঃ 'তা উপরে সিন্দুকে পড়ে রয়েছে।'

ঃ 'নিয়ে এসো।'

মুনীরা কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মখমলের এক থলে নিয়ে তিনি কামরায় ফিরে এলেন। আন্‌ওয়ার আলী শুয়ে শুয়ে থলেটি তাঁর হাত থেকে নিয়ে খুলে একটি হীরা বের করে মুনাওয়ার খানের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেনঃ 'মুনায়ার, তুমি হামেশা আমার কথা মেনেছো।

এটা নাও, নইলে আমি রাগ করবো।'

মুনীরা এগিয়ে এসে হীরাটি আন্‌ওয়ার আলীর হাত থেকে নিয়ে মুনাওয়ারের হাতে দিলেন।

আন্‌ওয়ার আলী থলে থেকে আরো তিনটি ছোট ছোট হীরা বের করে মুনাওয়ার

আলীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেনঃ ‘এ কটিও নিয়ে যাও, মুনাওয়ার! করীম খান, সইস ও খাদেমাকে একটি করে দেবে। তাদেরকে বুঝিয়ে বলো, যেনো কিছুদিন এগুলো লুকিয়ে রাখে। এগুলো খুব মূল্যবান।’

মুনাওয়ার খান হীরা হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত নিবিষ্ট মনে আন্‌ওয়ার আলীর দিকে তাকিয়ে বললোঃ ‘ভাইজান, আপনার কথায় মনে হয়, আপনি আমাদেরকে এখানে রেখে কোথাও যাচ্ছেন।’

আন্‌ওয়ার আলী জওয়াব দিলেনঃ ‘তোমাদেরকে ছেড়ে আমি যাবো না।’

ঃ ‘তা’হলে এ হীরা আপনার কাছে কেন রাখেন না।’

আন্‌ওয়ার আলী তিক্ত কণ্ঠে বললেনঃ ‘মুনাওয়ার, খোদার কসম, যাও’।

মুনাওয়ার এ তিক্ততার কারণ বুঝলে না। সে একবার আন্‌ওয়ারের দিকে, তারপর মুনীরার দিকে তাকিয়ে অনিচ্ছায় কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো। আন্‌ওয়ার আলী মখমলের থলেটি বালিশের নীচে রাখলেন।



দরযায় করাঘাত শুনে তাঁরা নিঃশব্দে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।

ঃ ‘কে ওখানে ? আন্‌ওয়ার আলী ছোট কামান নিয়ে বসে প্রশ্ন করলেন।

ঃ ‘আমি জাহান খান। ভিতরে আসতে পারি কি?‘

আন্‌ওয়ার আলী মুনীরার দিকে তাকালে তিনি একখানা সাদা চাদর এনে নিজের দেহ ঢাকলেন। আন্‌ওয়ার আলী আওয়ায দিলেনঃ ‘আসুন।’

মালিক জাহান খান কামরায় প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে রক্তাক্ত তলোয়ার এবং পোশাকেও রক্তের দাগ। কোনো ভূমিকা না করেই তিনি বললেনঃ ‘মাফ করবেন। আপনার নওকরদের না জানিয়ে আমি ভিতরে এসে গেছি। সড়কের উপর জায়গায় জায়গায় ইংরেজ সিপাহীরা টহল দিচ্ছিলো এবং আমায় পিছন দিক থেকে দেওয়াল টপকে ভিতরে আসতে হয়েছে। আপনার সম্পর্কে দারোগার খবর খুবই উদ্বেগজনক ছিলো। এখন আপনার কি অবস্থা?’

ঃ ‘যখমের চাইতে ক্লান্তিতেই আমি বেশী ভেঙ্গে পড়েছিলাম। আপনি তশরীফ রাখুন।’

ঃ ‘না, আমি রাতারাতি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। আমি আপনার শোকরগুযারী করছি এই জন্য যে, এই অবস্থায়ও আপনি এক পুরানো সাথীকে ভুলে যাননি।

ঃ ‘এখন আপনি কোথায় যাবেন?’

ঃ ‘আমি জানতে পেরেছি যে, শাহ্‌যাদা ফত্‌হে হায়দরের লশকর করিগাট্টা

পাহাড়ের পিছনে শিবির সন্নিবেশ করেছেন এবং আমি অবিলম্বে তাঁদের কাছে পৌঁছে যেতে চাই। শাহ্‌যাদা মীর কমরুদ্দীনের মতো গাদ্দারের কথা মতো যদি হাতিয়ার সমর্পণ না করেন, তাহলে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি তাঁর সাথে সহযোগিতা করবো। এখন পর্যন্ত সুলতানের যেসব বিশ্বস্ত সাথীর সাথে আমার মোলাকাত হয়েছে, তাঁদের সবারই মত, তাঁরা শাহ্‌যাদা ফত্‌হে হায়দরের কাছে পৌঁছে যাবেন। এখন সেরিংগাপটমকে ধ্বংস থেকে বাঁচানো আমাদের সামর্থ্যের ভিতরে নেই। শহরে ইংরেজের যে হিংস্র বর্বরতার ভয়ানক দৃশ্য আমি দেখেছি, তা বর্ণনার অতীত। আজ সেরিংগাপটমে কোনো নারীর সতীত্ব নিরাপদ নয়। আমি নিজ হাতে পাঁচজন ইংরেজকে হত্যা করেছি। এক গলির মধ্যে কয়েকজন ইংরেজ চারজন যুবতীকে ঘেরার মধ্যে নিয়েছিলো এবং হায়দরাবাদের সিপাহীরা অনুনয় করে তাদেরকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছিলো। আমার সাথীরা হামলা করে দেখতে দেখতে দশ-বারোজন ইংরেজকে মেরে ফেলেছে। হায়দরাবাদের সিপাহীরা বেশীর ভাগ ছিলো নিরপেক্ষ, কিন্তু কতক আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলো লড়াইয়ে।'

আন্‌ওয়ার আলী প্রশ্ন করলেনঃ 'শাহী মহলের অবস্থা আপনি কিছু জেনেছেন?'

ঃ 'না, ওদিককার সব রাস্তাই বন্ধ। আমি শুধু এতটা জেনেছি যে, আটটা পর্যন্ত মহলের দরযায় প্রচণ্ড লড়াই চলেছে এবং ফরাসী সৈন্যদল মহলরক্ষীদের সাথে ছিলো। তারপর হঠাৎ গুলীবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেলো। আরো জেনেছি যে, কেল্লার অধিনায়ক মীর নাদিম দুশমনের সাথে মিশে গেছে। এই অবস্থায় লড়াই চলতে থাকলে মহল দখল করে নিতে ইংরেজদের বেশী দেরী লাগতো না। আমার আফসোস, আপনি যখমী এবং আমার সাথে সহযোগিতা করতে আপনি পারবেন না। দুশমন শাহী মহল থেকে অবকাশ পেলেই নতুন তীব্রতা সহকারে লুটপাট, হত্য ধ্বংসতাণ্ডব শুরু করে দেবে এবং আপনার গৃহ থাকবে অত্যন্ত অরক্ষিত। এটা কি সম্ভব নয় যে, আপনাকে এমন কোনো বন্ধুর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, যার গৃহ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ?'

আন্‌ওয়ার জওয়াব দিলেনঃ 'আজ আমার জন্য সেরিংগাপটমের সকল গৃহই সমভাবে অরক্ষিত। এখন আমার পেরেশানী শুধু আমার বিবিকে নিয়ে। আমি তাঁকে শাহ্‌যাদা ফত্‌হে হায়দরের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে আমার যথেষ্ট উপকার হয়।'

জাহান খান বললেনঃ 'তিনি যদি অবিলম্বে যেতে তৈরী থাকেন, তাহলে আমি তাঁকে শাহ্‌যাদার কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে পারি। কিন্তু কয়েক ঘন্টা পর এ কার্যটি খুবই কঠিন হয়ে উঠবে।'

মুনীরা পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করে বললেনঃ 'না, আমি আপনাকে এই অবস্থায় রেখে যাবো না।'

আন্‌ওয়ার আলী বললেনঃ 'মুনীরা, আমার সাথে থাকা তোমার ঠিক হবে না। আমি গ্রেফতার হয়ে গেলে ইংরেজ আমায় খুব বেশী হলে ততোক্ষণ কয়েদখানায়

রাখবে, যতোক্ষণ মহীশূরের কোনো লশকরের তরফ থেকে কোনো বাধা পাওয়ার আশংকা থাকবে। কিন্তু এই হিংস্র পশুদের হাতে সেরিংগাপটমের কোনো নারীর ইয্যত নিরপদ নয়। তারা যদি জানতে পারে যে, ফরাসী কওমের সাথে তোমার সম্পর্ক রয়েছে, তাহলে তোমার পরিণাম হয়তো আমার কওমের স্ত্রী-কন্যাদের চাইতে আরো বেশী ভয়াবহ হবে।'

মুনীরা বললেনঃ 'এখন আমি আর ফরাসী নই; বরং মহীশূরের স্ত্রী-কন্যাদেরই আমি একজন।'

জাহান খান বললেনঃ 'বোন, সেরিংগাপটমের জন্য এখন তিন-চার দিন খুবই বিপজ্জনক। এ কওম বিজয়ের নেশায় কি কি করে যাচ্ছে, তা আপনি জানেন না।'

মুনীরা বললেনঃ 'তা আমি জানি। কিন্তু আমার ইয্যত, আমার যিন্দেগী ও মওত আমার স্বামীর সাথে। আমি তাঁকে ছেড়ে যাবো না।'

আন্ওয়ার আলী বললেনঃ 'মুনীরা! আগামী দু'এক দিন সেরিংগাপটমে বিজয়ী লশকরের হুকুমত চলবে এবং মানবতার মাথা গুজবার ঠাঁই মিলবে না। এ তুফান কেটে গেলে আমি এসে তোমার সাথে মিলিত হবো।' মুনাওয়ার ও করীম খানকে আমি তোমার সাথে পাঠাচ্ছি। মহীশূরের সীমানার মধ্যে তোমার জন্য কোনো আশ্রয়স্থল খুঁজে না পেলে মালিক জাহান খান তোমায় চাচা আকবর খানের পল্লীতে পৌছে দেবার ইন্তেযাম করতে পারবেন এবং আমার বিশ্বাস, অবস্থা অনুকূল হওয়া পর্যন্ত সামিনা ও তার মা তোমায় তাঁদের গৃহে আশ্রয় দিতে পারবেন।'

মুনীরা চূড়ান্ত সংকল্পের আওয়াযে বললেনঃ 'আমি শুধু জানি, এ মুহূর্তে আমায় আপনার প্রয়োজন।' এই কথা বলার সাথে সাথে তাঁর চোখে অশ্রু উথলে উঠলো।

জাহান খান বললেনঃ 'আন্ওয়ার আলী, আমার বোন ঠিকই বলেছেন। এর সম্পর্কে আপনার চিন্তার কারণ নেই। আমার বিশ্বাস, ইংরেজ শরাবের নেশায়ও কোনো খারাপ ব্যবহার করবে না এক ফরাসী মহিলার সাথে। এতটা সাহস তাদের নেই। আমাদের টিপু শহীদ হয়েছেন। তলোয়ার ও টাল থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। কিন্তু ফ্রান্সের নেপোলিয়ান এখনো যিন্দা রয়েছেন। আমি এখন আপনার এজাযত নিচ্ছি।'

জাহান খান দরযার দিকে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু আন্ওয়ার আলী বললেনঃ 'দাঁড়ান। আপনার কাছে আর একটি অনুরোধ' আমার।'

ঃ 'বলুন।' জাহান খান ফিরে তাকিয়ে বললেন।

ঃ 'মুরাদ এখনো আফগানিস্তানের অভিযান থেকে ফিরে আসেনি। কোনো বিশেষ ঘটনা না হলে দু'এক হফতার মধ্যে তার ফিরে আসা উচিত। কোথাও দেখা হলে তাকে বর্তমান অবস্থায় সেরিংগাপটম আসতে মানা করে দেবেন। আমার তরফ থেকে তাকে বলবেন যে, আকবর খানের গৃহে তার ইন্তেযার করা হচ্ছে। গত কয়েকদিনের মধ্যে সেখান থেকে দূত তার অবস্থা জানতে এসেছিলো। আপনার

ঘোড়ার প্রয়োজন হলে আমার আস্তাবল থেকে নিয়ে যান।'

ঃ 'না, এ সময়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেরিংগাপটম থেকে বেরিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন।'

ঃ 'আচ্ছা, খোদা হাফিয।' আন্ওয়ার আলী বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাত বাড়ালেন। জাহান খান তাঁর সাথে মোসাফাহা করে মুনীরাকে সালাম জানিয়ে বেরিয়ে কামরার বাইরে গেলেন।

আন্ওয়ার আলী মুনীরাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'মুনীরা, আমি তোমার শোকর গুযারী করছি।'

ঃ 'কি কারণে?'

ঃ 'তুমি আমার কথা মানোনি। আমি আমার দীলের উপর পাথর চাপা দিয়ে তোমায় এখান থেকে চলে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলাম। তুমি আমার কথা মানলে হয়তো আমি তোমার বিদায় নেবার খানেকক্ষণ পরেই পাগলের মতো বেরিয়ে চীৎকার করে তোমার নাম ধরে ডাকতাম। সত্যি তোমায় আমার বড়ো প্রয়োজন।'

মুনীরা অশ্রুসজল কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকলেন।

আন্ওয়ার আলী ক্লান্ত কণ্ঠে বললেনঃ 'আমি বড়োই ক্লান্ত। আমার ঘুম আসছে। তুমি দরযা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে দাও। বাইরে কোনো শব্দ পেলে আমায় জাগিয়ে দিও। আমি কেমন হাঁপিয়ে উঠেছি। একটা খিড়কি খুলে দাও। কিন্তু তোমার ঘুম আসতে থাকলে বন্ধ করে দিও।'



সূর্যাস্তের প্রায় তিন ঘন্টা পর সেরিংগাপটমের শহর, কেল্লা ও মহলের উপর ইংরেজদের পূর্ণ অধিকার কায়েম হল এবং মীর আলমের নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যের ফউজের কয়েকটি দল শহরে প্রবেশ করলো। শহরের চার দেওয়ালের ভিতরে মহীশূরের বারো হাজার যোদ্ধার লাশ ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এখনো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও মীর নিযাম আলীর সিপাহীদের বিজয় অসম্পূর্ণ। সুলতানের সন্ধানে তারা মহলের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাদ্দারদের নিশানদিহিতে সুলতানের বিশ্বস্ত অফিসারদের ঘরে ঘরে তালাশী চালাচ্ছে। যখমী ও নিরস্ত্রদের সিনার উপর সংগীণ রেখে সুলতানের খবর জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। ছোট ছোট শাহ্যাদাদের ধমক দেওয়া হচ্ছে। সেরিংগাপটমের সিপাহীদের বেশীর ভাগ সুলতানের শাহাদতের সময়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে লড়াই করেছেন এবং তারা ইংরেজদের কোনো সন্তোষজনক জওয়াব দিতে পারছেন না। কিন্তু যে সিপাহীরা স্বচক্ষে তাঁদের প্রিয় শাসককে ভূপতিত হতে দেখেছেন, তাদেরকেও কোনো ভীতি বা লোভ সুলতানের শাহাদত সম্পর্কে কিছু বলাতে পারলো না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সুলতানকে যিন্দা মনে করে তাঁকে লাশের স্তূপ থেকে বের করার বাঞ্ছিত সময়ে ইন্তেযার করছিলেন এবং

সুলতানের মৃত্যু সম্পর্কে যাঁদের বিশ্বাস ছিলো, দুশমনের নাপাক হাত তার দেহ স্পর্শ করবে, এটা তাদের কাছে অবাঞ্ছিত ছিলো।

'সুলতান শহীদ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর বিশ্বস্ত সাথীরা তাঁর লাশ কোথায়ও গোপন করেছেন। সুলতান শহীদ হন নি। -সুলতান যখমী হওয়ার পর কোথাও গা' ঢাকা দিয়েছেন।- সুলতান হামলার আগেই সেরিংগাপটম থেকে চলে গেছেন।- সুলতান শাহ্‌যাদা ফত্‌হে হায়দরের কাছে পৌঁছে গেছেন। -সুলতান সেরা বা চাতলদুর্গকে কেন্দ্র করে লড়াই চালিয়ে যাবেন।' এই ধরনের গুজব শুধু ইংরেজ ও মীর নিযাম আলীর ফউজের অফিসারদের জন্যই কেবল উদ্বেগজনক ছিলো না; বং যেসব গাদ্দার মহীশূরের আযাদীর বিনিময়ে তাদের প্রভুদের কাছ থেকে বড়ো বড়ো জায়গীরের ওয়াদা নিয়েছিলো, তাদের জন্যও ছিলো অন্তহীন উদ্বেগের কারণ। মীর সাদিক ও মুঈনুদ্দীনের পরিণাম দেখার পর নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে কোনো মিথ্যা আশা ছিলো না তাদের মনে।

মধ্যরাত্রির কাছাকাছি মহলের সামনে মীর কমরুদ্দীন, পূর্ণিয়া ও বদরুয্‌যামান কতিপয় ইংরেজ অফিসারের সাথে আলাপ করছেন। কয়েকজন সিপাহী মশাল হাতে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো। মীর নাদিম ছুটে এসে জোর গলায় বললোঃ 'আমি এইমাত্র সুলতানের খবর পেয়েছি। তাঁর লাশ কেল্লার উত্তর দরযার সামনে অন্যান্য লাশের স্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে রয়েছে। চলুন, আমি আপনাদেরকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।'

তাঁরা অবিলম্বে তার সাথে চললেন।

কিছুক্ষণ পর তাঁরা লাশের এক স্তূপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ইংরেজ অফিসারের হুকুমে সকল লাশ এক এক করে আলাদা করা হল। কয়েকটি লাশ সরানোর পর এক ইংরেজ সিপাহী একটি লাশের বাহু ধরে টানবার চেষ্টা করলে তার হাতে একটা শক্ত জিনিসের চাপ অনুভূত হল। তাঁর সাথে সাথেই লাশের মাথা থেকে পাগড়ি খুলে পড়লো এবং লম্বা লম্বা কালো চুল ছড়িয়ে পড়লো। ইংরেজ সিপাহী ইংরেজী ভাষায় কিছু বলে তার অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তাঁরা মশাল কাছে এনে দেখলেন, এক যুবতী। তাঁর বাহুর উপর এক সোনার কাঁকন চকমক করছে। তারপর আর একটি নারীর লাশ পাওয়া গেলো। তাঁর সারা দেহ গুলীর আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

পূর্ণিয়া এক সিপাহীর হাত থেকে মশাল নিয়ে ভালো করে তার মুখ দেখে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

'আপনি ওকে চিনতে পারেন?'ঃ এক ইংরেজ অফিসার প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'হ্যাঁ, এ একটি এতিম হিন্দু মেয়ে। সুলতান ওকে নিজের মেয়ে বানিয়ে নিয়েছিলেন। গত যুদ্ধে ওর বাপ মারা গিয়েছিলেন।'

ঃ 'আর অপর নারীটি কে?'

ঃ 'ওঁকে আমি জানি না। সম্ভবত শাহী খান্দানের কেউ হবেন।'

কিছুক্ষণ পর সকল লাশ সরানো হলে সবাই মোহাচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে রইলেন শেরে মহীশূরের দিকে। সুলতান টিপুর লেবাস রক্তে রঙীন হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর মুখের গুরুগম্ভীর মহিমাময় রূপের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ভাঙা তলোয়ারের কবজা এখনো তাঁর হাতে। তাঁর লেবাস ফউজী অফিসারদের থেকে আলাদা নয়। যে পাগড়ি তাঁকে অপরের থেকে আলাদা করতো, তা পড়ে রয়েছে কয়েক কদম দূরে। বদরুয্যামান এগিয়ে গিয়ে পাগড়ি তুলে নিলেন।

এক অফিসার প্রশ্ন করলেনঃ 'এই সুলতান টিপু?'

মীর কমরুদ্দীন ভাঙা গলায় বললেনঃ 'জি হ্যাঁ, আপনাদের বিজয় মোবারক হোক।'

ইংরেজ সিপাহী চীৎকার করে উঠলোঃ 'ইনি যিন্দা রয়েছেন।' কয়েকজন লোক বন্দুক উদ্যত করলো। ইংরেজ অফিসার চমকে উঠে এগিয়ে নাড়িতে হাত দেবার পর সিনার উপর হাত দিয়ে বললেনঃ 'না, ইনি মরে গেছেন।'

বদরুয্যামান সুলতানের শিরস্ত্রাণ চোখে লাগিয়ে বললেনঃ 'এঁর হত্যাকারী আপনারা নন, আমরা। আমরা এঁকে হত্যা করেছি। আমাদেরই ভাবী বংশধররা এঁর কবরের উপর ফুল চড়াবে।'

ঃ 'আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।' এই বলে ইংরেজ অফিসার মীর কমরুদ্দীনের উদ্দেশ্যে বললেনঃ 'আপনারা এঁকে পালকিতে তুলে মহলে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করুন। আমি জেনারেল হিয়ার্সকে খবর দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণ পর কেল্লার আনাচে-কানাচে জয়ধ্বনি উঠলো। তারপর ইংরেজ সিপাহীরা আনন্দে নাচতে নাচতে চীৎকার করতে করতে কেল্লা থেকে বেরিয়ে লোকের বাড়িঘরের দিকে চললো। শহরের বিভিন্ন অংশে সুলতানের সন্ধান করছিলো যারা, তারাও শামিল হল তাদের সাথে। নতুন করে শুরু হল লুটপাট, হত্যা ও ধ্বংস-তান্ডব।

যে কওমের কতক মা মীর সাদিকের মতো গাদ্দারদের স্তন্য দিয়ে পালন করেছিলো, বিধাতা সে কওমের নারীর আর্তচীৎকারে কর্ণপাত করলেন না। সেরিংগাপটমের কোনো গৃহ হিংস্র বর্বরতার তুফান থেকে নিরাপদ থাকলো না। এমন কি, যেসব গাদ্দার মীর সাদিক, পূর্ণিয়া, কমরুদ্দীন ও মুঈনুদ্দীনের মতো বিবেকহীন মানব পশুকে সহযোগিতা দিয়েছিলো, তারাও অনুভব করতে লাগলো যে, তারা শুধু কওমের আযাদী ও কওমের শহীদানের মূল্যই উসুল করেনি, স্ত্রী-কন্যাদের ইয্যতের সওদাও করেছে। মীর সাদিক ও মীর মুঈনুদ্দীন তাঁদের গাদ্দারীর মূল্যপ্রাপ্তির আগেই কতল হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারা যে হিংস্র শ্বাপদদের জন্য সেরিংগাপটমের পথ সাফ করে দিয়েছিলেন, তাদেরই হাতে নিজ গৃহের বরবাদীর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলো তাদের বিদেহী আত্মা। তাঁদের স্ত্রী-কন্যাদের দেহের লেবাস

ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছিলো এবং তাদের আর্তচীৎকারের জওয়াবে ভেসে আসছিলো শরাবের নেশায় মাতাল ইংরেজের অট্টহাসি।

'আমি মীর সাদিকের বিবি। আমি মীর সাদিকের বোন। আমি মীর সাদিকের কন্যা। -এ মীর মুঈনুদ্দীনের গৃহ। তিনি ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলীর বন্ধু। জেনারেল হিয়ার্স তাঁকে জানেন। ইংরেজের বন্ধু বলেই লোকেরা তাঁকে হত্যা করেছে। পাশের কামরায় তাঁর লাশ পড়ে রয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বন্ধু ও তোমাদের কওমের শুভাকাংখীদের স্ত্রী-কন্যার উপর হাত তোলা তোমাদের উচিত নয়। আমি মীর মুঈনুদ্দীনের পুত্র। এ আমার বিবি। এরা আমার বোন। আমাদেরকে জেনারেল হিয়ার্সের কাছে নিয়ে চলো।'-এই ধরনের অনুনয়ের জওয়াবে ইংরেজের কাছে ছিলো শুধু অট্টহাসি, আর কিছু নয়।

যেসব লোক সুলতানের মৃত্যুর পর যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে হতাশ হয়ে হাতিয়ার সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলো, তারাও এখন ঘরের হেফাযতে জন্য লড়াই করতে লাগলো। সেরিংগাপটমের গলিতে গলিতে, বাজারে বাজারে জমতে লাগলো রক্তের নতুন স্তর।



তখন ভোরের আভাস দেখা দিয়েছে। আন্ওয়ার আলী ক্রমাগত বন্দুকের দ্রুম দ্রুম আওয়ায এবং নারী ও শিশুর আর্তচীৎকার শুনে গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠেলেন। মুনীরা একটি বন্দুক তুলে নিয়ে আধখোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আঙিনার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আন্ওয়ার আলী উঠে আর একটি বন্দুক ধরে প্রশ্ন করলেনঃ 'কি হল, মুনীরা?'

ঃ 'আমাদের গৃহের আশপাশে চারদিকে লুটতরাজ শুরু হয়ে গেছে।' আন্ওয়ার আলী জলদী করে জানালার দিকে এগিয়ে গেলে তাঁর যখমে ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন। তিনি মুনীরাকে একদিকে সরিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে বললেনঃ 'তুমি কেন আমায় জাগালে না?'

ঃ 'আপনি গভীর ঘুমে অচেতন ছিলেন, আর আপনার আরামেরও তো দরকার। আমি ভাবলাম, কেউ এদিকে এলে আপনাকে জাগিয়ে দেবো।'

আন্ওয়ার আলী জানালার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বললেনঃ 'তোমার অমন করে জানালার সামনে দাঁড়ানো ঠিক নয়। তোমার বন্দুক চালানোরও প্রয়োজন নেই। যদি প্রয়োজনের সময়ে তুমি খালি বন্দুক ভর্তি করে দিতে পার, তা'হলেই যথেষ্ট হবে।'

মুনীরা বাকী সব অস্ত্র তুলে নিয়ে জানালার কাছে রেখে দিলেন এবং আন্ওয়ার আলীর কাছেই বসে পড়লেন। তার কাছে ভীতি ও উদ্বেগের এক-একটি মুহূর্ত কয়েক মাসের মতো দীর্ঘ মনে হয়। খানিকক্ষণ পর দেউড়ির কাছে শোরগোল শোনা গেলো এবং আন্ওয়ার আলী গর্দান একটুখানি উঁচু করে বাইরে তাকাতে লাগলেন।

মুনাওয়ার খান ছুটে আঙিনায় ঢুকলো এবং বারান্দায় এসে বুলন্দ আওয়াযে বললোঃ 'ভাইজান, ওরা পাশের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এদিকে আসছে। আমাদের দেউড়ির দরযা ওরা ভাঙছে।'

আন্ওয়ার আলী খিড়কি পথে বাইরে মাথা বের করে বললেনঃ 'মুনাওয়ার, করীম খানকে গিয়ে বলো, সে যেনো দরযা খুলে দিয়ে তাদের সামনে বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে।'

মুনাওয়ার ভীত হয়ে জওয়াব দিলোঃ 'জনাব, দেউড়ির দরযা খুলে দিলে তো ওরা এক্ষুণি ভিতরে চলে আসবে।'

ঃ 'তোমরা দেউড়ির -দরযা বন্ধ রেখেও তাদের ভিতরে আসা বন্ধ করতে পারবে না।'

মুনাওয়ার খান এগিয়ে কামরার দরাযায় ধাক্কা দিয়ে বললোঃ 'ভাইজান, খোদার কসম, আমায় ভিতরে আসতে দিন। আমি আপনার সাথে থাকতে চাই। বন্দুক চালাতে আমি পারি।'

আনওয়ার আলী উদ্বিগ্ন হয়ে এগিয়ে গেলেন। দরযার কড়া খুলে দিয়ে তিনি মুনাওয়ার খানের বাহুধরে ঝাঁকুনী দিয়ে বললেনঃ 'নিজের কুঠরীতে পড়ে থাকলেই তোমার ভালো হবে। যারা আমার তালাশে এসেছে, তারা তোমায় কিছু বলবে না। এখানে তুমি আমার কোনো সাহায্য করতে পারবে না। তুমি অকারণে মারা যাও, এটা আমি চাই না। যদি ওরা আমাদেরকে কোনো মানবোচিত আচরণের যোগ্য মনে করে, তাহলে আমার নওকরদেরও কোনো বিপদ নেই। নিজের ইয্যত বাঁচাতে যদি আমাদেরকে জান বাযি রাখতে হয়, তাহলে তোমরা আমাদের কাছ থেকে দূরে থেকে নিজের জান বাঁচাতে পারো। মৃত্যুর পথে আমাদের সাথীর সংখ্যা বাড়াবার প্রয়োজন নেই। কথার সময় নেই এখন যাও, দেউড়ির দরযা খুলে দাও আর জিজ্ঞেস করলে বলো যে, এ ঘরে যখমী ও এক নারী ছাড়া আর কেউ নেই।'

মুনাওয়ার খান কিছু বলতে চাচ্ছিলো, কিন্তু আন্ওয়ার আলী তাকে আঙিনার দিকে ঠেলে দিয়ে দরযা বন্ধ করলেন। খাদেমা হাঁপাতে হাঁপাতে কাঁপতে কাঁপতে খিড়কির সামনে দেখা দিলে আন্ওয়ার আলী তাকে দেখেই চীৎকার করে বললেন 'চাচী, আপনি হয় নিজের কুঠরীতে পড়ে থাকুন। নইলে ছাদের উপর চলে যান। আমরা আওয়ায না দিলে এদিকে আসার চেষ্টা করবেন না।'

খাদেমা কয়েক মুহূর্তে পেরেশান ও উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেলো। আন্ওয়ার আলী খিড়কির সামনে বসে গেলেন। দেউড়ির দিকে লোকের কোলাহল ক্রমাগত বেড়ে চললো। মুনীরা শ্বাসরুদ্ধ করে স্বামীর মুখভাব লক্ষ্য করতে লাগলেন। তিনি বললেনঃ 'আপনার যখম কষ্ট দিচ্ছে না তো?'

ঃ 'না, আমার মাথাটা কেমন করছে। দরযা খুলতে গিয়ে কেমন চক্কর লাগছিলো। এখন ঠিকই আছি। তোমার ভয় লাগছে না তো মুনীরা?'

ঃ 'না, আপনি কাছে থাকলে কোনা ভয় নেই আমার।

আন্‌ওয়ার আলী বললেনঃ 'আমার ব্যাপার ঠিক এর উলটো। আমার কোনো ভয় থাকলে তার কারণ, তুমি আমার কাছে রয়েছো। ওরা আসছে, মুনীরা,-ওরা আসছে।'

মুনীরা আধখোলা খিড়কি দিয়ে দেখলেন, সশস্ত্র ইংরেজের একটি দল এসে ঢুকেছে আঙিনায়। আন্‌ওয়ার আলী হাত দিয়ে তাঁকে একদিকে সরিয়ে দিয়ে বললেনঃ 'মাথা নীচু করো, মুনীরা!

পনেরো-বিশজন সশস্ত্র ইংরেজ আঙিনার দরযার কাছে এসে থামলো। দু'জন বন্দুক উদ্যত করে সামনে এগিয়ে এলো। আন্‌ওয়ার আলী বন্দুকের নল একটুখানি বাইরে বের করে ইংরেজী ভাষায় বললেনঃ 'থামো।'

তারা থেমে গেলো। এক সিপাহী বললোঃ 'আমরা তোমার বাড়ির তালাশী নিতে চাই। তোমায় হাতিয়ার সমর্পণ করে বাইরে আসার জন্য এক মিনিট সময় দেওয়া হচ্ছে। এক মিনিট পর আমরা গুলী ছুঁড়তে শুরু করবো। তারপর তুমি কোনো অব্যাহতির যোগ্য থাকবে না। আমরা জানি তুমি যখমী।'

আন্‌ওয়ার আলী বললেনঃ 'আমি তোমাদের কোনো দায়িত্বশীল অফিসারের সাথে কথা বলতে চাই।

ঃ 'আমাদের অফিসাররা আজ খুব ব্যস্ত। বিদ্রোহীদের সাথে আমাদের আচরণ হয়েতো তোমার জানা নেই।'

ঃ 'আমি জানি যে, তোমরা মানবতার নিকৃষ্টতম দুশমন। কিন্তু যদি তোমরা আমার ঘর লুট করতে চাও, তা'হলে আমি কোনো বাধা দেবো না। আমায় শুধু তোমাদের এতটুকু আশ্বাস দিতে হবে যে, আমি হাতিয়ার সমর্পণ করলে আমার সাথে যুদ্ধবন্দীর প্রাপ্য ব্যবহার করা হবে। তোমাদের ফউজের কোনো দায়িত্বশীল অফিসার হাযির থাকলেই এ আশ্বাস পাওয়া যেতে পারে। আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করতে প্রস্তুত যে, আমি যখন আশ্বস্ত হবো যে, তোমরা আমার সাথে কোনো দুর্ব্যবহার করবে না, তখন এ গৃহের কোনো জিনিসই তোমাদের কাছে গোপন করার চেষ্টা করা হবে না।'

পিছে দাঁড়ানো ইংরেজদের দল থেকে একজন আওয়ায দিলোঃ 'এই ধরনের বেঅকুফের সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করা আমাদের উচিত হবে না।' এক মিনিট সময় শেষ হয়ে গেছে।'

যে দু'জন সিপাহী আন্‌ওয়ার আলীর সাথে কথা বলছিলো, তারা ফিরে গিয়ে সাথীদের সাথে মিলিত হল। তারপর তারা এক কাতারে দাঁড়িয়ে গেলো।

আনওয়ার আলী বললেনঃ 'মুনীরা, তোমার সাথে ওরা দুর্ব্যবহার করবে না, এতটুকু আশ্বস্ত হতে যদি আমি পারতাম, তা'হলে আমি হাতিয়ার সমর্পণ করে

বেরিয়ে যেতাম। কিন্তু এরা সবাই সিপাহী এবং শরাবের নেশায় মাতাল। কোনো মানবোচিত আচরণের প্রত্যাশা এদের কাছে নেই আমার।

ঃ 'মুনীরা ! মুনীরা! মেঝের উপর শুয়ে পড়ো। উপরে মাথা তুলবার চেষ্টা করো না।' আন্ওয়ার আলীর মুখ থেকে এই কথাটি বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঙিনায় বন্দুকের 'আওয়ায শোনা যেতে লাগলো। কয়েকটি গুলী বন্ধ দরযা ও আধখোলা খিড়কি ভেদ করে পিছনের পাঁচিলে এসে লাগলো। আন্ওয়ার আলী পর পর দু'টি গুলী ছুঁড়লেন এবং দু'টি লোক গুলী খেয়ে পড়ে গেলো। বাকী লোক বিশৃংখল অবস্থায় পিছু হটতে লাগলো। আন্ওয়ার আলী দেখতে দেখতে আরো দু'জনকে গুলীর নিশানা বানাবার পর ছোট কামান দুটি তুললেন, কিন্তু এতক্ষণে আঙিনা খালি হয়ে গেছে। কয়েকজন ইংরেজ ভিতরে আঙিনা থেকে বেরিয়ে বাইরের বেড়ার ভিতর পৌছে গেলো এবং অবশিষ্ট লোক বাড়ির ডানদিকের আম গাছের পিছনে গায়েব হয়ে গেলো।



পাঁচ মিনিট কামরার মধ্যে পূর্ণ প্রশান্তি বিরাজ করলো এবং এর মধ্যে আন্ওয়ার আলী ও মুনীরা খালি বন্দুক ভর্তি করলেন। তারপর আঙিনার পাঁচিলের উপর দিয়ে গুলী আসতে লাগলো এবং কিছুক্ষণ ধরে খিড়কির সামনে মাথা তুলবার মওকা পেলেন না আন্ওয়ার আলী। মুনীরা চাপা গলায় বললেনঃ 'আপনি সুস্থ আছেন না?'

ঃ 'আমি ঠিকই আছি। তোমার মাথাটা নীচু করো।'

গুলীবর্ষণ আচানক বন্ধ হয়ে গেলো। আন্ওয়ার আলী গর্দান একটুখানি তুলে বাইরে তাকালে সামনের আঙিনার পাঁচিলের পিছন থেকে কয়েকজন ইংরেজের একটি দল দেখা গেলো। তিনি দু'হাতে ছোট কামান হাতে খিড়কির একটুখানি বামদিকে সরে দাঁড়ালেন এবং একদিকে ঝুঁকে বাইরে তাকাতে লাগলেন। আঙিনার পাঁচিলের পিছনে দাঁড়ানো লোকগুলোর মাথা তখন তাঁর নাগালের মধ্যে; তিনি একই সাথে 'দুটি লোককেই তাঁর ছোট কামানের নিশানা বানাবার চেষ্টা করছেন, অমনি আঙিনার বামদিকে গাছের মধ্যে কারুর শব্দ পাওয়া গেলো। তিনি দম বন্ধ করে সেদিকে তাকাতে লাগলেন। গাছের যে শাখাটি তাঁর নযরে আসছে, সেটি দুলছে। তিনি গর্দান একটুখানি এগিয়ে পাতার আড়ালে এক শাখায় কোনো লোককে দেখলেন। সাথে সাথেই বন্দুকের আওয়ায শোনা গেলো এবং গুলী এসে তাঁর কাঁধে লাগলো। তিনি যখম চেপে ধরে কাঁপতে কাঁপতে একদিকে সরলেন এবং পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। মুনীরার মুখ থেকে এক আর্ত চীৎকার বেরিয়ে এলো এবং তিনি তাঁকে ধরবার জন্য এগিয়ে এলেন। আন্ওয়ার আলী বললেনঃ 'শূয়ে পড়ো, মুনীরা।'

বন্দুকের আর একটি আওয়াযের সাথে সাথে মুনীরা গড়িয়ে পড়লেন তার পায়ের উপর। আন্ওয়ার আলীর হাত থেকে ছোট কামানটি পড়ে গেলো। তিনি মুনীরা! মুনীরা! বলে তাঁর মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে বসে পড়লেন। কিন্তু মুনীরার

কাছ থেকে কোনো জওয়াব মিললো না। তাঁর পেশানী থেকে ছুটে চলেছে রক্তের ফোয়ারা এবং তাঁর প্রস্তরীভূত চোখ দু'টি তাঁর আশা-আকাংখা ও হাসি-অশ্রুর দুনিয়াকে জানিয়ে যাচ্ছে বিদায় সম্ভাষণ।

'মুনীরা, মুনীরা! মুনীরা, আমার জিন! ঃ আন্ওয়ার আলী তাঁকে সিনায় চেপে ধরে বললেনঃ 'তুমি ওয়াদা করেছিলে যে, জীবনে মরণে আমরা পরস্পরের সাথী।'

মুনীরাকে তিনি মেঝের উপর শুইয়ে দিলেন এবং ছোট কামানটি হাতে নিয়ে খিড়কির দিকে এগিয়ে গেলেন। দেহের যখমের অনুভূতিও নেই তাঁর। পাঁচিলের দিক থেকে গুলীর পরোয়া নেই তাঁর। জীবন-মৃত্যুর সম্পর্কে নির্বিকার হয়ে খিড়কির বাইরে মাথা বের করে তিনি তাকালেন গাছের দিকে। দেখতে দেখতে তিনি পর পর দু'টি গুলী ছুঁড়লেন এবং দু'টি লাশ ভূপাতিত হল। অমনি এক সংগে অনেকগুলো গুলী এলো পাঁচিলের দিকে থেকে এবং আন্ওয়ার আলী তাঁর বাহুতে ও পিছনদিকে আঘাত খেয়ে পড়ে গেলেন। তারপর তিনি ডান হাতে একটি বন্দুক ধরলেন এবং অবশিষ্ট শক্তি নিয়ে কোনোমতে উঠে বসলেন। তাঁর বাম বাহুর শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। বাইরের বেড়ার মধ্যে ঘোড়ার পদশব্দ ও তার সাথে বিউগলের আওয়ায শোনা গেলো এবং গুলীবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেলো। আন্ওয়ার আলী এক হাত দিয়ে বন্ধুকের নল খিড়কির সাথে রেখে বাইরে তাকালেন। কিছুক্ষণ ধরে বাইরে সমাগত লোকদের আওয়ায আসতে লাগলো তাঁর কানে। তারপর আঙিনার দরযার দিক থেকে বুলন্দ আওয়ায এলোঃ 'আন্ওয়ার আলী! মুরাদ আলী! আমি হাশিম বেগ। গুলী বন্ধ করো। কর্ণেল ওয়েলেসলী তোমাদের জান বাঁচানোর ওয়াদা করেছেন। তিনি আমার সাথে আছেন। আমি ভিতরে আসছি। আমি হাশিম বেগ।'

কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে হাশিম বেগ প্রাংগণে প্রবেশ করলেন। আন্ওয়ারে আলী কোনো জওয়াব না দিয়ে বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে হামাগুড়ি দিয়ে একদিকে সরে গিয়ে মুনীরার লাশ জড়িয়ে ধরলেন। হাশিম বেগ খিড়কি দিয়ে ভিতরে তাকাবার পর কামরার দরযায় ধাক্কা দিলেন এবং দরযা বন্ধ পেয়ে খিড়কির পথে কামরার ভিতরে প্রবেশ করলেন।

ঃ 'আন্ওয়ার আলী! আন্ওয়ার আলী!! তিনি জলদী করে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে বাহু বন্ধনে জড়িয়ে ধরে বললেনঃ 'আমি তোমাদের জন বাঁচানোর ওয়াদা নিয়ে এসেছি।'

ঃ 'তুমি বহু দেরী করে এসেছো, হাশিম!' আন্ওয়ার আলী তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেনঃ 'এখন তোমায় আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

হাশিম বেগ তাঁকে শুইয়ে দিয়ে বললেনঃ 'আমি ইংরেজ ফউজের ডাক্তারকে ডাকছি।'

আন্ওয়ার আলী বললেনঃ 'না, আমি কোনো ইংরেজকে আমার যখমের উপর হাত রাখবার এজাযত দেবো না। হাশিম, আমি তোমাদের বিজয়ের মোবারকবাদ

জানাচ্ছি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, ইংরেজ হায়দারাবাদের সিপাহীদের সেরিংগাপটমের মালে গনিমতের কোন অংশ দেবে না। তথাপি আমি তোমায় হতাশ হতে দেবো না।'

হাশিম বেগম লজ্জা, উদ্বেগ ও বেদনার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন। আন্ওয়ার আলীকে ধরে তুলতে গিয়ে তাঁর হাত রক্তে রঙীন হয়ে গেছে। আন্ওয়ার আলী মেঝের উপর হামাগুড়ি দিয়ে শয্যার দিকে এগুলেন। তিনি বালিশের নীচে হাত দিয়ে মখমলের থলেটি বের করে হাশিম বেগের পায়ের উপর ছুঁড়ে দিলেন।

ঃ 'হাশিম, দোস্ত! এ থলেটি তুলে নাও। এর মধ্যে কয়েকটি বহুমূল্য হীরা রয়েছে। আমার দাদা সিরাজদ্দৌলার জন্য বুকের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যে ইনাম হাসিল করেছিলেন, তা' ইংরেজের হাতে যাবে, এটা আমি চাই না।'

হাশিম বেগ বেদনাতুর কণ্ঠে বললেনঃ 'আন্ওয়ার আলী, এর চাইতেও কঠিন ও তিক্ত কথা বলার অধিকার তোমার রয়েছে। হায়দরাবাদের ফউজের সিপাহীরা এই হত্যা ও রক্তপাতে সমভাবে অংশ নিয়েছে এবং হায়দরাবাদের মুসলমানদের ভাবী বংশধর এই দিন স্মরণ করে কিয়ামত পর্যন্ত অশ্রুপাত করবে, কিন্তু এই রক্তের দাগ তাদের পরিচ্ছদ থেকে কোনোদিন মুছে যাবে না। নিজের সম্পর্কে আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি যে, এ যুদ্ধে আমি সর্বপ্রকারে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তানবীরের আকাংখা ছিলো, যেনো আমি ফউজের সাথে থাকি। তাঁর ধারণা ছিলো যে, বিপদের সময়ে আমি সেরিংগাপটমের মুসলমানদের জান বাঁচাতে হয়তো পারবো। এখানেও যেসব অফিসার লড়াইয়ে কোনো অংশ নেন নি, আমি ছিলাম তাদেরই সাথে। মীর আলম আমাদেরকে নির্ভরের অযোগ্য মনে করে তাঁর শিবির থেকে বেরুবার এজাযত দেন নি। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তারপর আমরা শহরে প্রবেশ করার মওকা পেয়েছি। রাতের বেলায় আমি তোমাদের ঘরের সন্ধান করতে পারিনি। ভোরে যখন পৌছলাম, তখন হামলা চলছে। ইংরেজ পাঁচিলের আড়াল থেকে গুলীবর্ষণ করছে। আমি তাদেরকে বিরত করবার চেষ্টা করাতে তারা আমারই দিকে বন্দুক উদ্যত করলো। আমি কোনো অফিসারের সাহায্য নেবার জন্য বেরিয়ে গেলে তখন কর্ণেল ওয়েলেসলী এদিকে আসছিলেন।'

আন্ওয়ার আলী দুর্বলতায় চোখ বন্ধ করে বললেনঃ 'দোস্ত, আমার কথায় তোমার মনে তকলীফ হয়ে থাকলে আমি তার জন্য মার্জনা চাচ্ছি।'

হাশিম বেগ অশ্রুসজল চোখে বললেনঃ 'আন্ওয়ার আলী, আমি মুরাদের কথা জানতে চাচ্ছিলাম।'

ঃ 'মুরাদ এখানে নেই। সে যুদ্ধের আগেই আফগানিস্তান চলে গেছে। যদি দেখা হয়, তা'হলে তার হেফাযতের ভার তোমারই উপর রইলো। আমার নওকরদের যদি কোনো সাহায্য করতে পারো, তা'হলে খুব উপকার হয়। এ আমার বিবি এবং আমি চাই না যে, ওঁর উপর কোনো ইংরেজের নযর পড়ে। সম্ভব হলে এই গৃহেরই এককোণে আমাদেরকে দাফন করো।'

আন্ওয়ার আলীর মুখের উপর মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়া নেমে এলো। কামরার বাইরে ভারী বুটের আওয়ায শোনা যেতে লাগলো। ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বললেনঃ 'হাশিম থলেটি লুকিয়ে ফেলো। এখন এটা মুরাদ আলীর আমানত। তাকে না পেলে তুমি এটা শাহ্বায খানের ছোট বোনের কাছে পৌঁছে দিও। আমার বিশ্বাস, কোনো দিন তাঁদের ওখানে সে অবশ্যি যাবে।'

হাশিম বেগ থলেটি তুলে জিবের মধ্যে ফেললেন। বাইরে কেউ দরযা খট্খট্ করলে হাশিম বেগ উঠে বিছানার চাদর তুলে মুনীরার লাশ ঢেকে দিয়ে দরযা খুললেন। কর্ণেল ওয়েলেসলী ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং অবশিষ্ট সিপাহী হাশিমের ইশারায় থেমে গেলো। কর্ণেল ওয়েলেসলী এক মুহূর্তের জন্য আন্ওয়ার আলীর দিকে তাকিয়ে দেখে হাশিম বেগকে সম্বোধন করে বললেনঃ 'আপনি এ গৃহের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র জমা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলে আমার লোকেরা এখানে থেকে চলে যাবে।'

হাশিম বেগ জওয়াব দিলেনঃ 'আমি এ দায়িত্ব নিচ্ছি। কিন্তু আপনার অস্ত্রের পরিবর্তে এই নেকড়েদের সংযত রাখবার চেষ্টা করা উচিত।'

কর্ণেল ওয়েলেসলী ফিরে যেতে যেতে বললেনঃ 'এ নেকড়েদের সংযত করে রাখা আমার সাধ্যের ভিতরে নেই।'

তিনি কামরার বাইরে চলে গেলেন।

আন্ওয়ার আলী চোখ বন্ধ করে অতি কষ্টে শ্বাস টানছিলেন। হাশিম পুনরায় তাঁর কাছে এসে বসলেন। আন্ওয়ার আলী চোখ খুলে পানি চাইলেন। কামরার কোণে রাখা সোরাহী থেকে হাশিম বেগ পানির পেয়ালা ভর্তি করে হাত দিয়ে তাঁর গর্দান তুলে ধরে পেয়ালা তাঁর মুখে ধরলেন।

এক ঢোক পানি পান করার পর আন্ওয়ার আলীর হেঁচকী উঠলো এবং তাঁর মুখ থেকে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে এসে পানির সাথে মিশে গেলো। হাশিম তাঁর মাথা নিজের জানুর উপর রাখলেন। আনওয়ার আলী কয়েক মুহূর্ত নির্বাক নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলেন।

ঃ 'আন্ওয়ার আলী! আন্ওয়ার আলী!!' হাশিম বেগ উদ্বিগ্ন হয়ে ডাকলেন।

আন্ওয়ার আলীর মুখে একটা হালকা হাসির রেখা ফুটে উঠলো এবং তাঁর রূহ্ সেরিংগাপটমের শহীদানের রূহের সাথে মিলিত হল।



পরদিন সন্ধ্যা চারটার কাছাকাছি সময়ে সেরিংগাপটমের কেল্লা থেকে সুলতান শহীদের জানাযা বের করা হল। শাহ্যাদাগণ ও উচ্চ কর্মচারীগণ ছাড়া গোরা ফউজের চারটি কোম্পানী জানাযার সাথে ছিলো। সুলতানের যখমী যোদ্ধারা এগিয়ে গিয়ে জানাযা বয়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন। অতীতের লুটতরাজ, হত্যা ও

ধ্বংসতাণ্ডবের দরুন শহরবাসীদের মধ্যে ভীতি ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছিলো। গলি ও বাজার দেখা যাচ্ছিলো সুনসান, কিন্তু সুলতানের মৃতদেহ কেল্লা থেকে বাইরে 'আনা হলে সেরিংগাপটমের নারী পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তাদের আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে জানাযার সাথে শরীক হতে লাগলো। পথের অলি-গলিতে লোকের ভিড় বেড়ে চললো। তাদের ভীতি ও সন্ত্রাস দূর হয়ে গেলো এবং মনে হচ্ছিলো, যেনো এ বদনসীবরা তাদের শাসকের লাশকেও মনে করছে তাদের রক্ষক। সেরিংগাপটমের নর-নারী শোকে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো।

জানাযা উঠানোর সময়ে হাওয়া ছিলো বন্ধ। গরমের তীব্রতা ও গুমোটে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। একটা প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকার ঝড় সারা আসমান ছেয়ে ফেললো। জানাযা লালবাগে পৌঁছলো। শহরের কাযী জানাযার নামায পড়ালেন। মৃতদেহ যখন কবরে নামানো হল, চারদিক থেকে আকাশে তখন বিজলীর ভয়াবহ চমক ও গর্জনধ্বনি শোনা যেতে লাগলো। লোকের মধ্যে তখন একটা কম্পন অনুভূত হোতে লাগলো। গোরা সেনাবাহিনীকে সালামীর হুকুম দেওয়া হল। কিন্তু তাদের বন্দুকের আওয়ায ডুবে গেলো ভয়াবহ মেঘ গর্জনের ভিতরে। মনে হচ্ছিলো যেনো আসমানে গৌরব ও মহিমার মূর্ত প্রতীক সুলতান শহীদের রূহের অভ্যর্থনার আয়োজন চলছে পূর্ণ আড়ম্বরে।

অন্ধকার বেড়ে চললো বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক আরো তীব্র হয়ে উঠলো* সেরিংগাপটমের বাড়িঘর কেঁপে উঠছিলো, যে গাদ্দাররা ইংরেজদের সংগীণের পাহারায় জানাযার সাথে এসেছিলো, তারা ভয়ে সংকুচিত হয়ে গেলো। সুলতানের দাফন শেষ হতেই নেমে এলো অঝোর বৃষ্টিধারা। দেখতে দেখতে সেরিংগাপটমের গলিও বাজার নদীনালার মতো রূপ ধরলো।

কিছুক্ষণ পর মহীশূরের কিছুসংখ্যক ফউজী অফিসার ও সিপাহী কাবেরী নদীর প্লাবনের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। এক বৃদ্ধ অফিসার বুক চাপড়ে বললেনঃ 'আমার সারা জীবনে মে মাসের প্রথম হফতায় কাবেরী নদীতে এমন সয়লাব আর কখনো দেখিনি। মহীশূরের গাদ্দাররা, হায়! তোমরা যদি আর একটা দিন সবর করতে! কুদরত আমাদের সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তোমরাই সে মওকা দাওনি। আজ সেরিংগাপটমের সকল দরযা দুশ্‌মনের জন্য যদি খুলে দিতে, তা'হলে আমরা একটি গুলীও নষ্ট না করে তাদের সংকল্প মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারতাম।'

তারপর তিনি তাঁর সাথীদের দিকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'বন্ধুগণ, আমাদের সুলতান এই দিনটিরই ইন্তেযার করছিলেন। কতো বদকিসমত আমরা, যে মেঘ নেমে আসতো আমাদের বিজয়ের খোশখবর নিয়ে, তাই আজ ধুয়ে নিচ্ছে পরাজিত সিপাহীদের অশ্রুধারা।'

---

* জেনারেল মিডোজ, মেজর বিট্‌সন ও এলেনের রচনায় বজ্রবিদ্যুতের এই ভয়াবহ ঝড়ের প্রত্যক্ষ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শহরের অন্যান্য অংশের মতো বোম্বাইয়ের ইংরেজ ফউজের শিবিরেও বজ্রপাত হয়েছিলো এবং তার ফলে দু'জন অফিসার নিহত ও অসংখ্য লোক আহত হয়

উনত্রিশ

এক সন্ধ্যায় মুরাদ আলীর সাথে আটজন সওয়ার কাবুল নদীর কিনারে মোহ্‌মন্দ উপজাতির এক সরদারের বস্তিতে প্রবেশ করলেন। দেখতে দেখতে বস্তির কতক লোক তাঁদের পাশে এসে জমা হল। মুরাদ আলী ফরাসী যবানে বললেনঃ 'আমরা এ গাঁয়ের সরদারের সাথে দেখা করতে চাই।'

বস্তির লোকদের ভিড়ের মধ্য থেকে এক সুদর্শন নওজোয়ান এগিয়ে এসে বললেনঃ 'আসুন।'

মুরাদ আলী ও তাঁর সাথীরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং নওজোয়ান তাঁদেরকে সাথে নিয়ে কেল্লার মতো এক বিরাট গৃহের দিকে চললেন।

পথের মধ্যে মুরাদ আলী প্রশ্ন করলেনঃ 'আপনি এ গাঁয়ের সরদার?'

ঃ 'না, আমি সরদারের পৌত্র। আপনারা তশ্‌রীফ আনছেন কোথেকে?'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেনঃ 'আমরা মহীশূরের বাসিন্দা, কিন্তু এখন আমরা কাবুল থেকে আস্‌ছি।'

নওজোয়ান বললেনঃ 'এ তো খুবই খুশীর কথা। এর আগে আমি মহীশূরের কোনো বাসিন্দাকে দেখিনি। এ পথে হিন্দুস্তানের যেসব মুসাফির যাওয়া-আসা করতেন, তাঁরা আমাদেরকে সুলতান টিপু সম্পর্কে বহু চিত্তাকর্ষক কাহিনীও শুনিয়েছেন। কাবুলে আপনারা কি আনতে গিয়েছিলেন?'

ঃ 'আমরা আপনাদের শাসকের কাছে এক জরুরী পয়গাম নিয়ে গিয়েছিলাম।'

ঃ 'এখন আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?'

ঃ এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। আজ রাতের জন্য আমরা আপনাদের মেহ্‌মান।'

নওজোয়ান জওয়াব দিলেনঃ 'আপনাদের খেদমত আমাদের জন্য খুবই খুশীর কথা।'

গৃহের ঘেরার বাইরে সরদারের লোকেরা তাঁদের ঘোড়া ধরলো এবং নওজোয়ান তাঁদেরকে নিয়ে গেলেন মেহ্‌মানখানায়। মেহ্‌মানখানার একটি প্রশস্ত কামরা দামী গালিচা দিয়ে সাজানো এবং মুরাদ আলী মেযবানের ইশারায় সাথীদের নিয়ে সেখানে বসলেন। নওজোয়ানের নাম মাহ্‌মুদ খান। মুরাদ আলী তাঁর কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করে জানলেন যে, গাঁয়ের সরদারের নাম মুকাররম খান এবং মাহ্‌মুদ খান তাঁর সর্ব কনিষ্ঠ পৌত্র। তাঁর বাপ, দু'জন বড়ো ভাই, এক চাচা ও তাঁর তিন পুত্র যামান শাহ্‌র ফউজে উচ্চপদে বহাল রয়েছেন। মাহ্‌মুদ খান কিছুক্ষণ মুরাদ আলীর সাথে আলাপ করার পর সরদারকে খবর দেবার জন্য গৃহের অপর অংশে চলে গেলেন।

কয়েক মিনিট পর এক শ্বেতশ্মশ্রু দীর্ঘকায় পুরুষ মাহ্‌মুদ খানের সাথে কামরায় প্রবেশ করলেন। তার কাঁধের উপর একটি ভারী জুব্বা। বার্ধক্য সত্ত্বেও তাঁর দেহ সুস্থ সবল। তিনি সালাম করলে মুরাদ আলী ও তাঁর সাথীরা জওয়াব দিয়ে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুকার্‌রম খান একে একে তাঁদের সবার সাথে মোসাফাহ করে তাঁদের মাঝখানে এক তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন।

ঃ 'আপনারা মহীশূরের বাসিন্দা? 'কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর তিনি প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'জি হ্যাঁ।'

ঃ 'আপনারা কাবুল হয়ে এসেছেন?'

ঃ 'জি হ্যাঁ।'

ঃ 'যামান শাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করেছেন?'

ঃ 'জি হ্যাঁ।' 'মুরাদ আলী জওয়াব দিলেন 'আমরা সুলতান টিপুর তরফ থেকে তাঁর খেদমতে জরুরী পয়গাম নিয়ে গিয়েছিলাম।'

বৃদ্ধ সরদার ভালো করে মুরাদ আলীর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আপনার মুখ বলছে যে, আপনি আপনার অভিযানে সফল হন নি।'

মুরাদ আলী ও তাঁর সাথীরা পেরেশান হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। মুকাররম খান হেসে বললেনঃ 'আমার কথা শুনে পেরেশান হবেন না। মহীশূরের অবস্থা আমার জানা আছে। সুলতান টিপু যদি কোনো যরুরী পয়গাম নিয়ে আপনাদেরকে যামান শাহ্‌র কাছে পাঠিয়ে থাকেন, তা'হলে সে পয়গাম কি, তা' বুঝতে আমার অসুবিধা হচ্ছে না। যামান শাহ্‌র লাহোরের দিকে অগ্রগতির কয়েক মাস আগে আমি কাবুল গিয়েছিলাম। 'সেখানে আমি তাঁর উযির ওফাদার খানের মেহ্‌মান ছিলাম। সুলতান টিপু সম্পর্কে আমি অনেক কিছু শুনেছি। আমার মেয্‌বান যখন আমায় বললেন যে, সুলতানের দূত দীর্ঘদিন কাবুলে অবস্থান করছেন, তখন আমি তাঁদের সাথে মোলাকাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। তাই পরদিন ওফাদার খান তাঁদেরকে খানার দাওয়াত দিলেন। সেখানে আপনাদের দূত মীর হাবীবুল্লাহ্‌ ও তাঁর অন্যতম সাথী মীর রেযার সাথে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আমার প্রথম মোলাকাত হল। দীর্ঘ সময় তাঁরা সুলতান টিপুর ব্যক্তিত্ব ও মুজাহিদসুলভ কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তারপর ওফাদার খানের মুখে আমি শুনলাম, তাঁরা কি উদ্দেশ্যে কাবুলে তশরীফ এনেছেন। তার পরদিন আমি মোলাকাত করলাম আলা হযরত যামান শাহ্‌র সাথে। পানিপথের যুদ্ধে আমি ছিলাম আহমদ শাহ আবদালীর সাথে। তারপর তৈমুর শাহ্‌র সাথে পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে কয়েকটি সংঘর্ষে আমি হিসসা নিয়েছি। যামান শাহ্‌ আমায় খুব ইয্‌যত করতেন। আমি তাঁকে জোর দিয়ে বলেছিলাম যে, হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সাহায্য করা তাঁর ফরয। সুলতান টিপু নিঃসংগ অবস্থায় বছরের পর বছর ইংরেজের মোকাবিলা করে যাচ্ছেন। তাঁর

পরাজয় যদি হয়, তা'হলে ইংরেজ মারাঠাদের তুলনায় আরা বেশী বিপজ্জনক প্রমাণিত হবে। আলা হযরত আমায় আশ্বাস দিলেন যে, তিনি হিন্দুস্তানের উপর হামলার ফয়সালা করেছেন। কয়েক মাস পর তাঁর সেনাবাহিনী লাহোরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো। আমার মনে আস্থা জন্মালো যে, কয়েক মাসের মধ্যেই কোনো এক ময়দানে পানিপথের পুনরাবৃত্তি হবে এবং মহীশূর ও আফগানিস্তানের সিপাহীরা মিলিত হয়ে কয়েক মাসের মধ্যে হিন্দুস্তান থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করবে। কিন্তু মুসলমানদের দুর্ভাগ্য, আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও বাইরের বিপদ সম্ভাবনা যামান শাহ্‌কে লাহোর থেকে আগে বাড়বার মওকা দিলো না। তিনি পেশাওয়ার পৌছলে আমি তাঁর সাথে মোলাকাত করলাম এবং তিনি দৃঢ় নিশ্চয়তা সহকারে বললেন যে, আফগানিস্তানের অবস্থার উন্নতি হলেই তিনি পুনরায় দিল্লীর সাথে রওয়ানা হবেন।'

মুরাদ আলী বললেনঃ 'আমাদের কাবুল পৌছবার দু'দিন আগে তিনি হিরাতের পথে রওয়ানা হয়ে গেছেন এবং আমরা কাবুল থেকে কয়েক ক্রোশ আগে গিয়ে তাঁর সাথে মোলাকাত করেছি। তিনি আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, হিরাতের অভিযান শেষ করেই তিনি সুলতানকে সন্তোষজনক জওয়াব দিতে পারবেন।'

মুকার্‌রম খান বললেনঃ' আমি আপনাদেরকে হতাশ করতে চাই না, কিন্তু আফগানিস্তানের অবস্থাই এখন অনেক খারাপ হয়ে গেছে। গত হফতায় গুজব রটেছিলো যে, বিদ্রোহীরা কান্দাহার দখল করে নিয়েছে এবং আজ ভোরে পেশাওয়ার থেকে খবর এসেছে যে, শুজাউল মুল্‌কও তাঁর ভ্রাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন।'

মুরাদ আলী ও তাঁর সাথীরা বেদনাতুর দৃষ্টিতে কখনো বৃদ্ধ সরদারের দিকে, আবার কখনো পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর গাঁয়ের মসজিদ থেকে মাগরিবের আযান ধ্বনি শোনা গেলো এবং তাঁরা সরদারের সাথে বেরিয়ে গেলেন।



রাতের বেলায় মুকর্‌রম খানের দস্তরখানে মেহ্‌মান ব্যতীত বস্তির কিছুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক হাযির ছিলেন। আড়ম্বরপূর্ণ খানা থেকে আফগান সরদারের মর্যাদার অনুরূপ মেহ্‌মান নেওয়াযীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিলো। খানার পর মেহ্‌মানদের খাতিরদারীর জন্য গাঁয়ের এক গায়ককে ডাকা হল। গায়ক সরদারের ফরমায়েশ অনুযায়ী চিত্তাকর্ষক সুরে এক পশ্‌তু গীত শুরু করে দিলেন। মুরাদ আলী ও তাঁর সাথীরা পানিপথ ও আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালীর নাম ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারলেন না। কিন্তু বস্তির লোক তন্ময় হয়ে গীত শুনতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর গায়ক চুপ করলে সরদার বললেনঃ 'এখন একটা ফারসী গান শোনাও। আমাদের মেহ্‌মান পশ্‌তু জানেন না।' তারপর তিনি মুরাদ আলীকে বললেনঃ 'উনি আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী ও পানিপথের যুদ্ধ সম্পর্কে গীত গাচ্ছিলেন। এ সুর আমার খুব পসন্দ।'

মুরাদ আল বললেনঃ 'এর সুর আমি বুঝি না। কিন্তু এক আফগানের মুখে পানিপথ ও আহ্মদ শাহ্ আবদালীর নাম শোনাই যথেষ্ট। উনি কি গাচ্ছিলেন, তা' আমরা বুঝে উঠতে পারি। পানিপথের সম্পর্কে হিন্দুস্তানের মুসলমানরাও গান গেয়ে থাকে।'

মুকার্‌রম খান বললেনঃ 'বেটা, যখন পানিপথের যুদ্ধ হল, তখন আমার বয়স পঁচিশ বছর। তখন আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, এমন একদিন আসবে, যখন আহ্মদ শাহ্ আবদালী দুনিয়ায় থাকবে না এবং আমরা তাঁর সম্পর্কে শুধু গীত শুনেই খুশী থাকবো। সে ছিলো এক বিচিত্র যামানা। দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকতো মারাঠা ফউজ, কিন্তু আমাদের মনে হত, যদি সারা হিন্দুস্তানে তারা ছড়িয়ে থাকতো, তা'হলেও আমরা তাদেরকে পরাজিত করতে পারতাম। দিনের সূর্য আর কোনোদিন হিন্দুস্তানের কোনো ময়দানে মুসলমানদের এমন শৌর্য ও মহিমা দেখতে পাবে না। এখনো আমার মনে হচ্ছে যেনো এ কালকের ঘটনা। শাহ্ওয়ালী খান, শাহ্ পসন্দ খান, বরখোরদার, নাসীর খান বেলুচ, নজীবুদ্‌দৌলা, রহমত খান রোহিলা ও মোগল সরদারদের রূপ এখনো আমার চোখের সামনে রয়েছে।'

সমাগত লোকদের দৃষ্টি গায়কের দিক থেকে সরে গিয়ে বৃদ্ধ সরদারের মুখের উপর নিবদ্ধ হল এবং তিনি পানিপথের যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বর্ণনা করতে লাগলেন। তিনি বললেনঃ 'শেষ সংঘর্ষের পূর্বে, পানিপথের ময়দানে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটেছিলো। আমাদের ফউজের জোয়ানরা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে মারাঠা শিবিরের কাছে পৌঁছতো এবং মারাঠা যোদ্ধাদের মোকাবিলার আহ্বান জানাতো। এক জোয়ান কোনো মারাঠা সরদারকে মৃত্যুর কবলে ঠেলে দিয়ে ফিরে এলে তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাদের তরফ থেকে কেউ এসে আমাদের শিবিরের সামনে দাঁড়াতো। আমি সে মোকাবিলায় তিনজন মারাঠা জোয়ানকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে শাহ্ ওয়ালী খানের কাছ থেকে ইনাম হাসিল করেছিলাম। তাঁর তলোয়ার এখনো আমার কাছে রয়েছে।'

মুরাদ আলী বললেনঃ 'আপনার সাথে আরো এক নওজোয়ান ছিলেন এবং তিনিও কখনো আফগান, কখনো বেলুচ, কখনো মোগল, আর কখনো রোহিলা সিপাহীর বেশ পরিধান করে মারাঠাদের আহবান জানাতেন।

বৃদ্ধ সরদার চমকে উঠে মুরাদ আলীর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ হাঁা নাসীর খান যাঁর মাথায় নিজের পাগড়ি তুলে দিয়েছিলেন, তাঁকে আমি কি ক'রে ভুলবো? তিনি আরো কয়েক জন সরদারের কাছ থেকে ইনাম হাসিল করেছিলেন। তাঁর সাথে মোসাফাহা করে আমরা গর্ববোধ করতাম।'

মুরাদ আলী বললেনঃ 'তার নাম ছিলো আকবর খান?'

ঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তাঁকে কি করে চিনলেন?

মুরাদ আলী সজল চোখে মৃদু হাস্য সহকারে বললেনঃ 'তিনি আমার পিতার বন্ধু ছিলেন?'

ঃ 'তিনি পানিপথের যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং তাঁর অধীনে ছিলো এক হাজার রোহিলা সিপাহী। তাদের বেশীর ভাগ ছিলো আকবর খানের গোষ্ঠীর লোক।'

মুকার্‌রম খান কিছুক্ষণ মোহাচ্ছন্নের মতো মুরাদ আলীর দিকে তাকিয়ে থেকে দু'হাত তাঁর কাঁধে রেখে বললেনঃ 'তুমি-তুমি মোয়ায্‌যম আলীর পুত্র?'

ঃ 'জি হ্যাঁ।' কথাটি বলার সাথে সাথে মুরাদ আলীর চোখ দু'টি অশ্রুভারে ছল ছল করে উঠলো।

মুকার্‌রম খান ধরা গলায় বললেনঃ 'তোমার বিলকুল সেই রূপ। তোমায় দেখেই আমার মনে হয়েছিলো, এ রূপ হয়তো আগেও দেখেছি কোথাও। তুমি সেই মুজাহিদের পুত্র, আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী যাঁকে নিজের লেবাস পরিয়ে দিয়েছিলেন, হামেশা আমি তাঁকে দেখতাম আকবর খানের সাথে। আমি দিল্লীর মসজিদে তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। আজ চল্লিশ বছর পর সেই মুজাহিদের পুত্র আমার গৃহে হাযির, যার রূপ দেখে আমার ঈমান তাযা হয়ে উঠতো আর আমি কিনা তাকে চিনতে পারিনি।'

বৃদ্ধ সরদারের আওয়ায বসে গেলো এবং তিনি আস্তিনে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললেন। সমবেত লোকদের অন্তর স্পর্শ করলো, সে দৃশ্য। কিছুক্ষণ পর মুকার্‌রম খান তাঁর চোখের অশ্রু মুছে মুরাদ আলীর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'তোমার বাপ যিন্দাহ্‌ আছেন?'

ঃ 'জি না, তিনি মহীশূরে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন?'

ঃ 'আর আকবর খান?'

ঃ 'তিনি মারাঠাদের হাতে শহীদ হয়েছেন।'

মুকার্‌রম খানের কয়েকটি প্রশ্নের জওয়াবে মুরাদ আলী সংক্ষেপে তাঁর ও আকবর খানের খান্দানের অতীত কাহিনী বর্ণনা করলেন। যখন রোহিলাখন্ড থেকে আকবর খানের গোষ্ঠীর হিজরতের প্রসংগে উঠলো, তখন মুকার্‌রম খান বললেনঃ 'যেসব লোক রোহিলাখণ্ড থেকে হিজরত করে এখানে এসেছিলেন, তাঁদের কয়েকটি খান্দান এখান থেকে উত্তরদিকে কয়েক ক্রোশ দূরে আবাদ হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ আকবর খানের স্বজন আছে কিনা, তা' আমি জানি না। তুমি চাইলে তাঁদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ লোককে ডেকে আমি তোমার সাথে মোলাকাতের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

ঃ 'না, আমি অবিলম্বে সেরিংগাপটমে পৌছতে চাই। খোদা জানেন, সেখানে কি হচ্ছে?'

মুকার্‌রম খান দীর্ঘ সময় মুরাদ আলীর সাথে কথা বললেন। ইংরেজ, মারাঠা ও মীর নিযাম আলীর সাথে সুলতান টিপুর যুদ্ধই হল তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু। মধ্যরাত্রির কাছাকাছি সময়ে মজলিস ভাঙলো। সরদার উঠে যেতে থাকলে সমাগত লোকেরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। সরদার কামরা থেকে বেরিয়ে

যাবার সময়ে মুরাদ আলীকে বুকে টেনে নিয়ে বললেনঃ 'বাছা আমার, এ ঘরে তুমি মেহ্মান নও। আমি তোমায় মনে করি আমার পুত্র। এবার আরাম করো।'

পরদিন মুকাররম খান বস্তি থেকে এক মাইল দূরে গিয়ে মুরাদ আলী ও তাঁর সাথীদের বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। পেশাওয়ারে বিদ্রোহের দরুন পথে বিপদাশংকা বিবেচনায় মুকাররম খানের গোষ্ঠীর বিশজন সশস্ত্র লোক তাঁদের সাথে চললো। মুরাদ আলীর সাথে মোসাফাহা করতে গিয়ে আর একবার বৃদ্ধ সরদারের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেনঃ 'বেটা, আমার যিন্দেগীতে হয়তো তুমি আর কোনোদিন এদিকে আসবে না। কিন্তু মনে রেখো, এ ঘরের দরযা হামেশা তোমার জন্য খোলা থাকবে। যদি আমি না থাকি, তা'হলেও আমার খান্দানের বাচ্চা ও জোয়ান সবাই তোমায় উপযুক্ত সমাদর করে গ্রহণ করবে।'

তারপর তিনি মাহ্মুদ খানকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'বেটা, ওঁকে তোমায় আটকের ওপারে পৌছে দিয়ে ফিরতে হবে।'



সুলতানের শাহাদতের ছয়দিন পর শাহ্যাদা ফত্হে হায়দর জেনারেল হিয়ার্সের ওয়াদা এবং কমরুদ্দীন, পূর্ণিয়া ও মীর গোলাম আলীর পরামর্শে প্রভাবিত হয়ে হাতিয়ার সমর্পণ করলেন। মহীশূরের স্বাধীনতাকামীদের শিরায় তখনো কয়েক বিন্দু রক্ত অবশিষ্ট ছিলো এবং তাঁরা শেষ পর্যন্ত শাহ্যাদা ফত্হে হায়দরকে যুদ্ধ জারী রাখার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। মালিক জাহান খান সেরিংগাপটম থেকে ফেরার হওয়ার পর স্বাধীনতাকামীদের পরিচালক হয়ে বসেছিলেন। তিনি শাহ্যাদা ফত্হে হায়দরকে এই বলে বুঝাবার চেষ্টা করলেনঃ 'আপনার অবিলম্বে চাতল দুর্গে চলে যাওয়া প্রয়োজন। ওখানে কয়েকদিনের মধ্যে সুলতান শহীদের হাজার হাজার প্রাণপণ যোদ্ধা এসে জমা হবে এবং তারা শেষমুহূর্ত পর্যন্ত আপনার সহযোগিতা করবে। মহীশূরের শহীদানের রক্ত ব্যর্থ হোতে পারে না। সেরিংগাপটমে হিন্দু-মুসলমানের উপর ইংরেজ যে যুলুম করেছে, তারপর তাদের কাছে কোনো মানবোচিত আচরণের প্রত্যাশা করা নিকৃষ্টতম আত্মপ্রতারণা। যে দেশদ্রোহীরা নিজ হাতে সেরিংগাপটমের বুকে ইংরেজের পতাকা উত্তোলন করেছে, তাদের পরামর্শে আপনি আস্থা স্থাপন করবেন না। এ গাদ্দারদের মনে হামেশা ভয় থাকবে যে, সুলতানের বিশ্বস্ত জীবনপণ যোদ্ধারা কখনো মাফ করবে না তাদেরকে। মীর কমরুদ্দীন, পূর্ণিয়া ও তাদের সাথীদের শেষ চেষ্টা হবে মহীশূর থেকে আপনার খান্দানের আধিপত্য চিরদিনের জন্য খতম করে দেওয়া।

'এ কথা সত্য যে, এহেন পরিস্থিতিতে আমরা অনির্দিষ্টকাল দুশমনের মোকাবিলা করতে পারি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস সেরিংগাপটমের উপর ইংরেজের যুলুম হিন্দুস্তানের কোটি কোটি মানুষকে প্রভাবিত না করে পারে না। যদি আমরা কয়েক হফ্তা অথবা কয়েক মাস লড়াই চালিয়ে যেতে পারি, তা'হলে আমাদের যুদ্ধ শুধু মহীশুরে

সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং গোটা হিন্দুস্তানের আযাদী সংগ্রামে পরিণত হবে। আমার আরো বিশ্বাস, এ দেশের সকল শাসকই মীর নিযাম আলীর মতো বিবেকবর্জিত প্রমাণিত হবেন না। এখন তাঁদের কাছে ইংরেজের হিংসাত্মক সংকল্পের নেকাব খুলে গেছে এবং সেরিংগাপটমের ঘটনার পর নিজস্ব স্বার্থের জন্য তাঁরা আমাদের সহযোগিতা করতে বাধ্য হবেন। এই যুদ্ধে পেশোয়া ও মারাঠা সরদারদের কর্মনীতি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে তাঁদের অনুভূতি জেগে উঠেছে।

'সুলতান শহীদ ইংরেজের বিরুদ্ধে হিন্দুস্তান, আফগানিস্তান ও ইরানের যে ঐক্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা' একদিন অবশ্যি বাস্তবে রূপায়িত হবে। সম্ভবত হিন্দুস্তানের উপর যামান শাহ্‌র হামলা এ দেশে রাজনৈতিক নক্‌শা বদলে দেবে। আমার বিশ্বাস, তিনি অবশ্যি আসবেন এবং এ দেশের অধিকাংশ শাসক তাঁকে তাঁদের নাজাতদাতা মনে করে তাঁর ঝাণ্ডাতলে সমবেত হবেন। যাঁরা তাঁর সাথে সহযোগিতা করবেন না, তাঁদেরকে দেশের ইয্‌যত ও আযাদীর দুশমন মনে করে মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দেওয়া হবে। ইংরেজদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা ছিলো সুলতান শহীদের যিন্দেগীর সব চাইতে বড়ো আকাংখা। তাঁর সে আকাংখা বাস্তবে রূপায়িত হবে।'

কিন্তু শাহ্‌যাদা ফত্‌হে হায়দরকে মালিক জাহান খান ও তাঁর সাথীদের আবেদন প্রভাবিত করতে পারলো না। তাঁর ভাই ও খান্দানের বাকী লোকেরা সেরিংগাপটমে ইংরেজের রহম ও করমের উপর নির্ভর করেছিলেন। পতনোন্মুখ পাঁচিলের আশ্রয় নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার উদ্যম খুব কম সিপাহী ও অফিসারের মধ্যে দেখা যাচ্ছিলো। সুলতানের শাহাদত ও সেরিংগাপটমের পরাজয় তাদেরকে ভীত ও হতাশ করে দিয়েছিলো এবং তাদের মধ্যে অনেকের সন্তান-সন্ততি ছিলো সেরিংগাপটমে।

জেনারেল হিয়ার্সের ওয়াদা সত্ত্বেও শাহ্‌যাদা ফত্‌হে হায়দর ইংরেজের কাছ থেকে কোনো সদাচরণের প্রত্যাশা করতেন না। যে দেশদ্রোহীরা ইংরেজের উকিল হয়ে তাঁকে তাঁর খান্দানের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশা দিচ্ছিলো, তাদের সম্পর্কেও কোনো মিথ্যা আশা তিনি পোষণ করেন নি। তাঁর কাছে সুলতানের শাহাদতের পর মহীশূরের আযাদী সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে এবং এক বাহাদুর সিপাহী হওয়া সত্ত্বেও রাতের অন্ধকারে লুণ্ঠিত কাফেলার পথ প্রদর্শক হতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

শাহ্‌যাদা ফত্‌হে হায়দর ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করার জন্য যখন সেরিংগাপটমের অভিমুখে চললেন, তখন মালিক জাহান খান গজলহাটির এক পাহাড়ের উপকণ্ঠে একদল বিদ্রোহীর সামনে বক্তৃতা করছিলেনঃ

'শাহ্‌যাদা আমার কথা মানলেন না। আমার মনে হচ্ছে, পরিস্থিতি তাঁকে অসহায় ও নিরুপায় করে দিয়েছে। কিন্তু আমি সুলতান শহীদের পবিত্র রক্তের

কসম করে ঘোষণা করছি, যতোক্ষণ আমার শিরায় একবিন্দু রক্তও অবশিষ্ট থাকবে, আমি মহীশূরের ইয্যত ও আযাদীর দুশমনদের ততোক্ষণ স্বস্তিতে থাকতে দেবো না। যে গাদ্দাররা আমার কওমের ভাগ্যে এই দিন এনে দিয়েছে, তাদেরকেও আমি মাফ করবো না।

'বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি তোমাদের কাছে কোনো গৌরবময় বিজয়ের ওয়াদা করতে পারি না, কিন্তু আমি তোমাদের কাছে একটি ওয়াদা করতে পারি। তা হচ্ছেঃ ইংরেজ ও তাদের মিত্ররা তোমাদের হাতে কোনোদিন গোলামীর জিঞ্জির পরাতে পারবে না। আযাদীর যিন্দেগী থেকে হতাশ হয়ে মুসলমান যে জিনিসটি কামনা করতে পারে, তা হচ্ছে ইয্যতের মৃত্যু। যাঁরা ইয্যতের মৃত্যুর সন্ধানে আমার সাথে মিলিত হোতে চান, তাঁদেরকে আমি হতাশ করবো না।'

কিছুক্ষণ পর মালিক জাহান খানের নেতৃত্বে দেড়শ' সওয়ার কোনো অজ্ঞাত মন্যিলের পথে রওয়ানা হল।

হায়দর আলী ও সুলতান টিপু তাঁর তলোয়ারের মুখে মহীশূরের কাহিনীতে যে সুন্দর উপাদান সংযোজন করেছিলেন, শাহ্যাদা ফত্হে হায়দরের হাতিয়ার সমর্পণের পর তার পরিসমাপ্তি ঘটলো। সেরা ও চাতলদুর্গের অধিনায়করাও মহীশূরের ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশ হয়ে হাতিয়ার সমর্পণ করলেন। খোদাদাদ সালতানাত হয়ে গেলো এক নিস্প্রাণ দেহ এবং ইংরেজ শকুনের মতো তাকে ঠুকরে খেতে লাগলো। ওয়েলেসলী মালে গণিমতের কয়েকটি টকুরা।*

নিযামের সামনে ফেলে দিলেন এবং উপকূল এলাকার সকল জেলা ও কোয়েম্বাটুর ব্যতীত সেরিংগাপটম দ্বীপ নিজেদের অধিকারভূক্ত করলেন।

খোদাদাদ সালতানাতের বন্দরবাঁট ভাগাভাগির পর ইংরেজ সাবেক হিন্দু রাজার খান্দানের এক পাঁচ বছরের ছেলেকে খুঁজে এনে তখ্তে বসিয়ে দিলো। হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক দাবার ছকে এই নতুন রাজা ছিলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সব চাইতে অসহায় ও তুচ্ছ ঘুঁটি। তার রাজ্য ছিলো মধ্য মহীশূরের কয়েকটি জেলায় সীমাবদ্ধ। গাদ্দারীর বিনিময় হিসাবে পূর্ণিয়াকে নিযুক্ত করা হল এই নতুন রাজার দেওয়ান। মীর কমরুদ্দীনকে দেওয়া হল গুমকুণ্ডার জায়গীর। মীর মুঈনুদ্দীনের উত্তরাধিকারী ও অন্যান্য গাদ্দারদের অতীত মর্যাদা বিবেচনায় জায়গীর দেওয়া হল। শাহ্যাদাদের নির্বাসনে পাঠানো হল ভোল্লোরে। এবার ইংরেজ নিশ্চিতরূপে মহীশূরের আযাদীর সমাপ্তি ঘটালো।

---

* নিযাম আলী আজীবন জাতিদ্রোহিতার বিনিময়ে যা' পেলেন, তা' ছিলো বিদ্রুপের মতো। নিযামকে গুটি ও চাতলদুর্গের কিছু অংশ দেওয়া হল। ইংরেজ সাব্সিডিয়ারী সিস্টেম কবুল করার শর্তে মারাঠাদের তুংগভদ্রার উত্তরে কয়েকটি এলাকা দান করার প্রস্তাব করলে পেশোয়া তা'প্রত্যাখ্যান করলেন এবং এলাকাগুলো কোম্পানী ও হায়দরাবাদ সরকারের মধ্যে ভাগাভাগি হল, কিন্তু মীর নিযাম আলীর জন্য এই যিল্লতের টুকরা লাভের খুশীও অস্থায়ী প্রমাণিত হল। ইসায়ী ১৮০০ সালের গোড়ার দিকে লর্ড ওয়েলেসলীর ইচ্ছানুযায়ী এলাকাগুলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রত্যর্পণ করা হয়।

কিন্তু মহীশূরের ভস্মস্তূপের ভিতরে তখনো ধিকিধিকি জ্বলছিলো কতকগুলো অগ্নিকণা। তাই নতুন রাজার অভিষেকের দু'দিন পর জেনারেল হিয়ার্স লর্ড ওয়েলেসলীর কাছে চিঠিতে লিখলেনঃ 'আমাদের বিরুদ্ধে মালিক জাহান খানের তৎপরতা নিয়মিত যুদ্ধে রূপান্তরিত হচ্ছে। আজ খবর পাওয়া গেলো যে, তিনি চাতলদুর্গের পশ্চিমে আমাদের এক চৌকির উপর হামলা করে আমাদের পঞ্চাশজন লোককে হত্যা করেছেন। গত সপ্তাহে হায়দরাবাদ সীমান্তে মীর নিযাম আলীর কয়েকটি সৈন্য দলকে তিনি সাফ করে দিয়েছেন। আমার প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী মালিক জাহান খানের সাথে পাঁচ হাজার বিদ্রোহী জমা হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

ত্রিশ

একদিন দুপুরবেলা বিলকিস তাঁর গৃহের আঙিনায় একটি গাছের তলায় শুয়ে রয়েছেন। সামিনা এক কামরা থেকে বেরিয়ে বিলকিসের খাটের কাছে একটি মোড়ার উপর বসলেন। গুমোট আবহাওয়া। বিলকিস পাখা নিয়ে নিজের মুখে হাওয়া দিতে দিতে বললেনঃ 'হাওয়া আজ বিলকুল বন্ধ। বৃষ্টি অবশ্যি আসবে।'

সামিনা কোনো কথা না বলে মায়ের হাত ধরে পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন।

এক নওকর দ্রুত পা ফেলে আঙিনায় প্রবেশ করলো এবং বিলকিসের দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বললেনঃ 'বিবিজী, হাশিম বেগ সাহেবের লোক এসে গেছে। সে এই চিঠিটা দিলো। তার সাথে আর একটি লোক এসেছে এবং সে বলছে, সে নাকি মুরাদ আলীর নওকর।'

বিলকিস হাত বাড়িয়ে চিঠিটা ধরলেন। নওকর ফিরে চলে গেলো। সামিনার বুক কেঁপে উঠলো এবং তিনি অন্তহীন অস্থিরতা সহকারে তাঁর মার দিকে দেখতে লাগলেন। বিলকিস চিঠি না খুলে সামিনার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেনঃ 'বেটি, আমায় পড়ে শোনাও।'

সামিনা কাঁপতে কাঁপতে হাত দিয়ে চিঠি খুলে পড়ে শুনাতে লাগলেন। হাশিম বেগ লিখেছেন'ঃ

'খালাজান! আস্‌সালামু আলাইকুম। আমার আফসোস, আমি মুরাদ আলীকে আপনার পয়গাম পৌছে দিতে পারিনি। আপনার চিঠি পাওয়ার চারদিন আগে তিনি রাতের বেলায় নিজের গৃহে পৌছে কিছুক্ষণ পরেই শহরে কোনো বন্ধুর অবস্থা জানবার জন্য চলে গেলেন। তারপর তিনি এখনো ঘরে ফিরে আসেন নি।

'ভোরে তাঁর নওকর আমায় খবর দিলে আমি সেরিংগাপটমের আনাচে কানাচে খুঁজে বেড়িয়েছি। তাঁর নওকর বললো, তিনি তাঁর ভাই ও তাঁর বিবির মৃত্যুর ঘটনা

শোনার পর তাঁদের কবর দেখে এলেন। তারপর কারুর সাথে কথা না বলে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। এক নওকর তাঁর ঘোড়ার বাগ ধরে প্রশ্ন করলো, তিনি কোথায় যাচ্ছেন। তিনি জওয়াব দিলেন যে, তিনি এক বন্ধুর অবস্থা জানতে যাবেন। আমার মনে হয়, সে রাত্রে তিনি আর সেরিংগাপটমে থাকেন নি। সম্ভবত আমার চিঠির আগেই তিনি আপনাদের কাছে পৌঁছে গেছেন।

'আমি সেরিংগাপটম থেকে আধুনী যাবার হুকুম পেয়েছি। এই হফ্তায় আমি এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবো। সম্ভবত আমার ফউজকে স্থায়ীভাবে ওখানেই রাখা হবে। মুরাদ আলীর নওকরদের অবস্থা ছিলো খুবই খারাপ।

'এক নওকরকে আমি নিজের কাছে রেখেছি এবং আর একটিকে পাঠাচ্ছি আপনাদের কাছে। বাকী ক'জন সেরিংগাপটম ছেড়ে যেতে রাযী হল না।

'মুরাদ আলী আপনাদের কাছে পৌঁছে থাকলে তাঁকে আমার সালাম দেবেন। তাঁর আঘাতের প্রতিকার কোনো মানুষের হাতে নেই। তিনি আপনাদের কাছে না পৌঁছে থাকলে তাঁর সন্ধান চালানো হবে। আমার একটিমাত্র ভয়, তিনি বিদ্রোহী দলের সাথে মিলিত না হন। তা'হলে তাঁর সাহায্য করতে খুবই মুশকিল হবে আমার। সামিনাকে সালাম।'

চিঠির শেষের দিকে সামিনা তাঁর গলার আওয়ায সংযত 'করে রাখতে পারলেন না। অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে তিনি বলে উঠলেনঃ তিনি অবশ্যি আসবেন, আম্মাজান। তিনি ওয়াদা করে গেছেন। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরই হয়তো ইংরেজ তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়েছে। এও হোতে পারে যে, তিনি গ্রেফতারীর বিপদ দেখে কোথাও আত্মগোপন করেছেন এবং তাঁর নওকররা ভাইজানকে নির্ভরের অযোগ্য মনে করে তাঁর সন্ধান দেয়নি। এখন তাঁর নওকরকে ভিতরে ডেকে জিজ্ঞেস করুন।'

বিলকিস বললেনঃ 'আচ্ছা বেটি, খাদেমাকে বলো তাকে ডেকে আনতে।' সামিনা উঠে খাদেমাকে আওয়ায দিতে দিতে বাবুর্চিখানার দিকে গেলেন।

খাদেমা বাবুর্চিখানা থেকে বাইরে তাকিয়ে বললোঃ 'কি ব্যাপার, বিবিজী?'

সামিনা বললেনঃ 'তুমি বাইরে গিয়ে নওকরদের বলো, সেরিংগাপটম থেকে মুরাদ আলীর যে নওকর এসেছে, তাকে যেনো ভিতরে পাঠিয়ে দেয়।'

খাদেমা বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই মুনাওয়ার খান আঙিনায় প্রবেশ করলো। বিলকিস ও সামিনাকে সালাম করে সে আদবের সাথে দাঁড়ালো। সামিনা উঠে মোড়াটা একটুখানি এগিয়ে দিয়ে নিজে মায়ের কাছে গিয়ে খাটের উপর বসলেন।

ঃ 'বসো' বিলকিস মোড়ার দিকে ইশারা করে বললেন এবং মুনাওয়ার খানিকটা ইতস্তত করে বসে পড়লো। বিলকিস ও সামিনার অসংখ্য প্রশ্নের জওয়াবে সে সেরিংগাপটমের যাবতীয় ঘটনা বিবৃত করলো। নিজস্ব অতীত কাহিনীর শেষের

দিকের ঘটনা শুনাতে গিয়ে তার বাকশক্তি নিঃশেষ হয়ে এলো এবং সে অতি কষ্টে তার কান্না সংযত করবার চেষ্টা করলো। বিলকিস মুরাদ আলী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় দু'হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলো। সে বললোঃ 'বিবিজী, আমার ধারণা ছিলো।

তিনি আপনাদের কাছে পৌঁছে গেছেন, কিন্তু আপনাদের নওকর বললো যে, তিনি এখানে আসেন নি। তিনি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁর ঘোড়ার বাগ ধরে জানতে চাইলাম, তিনি কোথায় যাচ্ছেন। তিনি বললেন যে, তা' তাঁর জানা নেই। আমি তাঁর সাথে যাবার জন্য যিদ ধরলে তিনি বললেন যে, এখন আর আমরা তাঁর সাথে থাকতে পারি না। তিনি শহরে এক বন্ধুর অবস্থা জানতে যাচ্ছেন, এই শেষ সান্ত্বনা দিয়ে তিনি চলে গেলেন। তারপর তিনি কোথায় গেলেন, তা' আমরা জানতে পারিনি। আমরা সেরিংগাপটমের আনাচে-কানাচে তাঁর সন্ধান করেছি; কিন্তু শহরে কোনো দোস্ত তাঁর খবর জানেন না। মীর্যা হাশিম বেগ সাহেবও তাঁর সন্ধান করার বহু চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তিনিও নিশ্চিত বুঝেছিলেন যে, তিনি সোজা আপনাদের কাছেই পৌঁছে থাকবেন। বিবিজী, যদি আপনারা তাঁর কোনো খবর জানতে পারেন, তা'হলে, খোদার কসম, আমার কাছে তা গোপন করবেন না।'

মুনাওয়ার খানের চোখ পুনরায় অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। বিলকিস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ 'বেটা, তোমায় সাহস করতে হবে। আমার বিশ্বাস, মুরাদ আলী এখানে অবশ্যি আসবে। আমি হাশিমকে খবর পাঠাচ্ছি, যেনো তাঁর সন্ধান চলতে থাকে। আমার ইচ্ছা যতোদিন মুরাদ আলীর সন্ধান পাওয়া না যাচ্ছে, তুমি আমাদের কাছেই থাকবে।'



আরো পাঁচ মাস কেটে গেছে, কিন্তু মুরাদ আলীর কোনো সন্ধান মেলেনি। এই সময়ের মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে মালিক জাহান খানের তৎপরতা নিয়মিত যুদ্ধের রূপ গ্রহণ করেছে। কখনো তাঁর সম্পর্কে খবর আসে যে, মহীশূরের অমুক এলাকায় হামলা করে তিনি আচানক ইংরেজদের কয়েকটি চৌকি সাফ করে দিয়েছেন। কখনো শোনা যায়, ইংরেজ ফউজ বিদ্রোহীদের পরাজিত করে মারাঠা এলাকার দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। তারপর আবার কিছুদিন পর খবর আসে যে, মালিক জাহান খান মারাঠা এলাকা থেকে বেরিয়ে নিযাম রাজ্যের সীমান্তে প্রবেশ করেছেন।

মালিক জাহান খানের সহযোগীর সংখ্যা দিনের পর দিন ক্রমাগত বেড়ে চললো। মহীশূরের স্বাধীনতাকামী মানুষেরা তাঁকে শেষ আশা মনে করে দলে দলে তাঁর ঝাণ্ডাতলে জমা হতে লাগলো। সেরিংগাপটম বিজিত হওয়ার পর কোনো কোনো মারাঠা সরদারেরও চৈতন্য হল যে, খোদাদাদ সালতানাতের সমাপ্তির পর ইংরেজের তলোয়ার আজ তাঁদের শাহ্রগ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। পর্দার অন্তরালে তাঁরা মালিক

জাহান খানের সাহায্য করতে লাগলেন। মহীশূরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিভিন্ন সংকট- সংকুল পাহাড় ও জংগল বিদ্রোহীদের জন্য অপরাজেয় কেল্লার কাজ করতো। কোনো বিশেষ স্থানে ইংরেজদের আবেষ্টন সংকীর্ণ হয়ে এলে তাঁরা বিস্ময়কর গতিতে বহু ক্রোশ দূরে আর কোনো স্থানে চলে যেতেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্যের অভাবে বিদ্রোহীদের গতিবিধি জানা ছিলো ইংরেজের পক্ষে দুঃসাধ্য, রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে বিদ্রোহীরা প্রত্যেক জায়গায়ই সাহায্য পেতো স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে।

হায়দরাবাদী ও ইংরেজ সিপাহীর মতো মালিক জাহান খান সেই সব সরদারকেও অমার্জনীয় অপরাধী মনে করতেন, যারা মহীশূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দৌড় ঝাঁপ করে অংশ নিয়েছে। তাই পরশুরাম ভাওয়ের বিশেষ বিশেষ সাথীর অনেকে কতল হয়ে গেলো এবং আরও অনেকে সীমান্তবর্তী এলাকাকে অরক্ষিত মনে করে পলায়নের পন্থা অবলম্বন করলো। মহীশূরের যেসব গাদ্দার জাতিদ্রোহিতার বিনিময়ে বড়ো বড়ো জায়গীর হাসিল করেছিলো, তারা মালিক জাহান খানকে এতো ভয় করতো যে, ঘরের বাইরে তাকাতেই তারা বিপদের আশংকা করতো।



সামিনার যিন্দেগীর সকল আকর্ষণ সীমাবদ্ধ হল মুরাদ আলীর প্রতীক্ষায়। এক সন্ধ্যায় তিনি মাগরিবের নামায পড়ে গৃহের ছাদের উপর দাঁড়িয়েছিলেন। পশ্চিম আসমানে সন্ধ্যারাতের চাঁদ দেখা দিয়েছে। সামিনা দোআ করার জন্য হাত তুললেন এবং তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেললো অশ্রুর পরদা।

খাদেমা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে সামিনাকে দোআ করতে দেখে কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে গেলো। দোআ খতম হলে সে বললোঃ 'বিবিজী, আপনার ভগ্নিপতি তশরীফ এনেছেন।'

সামিনা তাঁর বুকের কম্পন সংযত করবার চেষ্টা করে বললেনঃ 'তিনি একা এসেছেন?'

ঃ 'জি না, তাঁর সাথে নওকরও রয়েছে।'

সামিনা স্তিমিত আওয়াযে প্রশ্ন করলেন ঃ 'তিনি মুরাদ আলীর কোনো খবর এনেছেন?'

ঃ 'জি না।'

সামিনার বুকের কম্পন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো। তিনি ধীরে পা ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলেন। ঘরের এক কামরায় তাঁর মা ও হাশিম বেগের আওয়ায শোনা গেলো। তিনি এগিয়ে চললেন, কিন্তু দরযার কাছে এসে তাঁর হিম্মত নিঃশেষ হয়ে গেলো। হাশিম বেগ বললেনঃ 'খালাজান! এখন ওঁর চিন্তা ছেড়ে দিন। এখন তিনি ফিরে আসতে পারেন না। এ দেশের যমিন তাঁর জন্য

সংকীর্ণ হয়ে গেছে। যে মুরাদকে আপনি পুত্রের মতো স্নেহ করতেন, তিনি মরে গেছেন।'

বিল্‌কিসের আওয়ায শোনা গেলোঃ 'না বেটা, খোদার কসম, এমন কথা বলো না।'

ঃ 'খালাজান, আমি তাঁর জন্য কম পেরেশান নই। কিন্তু তিনি এমন এক দলে শামিল হয়েছেন, যার কর্মতৎপরতার পরিণাম আমি ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার আফ্‌সোস, সেরিংগাপটমে তাঁর সাথে আমার দেখা হয়নি। সেখানে দেখা হলে আমি তাঁকে মালিক জাহান খানের সাথী হতে বাধা দিতাম।'

ঃ 'কিন্তু বেটা, তুমি কি করে জানলে যে, মুরাদ মালিক জাহান খানের সাথে শামিল হয়েছেন।'

ঃ 'খালাজান, সম্প্রতি ইংরেজরা ঘোষণা করেছে যে, যে লোক মালিক জাহান খানের সাহচর্য ছেড়ে আসবে, তাদের কোন সাজা দেয়া হবে না। যেসব লোক তাঁর সাহচর্য ছেড়ে সেরিংগাপটম ফিরে এসেছে, তাদের সাথে আমি দেখা করেছি। তারা বলেছে যে, বিদ্রোহী লশ্‌কর মালিক জাহান খানের পর মুরাদ আলীকেই সব চাইতে বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী ও নির্ভরযোগ্য মনে করে। তারা আরো বলেছে যে, মুরাদ কোনো মূল্যের বিনিময়ে মালিক জাহান খানের সাহচর্য ত্যাগ করতে রাযী হবেন না। যিন্দেগীর প্রতি এখন তাঁর কোনো আকর্ষণ নেই।'

সামিনার সহনশক্তি নিঃশেষ হয়ে এলো। তিনি আচানক কামরায় প্রবেশ করলেন এবং বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে হাশিম বেগের দিকে তাকাতে লাগলেন।

হাশিম বেগ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেনঃ 'বসো, সামিনা ! আমার আফ্‌সোস, মুরাদ আলী সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক খবর আমি আনতে পারিনি।'

সামিনা তাঁর মায়ের দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বললেনঃ 'আম্মাজান তিনি অবশ্যি আসবেন। তিনি ওয়াদা করে গেছেন। তিনি কারুর সাথে মিথ্যা ওয়াদা করতে পারেন না। হায়! আমি যদি তাঁর কাছে যেতে পারতাম!'

এই কথার সাথেই সামিনার খুবসুরত চোখের অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়তে লাগলো। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি সামনের কামরায় চলে গেলেন।

হাশিম বেগ কিছুক্ষণ পেরেশানী ও উদ্বেগের দৃষ্টিতে বিল্‌কিসের দিকে তাকালেন। অবশেষে তিনি বললেনঃ 'আমি জানতাম না যে, সামিনা ----। আমি আগে কখনো ওর চোখে অশ্রু দেখিনি।'

বিল্‌কিস স্তিমিত কণ্ঠে জওয়াব দিলেনঃ 'বেটা, সামিনা বদলে গেছে।'

হাশিম কুরসি থেকে উঠে সামনের কামরার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেনঃ 'খালাজান, আমি পাথরের মোমে পরিণত হওয়া বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু সামিনার চোখে অশ্রু আমি কল্পনাও করতে পারি না। আমি এক্ষুণি আসছি।'

তিনি সামনের কামরায় প্রবেশ করলেন। সামিনা শয্যার উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। তিনি অবনত হয়ে সস্নেহে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেনঃ 'সামিনা, ছোট বোনটি আমার, ধৈর্য ধরো। তোমার কাছে আমি ওয়াদা করছি, আমি নিজে তাঁর কাছে গিয়ে বলবো যে, আমাদের ছোট্ট সামিনা তাঁর ইন্তেযার করছে।'

সামিনা উঠে অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন হাশিমের মুখের দিকে।

হাশিম বললেনঃ 'সামিনা, আমি জানতাম না, বেঅকুফ তোমায় এতটা পেরেশান করেছে।'

সামিনা গর্দান নীচু করলেন। হাশিম বেগ জিবের ভিতরে হাত দিয়ে মখমলের একটি থলে বের করে অপর হাতে সামিনার চিবুক স্পর্শ করে বললেনঃ 'সামিনা, এই লও। এ মুরাদ আলীর আমানত এবং আমার বিশ্বাস, তিনি ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এর হেফাযত করতে পারবে।'

সামিনা দ্বিধাগ্রস্ত দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর দিকে।

হাশিম বেগ হাত ধরে তাঁর হাতের তালুর উপর জওয়াহেরাত ভরা থলেটি রেখে কিছু না বলে বিল্‌কিসের কামরায় চলে গেলেন।

ঃ 'খালাজান, ভোর হতেই আমি এখান থেকে চলে যাবো।'

ঃ ' কোথায়?

ঃ 'আমি মুরাদ আলীর সন্ধানে যাচ্ছি, খালাজান!'



বিশ দিন পর হাশিম বেগ এক বিপদসংকুল পাহাড়ী এলাকায় সফর করছেন। তখন দুপুর বেলা। এক পাহাড়ের পাদদেশে ঘন বন অতিক্রম করে তিনি এক নদীর কিনারে থেমে ঘোড়াকে পানি পান করালেন। তারপর নীচে নেমে তিনি নিজের পিপাসা দূর করলেন। তারপর জিব থেকে একটি নক্‌শা বের করে তিনি নদীর কিনারে এক পাথরের উপর বসে দেখতে লাগলেন। কয়েক মিনিট পর নক্‌শা ভাঁজ করে জিবের ভিতরে রেখে তিনি আবার সওয়ার হলেন ঘোড়ার উপর। নদী পার হয়ে অপর কিনারে এক গাছের কাছে থেকে তিনি তলোয়ার বের করলেন এবং ঝুঁকেপড়া একটি গাছের শাখা কেটে নদীর কিনারে বেয়ে বাম দিকে চললেন। প্রায় আধ মাইল চলার পর সেই নদীতে এসে মিশেছে আর একটি নদী এবং হাশিম বেগ সেখানে ডানদিকে মোড় ঘুরে অপর নদীটির কিনার ধরলেন। আচানক ঘন গাছপালার মধ্যে একটা শব্দ তাঁর কানে এলো এবং তিনি ঘোড়া থামালেন।

গাছপালার ভিতর থেকে একটি লোক তাঁর দিকে বন্দুক সোজা করে বেরিয়ে এলো এবং অবিলম্বে এগিয়ে এসে বললোঃ 'কে তুমি?'

হাশিম বেগ আশ্বস্ত হয়ে জওয়াব দিলেনঃ 'যদি তুমি মালিক জাহান খানের লোক হয়ে থাকো, তা'হলে আমায় তাঁর কাছে নিয়ে চলো।'

ঃ 'তুমি কি করে জানলে যে, মালিক জাহান খান এখানে রয়েছেন?' আগন্তুক লোকটি এগিয়ে বন্দুকের নল হাশিম বেগের মুখের সামনে ধরলো।

হাশিম বেগ পেরেশান হয়ে এদিক ওদিকে তাকালেন। তাঁর আগে পিছে ও ডানদিকে আরো সশস্ত্র লোক। আগন্তুক বললোঃ 'তুমি ঘোড়া থেকে নেমে এসো এবং তোমার তলোয়ার বন্দুক আমাদের হাতে ছেড়ে দাও।'

হাশিম বেগ বিনাদ্বিধায় হুকুম তামিল করে বললেনঃ 'তোমরা বিশ্বাস রাখতে পারো, আমি এখান পর্যন্ত পৌছে পালাবার চেষ্টা করবো না। মালিক জাহান খানের কাছে আমায় নিয়ে চলো।'

ইতিমধ্যে দশজন লোক হাশিম বেগের কাছে এসে জমা হল। তাদের মধ্যে এক নওজোয়ান বললোঃ 'তুমি ওদিকের নদীর ধারে কোনো নক্‌শা দেখেছিলে?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'সে নক্‌শাটিও আমাদের হাতে ছেড়ে দাও।'

হাশিম বেগ জিব থেকে নক্‌শা বের করে তার হাতে দিলেন। নওজোয়ান নক্‌শাটি সাথীদের দেখিয়ে হাশিম বেগকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'মালিক জাহান খান ইংরেজের চরদের সাথে কিরূপ আচরণ করেন, তোমার জানা আছে কি?'

ঃ 'তা' আমার জানা আছে।' হাশিম বেগ জওয়াব দিলেন। 'আমি এখান থেকে দু'তিন মাইল দূরে এক গাছে ঝুলানো পাঁচটি লাশ দেখেছি। কিন্তু আমি কারুর গুপ্তচর নই।'

ঃ 'এ নক্‌শা তোমায় কে দিয়েছে?'

হাশিম বেগ বললেনঃ 'দেখো, আমি মালিক জাহান খানের সাথে দেখা করতে চাই এবং আমি তোমাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছি, তাঁর সাথে আমার মোলাকাত হওয়ার পর এই ধরনের প্রশ্ন করার প্রয়োজন হবে না তোমাদের।'

নওজোয়ান দুই বৃদ্ধকে একদিকে ডেকে নিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর হাশিম বেগকে লক্ষ্য করে বললোঃ 'আমরা তোমার চোখে পট্টি বেঁধে মালিক জাহান খানের কাছে নিয়ে যাবো।'

হাশিম বেগ জওয়াব দিলেনঃ 'এটা জরুরী হলে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

কিছুক্ষণ পর হাশিম বেগ চোখে পট্টি বাঁধিয়ে ঘোড়ার উপর সওয়ার হলেন এবং একটি লোক বাগ ধরে চললো।

পথে হাশিম বেগের সাথে কোনো কথা বললো না তারা। ঘোড়ার যিনের উপর বসে তিনি শুধু অনুভব করছিলেন যে, তিনি ঘন বনের ভিতর দিয়ে এক অসমতল

দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলেছেন।

প্রায় তিন ঘন্টা সফরের পর লোকগুলো এক জায়গায় থামলো এবং একজন হাশিম বেগকে ঘোড়া থেকে নামতে বললোঃ হাশিম বেগ হুকুম তামিল করলেন এবং একজন তাঁর চোখের পট্টি খুলতে খুলতে বললোঃ 'তুমি এখানে বসো। আমি মালিক জাহান খানকে এখনই খবর দিচ্ছি।'

হাশিম বেগ ক্লান্তি অনুভব করছিলেন। তিনি এক গাছে ঠেস দিয়ে বসলেন। দু'টি লোক সামনে এক উঁচু পাহাড়ের দিকে চললো এবং অবশিষ্ট লোকেরা তাঁর কাছে বসলো। হাশিম চারদিকে নযর করে দেখলেন। একদিকে সংকীর্ণ উপত্যকার ঢালু পথ এবং অপর তিনদিকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। কয়েক মিনিট নির্বিকার নিশ্চল বসে তিনি লোক ক'টিকে দেখতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সাহস করে বললেনঃ 'আমায় আর কতোক্ষণ এখানে থাকতে হবে?'

এক ব্যক্তি জওয়াব দিলোঃ 'আমরা মালিক জাহান খানকে খবর পাঠিয়েছি। তাঁর এখানে পৌঁছতে বেশী দেরী হবে না।'

প্রায় এক ঘন্টা ইন্তেযার করার পর হাশিম বেগ কাছে ঘন গাছপালার মধ্যে ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে পেলেন।

ঃ 'তিনি আসছেন।' এক ব্যক্তি উঠে বললো এবং তার সাথীরা উঠে দাঁড়ালো। হাশিম বেগও তাদের অনুকরণ করলেন।

তিনজন সওয়ার তাদের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। তাদের একজনের হাতে সেই নক্শা, যেটি হাশিম বেগের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিলো। তিনি অবিলম্বে হাশিম বেগের দিকে এগিয়ে তাঁকে নক্শা দেখিয়ে বললেনঃ 'তুমি এই নক্শার সাহায্যে এখানে এসেছো?'

ঃ 'হ্যাঁ।' হাশিম বেগ জওয়াব দিলেন।'

ঃ 'তুমি এ নক্শা পেয়েছো কোত্থেকে?'

ঃ হাশিম বেগ জওয়াব দিলেন 'আমি এ ধরনের প্রশ্নে জওয়াব শুধু মালিক জাহান খানকেই দিতে পারি।'

ঃ 'আমি মালিক জাহান খান এবং আমার সাথে কথা বলবার আগে তোমায় ভালো করে চিন্তা করা উচিত যে, সত্য মিথ্যা পরখ করে নিতে আমার দেরী লাগবে না। এবার বলো, এ নক্শা তুমি কোত্থেকে পেলে?'

ঃ 'এ নক্শা আমি আপনার এক পলাতক সাথীর কাছ থেকে পেয়েছিলাম। তার সাথে আমার মোলাকাত মীর কম্‌রুদ্দীনের ওখানে। আপনার কাছ পর্যন্ত আসার প্রয়োজন ছিলো আমার।'

ঃ 'তুমি সে লোকটির নাম বলতে পারো আমায়?'

ঃ 'তার নাম ছিলো সিরাজুদ্দীন'

ঃ 'তুমি মিথ্যা বলছো। এই নামের কোনো লোককে তো আমি জানি না।'

মালিক জাহান খানের সাথীরা এবার তাঁর দিকে তাকালো গযবের দৃষ্টিতে। তিনি সংযত হয়ে বললেনঃ 'হতে পারে, সে আমায় তার নাম মিথ্যা বলেছে।'

মালিক জাহান খান তাঁর সাথীদের দিকে তাকালেন এবং এক ব্যক্তি জলদী করে এক গাছের উপর চড়ে এক মযবুত শাখার সাথে একটা দড়ি বেঁধে নীচে লটকে দিলো। দু'জন হাশিম বেগকে ধরে গাছের নীচে নিয়ে দড়ির মাথার ফাঁদ তাঁর গলায় পরিয়ে দিলো।

মালিক জাহান খান বললেনঃ 'এবার বলো, এখানে কি জন্য এসেছো এবং তোমার সাথে যে ফউজ আসছে, তা' এখান থেকে কতো দূরে?'

হাশিম বেগ নিশ্চিন্ত মনে জওয়াব দিলেনঃ 'আমি আমার এক স্বজনের সন্ধানে এখানে এসেছি এবং আমার সাথে কোনো ফউজ আসেনি। তা' সত্ত্বেও যদি আমায় ফাঁসি দিয়ে আপনার কোনো ফায়দা হয়, তা'হলে সানন্দে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।'

ঃ 'এখানে কে তোমার স্বজন।'

ঃ 'মুরাদ আলী।'

মালিক জাহান খান কয়েক মুহূর্ত পেরেশান ও বিস্মিত হ'য়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে হাশিম বেগের গলা থেকে ফাঁদ খুলে দিয়ে বললেনঃ 'মুরাদ আলীর সাথে কি সম্পর্কে আপনার?'

ঃ 'আপনি বুঝে নিন, তিনি আমার ভাই।'

ঃ 'সেরিংগাপটমের যাঁরা মুরাদ আলীকে আপন ভাই বলতে পারেন, তাঁরা আমার জানা। আপনার আকৃতি ও রূপ তাঁদের থেকে স্বতন্ত্র।'

ঃ 'আমার বাসস্থান সেরিংগাপটম নয়, হায়দরাবাদ।'

মালিক জাহান খান ভ্রূকুটি করে বললেনঃ 'তুমি এখনই বললে, সেরিংগাপটম থেকে এসেছো। আমার কাছে দুর্বোধ্য হবার চেষ্টা করো না। তোমার নাম কি?'

ঃ 'আমার নাম হাশিম বেগ। কয়েকদিন আমি উত্তর সীমান্তে ঘোরাফেরা করে আপনার আশ্রয়স্থলের সন্ধান নেবার জন্য সেরিংগাপটম গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি আমায় মুরাদ আলীর সামনে নিয়ে গেলে এখনই রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।'

মালিক জাহান খান তাঁর ঘোড়ার বাগ ধরে তাঁর সাথীদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'তোমরা ওঁকে শিবিরে নিয়ে এসো।' তারপর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তিনি দ্রুতগতিতে ঘন গাছপালার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।



হাশিম বেগ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মালিক জাহান খানের সাথীদের সাথে চললেন। কিছুক্ষণ পর উঁচু পাহাড়ের অপরদিকে আর একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় স্থানে স্থানে জীর্ণ খিমা ও ঘাসপাতার তৈরী চালা দেখা গেলো। উপত্যকায় প্রবেশ করার পর এক প্রশস্ত খিমার সামনে মালিক জাহান খান ও মুরাদ আলীকে দেখা গেলো। তিনি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে আগে গেলেন, কিন্তু মুরাদ আলী তাঁকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হাশিম বেগের পা যেনো যমিনে গেড়ে গেলো। তিনি ভারাক্রান্ত আওয়াযে বললেনঃ 'মুরাদ, আমি হাশিম।'

ঃ 'আমি জানি, কিন্তু আমার সন্ধানে আপনার এখানে আসা উচিত হয়নি।'

হাশিমের মন বসে গেলো। তথাপি তিনি এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে তাঁর বাহু ধরে ঝাঁকুনী দিয়ে বললেনঃ 'আমি নিরপরাধ।'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেনঃ 'আপনার সাফাই পেশ করবার প্রয়োজন নেই। আমি জানি, আপনি আমার ভাইয়ের জান বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন এবং আমি আপনার কাছে শোকরগুযারী করছি।'

হাশিম বেগ মালিক জাহান খানের দিকে তাকিয়ে অনুনয়ের স্বরে বললেনঃ 'যদি আপনি এজাযত দেন, তা'হলে আমি কয়েক মিনিট ওঁর সাথে একা একা কথা বলতে চাই।'

মুরাদ আলী বললেনঃ 'না, এখন কথা বলে কোনো ফায়দা নেই। যদি আপনি আমায় এই কথা বলতে এসে থাকেন যে, আপনার সুপারিশে ইংরেজরা আমার অপরাধ মাফ করে দিয়েছে এবং নিরাপদে ঘরে ফিরে যেতে পারি, তা'হলে আপনি সময় নষ্ট করছেন।'

মুরাদ আলীর বাহুর উপর হাশিম বেগের হাতের চাপ আচানক ঢিলা হয়ে গেলো এবং তিনি অন্তহীন হতাশা ও উদ্বেগ সহকারে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।

মুরাদ আলী মালিক জাহান খানের দিকে মনোযোগ দিয়ে বললেনঃ 'আমি এ কথার যামানত দিতে পারি, উনি আমাদের সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা নিয়ে আসেন নি। এবার ওঁর ফিরে যাবার ইন্তেযাম করে দিন।'

হাশিম বেগ কিছু বলতে চান, কিন্তু তাঁর আওয়ায বসে গেছে। মুরাদ আলী খিমার দিকে এগিয়ে চললেন। হাশিম বেগ কয়েক মুহূর্তে তাঁর শুকনো ঠোঁট চাটার পর পূর্ণ শক্তিতে চীৎকার করে বললেনঃ 'মুরাদ, দাঁড়াও। সামিনা আমায় পাঠিয়েছে।'

মুরাদ আলীর পা যেনো মাঠিতে গেড়ে গেলো। কিন্তু তিনি ফিরে হাশিম বেগের

দিকে না তাকিয়ে গর্দান নীচু করে দাঁড়ালেন।

হাশিম বেগ ছুটে গিয়ে তাঁর বাহু ধরে নিজের দিকে টেনে এনে বললেনঃ 'মুরাদ, আমি শাহ্বায ও তাঁর পিতার মৃত্যুতে সামিনার চোখে অশ্রু দেখিনি, কিন্তু এবার তাঁকে আমি কাঁদতে দেখেছি। আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।'

মুরাদ আলী উদ্বিগ্ন হয়ে জওয়াব দিলেনঃ 'আমি সামিনার কাছে ওয়াদা করেছিলাম যে, যিন্দা থাকলে কোনোদিন আমি অবশ্যি ফিরে যাবো। কিন্তু এখন আপনি তাঁকে জানিয়ে দিতে পারেন যে, মুরাদ মরে গেছে এবং যে লোকটির সাথে আপনি এ বনের মধ্যে মোলাকাত করলেন, সে তার লাশ।'

ঃ 'মুরাদ, আমি তোমার সাথে নিশ্চিন্ত মনে বসে কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমি বহু কষ্টে তোমার সন্ধান করেছি।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা, আসুন। কিন্তু আমার ভয় হয়, আমার কথা শুনে আপনার তকলীফ হবে।'

তাঁরা খিমায় প্রবেশ করে চাটাইয়ের উপর বসলেন। হাশিম বেগ বললেনঃ যদি আমায় বুঝাতে পারো যে, তোমাদের এই যুদ্ধে মহীশূরের কোনো কল্যাণ হবে, তা'হলে আমি তোমাদের সহযোগিতা করবার ওয়াদা করছি।'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেন 'দেখুন, এসব কথায় কোনো ফায়দা নেই। আমি জানি, যে কওমের পরিচ্ছদ সুলতান শহীদের খুনে রাঙা হয়েছে, তার গোনাহ্র কাফ্ফারা আমরা আদায় করতে পারি না। যে লোকদের কাতারে মীর কমরুদ্দীনের মতো গাদ্দার ঢুকে গেছে, তাদেরকে আমরা ইয্যত ও আযাদীর পথ দেখাতে পারি না। যাদের প্রতিটি মুহূর্ত ছিলো যিন্দেগীর আকাংখায় পরিপূর্ণ, তাদের সে অতীতকে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারবো না। আমাদের জন্য এ দুনিয়া হয়ে গেছে অন্ধকার। অমাদের ইয্যত ও আযাদীর দুশ্মন আমাদের যিন্দেগীর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে গেছে। এখন আমাদের জন্য সর্বশেষ কাম্য রয়েছে ইয্যতের মৃত্যু। তা' থেকে আমাদেরকে তারা বঞ্চিত করতে পারবে না। আপনি আমায় খুব বেশী হলে বুঝাতে পারবেন যে, আমাদের এ যুদ্ধ নিস্ফল। কিন্তু আমার চূড়ান্ত জওয়াব, আমি শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত মালিক জাহান খানের সহযোগিতা করবার হলফ নিয়েছি, আমায় খুঁজতে গিয়ে আপনি যে কষ্ট স্বীকার করেছেন, তার জন্য আমি আপনার শোকরগুযারী করছি। কিন্তু আমায় মালিক জাহান খানের সাথে চুক্তিভংগ করে চলে যাবার পরামর্শ দেবেন না। আমার স্বাথীদের সাথে চুক্তিভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে আমি তাঁদেরকে মুখ দেখাতে পারবো না, যাঁরা আমায় আন্ওয়ার আলীর ভ্রাতা ও মোয়ায্যম আলীর পুত্র বলে মর্যাদা দান করেন। আর কিছু বলতে চান আপনি?'

হাশিম বেগ জওয়াব দিলেনঃ 'কিছু নয়। আমি আর কিছু বলতে চাচ্ছি না। আমি অনুভব করছি যে, এখন দলীলের চাইতেও বেশী করে আপনার প্রয়োজন দোআর।'

ঃ 'তা হলে আমার জন্য আপনারা দোআ করবেন, যেনো যিন্দেগীর আকাংখা আমায় রোয কিয়ামতে সেরিংগাপটমের শহীদানের সাথে উঠবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না করে।'

হাশিম বেগ বললেনঃ 'কখনো লড়াইয়ের পরিবর্তে তলোয়ার কোষবদ্ধ করতে অধিককতর হিম্মত, সহিষ্ণুতা ও সবরের প্রয়োজন হয়। আমি খোদার কাছে দোআ করবো, যেনো কোনোদিন আপনি তাদের কথাও চিন্তা করতে পারেন, যাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে নিজস্ব উৎসাহ-উদ্দীপনা অব্যাহত রাখার জন্য আপনার মতো দৃঢ়সংকল্প মানুষের সাহচর্য ও পথ নির্দেশের প্রয়োজন হবে।

'আমি আপনাকে ইংরেজের আনুগত্য মেনে নেবার পরামর্শ দিতে এসেছি। যাবার আগে আপনার এ-ভুল ধারণা আমি দূর করে দিতে চাই। না, এ পরামর্শ আমি আপনাকে দিতে পারি না। আমি আপনাকে শুধু এই বলতে এসেছি যে, সুলতান টিপুর শাহাদতের পর মহীশূরের স্বাধীনতাকামীদের আখেরী কেল্লা মিস্‌মার হয়ে গেছে'। কিন্তু যদি আপনি ভবিষ্যতের আশায় যিন্দা থাকার চেষ্টা করেন, তা'হলে খোদার রহমতে এ সম্ভাবনা সুদূর নয় যে, মহীশূরের বাইরে আর কোনো কেল্লার সন্ধান করে নিতে পারবেন। আমি মালিক জাহান খানের স্বাধীনতা স্পৃহার প্রশংসা করি, কিন্তু যে কওম নিজের হাতে নিজের গলা টিপে মেরেছে, তার ঢাল-তলোয়ার হতে তিনি পারেন না। আমি উপলব্ধি করছি যে, আপনাকে উপদেশ দেবার অধিকার আমার নেই। আমি সেই দুর্ভাগাদের একজন, যারা বিবেকের আওয়ায উপেক্ষা করে নিরুপায় অবস্থার কাছে মাথা নত করে দিয়েছে।'

এই কথা বলে হাশিম বেগ দাঁড়িয়ে গেলেন।

মুরাদ আলী বললেনঃ 'আপনি চলে যাচ্ছেন।'

ঃ হ্যাঁ, এখানে আমার কর্তব্য আপাতত খতম হল।'

ঃ 'আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন হয়তো, কিন্তু আমি আপনাকে এখানে থাকবার দাওয়াত দিতে পারছি না। আজকাল প্রতি মুহূর্তে দুশ্‌মনের হামলার বিপদ সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের। লড়াইয়ের সময়ে আপনি এখানে থাকেন, এটা আমি চাই না। এই কথা বলে মুরাদ আলী উঠে হাশিম বেগের সাথে খিমার বাইরে বেরিয়ে এলেন।

কিছুক্ষণ পর হাশিম বেগকে জংগলের বাইরে পৌছে দেবার জন্য বিশজন লোকের এক কাফেলা তৈরী হল। তিনি মালিক জাহান খানের সাথে মোসাফাহা করার পর মুরাদ আলীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেনঃ 'আমি একটা কথা আপনাকে বলিনি। সামিনা বলেছিলো, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত সে আপনার ইন্তেযার করবে। হ্যাঁ, আরো একটা কথা আমার মনে পড়ছে। আপনার ভাই মৃত্যুর সময়ে জওয়াহেরাতের এক থলে আমার হাতে দিয়েছিলেন। আমি আপনার সে আমানত

সামিনার কাছে রেখে এসেছি। যদি আপনি সেখানে যেতে না চান, তা'হলে কোনো লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিতে পারেন।'

মুরাদ আলী তার হাত ধরে বললেনঃ 'আপনি সেখানে যাবেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, আমি আগে সেখানেই যাবো।

ঃ 'সামিনাকে বলবেন ....মুরাদ আলী তার কথা শেষ না করে হাশিম বেগের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঃ 'কি বলবেন? বলুন, চুপ করে গেলেন কেন?'

ঃ 'কিছু না। খোদা হাফিয।' বলে মুরাদ আলী লম্বা লম্বা পা ফেলে খিমার দিকে চললেন।

খিমায় ঢুকে তিনি স্তব্ধ হয়ে চাটাইর উপর শুয়ে পড়লেন। বাইরে ঘোড়ার পদধ্বনি শোনা গেলো। মালিক জাহান খান খিমায় ঢুকলে তিনি উঠে বসলেন।

জাহান খান বললেনঃ 'মুরাদ, তুমি যেতে চাইলে আমি তোমায় মানা করবো না।'

মুরাদ আলী কোনো কথা না বলে মাথা অপরদিকে ঘুরিয়ে নিলেন। কয়েকদিন পর হাশিম বেগ বিলকিস ও সামিনার কাছে তার সফরের কাহিনী বর্ণনা করছিলেন। সামিনা মা ও ভগ্নিপতির কথা নির্বিকার শুনে না গিয়ে নিজের মনকে মিথ্যা প্রবোধ দেবার জন্য বারবার বলতে লাগলেনঃ 'উনি আসবেন, ভাইজান, উনি অবশ্যি আসবেন। আম্মাজান, আমার বিশ্বাস, উনি অবশ্যি আসবেন।'

একত্রিশ

বিল্‌কিসের গৃহে প্রায় এক হফ্‌তা অবস্থানের পর হাশিম বেগ আধুনী ফিরে গেলেন। এরপর সামিনা কিছুকাল মালিক জাহান খানের তৎপরতা সম্পর্কে নানারকম পরস্পরবিরোধী খবর শুনতে থাকলেন। কখনো খবর আসে, তিনি দক্ষিণদিকে অগ্রগতির পর অমুক এলাকা জয় করেছেন; আবার কখনো খবর আসে যে, অমুন স্থানে ইংরেজের হাতে পরাজিত হয়ে তিনি পিছু হটে গেছেন।

ইসায়ী ১৮০০ সালের বর্ষার মওসুমে মালিক জাহান খানের তৎপরতা ইংরেজদের জন্য পেরেশানীর কারণ হয়ে উঠলো। কিন্তু মহীশূরের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির শাসকদের নিরপেক্ষতার দরুন জাহান খানের বিক্ষিপ্ত লড়াই ব্যাপক আযাদী সংগ্রামে রূপান্তরিত হতে পারে নি। আগের যুদ্ধে তার কতক সাথী মারা গিয়েছিলো এবং কতক হতাশ ও ভীত হয়ে তার সাহচর্য ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। ইংরেজরা তার যোদ্ধাদলের সাথে তাদের বহুসংখ্যক গুপ্তচর শামিল করে দিয়েছিলো। এইসব গুপ্তচর একদিকে জাহান খানের সাথীদের মধ্যে হতাশা ও ভীতি ছড়িয়ে দিতো এবং অপরদিকে তারা মালিক

জাহান খানের তৎপরতা সম্পর্কে ইংরেজদের অবহিত করে রাখতো।

বর্ষার মওসুমের শেষে খবর এলো যে, মালিক জাহান খানকে দমন করার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত কর্নেল আর্থার ওয়েলেসলী এক বিশাল লশ্‌করসহ উত্তর সীমান্তের পাহাড়ে-জংগলে বিদ্রোহীদের পিছু ধাওয়া করছেন। তারপর একদিন খবর রটলো যে, এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মালিক জাহান খান পরাজিত হওয়ার পর শহীদ হয়ে গেছেন এবং কর্ণেল ওয়েলেসলীর সৈন্যদল তার অবশিষ্ট সাথীদের দমন করতে ব্যস্ত।

সঠিক পরিস্থিতি জানবার জন্য বিলকিস গাঁয়ের একজন লোককে হাশিম বেগের কাছে পাঠালেন। হাশিম বেগ তার চিঠির জওয়াবে মালিক জাহান খানের মৃত্যু সংবাদ সমর্থন করলেন কিন্তু মুরাদ আলীর কথা তিনি লিখলেন যে, যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

মালিক জাহান খানের মৃত্যুর খবর শোনার পর মুরাদ আলী সম্পর্কে সামিনার উদ্বেগ ও অস্থিরতা ক্রমাগত বেড়ে চললো। প্রতীক্ষার এক-একটি মূহূর্ত তার কাছে বছরের মতো দীর্ঘ মনে হতে লাগলো। অক্টোবর মাসের এক সন্ধ্যায় তিনি যথারীতি বাড়ির ছাদের উপর নিঃসংগ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আরামদায়ক হাওয়া বয়ে চলেছে। গাঁয়ের রাখাল ও চাষীরা দিনভর মেহ্‌নত করে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে ফিরে আসছে নিজ নিজ গৃহে। দূরের বস্তির বাড়িগুলো থেকে হালকা হালকা ধোয়া দেখা যাচ্ছে। গাঁয়ের আকাশ-বাতাস নীড়ে ফিরে আসা পাখীদের কল-কাকলীতে মুখর।

কিছুক্ষণ পর গাঁয়ের উপর রাতের প্রশান্তি নেম এলো। আসমানে বিক্ষিপ্ত সিতারারাজি নযরে আসতে লাগলো। তারপর পূর্বদিকের এক পাহাড়ের পিছন থেকে দেখা দিলো চাঁদ। দেউড়ির বাইরে লুকোচুরি খেলায় মত্ত শিশুদের অট্টহাসি শোনা যাচ্ছে। সামিনা কিছুক্ষণ ছাতের উপর পায়চারি করে ছাতের ধারে উঁচু রেলিং-এর উপর বসলেন। চাঁদ পরিপুর্ণ রূপ নিয়ে উঠে আসছে। নীচে বাইরের আঙিনায় নওকররা আলাপ করছে।

গাঁয়ের মসজিদ থেকে এশার আযানধ্বনি ভেসে এলো। সামিনা নীচে নেমে যাবার উপক্রম করছেন, অমনি দেউড়ির দিকে ঘোড়ার পদশব্দ শোনা গেলো এবং তিনি বিস্ফোরিত চোখে সেদিকে তাকাতে লাগলেন।

যমিনের দিকে অবনত দেহ সওয়ারকে নিয়ে একটি ঘোড়া ধীর-পদক্ষেপে দেউড়ির পথে বাইরের আঙিনায় প্রবেশ করলো।

'কে ?' ঃ এক নওকর বললো।

সওয়ার কোনো জওয়াব না দিয়ে ঘোড়া থেকে নামবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যমিনে পা রাখতেই তিনি উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। নওকর ছুটে এলো তার কাছে।

ঃ 'এ কে? কি হল এর ?'

ঃ 'এ যখমী-এ বেহুঁশ-এ রোগী।' 'তারা পরস্পরকে বুঝাবার চেষ্টা করলো।

সামিনা উঠে সিঁড়ির দিকে গেলেন। তার বুক কাঁপছে এবং পা থরথর করছে। নীচে নেমে তিনি বাইরের হাবেলীর দিকে চললেন। পিছন থেকে মায়ের আওয়ায এলোঃ 'সামিনা, কোথায় যাচ্ছো?'

সামিনা ফিরে না তাকিয়েই জওয়াব দিলেনঃ 'আম্মাজান, আমি এখানেই। এক্ষণি আসছি।

এতক্ষণে নওকররা নবাগতকে এক খাটের উপর শুইয়ে দিয়েছে। মুনাওয়ার খান সামিনাকে দেখে চীৎকার করে উঠলোঃ 'বিবিজী, উনি এসেছেন। আমার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে, কিন্তু উনি বেহুঁশ। জ্বরে ওঁর শরীর জ্বলে যাচ্ছে। গাঁয়ে কোনো ভালো হাকীম থাকলে ডাকান।'

সামিনার দৃষ্টি নবাগতের মুখের উপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তিনি কিছুক্ষণ নিশ্চল নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তিনি আচানক এগিয়ে মুরাদ আলীর নাড়িতে হাত রেখে বললেনঃ 'ওঁকে ভিতরে নিয়ে চলো এবং চিকিৎসককে অবিলম্বে ডেকে আনো। মুনাওয়ার, তুমি আম্মাজানকে খবর দাও।'



প্রায় এক ঘন্টা পর হুঁশ ফিরে এলে মুরাদ চোখ খুলে দেখলেন, তিনি এক কামরার মধ্যে শুয়ে আছেন। এক বৃদ্ধ চিকিৎসক তাঁর আহত বাহুতে পট্টি বাঁধছেন এবং ঘরের নওকর ও গাঁয়ের কিছুসংখ্যক লোক তাঁর কাছে জমা হয়েছেন। তিনি এদিক ওদিক তাকিয়ে মুনাওয়ার খানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং তাকে পানি আনতে বললেন।

মুনাওয়ার ছুটে বাইরে চলে গেলো এবং পানির পেয়ালা নিয়ে ফিরে এলো। মুরাদ আলী পানি পান করার জন্য মাথা তুললেন, কিন্তু দুর্বলতার দরুন তাঁর চোখের সামনে অন্ধকার ছেয়ে গেলো। তিনি পুনরায় বালিশে মাথা রাখলেন। এক ব্যক্তি জলদী করে এগিয়ে এসে তাঁকে ধরে কয়েক ঢোক পানি পান করিয়ে আবার শুইয়ে দিলেন।

চিকিৎসক প্রলেপ পট্টি বাঁধা শেষ করে একটা অষুধ পান করালেন এবং কামরায় সমাগত লোকদের লক্ষ্য করে বললেনঃ 'ওঁর আরামের প্রয়োজন। আপনারা এখন চলে যান।'

তাঁরা একে একে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু মুনাওয়ার তার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলো। মুরাদ আলী ক্ষীণ কণ্ঠে বললেনঃ 'মুনাওয়ার, তুমি কি করে এখানে এলে?'

মুনাওয়ারের চোখে অশ্রুধারা উথ্‌লে উঠলো এবং কিছুক্ষণ তার গলা থেকে আওয়ায বেরুলো না। অবশেষ সে তার কান্না রোধ করে বললোঃ 'হাশিম বেগ সাহেব আমায় এখানে পাঠিয়েছেন। আমার ধারণা ছিলো, আপনি আগেই এখানে পৌঁছে গেছেন।'

মুরাদ আলী তার হাত ধরে চোখ মুদলেন। মুনাওয়ার কিছু সময় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকলো এবং মুরাদ আলী তার হাত ছেড়ে দিলে সে 'ভাইজান! ভাইজান!!' বলে চীৎকার করে উঠলো।

চিকিৎসক জলদী করে তাঁর নাড়ি দেখলেন।

মুরাদ আলী চোখ খুললেন এবং চোখের উপরে মৃদু হাসি টেনে এনে বললেনঃ 'আমি সুস্থ আছি। আমার ঘুম আসছে। আমি বড়োই ক্লান্ত।'

ঃ 'আপনি খানিকটা দুধ, পান করে নিন।' হাকীম সাহেব বললেন।

ঃ ' না, এখন নয়।' মুরাদ আলী চোখ বন্ধ করে জওয়াব দিলেন।

চিকিৎসক মুনাওয়ার খানকে বললেনঃ' আমি চলে যাচ্ছি। তুমি বেগম সাহেবাকে খবর দিও যে, ওঁর তবিয়ত ভালোই আছে, কিন্তু ওঁর আরামের খুবই প্রয়োজন। রাতের বেলায় প্রয়োজন হলে আমায় খবর দিও।'

মুরাদ যখন চোখ খুললেন, তখন ভোর হয়ে গেছে। প্রভাতসূর্যের কিরণ কামরায় এসে পড়েছে। সামিনা তাঁর শয্যার কাছে এক কুরসির উপর বসে ঘুমাচ্ছেন। মুনাওয়ার দরযার কাছে এক চাটাইর উপর শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। সামিনার মাথা একদিকে ঝুঁকে রয়েছে এবং একগোছা চুল ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর মুখের উপর।

এই কামরায়ই সামিনার সাথে মুরাদ আলীর শেষ মোলাকাত হয়েছিলো। শাহ্‌বাযের স্মরণচিহ্নগুলো তেমনি পড়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ তিনি শয্যার উপর পড়ে থাকা সামিনার মুখের দিকে তাকালেন। পিপাসায় তাঁর গলা শুকিয়ে আসছে। তাঁর শয্যার ডানদিকে এক তেপায়ীর উপর পানির সোরাহী। সামিনা অথবা মুনাওয়ারকে আওয়ায না দিয়ে মুরাদ আলী নিজে উঠে বসলেন। তিনি সোরাহী থেকে এক পেয়ালা পানি ঢেলে পান করলেন। তারপর যখন দ্বিতীয়বার পানি ঢালছেন, অমনি সামিনা চোখ খুললেন। মুরাদ আলীর দিকে তাকিয়ে একনযর দেখে জলদী করে এগিয়ে এসে তিনি তাঁর হাত থেকে সোরাহীটা ধরলেন এবং পেয়ালা ভরে তাঁর সামনে ধরলেন। মুরাদ আলীর মাথা ঘুরছে। পানি পান করে তিনি শুয়ে পড়লেন এবং সামিনা তাঁর চুলগুলো সংযত করে নিয়ে কুরসি থেকে উঠে বললেনঃ আম্মাজান রাতের বেলা আপনার জন্য দুধ নিয়ে এসেছিলেন। তা' এখানে পড়ে থেকে খারাপ হয়ে গেছে। আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন, তাই জাগিয়ে দেওয়া আমরা ভালো মনে করিনি। আম্মাজান এইমাত্র উঠে গেলেন। আপনার ক্ষিধে পেয়ে থাকবে। তাজা দুধ

নিয়ে আসি?'

মুরাদ আলী ক্ষীণকণ্ঠে বললেনঃ 'বসো, সামিনা।'

সামিনা মাথা নত করে বসে কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেনঃ 'রাতের বেলায় আপনার সে কি জ্বর। এখন আপনার তবিয়ত কেমন?'

ঃ 'আমি ভালো আছি। পথে আমি বারবার মনে করেছি, হয়তো এখানে পৌছতে পারবো না। রাতের বেলা আমি জানতেই পারিনি, আমি কোথায়। দীর্ঘকাল পর আমি এমনি করে ঘুমিয়েছি। আমার আফ্‌সোস, তোমাদেরকে আমি বহু তকলীফ দিয়েছি। তোমরা হয়তো সারারাত ঘুমোতে পারোনি।'

ঃ 'আমার বিশ্বাস ছিলো, আপনি অবশ্যি আসবেন।' এই কথা' বলে সামিনা গর্দান খানিকটা উঁচু করে মুরাদ আলীর দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে তখন অশ্রু টলটল করছে। মুরাদ আলী বললেনঃ 'সামিনা, আমার জন্য দুনিয়ায় এ গৃহ ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল ছিলো না। তোমাদের কাছে আমি শোকর গুযার।'

সামিনা জলদী করে চোখের পানি মুছে ফেলে আলোচনার মোড় ঘুমিয়ে বললেনঃ 'গাঁয়ের চিকিৎসক তেমন অভিজ্ঞ নন। আম্মাজান আধুনীতে ভাইজান হাশিম বেগের কাছে খবর পাঠিয়েছেন, যেনো তিনি কোনো ভালো হাকীম নিয়ে পৌছে যান।'

মুরাদ আলী বললেনঃ 'তাঁকে তকলীফ দেওয়ার প্রয়োজন ছিলো না।'

'আমি আম্মাজানকে খবর দিচ্ছি।' সামিনা উঠে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বসতবাড়ির আঙিনা পার হয়ে তিনি এক কামরায় প্রবেশ করলেন। বিল্‌কিস তাঁরই সাথে সারা রাত বিনিদ্র কাটিয়েছেন। তিনি তাঁর শয্যার উপর গভীর ঘুমে অচেতন। সামিনা বেএখ্‌তিয়ার এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে শুয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

মা ঘাবড়ে গিয়ে বললেনঃ 'কি হল, সামিনা ? কথা বলছো না কেন?' মুরাদ এখন কেমন?'

ঃ 'আম্মাজান, উনি ঠিকই আছেন, বেশ ভালো আছেন। এখনই তিনি কথা বলছিলেন আমার সাথে।



কিছুক্ষণ পর বিল্‌কিস ও সামিনা মুরাদ আলীর কাছে গিয়ে বসলেন এবং মুরাদ আলী তাদেরকে শোনাতে লাগলেন তার অতীত দিনের কাহিনী। ইংরেজের সাথে মালিক জাহান খানের শেষ সংর্ঘ ও তাঁর নিজের যখমী হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি বিল্‌কিসকে সম্বোধন করে বললেনঃ 'চাচীজান, পরাজয়ের পর মহীশূরের সীমানার মধ্যে আমার কোনো আশ্রয়স্থল ছিলো না। ইংরেজরা আমার মস্তকের মূল্য

নির্ধারণ করে দিয়েছিলো। আমার সাথে পঞ্চাশজন লোক সীমান্তের এক মারাঠা সরদারের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলো। তাকে আমরা বন্ধু মনে করতাম। আগের যুদ্ধ-বিগ্রহে সে আমাদেরকে গোপনে সাহায্য করেছে। কিন্তু মালিক জাহান খানের মৃত্যুর পর দুনিয়া বদলে গেলো এবং আমরা জানতে পারলাম যে, লোকটি আমাদেরকে ইংরেজের হাতে তুলে দিতে চাচ্ছে। তার এক আত্মীয় হুঁশিয়ার করে দিলো আমাদেরকে এবং আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। যখমী ও অসুস্থ থাকার ফলে বেশী সময়ে আমি বন্ধুদের সাথে থাকতে পারিনি। আমার অনুরোধে তারা আমায় জংগলের এক বস্তিতে ছেড়ে চলে যায়। বস্তির কিষাণ ও রাখালরা নেকদীলীর পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু আমার অবস্থা খুব খারাপ ছিলো এবং আমি সেখানে মরতে চাইনি।'

বিল্‌কিস অশ্রুসজল চোখে বললেনঃ 'বেটা, তুমি সোজা এখানে চলে এলে না কেন?'

ঃ 'চাচীজান, আমার ভয় ছিলো, আপনি আমার কারণে আবার কোনো মুশ্‌কিলে না পড়ে যান এবং এখনো আমি খুব শীঘ্‌গিরই এখানে থেকে চলে যেতে চাচ্ছি। সওয়ারীর সামর্থ্য হলেই আমি আপনাদের কাছ থেকে এজাযাত নেবো।'

সামিনার মুখ বিষাদের মেঘে ছেয়ে গেলো।

বিল্‌কিস বললেনঃ 'বেটা, এখানে তোমার কোনো বিপদ নেই। কোনো বিপদ এলে আমার বিশ্বাস, হাশিম তোমার সাহায্য করতে পারবে। হায়দরাবাদ ও আধুনীর শাসন কর্তৃপক্ষের বহু বিশিষ্ট লোক তাঁর দোস্ত।'

মুরাদ আলী বললেনঃ 'চাচীজান, যে উম্‌রাহ্‌ দাক্ষিণাত্যের হুকুমতকে সুলতান টিপুর হত্যায় অংশ নিতে বাধা দিতে পারেনি, তারা আমার জন্য কিছু করতে পারে না। নিযাম ইংরেজের সন্তোষের জন্য শুধু মহীশূরবাসীদের পাইকারী হত্যায় অংশ নিয়েই নিরস্ত হন নি; বরং নিজস্ব প্রজাদের নিস্বনিরন্ন অসহায় করে তাদের সামনে তুলে দিয়েছেন। আমার জন্য তারা তাদের ফিরিংগি মনিবদের নারায করবে, এরূপ প্রত্যাশা করা আত্মপ্রতারণা মাত্র। তাদের কাছে থেকে কোনো সদাচরণের প্রত্যাশা থাকলেও তাদের আশ্রয় গ্রহণ করা আমার মনঃপূত নয়। যদি আমার প্রত্যয় জন্মে যে, এখন যিল্লত ও গোলামীর যিন্দেগী এখ্‌তিয়ার করা ছাড়া কোনো চারা নেই আমার, তা'হলেও আমি এমন কোনো মনিবের আনুগত্য কবুল করবো না, যে নিজেই ইংরেজের গোলাম।'

ঃ 'কিন্তু তুমি কোথায় যাবে?' বিল্‌কিস বিষণ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেনঃ 'চাচীজান, এমন এক দেশ আমি দেখে এসেছি, যেখানকার কিষাণ ও রাখাল এখনো আযাদীর গীত গায়। আমি আফগানিস্তানে চলে যাবো। দিল্লীর মুসলমানদের ফরিয়াদ যাদেরকে নিয়ে এসেছিলো পানিপথের ময়দানে, তারা আমায় হতাশ করবে না, এই আমার বিশ্বাস। কাবুল নদীর কিনারে রয়েছে

একটি ছোট বস্তি এবং সে বস্তির বৃদ্ধ সরদার ছিলেন পানিপথের মুজাহিদদের সাথী। তিনি চাচা আকবর খান ও আব্বাজানকে জানতেন এবং তিনি আমায় আপনাদের গোষ্ঠীর সেই লোকদের সন্ধান দিয়েছেন, যারা রোহিলাখণ্ড থেকে হিজরত করে সেখানে আবাদ হয়েছেন।'

সামিনা কিছু বলতে চান, কিন্তু তাঁর বাকশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। বিল্‌কিস অন্তহীন যাতনায় মুরাদ আলীর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'বেটা, আফগানিস্তানের নতুন পরিস্থিতি তুমি জানো না। সেখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যামান শাহ্‌র সম্পর্কে এ খবরও রটেছে যে, তিনি বিদ্রোহীদের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়েছেন।'

মুরাদ আলী বললেনঃ 'চাচীজান, আমার মুসীবতের সর্বাধিক অন্ধকার দিনেও আমি আফগানিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর থাকিনি। যামান শাহ্ সম্পর্কে সকল গুজবই আমি শুনেছি। সম্ভবত এসব গুজব সত্যি, কিন্তু কওম যদি যিন্দা থাকে, তা'হলে নিকৃষ্টতম অবস্থাকেও তারা অনুকূল বানিয়ে নিতে পারে। আমার বিশ্বাস, আফগানিস্তানের বাসিন্দারা যামান শাহ্‌র পরেও তাদের আযাদীর পতাকা ভূলুণ্ঠিত হতে দেবে না। বাইরের বিপদ যখন আসবে, তখন আফগান সরদারদের ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হোতে দেরী লাগবে না। এই উদ্বেগজনক খবরই আফগানিস্তান যাবার ইরাদা আমার ভিতরে আরো দৃঢ় করে দিয়েছে। হয়তো আমি তাদের কোনো খেদমত করতে পারবো এবং ইংরেজ আধিপত্যের যে গতি মহীশূরের শক্তিশালী কেল্লা মিস্‌মার করে দ্রুত এগিয়ে চলেছে উত্তরদিকে, তার প্রচণ্ড তীব্রতার অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারবো তাদের অন্তরে। ইসলামের যে দুর্ভাগা সন্তানরা স্বচক্ষে দেখেছে সেরিংচাপটমের উপর রোয কিয়ামতের অভিনয়, তাদের ফরিয়াদ নিয়ে আমি যাবো আহ্‌মদ শাহ্ আবদালীর পুত্রদের কাছে। কওমের ইয্‌যত ও আযাদীর জনা ভিতরের গাদ্দাররা কতো বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়, তা' আমি বলবো তাদেরকে। আমি তাদেরকে বলবোঃ ইসলামের সুখ্যাতির রক্ষা করা, সেরিংগাপটমের ঘটনাবলী থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। তোমাদের কাতারে যদি কোনো মীর সাদিক থাকে, তা'হলে সময় আসার আগে তার হাত থেকে নাজাতের ব্যবস্থা করো। যদি তোমরা বাইরের বিপদ থেকে চোখ বন্ধ করে আত্মকলহে লিপ্ত হও, তা'হলে তোমাদের পরিণাম আমাদের থেকে আলাদা হবে না।'

মুরাদ আলী জোশের আতিশয্যের শয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন। বিল্‌কিস উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার কপালে হাত রেখে বললেনঃ 'বেটা, তোমার গায়ে জ্বর। শুয়ে পড়ো। সুস্থ হয়ে উঠলে আমি তোমার পথরোধ করবো না।

মুরাদ আলী শুয়ে পড়লেন। বিল্‌কিস সামিনার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'এসো, বেটি! ওকে বিশ্রাম করতে দাও।'

চারদিন পর আধুনীর চিকিৎসক বিল্‌কিসের গৃহে পৌঁছলেন। মুরাদ আলীর

সাথে যথারীতি সালাম বিনিময়ের পর তিনি জিব থেকে একখানা চিঠি বের করে তার সামনে পেশ করলেন। হাশিম বেগ লিখেছেনঃ

'প্রিয় ভাই, খোদার শোকর, আপনি খালাজানের কাছে পৌঁছে গেছেন। আমি আধুনীর যোগ্যতম চিকিৎসক হাকীম মোস্তফা খানকে আপনার এলাজের জন্য পাঠাচ্ছি। আমি নিজে আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এক হফ্‌তার মধ্যে আমার ছুটি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তান্‌বীর ও আম্মাজান আমার সাথে রয়েছে এবং তারাও আপনাকে দেখার জন্য আগ্রহান্বিত। আমরা খুব বেশী হলে দশ-পনেরো দিনের মধ্যে আপনার কাছে পৌঁছে যাবো। আপনার ভাই হাশিম।'

হাকীম মোস্তফা খানের এলাজ শুরু হওয়ার পাঁচ দিন পর মুরাদ আলীর জ্বর ছেড়ে গেলো এবং তার যখম ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগলো। আট দিন পর তিনি প্রথম ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে গাঁয়ের মসজিদে নামায আদায় করলেন এবং তার পরদিন হাকীম মোস্তফা খান ফিরে চলে গেলেন।



মুরাদ আলীর অসুস্থতার দিনগুলিতে সামিনা তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন যে, কালের বিপ্লব তাদের মাঝখানে খাড়া করে দিয়েছে এক দুর্লংঘ্য প্রাচীর। যেসব জংগলে পাহাড়ে মালিক জাহান খানের সাথীরা ছিলেন সংগ্রামরত, মুরাদ আলীর আগমনের পূর্বে কতো রূপে তা ভেসে উঠেছে তার কল্পনায়। জীবনপণ যোদ্ধাদের সাহাচর্যে মুরাদ আলীর যিন্দেগীর কতো বিচিত্র ছবি ভেসে উঠেছে তার কল্পনার চোখে। তিনি কখনো দেখেন যে, মুরাদ আলী যুদ্ধের ময়দানে শমশের হাতে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বন্দুকের দ্রুম দ্রুম আওয়ায, তলোয়ারের ঝংকার ও আহতদের আর্তচীৎকার ভেসে আসছে তার কানে। কখনও তিনি দেখেন, তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় যখমীদের সাথে পড়ে রয়েছেন এক অন্ধকার গুহায় এবং দুশমন বাহিনী তার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে জংগলে পাহাড়ে। রাত্রে ঘুমের মধ্যে এই উদ্বেগজনক চিন্তা রূপান্তরিত হয় ভয়ানক স্বপ্নে।

বিদ্রোহীদের পরাজয় ও মালিক জাহান খানের মৃত্যুর খবর শুনে তার উদ্বেগ চরমে পৌঁছে গিয়েছিলো। তথাপি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার মনে এ আশা কায়েম ছিলো যে, যিন্দা থাকলে মুরাদ আলী অবশ্যি আসবেন। তার প্রতিটি মুহূর্ত যে তারই স্মরণে কেটে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে তো তিনি বেখবর নন। উঠতে, বসতে, নিদ্রায় জাগরণে শুধু তারই আগমনের কল্পনা ভেসে ওঠে তার অন্তরে। তারপর খোদার দরবারে তার দোআ কবুল হল এবং মুরাদ আলী এসে পৌঁছলেন তাঁদের গৃহে, কিন্তু এ সেই নওজোয়ান নন, কয়েক বছর আগে যিনি আবার ফিরে আসার ওয়াদা করে বিদায় নিয়েছিলেন- যাঁর কল্পনায় ভরে ছিলো তার আশা ও স্বপ্নের

দুনিয়া। মুরাদ আলী বদলে গেছেন। এখন তার বিপর্যস্ত দুনিয়ায় সামিনার জন্য কোনো স্থান নেই। আফগানিস্তান যাবার ইচ্ছা প্রকাশের পর তিনি ভবিষ্যত সম্পর্কে সামিনার আশা-আকাংখার নিভু নিভু প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছেন। তিনি কেন আফগানিস্তান যাচ্ছেন, সে নিয়ে কোন অভিযোগ তার নেই। সামিনার একমাত্র অভিযোগ, মুরাদ তার নিজস্ব আঘাতের কারণ চিন্তা করতে গিয়ে তাকে উপেক্ষা করে গেছেন। হায়! তিনি যদি একবার- শুধু একটিবার বলতেনঃ আমাদের ভবিষ্যতের অন্ধকার পাড়ি দিতে পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজন। তুমি চাইলে কাবুল নদীর কিনারে আমি তোমার জন্য গড়ে তুলবো একটি ঝুঁপড়ি।'

তিনি বারবার চিন্তা করেনঃ 'মুরাদ আলী আমার অনুভূতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফিল, এও কি হতে পারে? আমার সকল স্বপ্নের তাৎপর্য কি এই যে, তিনি মাত্র কয়েকদিনের জন্য এখানে এসে চিরদিনের জন্য চলে যাবেন?' অভিযোগের এক তুফান বুকে নিয়ে তিনি তাঁর কামরায় প্রবেশ করেন, কিন্তু মুরাদ আলীর দুর্বল শীর্ণ মুখ ও উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি তার মুখ বন্ধ করে দেয়। তিনি মুহূর্তের জন্য সামিনার দিকে তাকান, তার পরই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ছাতের বা পাচিলের দিকে। তিনি অন্তহীন চেষ্টা সত্ত্বেও এর বেশী কিছু বলতে পারেন নাঃ এখন আপনার তবিয়ত কেমন?'

আধুনীর হাকীম সাহেবের ফিরে যাবার দু'দিন পর এক দুপুর বেলা মুরাদ আলী আধো ঘুমে শয্যার উপর পড়ে রয়েছেন। সামিনা কামরায় প্রবেশ করলেন। মুরাদ আলী চমকে চোখ খুললেন এবং তাকে দেখে উঠে বসলেন। সামিনা বললেনঃ 'হাশিম ভাই ও তান্‌বীর আপনার খবর এসেছে। ওরা আধুনী থেকে রওয়ানা হয়েছেন এবং কাল-পরশু পর্যন্ত এখানে পৌছে যাবেন। মুনাওয়ার বললোঃ 'আজ ভোরে আপনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। হাকীম সাহেব তাকিদ করে গেছেন, কিছুদিন আপনার চলাফেরা না করা উচিত।'

ঃ 'বেশী দূরে আমি যাইনি।'

সামিনা কয়েক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধীরে পা ফেলে দরযার দিকে গেলেন।

ঃ 'সামিনা!' মুরাদ আলী ডাকলেন।

তিনি থেমে তার দিকে ফিরে তাকালেন।

ঃ 'বসো, সামিনাঃ আমি তোমার সাথে কথা বলবো।'

সামিনা তার বুকে একটা খুশীর কম্পন অনুভব করলেন এবং এগিয়ে গিয়ে তিনি তার ডানদিকের কুরসিতে বসলেন।

ঃ 'সামিনা। খানিকক্ষণ চুপ থেকে মুরাদ আলী বললেনঃ 'তুমি আমার উপর রাগ করেছো?'

ঃ 'তা' কি জন্যে?' সামিনা তার দিকে না তাঁকিয়ে চাপা গলায় বললেন।

ঃ ' আমি আফগানিস্তান যাচ্ছি বলে তুমি রাগ করেছো?'

সামিনা তার ঠোটের উপর বিষণ্ন হাসি টেনে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আমি রাগ করলেই বা কি এসে যায়?'

ঃ 'শোন, সামিনা, আমি তোমায় বলতে চাই যে, তোমার কাছ থেকে শেষবার আমি যেদিন বিদায় নিয়ে চলে যাই, সেদিন মহীশূরের আসমানে এক অন্ধকার ঝড়ের পূর্বাভাষ দেখা সত্ত্বেও আমার দুনিয়া ছিলো যিন্দেগীর উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর এবং আমার মনে বিশ্বাস ছিলো যে, কোনোদিন ফিরে এসে আমি তোমার পায়ে ঢেলে দেবো সারা দুনিয়ার খুশী। আমি তোমায় বানাবো তোমার দেশ ও তোমার গৃহের চাইতে শ্রেয়ঃ এক দেশের এক গৃহের সৌন্দর্যের প্রতীক। কিন্তু এখন আমার দুনিয়া বদলে গেছে। এখন আমার কোনো দেশ নেই, কোনো গৃহ নেই। আমি এক লুণ্ঠিত কাফেলার নিঃসম্বল মুসাফির। এখন আমি তোমায় আমার দুঃখ-মুসীবতের শরীক বানাতে পারি না। হাশিম বেগের সাথে মোলাকাতের পরই আমি চলে যাবো এখান থেকে।'

' আপনার নিরুপায় অবস্থার কথা আমি জানি এবং আপনার পথ রোধ করতেও আমি পারবো না। কিন্তু আপনি এখান থেকে একা যাবেন না।'

ঃ বলে সামিনা উঠে দরযার দিকে চললেন।

ঃ 'সামিনা, সামিনা।' মুরাদ আলী কম্পিত কণ্ঠে ডাকলেন। সামিনা দরযার কাছে থেমে তার দিকে তাকাতে লাগলেন।

মুরাদ আলী বেদনাব্যঞ্জক কণ্ঠে বললেনঃ 'তুমি কি এমন একটি মানুষের সাহচর্য মেনে নেবে, যার পথে কাঁটা ছাড়া আর কিছু নেই?'

সামিনা জওয়াব না দিয়ে হাসলেন এবং সাথে সাথেই তার চোখে উথলে উঠলো অশ্রুধারা।

ঃ 'সামিনা, আমার কথার জওয়াব দাও। আমি শাহ্বাযের বোন ও সরদার আকবর খানের কন্যার কাছে জানতে চাই, তিনি কি মামুলী রাখাল অথবা কিষাণের সংকীর্ণ পর্ণকুটিরে যিন্দেগী কাটাতে পারবেন ?'

তিনি জওয়াব দিলেনঃ 'আপনার, সংকীর্ণ পর্ণকুটিরই আমি নিযামের প্রসাদের চাইতে প্রশস্ত মনে করবো।'

বিল্‌কিস এসে কামরায় প্রবেশ করলেন। বললেনঃ 'বেটা, হাশিমের পয়গাম

এসেছে।

ঃ 'হাঁ চাচীজান, সামিনা আমায় বলেছে।'

বিল্‌কিস কুরসির উপর বসলেন এবং সামিনা কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মুরাদ আলী বললেনঃ 'চাচীজান, আপনার এজাযত হলে আমি কিছু বলতে চাই।'

বিল্‌কিস সস্নেহ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'বলো, বেটা!'

মুরাদ আলী কিছুক্ষণ ইতস্তত করে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'চাচীজান, লোকে বলে, রাতের অন্ধকারে মানুষের ছায়াও তাকে ছেড়ে যায়। কিন্তু আপনার কাছে এসে আমি অনুভব করেছি যে, আমি এ দুনিয়ায় একা নই। আমি আপনার কাছে বলতে চাই .....'

ঃ 'কি বলবে, বেটা? চুপ করে গেলে কেন?'

ঃ 'চাচীজান!' অশ্রুভরা চোখে তিনি বললেনঃ 'আজ সামিনার সাথে আলাপের পর আমি আমার অন্তরে অনুভব করি যিন্দেগীর আশা-আকাংখার দিকে হাত বাড়ানোর প্রয়োজন। আমার অবস্থা আপনার কাছে পুশিদা নেই এবং আমার ভবিষ্যত সম্পর্কেও আমি কোনো উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলতে পারছি না। আমার সকল পুঁজি অতীতের স্মৃতিতে সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমার নিঃসম্বল অবস্থা, অসহায়তা ও অসামর্থ্য সত্ত্বেও আমি চাই সামিনাকে ভবিষৎতের অন্ধকার পথে আমার জীবনসংগিনী বানাতে।'

বিলকিস সস্নেহে তাঁর হাত দু'টি মুরাদ আলীর মাথায় রেখে বললেনঃ 'বেটা, এ কথা বলবার জন্য এত দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন ছিলো না তোমার। আমি সামিনার মা। আমি জানি, সে তোমার পথের কাঁটাকে ফুলের চাইতেও বেশী প্রিয় মনে করবে। তুমি আগে যখন এসেছিলে, তখনই আমি দীলের মধ্যে সামিনার ভবিষ্যত সম্পর্কে ফয়সালা করে রেখেছি।'

'মুরাদ আলী কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে বললেনঃ 'চাচীজান, সে ছিলো আর এক যামানা। তখন আমি গর্ব ও আত্মসম্ভ্রমের সাথে কথা বলতে পারতাম, কিন্তু আজ সে মনোভাব সেরিংগাপটমের মাটিতে দাফন হয়ে গেছে।'

বিল্‌কিস বললেনঃ 'তুমি মোয়ায্‌যম আলীর পুত্র, এতটুকু জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

সামিনা কামরায় প্রবেশ করলেন এবং এগিয়ে এসে মখমলের ছোট্ট একটি থলে মুরাদ আলীর হাতে দিয়ে বললেনঃ 'এই নিন আপনার আমানত। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'

দেখতে দেখতে মুরাদ আলী কল্পনা কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে। তিনি থলেটি স্পর্শ না করেই ভারাক্রান্ত আওয়াযে বললেনঃ সামিনা, ওটা তোমার কাছেই থাকতে দাও।'

সামিনা মায়ের দিকে তাকালেন এবং তাঁর ইশারায় থলেটি নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিল্‌কিস বললেনঃ 'বেটা, হাশিম বলছিলো, ও জওয়াহেরাত খুবই দামী। কিন্তু ধরে নাও, যদি তুমি দুনিয়ার দরিদ্রতম মানুষও হোতে, তা'হলে আমি সামিনার হাত তোমার হাতে তুলে দিতে গর্ব করতাম।'



পরদিন মুরাদ আলী গাঁয়ের মসজিদ থেকে এশার নামায পড়ে এসে জানলেন যে, হাশিম বেগ পৌঁছে গেছেন। তিনি তাঁর কামরার কাছে পৌঁছলে খাদেমা তাকে বাধা দিয়ে বললোঃ 'জনাব, বেগম সাহেবা আপনাকে ডাকছেন।'

তিনি তার সাথে সাথে চললেন। দু'মিনিট পরে তিনি বসত বাড়ির এক প্রশস্ত কামরায় প্রবেশ করলেন। সেখানে হাশিম বেগ, তান্‌বীর ও বিল্‌কিস পরস্পর আলাপ করছেন। মুরাদ আলী সালাম করলেন এবং হাশিম বেগ জলদী করে উঠে তাঁর গলা ধরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর তাঁকে নিজের কাছে বসিয়ে বললেনঃ 'আমরা এখনই আপনার সম্পর্কে কথা বলছিলাম। আমি সামিনা ও খালাজানকে মোবারকবাদ জানিয়ে ফেলেছি এবং আমার অনুরোধ, অবিলম্বে আপনাদের শাদী হয়ে যাক।

'বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনারা এখানে বেশীদিন থাকতে পারছেন না। দক্ষিণ হিন্দুস্তানের আনাচে কানাচে জাহান খানের সাথীদের সন্ধান চলছে। যেদিন আপনার এখানে পৌঁছাবার খবর পেলাম, তার দু'দিন পর দাক্ষিণাত্যের হুকুমত আধুনীর কাছে এক জংগল থেকে দশজন লোককে গ্রেফতার করে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করেছে। আমি তাদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হল না। আমি জানতে পেরেছি যে, কোনো মারাঠা সরদারও আপনাদের কতক সাথীকে ইংরেজের কাছে ধরে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত হয়তো ইংরেজ আপনার সম্পর্কে কিছু জানতে পারেনি। কিন্তু বেশীদিন আপনি এখানে লুকিয়ে থাকতে পারবেন না। এ এলাকা আপনার জন্য নিরাপদ নয়, বলা আমার পক্ষে পীড়াদায়ক, কিন্তু আপনার নিরাপত্তা বিধান আমার প্রথম কর্তব্য।'

মুরাদ আলী জওয়াব দিলেনঃ 'আমি শুধু আপনার আগমনের প্রতীক্ষা করেছিলাম।

হাশিম বেগ বললেনঃ 'খালাজান আমায় বললেন, আপনি নাকি আফগানিস্তান

যেতে চাচ্ছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

হাশিম বেগ বিল্‌কিসকে বললেনঃ 'খালাজান, আপনি আমার সাথে একমত হোলে কাল অথবা পরশু এঁদের শাদীর ইন্তেযাম করা যেতে পারে। আমাদের কোনো লম্বা চওড়া প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। খান্দানের কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে ডেকে আনলেই যথেষ্ট হবে। এঁদেরকে বিদায় করে দিয়ে আমরা আপনাকে আমাদের সাথে আধুনী নিয়ে যাবো।'

একটি ছোট্ট ছেলে অপর কামরা থেকে বেরিয়ে সোজা মুরাদ আলীর কাছে এসে বললোঃ 'আপনার নাম মুরাদ আলী?'

ঃ হ্যাঁ, আমারই নাম মুরাদ আলী।' 'তিনি হেসে জওয়াব দিলেন।'

হাশিম বেগ বললেনঃ এ আপনার ভাতিজা।

ছেলেটি বললোঃ 'ভাতিজা নই, ভাগ্নে। কেন, আপনি আমার মামু নন?'

ঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু তোমায় কে বলে দিয়েছে?'

ঃ 'খালা সামিনা আমায় বলেছেন।'

তান্‌বীর তাকে ইশারা করে কাছে ডেকে বললেনঃ 'উনি তোমার খালু, বেটা!'

ছেলেটি মুরাদ আলীকে ভালো করে এক নযর দেখে নিয়ে অপর কামরায় সামিনার কাছে ছুটে গিয়ে বুলন্দ আওয়াযে বললোঃ 'খালাজান, আম্মা বললেন, উনি আমার মামু নন, খালু।' সামিনা জলদী করে ছুটে এসে তার মুখ চেপে ধরলেন।'

তিনদিন পর মুরাদ আলী ও সামিনার শাদী হয়ে গেলো।

চার মাস পর মুরাদ আলী ও সামিনা পাহাড়ের পাদদেশে এক সড়কের উপর ঘোড়া থামিয়ে নীচের উপত্যকায় প্রবাহমান দরিয়ার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখতে লাগলেন। মুনাওয়ার খান ও আরো পাঁচজন নওকর কয়েক কদম আগে সড়কের এক মোড়ে মাল বোঝাই চারটি উটের কাছে দাঁড়িয়ে। পেশাওয়ার থেকে যে কাবুলগামী ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে ওঁরা কয়েক মনযিল অতিক্রম করেছেন, সে কাফেলাটি প্রায় দু'মাইল পিছনে এক ঘাটি অতিক্রম করে যাচ্ছে।

মুরাদ আলী দরিয়ার কিনারে এক বস্তির দিকে ইশারা করে বললেনঃ 'সামিনা, ওই যে সরদার মুকাররম খানের বস্তি। ওই আমাদের আখেরী মন্‌যিল দরিয়ার অপর কিনারে পাথরঢাকা পাহাড়ী এলাকার পিছনে তোমাদের গোষ্ঠীর লোকদের আবাদী।

কোনো দিন আমরা যাবো তাদের কাছে। এই সে যমিন, যে দেখেছিলো মাহ্মুদ গজ্নবী ও আহ্মদ শাহ্ আবদালীর শৌর্য ও মহিমা। এ সেই পবিত্র মাটি, যার কণায় কণায় বিধৃত রয়েছে মুসলমানের গৌরব কাহিনী। হিন্দুস্তানে আমাদের আযাদীর ঝাণ্ডা ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেছে এবং সেই তলোয়ার ভেঙ্গে গেছে, যা' বছরের পর বছর ধরে দক্ষিণ হিন্দুস্তানে ইংরেজ হামলার সয়লাব প্রতিরোধ করেছিলো। আমাদের সকল উদ্যম-উৎসাহ সুলতান শহীদের সাথে দাফন হয়েছে সেরিংগাপটমের মাটির বুকে। এক হিন্দুস্তানের কোনো কেল্লা, কোনো দরিয়া, বা পাহাড় রোধ করতে পারবে না ইংরেজ আক্রমণের সয়লাব। আফগানিস্তানের বর্তমান অবস্থাও যথেষ্ট নিরুৎসাহব্যঞ্জক, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই প্রস্তরময় পাহাড় প্রান্তর সে সয়লাবের সামনে শেষ প্রাচীর প্রমাণিত হবে। এখানকার উম্রাহ্র গৃহযুদ্ধের ভয় করি না আমি। সেই কিষাণ ও রাখালদের শৌর্য ও হিম্মতের উপর ভরসা আছে আমার, বিপদের দিনে যারা তাদের ঝুঁপড়িকে পরিণত করতে পারে অপরাজেয় কেল্লায়। এই আশা নিয়ে আমি এদেশে এসেছি যে, কোনো দিন হিন্দুস্তানে আমার মযলুম ভাইবোনদের ফরিয়াদ এদেরকে অধীর চঞ্চল করে তুলবে। এই পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসবেন কোনো মাহ্মুদ এবং সুলতান শহীদের রূহ্ কাবেরী নদীর কিনারে তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। এই মাটি থেকে উঠে আসবেন কোনো আহ্মদ শাহ্ আবদালী এবং হিন্দুস্তানের মুসলমান তাদের অন্ধকারময় দিনে দেখতে পাবে এক নতুন প্রভাতের সুর্যশিখা। তারপর আমরা না হলে আমাদেরই ভাবী বংশধররা হবে এখানে থেকে দক্ষিণ-পূর্বগামী মুজাহিদ বাহিনীর সংগী।

'সামিনা, এ দেশের আত্মসম্ভ্রমশীল বাহাদুর মানুষের দীলে আমাদেরকে পয়দা করে তুলতে হবে সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা, যা একদিন মাহ্মুদ গজ্নবীকে সোমনাথে ও আহ্মদ শাহ আবদালীকে পানিপথের ময়দানে টেনে নিয়েছিলো। মুকাররম খানের সাথে মোলাকাতের পর আমি এই অনুভূতি নিয়ে ফিরে গিয়েছিলোম যে, যদি আফগানিস্তানে কোনো খোদার বান্দা ইসলামের সত্যিকার প্রাণধারা জাগিয়ে দিতে পারে, তা'হলে এ সরযমিন হবে আলমে ইসলামের এক অপরাজেয় কেল্লা। আমার ভবিষ্যত সম্পর্কে এখানে আমি যে স্বপ্ন দেখছি, তা' কতোটা বাস্তবে রূপায়িত হবে, বলতে পারি না, কিন্তু আমি তোমার কাছে ওয়াদা করতে পারি যে, এখন আমাদের ভাগ্যলিপি ইংরেজের গোলমী নয়।

কয়েক মিনিট বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে কথা বলার পর তারা এগিয়ে চললেন এবং তাদের শ্রমক্লান্ত ঘোড়া ধীরে ধীরে উপত্যকার দিকে নেমে চললো। পরের মোড়ে মুনাওয়ার ও অন্যান্য লোকেরা তাদের সাথে মিলিত হল। তখন আসরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর তারা পৌঁছলেন কাবুল নদীর কিনারে। মুরাদ আলী ঘোড়া থেকে নেমে ওযুর জন্য এক পাথরের উপর বসলেন। আচানক তাঁর চোখের সামনে ভেসে এলো কাবেরী নদীর মনোরম দৃশ্য। কল্পনায়

তিনি দেখতে লাগলেন সেরিংগাপটমের কেল্লার পাঁচিল ও বুরুজ। আড়ম্বরপূর্ণ শহরের গলিতে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শৈশব ও যৌবনের সাথীদের সাথে। তিনি বেড়াচ্ছেন সেরিংগাপটমের খুবসুরত বড় বাগিচায়। তিনি সেই মুগ্ধকর মসজিদসমূহ তওয়াফ করছেন, যেখানে একদিন প্রত্যেক নামাযে দোআ করা হোত সুলতান টিপুর বিজয় কামনায়। তারপর একে একে তাঁর চোখে ভেসে আসতে লাগলো তাঁর গৃহের কতো চিত্র। যিন্দেগীর কতো হাসি আনন্দ সেখানে দাফন হয়ে রয়েছে। কতো আনন্দের অট্টহাসি খামোশ হয়ে গেছে।

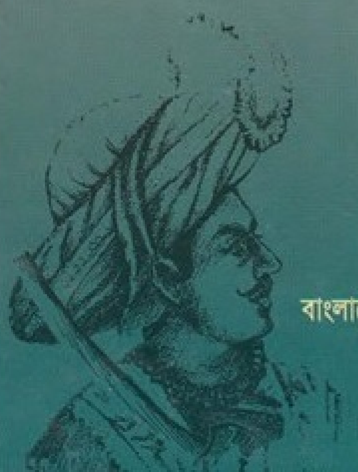
'অনেক দেরী হয়ে গেলো। কি ভাবছেন, আপনি?' সামিনা পিছন থেকে তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন।

মুরাদ আলী ফিরে তাকালেন। তাঁর দীপ্ত আঁখিকোণ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

ঃ 'কি হল? ' সামিনা ভারাক্রান্ত আওয়াযে প্রশ্ন করলেন 'আপনি কাঁদছেন?'

ঃ 'কিছু নয়, সামিনা। কাবেরী নদী থেকে কাবুল নদী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে মুসাফির, এ অশ্রু তার শেষ সম্বল।'

॥ সমাপ্ত ॥





বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা